স্বর্ণকুমারী দেবী

ডক্টর মীনা চট্টোপাধ্যায়

মাকে দিলাম

প্রথম প্রকাশ
২০০০

স্বর্ণকুমারীর দেবীর প্রতিকৃতি শিল্পী
রতন আচার্য্য

গ্রন্থস্বত্ব
ডঃ মীনা চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রণ ও কম্পিউটার টাইপ সেটিং
সাইবার জেট এন্টারপ্রাইজ,
২২/১ ক্রীক রো, কলিকাতা ৭০০ ০১৪
দূরভাষ ২৪৬ ৪৯৪১

Swarnakumari Devi

প্রকাশক :
অনুভাব
২৮এস. আর. দাস, রোড
কলকাতা- ৭০০ ০২৬
দূরভাষ ৪৬৪ ৭৭৬৯

পরিবেশক :
লিপিকা
৩০/১ কলেজ রো, কলকাতা-৯

বঙ্গবাতায়ন
১৯/১৯/১ পীতাম্বর ঘটক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০২৭
দূরভাষ ৪৭৯ ৯৪৮২

Preface :

Swarnakumari Devi (1856–1932) an elder sister of Rabindranath had enriched Bengali Literature through her varied but valuable contributions. But apart from the booklet, prepared by Brojendranath Bandyopadhyaya and a short article written by Manmatha Nath Ghosh on Swarnakumari's life and work no major work was done till now. Shrimati Chattopadhyaya has prepared the biographical history of Swarnakumari meticulously and thoroughly, correcting some errors and adding fresh materials, from all available sources. Her treatment of Swarnakumari's novels, both historical and social, have been fairly treated, especially her debt to Bankimchandra has been clearly explained. Swarnakumari, though less known to present-day readers as a writer of short stories and a poet, she certainly deserves a place among the story writers and poets in modern Bengali Literature. Shriamti Chattopadhyaya has done justice to Swarnakumari while discussing those two topics.

P. N. Bisi
(Pramatha Nath Bisi)

নিবেদন :

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক স্বর্গীয় ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সালে আমি এই গবেষণার কাজটি সমাপ্ত করেছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য প্রদত্ত এই গবেষণা কাজের পরীক্ষক ছিলেন স্বর্গীয় অধ্যাপক শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন ও অধ্যাপক শ্রী প্রমথনাথ বিশী। স্বর্গীয় অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন ছিলেন বিশেষ পরামর্শদাতা।

আজ সুদীর্ঘ সাতাশ বছর পরে বইটিকে প্রকাশ করতে পেরে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার অগ্রজ শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় ও অনুজপ্রতিম শ্রী বিপ্রদাস ভট্টাচার্যকে যাদের আন্তরিক সহায়তা ভিন্ন বইটি হয়ত কোনদিনই প্রকাশনার মুখ দেখত না। এ ব্যাপারে আরও একজনের নাম অবশ্যই করতে হয়, সে হল আমার কলেজের অশিক্ষক সহকর্মী শ্রী অসিত সিমলাই, বইটির প্রকাশনার প্রস্তুতি পর্বে যার বিশেষ সহায়তা পেয়েছি। এছাড়া গবেষণা কাজের তথ্য সংগ্রহে আমি বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছি ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া লাইব্রেরী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার প্রমুখ গ্রন্থাগারগুলি থেকে। সবশেষে বলতে হয় শ্রী অনীত তালুকদারের কথা যিনি যথাসাধ্য পরিশ্রম করে বইটির সুচারু সুষ্ঠু প্রকাশনায় আন্তরিকতার সঙ্গে বিশেষ সহায়তা করেছেন। এছাড়া প্রকাশনাকর্মে সংযুক্ত প্রত্যেকটি কর্মীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

মীনা চট্টোপাধ্যায়

অমৃত বিহার প্রজেক্ট
ফ্ল্যাট নং ১/৪, ব্লক জি,
কামালগাজী,
ডাকঘর - নরেন্দ্রপুর
দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা
পিন কোড - ৭৪৩৫০৮

সূচীপত্র

স্বর্ণকুমারী দেবী

[প্রথম ভাগ]

পৃষ্ঠা

[দ্বিতীয় ভাগ]

প্রথম ভাগ

সূচনা

উনিশ শতকের শেষদিকে সৃষ্টিধর্মী ও মননশীল সাহিত্য সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্যের দেবদেউলকে ভাস্বর করে তুলেছিলেন প্রতিভাশালিনী লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী। প্রায় অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ধরে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে সৃষ্টি কার্য চালিয়ে তিনি স্বকীয়তার নিদর্শনও রেখে গেছেন। স্বর্ণ-প্রতিভা শুধুই সাহিত্যসৃষ্টির বৈচিত্র্যে নয়, বাঙলা দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মহলেও নিয়ে এসেছিল আলোড়ন। লেখনী স্বর্ণকুমারীর আগেও বাঙালী মহিলা ধরেছিলেন, কিন্তু সে লেখনীতে নারীস্বভাবের স্পর্শ ছিল বেশি— যে-স্বভাব থেকে চ্যুত হয়ে প্রথম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বকীয় সৃজনীপ্রতিভার নৈপুণ্য দেখালেন স্বর্ণকুমারী। এই বিশিষ্টতা স্বর্ণকুমারী আকস্মিকভাবে পান নি, পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর দুকূলপ্রসারী উজানের পরিপূর্ণতায় ভরা জীবনবোধ থেকে। ঠাকুরবাড়ীর পরিবার এই জীবনবোধ পেয়েছিল পাশ্চাত্ত্য নব্যসংস্কৃতি ও ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের মানসিক সম্পদের সমন্বয় থেকে।

শতাব্দীকাল ধরে বাঙালীর ভাব ও চিন্তারাজ্যে অক্ষুণ্ণ উজ্জ্বলতা বহন করে আসছে যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী সেই বংশেই স্বর্ণকুমারীর জন্ম। উনিশ শতকের প্রথমদিকে গণ্যমান্য প্রগতিশীল ধনী বাঙালী বলে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন স্বর্ণকুমারীর পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪—১৮৪৬)।

দ্বারকানাথের তিন পুত্র— দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭—১৯০৫), গিরীন্দ্রনাথ (১৮২০—৫৪) ও নগেন্দ্রনাথ (১৮২৯—৫৮)। দেবেন্দ্রনাথের আগে দ্বারকানাথের এক অল্পায়ু কন্যাসন্তান ছিল। দেবেন্দ্রনাথের পরেও এক পুত্র নরেন্দ্রনাথ (আয়ু ৩ বছর) এবং গিরীন্দ্রনাথের পরে এক পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ (১৮২৬—৩৯) ছিলেন।[১] দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেন (১৮১৭ সাল) তখনও তাঁর স্বোপার্জিত এই বিপুল বিত্তের আগমন হয় নি। দ্বারকানাথের তখনও পৈতৃক গোলপাতার ঘর বিদ্যমান।[২] অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের জন্ম হয় নি, তিনি জন্মেছিলেন তার সূচনাক্ষেত্রে। 'আত্মজীবনী'তে দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন, প্রথম যেদিন তিনি শাল গায়ে দিয়েছেন সেদিনের কথা তাঁর মনে আছে।[৩] বিষয়সম্পত্তির পর্যবেক্ষণে, তৎকালীন কলকাতার নানা লোকহিতকর অনুষ্ঠানে, ইউরোপীয় ও দেশীয় বিভিন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে বিবিধ সামাজিকতায় দ্বারকানাথকে সব সময় ব্যস্ত থাকতে হত। দেবেন্দ্রনাথের বয়স যখন ছ-বছর তখনই দ্বারকানাথ গর্ভণমেণ্টের বিশ্বাসভাজন হয়ে ভাবী অতুল সম্পদের ভিত্তি স্থাপনের নানা চেষ্টায় নিযুক্ত। কিন্তু কর্মবাহুল্য সত্ত্বেও ছেলের শিক্ষা, সভ্যতার দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। ছ-বছর বয়সে হাতে খড়ি দিয়ে বাড়ীর পাঠশালায় গুরুমশায়ের কাছে দেবেন্দ্রনাথের বিদ্যারম্ভ হল। তারপর কিছুকাল বাড়ীতেই তিনি গৃহশিক্ষকের কাছে ইংরাজী, বাংলা, ফারসী

পড়লেন এবং গান শিখলেন। বছর নয়েক বয়সে তাঁকে গাড়ী করে নিয়ে গিয়ে রামমোহন (১৭৭৪—১৮৩৩) নিজের স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। ১৮৩০ সালে দেবেন্দ্রনাথ ভর্তি হলেন হিন্দু কলেজে। সেখানে তিন চার বছর তিনি পড়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বাল্যকালটা পিতামহীর স্নেহ পরিচর্যাতেই কেটেছে। তিনি শয়ন উপবেশন আহার সব করতেন পিতামহীর সঙ্গে। তাই বাল্যে নিরামিষ আহারেই তিনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন।[৪]

অতি শৈশবকাল থেকেই রামমোহন রায়ের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের যোগাযোগ। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। পরবর্তী জীবনে দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের যে আরব্ধ কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব নিজে তুলে নিয়েছিলেন, বিধাতার কোন অমোঘ বিধানে দেবেন্দ্রনাথের জীবনে তার সূত্রপাত বাল্যকাল থেকেই হয়। তাই অতি শৈশবে যখন রামমোহনের সঙ্গে বাক্যালাপের বিশেষ সুযোগ ছিল না, তখন থেকেই বালক দেবেন্দ্রনাথের কাছে রামমোহনের মুখের কী এক নিগূঢ় আকর্ষণ ছিল। এ স্বীকারোক্তি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে আছে।[৫] রামমোহন কখনো দেবেন্দ্রনাথকে উপদেশ দেন নি, তবু দেবেন্দ্রনাথের উপর তাঁর অপরিসীম প্রভাব ছিল, যে প্রভাব দেবেন্দ্রনাথের আত্মানুভূতি জাত। ভারতীয় সনাতন অধ্যাত্ম ঐতিহ্যকে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির আলোক উদ্ভাসিত নব পরিবেশে আপন কর্মে ভাবনায় গ্রহণ করে রামমোহনের কর্মপ্রচেষ্টাকে সার্থক ও সত্য করে তোলার উৎসাহ দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কাছেই পেয়েছেন। এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি রয়েছে : "... যদিও রাজার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, যদিও তিনি আমাকে কোন উপদেশ দেন নাই, তথাচ তাঁহার মুখশ্রী এবং চরিত্র আমার হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। তাঁহার দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম।"[৬] ১৮২৯ সালে দেবেন্দ্রনাথের বার বছর বয়সে বিবাহ হয়, বধূ সারদাদেবীর বয়স তখন ছয়। তাঁর সৌভাগ্যের জোরে স্বীয় ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি হয়েছিল বলে দ্বারকানাথ মনে করতেন। সেজন্য খুশি হয়ে তিনি পুত্রবধূ সারদাদেবীকে (১৮২৪—৭৫) হীরা পান্না বসানো খেলনা কিনে দিয়েছিলেন।[৭] সারদাদেবী ধর্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। পরবর্তীকালে স্বামী দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনিও দালানে তাঁর পাশে বসে উপাসনা করতেন।

বিষয় বাণিজ্যের সুবিধার জন্য দ্বারকানাথকে যে বিলাস-ব্যসনের আয়োজন করতে হত, তার ফলে প্রিয় পুত্রের অনিষ্ট হতে লাগল। সতের আঠার বছর বয়সে কিছুকাল দেবেন্দ্রনাথ পিতার আয়োজিত বিলাসব্যসনে মত্ত হয়েছিলেন, যার জন্য পিতা বারবার তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিলেন ও অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু পুত্রের অর্থব্যয়ের অধিকার সঙ্কুচিত করতে স্বভাবতই তাঁর স্নেহপ্রবণ হৃদয় সম্মত হল না। তার পরিবর্তে তিনি দেবেন্দ্রনাথকে কাজে নিয়োগ করলেন।[৮] ব্যবসাকাজের উপযোগী শিক্ষা দেওয়ার জন্য পিতা দ্বারকানাথ পুত্রকে হিন্দুকলেজ থেকে ছাড়িয়ে এনে ছোটভাই রমানাথ ঠাকুরের অধীনে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে শিক্ষানবীশিতে নিযুক্ত করে দিলেন। ১৮৩৮ সাল নাগাদ দেবেন্দ্রনাথ শিক্ষানবীশ থেকে রমানাথ ঠাকুরের সহকারীর পদে উন্নীত হলেন।[৯] নব্যশিক্ষার উগ্রতা দেবেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করতে পারল না। বাল্যে রামমোহন রায়ের স্কুলে স্বদেশের ধর্ম সংস্কৃতির সংস্কার ও উন্নতি সাধনেরই শিক্ষা পেয়েছিলেন তিনি।

হিন্দুকলেজেও বেশিদিন পড়লেন না তিনি, তাই 'ইয়ংবেঙ্গল' দলের হিন্দুর ধর্ম সংস্কার আচার ব্যবহারের প্রতি অবজ্ঞাও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারল না।

এতদিন দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম বা ঈশ্বর জানেন নি। আকস্মিকভাবে দেবেন্দ্রনাথের জীবনে এল পরিবর্তন। ঈশ্বরের আশ্চর্য বিধানে ১৮৩৮ সালে দেবেন্দ্রনাথের ২১ বছর বয়সে চিত্তের গতি একেবারে বিপরীত মুখে বইল। সে দিনটির কথা তিনি আত্মজীবনীতে বর্ণনা করেছেন। দিনটি হল— পিতামহীর মৃত্যুর পূর্বদিন। পূর্ণিমার রাতে দেবেন্দ্রনাথ বসেছিলেন নিমতলার গঙ্গার ঘাটে, একখানা চাঁচের উপর। গঙ্গা তীরে একটি খোলার চালাতে পিতামহীকে রাখা হয়েছিল, তাঁর কাছে নাম সংকীর্তন করা হচ্ছিল। সে সময়ে দেবেন্দ্রনাথের মনে এক আশ্চর্য উদাস ভাব উপস্থিত হল। মনে হল তিনি যেন পূর্বের মানুষ নন, ঐশ্বর্যের উপর এল বৈরাগ্য। এক অপূর্ব আনন্দ ও ঔদাস্য নিয়ে-রাত্রি দ্বিপ্রহরে বাড়ী ফিরলেন তিনি। পরে সে আনন্দ আর রইল না, রইল শুধু ঔদাস্য, বিষাদ। সেই আনন্দ ফিরে পাবার জন্য তাঁর হৃদয়ে আকুলতা জাগল।[১০] দ্বারকানাথের তখন বিপুল বিষয়-আশয়। তিনি চেয়েছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সম্পত্তি পরিচালনায় পিতার সহায়ক হবেন। কিন্তু হল অন্য রকম। তিনি দেখলেন পুত্রের মনের গতি, লক্ষ্য অন্যদিকে, অধ্যাত্ম চিন্তায় তাঁর অনুরাগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে তিনি অতিশয় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে পিতার এই দুশ্চিন্তার উল্লেখ আছে।[১১] দ্বিতীয়বার বিলেত গিয়ে দ্বারকানাথের দেবেন্দ্রনাথকে লিখিত ১৮৪৬ সালের ২২মে-র চিঠিতেও এই দুর্ভাবনার উল্লেখ আছে।[১২] কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তখন ঈশ্বর অন্বেষণে ব্যাকুল। পিতামহীর মৃত্যুর পর ১৮৩৬/৩৭ সালে একদিন 'কল্পতরু' হয়ে তিনি নিজের সব বিষয় সম্পত্তি বিলিয়ে দিলেন। তবু মনের বিষাদ আর ঘোচে না। কেবলই খুঁজছেন মনের শান্তি, ঈশ্বরচিন্তায় তিনি আত্মবিভোর। এ সময় সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করলেন তিনি, ভারতীয় দর্শন পুরাণ পড়ে দেখবেন ঈশ্বরকে পাওয়ার পথ পাওয়া যায় কি না। কমলাকান্ত চূড়ামণির কাছে প্রথমে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়তে আরম্ভ করলেন। ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রও এ সময়ে তিনি প্রচুর পড়েছিলেন।[১৩] আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ ইউরোপীয় কোন কোন দর্শনশাস্ত্র পড়েছিলেন তার উল্লেখ করেন নি। তাঁর জীবনীকার অজিতকুমার চক্রবর্তীর অনুমান অনুযায়ী তিনি লক, হিউম পড়েছিলেন। হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে হিউমের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল, সেই হিসেবে হিউম জানা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এছাড়া ভল্টেয়ার, রুশো, ডিজিরা, ডি আলেমবার্ট প্রভৃতি লেখকদেরও কিছু দেবেন্দ্রনাথ পড়েছিলেন বলে অজিত চক্রবর্তীর ধারণা।[১৪] যখন থেকে দেবেন্দ্রনাথ অনুভব করলেন ঈশ্বরের শরীর নেই, তাঁর প্রতিমা নেই, তখন থেকেই পৌত্তলিকতার উপর তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মাল। চেতনা হল তাঁর, রামমোহন রায়ের আদর্শকে মনে প্রাণে গ্রহণ করলেন তিনি, এবং স্থির করলেন পূজো করবেন না, প্রতিমাকে প্রণাম করবেন না। ভায়েদের নিয়ে দল বাঁধলেন দেবেন্দ্রনাথ, সঙ্কল্প করলেন পূজোর সময় পূজোদালানে কেউ যাবেন না। যদি কেউ যেতেনও, প্রণাম করতেন না। তখন সন্ধ্যের আরতির সময় দ্বারকানাথ দালানে যেতেন। সুতরাং ভয়ে দেবেন্দ্রনাথদেরও যেতে হত, কিন্তু প্রণামের সময় সবাই যখন ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করত, তাঁরা করতেন না। কেউ দেখতেও পেতেন না। পৌত্তলিকতার সমর্থক

শাস্ত্রকেও ত্যাগ করবার সঙ্কল্প নিলেন দেবেন্দ্রনাথ।[১৫] রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের (১৭৮৬—১৮৪৫) কাছে উপনিষদ পড়তেন দেবেন্দ্রনাথ। একেই বিষয় সম্পদে পুত্রের বিরাগ, উপনিষদ পড়লে সেই বৈরাগ্য, অধ্যাত্ম চিন্তা আরও বেড়ে যাবে— সেই ভেবে দ্বারকানাথ রামচন্দ্রকে ভর্ৎসনা করলেন দেবেন্দ্রনাথকে উপনিষদ পড়ানোর জন্য, যাতে উপনিষদ দেবেন্দ্রনাথের মনে আরও ইন্ধন যোগাতে না পারে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় প্রতিজ্ঞায় অটল। হেদুয়ার তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশের কাছে উপনিষদ পড়ে আসা শুরু করলেন এবং বিদ্যাবাগীশকে বাড়ীতে আসতে নিষেধ করলেন। উপনিষদকে অবলম্বন করে দেবেন্দ্রনাথ লক্ষ্য পথে এগোতে লাগলেন।[১৬] উপনিষদে নিজের আকাঙ্ক্ষিত সত্যের আলো পেয়ে সেই সত্যধর্ম প্রচারে অভিলাষী হয়ে ১৮৩৯ সালে (১৭৬১ শকাব্দ, ২১ আশ্বিন) কৃষ্ণাচতুর্দশীতে দুর্গাপূজোর উৎসবে যখন সবাই ব্যস্ত, তখন দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে একটি সভা স্থাপিত হল। সকলকে নিয়ে যখন দেবেন্দ্রনাথ সভায় বসলেন, একটা শ্রদ্ধার ভাব এসে যেন হৃদয় অধিকার করল। প্রথমে সভার নাম দিলেন 'তত্ত্বরঞ্জিনী'। দ্বিতীয় অধিবেশনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এলেন ও সভার নাম দিলেন 'তত্ত্ববোধিনী'। ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতির ভার গ্রহণ করলেন দেবেন্দ্রনাথ এবং স্থির হল 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ব্রাহ্ম সমাজের তত্ত্বাবধান করবে। দেবেন্দ্রনাথের নিজের জীবনেরও লক্ষ্য হল, ব্রহ্মকে পিতা, উপাস্য ও প্রভু হিসাবে উপাসনা করা। এই লক্ষ্য সুসম্পন্ন করার জন্য ১৭৬৫ শকাব্দে (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে) ভাদ্র মাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রচারের সঙ্কল্প করলেন দেবেন্দ্রনাথ।[১৭] এমন সময় দ্বারকানাথ বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে একদিন তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ডের বোন মিস এমিলি ইডেন প্রমুখ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় মহিলাদের এক ভোজ দেন (২৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৪৯)। এ ব্যাপারে কোন বিখ্যাত বাঙালী বলেছিলেন যে, দ্বারকানাথ কেবল ইংরেজদের নিয়ে আমোদ করেন, বাঙালীদের ডাকেন না। একথা দ্বারকানাথের কর্ণগোচর হলে, তিনি একদিন ঐ বাগানে প্রধান প্রধান বাঙালীদের নিয়ে বাঈনাচ, গানবাজনা দিয়ে জমকালো মজলিস করেন। দ্বারকানাথ তাঁদের অভ্যর্থনা ও পরিতোষণের ভার দিলেন দেবেন্দ্রনাথকে। ঘটনাক্রমে সেদিন ছিল দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশন। সেই সভার অধিবেশন নিয়ে তিনি ব্যস্ত উৎসাহী— ঈশ্বরের উপাসনা করবেন সেদিন। অতএব এই গুরুতর কর্তব্য ছেড়ে বাগানের মজলিসে সেদিন দেবেন্দ্রনাথ যেতে পারলেন না। পিতার শাসনের ভয়ে একবার তাড়াতাড়ি সে বিলাসভূমি ঘুরে চলে এলেন। এই ব্যাপারে তাঁর মনের ঔদাস্য পিতা দ্বারকানাথের দৃষ্টি এড়াল না।[১৮] ১৭৬৫ শকাব্দের ৭ই পৌষ (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ) দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম নিলেন। ব্রাহ্মধর্মে দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতার পরিবর্তে ব্রহ্মোপাসনার প্রবর্তন করলেন।[১৯]

দেবেন্দ্রনাথের জননী দিগম্বরী দেবীও (—১৮৩৯) ছিলেন স্বধর্মে নিষ্ঠ, দৃঢ় ও তেজস্বী চরিত্রের। দেবেন্দ্রনাথ মাকেও যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করতেন ও ভালবাসতেন। দ্বারকানাথ যখন সাহেবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা শুরু করলেন তখন দিগম্বরী দেবী স্বামীর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে জীবন কাটান। দেবেন্দ্রনাথের অল্প বয়সেই মায়ের মৃত্যু হয়। যখন পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করবেন বলে দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসংগ্রামে রত হন, তখন তিনি

একদিন স্বপ্নে দেখলেন, ধর্মে নিষ্ঠাবতী ছিলেন তাঁর যে মা, সেই মা তাঁকে আশীর্বাদ করে বলছেন, "তুই নাকি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছিস? কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।"[২০] স্বপ্নে মায়ের এমন আশীর্বাদ পেয়ে সে সময়ে দেবেন্দ্রনাথ অতিশয় আশ্বস্ত হয়েছিলেন। লাটসাহেবের ভগ্নীর সম্বর্ধনা ও তার অনুসরণে পিতার বাঙালীদের আপ্যায়িত করার মজলিসে দেবেন্দ্রনাথ বিরক্ত (১৮৪১), দ্বিতীয় বার পিতার ইংলণ্ড বাসকালে বিষয়সম্পত্তি দেখতে হচ্ছে বলে তিনি অসুখী (১৮৪৬)। 'কার ঠাকুর কোম্পানী'র আট আনার অংশীদার ছিলেন দ্বারকানাথ, বাকী আট আনার এক আনার অংশীদার ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ও সাত আনার ছিলেন ইউরোপীয়রা। দ্বিতীয়বার বিলেত যাওয়ার আগে দ্বারকানাথ তাঁর উইলে নিজের মৃত্যুর পরে নিজের অংশের আট আনার মালিকানাও দিয়ে যান দেবেন্দ্রনাথকে।[২১] জীবনভোর অপর্যাপ্ত ব্যয় ও দান করে দ্বারকানাথ মারা যাওয়ার সময় (১৮৪৬) এক কোটি টাকার দেনা ও মাত্র প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার বিষয় রেখে যান।[২২] পিতার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ কার ঠাকুর কোম্পানীর নিজের ও পিতৃপ্রদত্ত অংশ তিন ভায়ে সমান ভাগে ভাগ করে নিলেন। এর পর বছর দেড়েকের মধ্যেই 'কার ঠাকুর কোম্পানী' দেউলে হয়ে গেল। দ্বারকানাথের মৃত্যুর সময় যে দেনা ছিল, কোম্পানী দেউলে হওয়ার সময়ে তার শোধ করতে আর এক চতুর্থাংশ বাকী ছিল। এর অর্ধেকেরও বেশি ছিল বন্ধকী। কাজেই পাওনা ঠিকমত আদায় হলে বাকী ঋণ শোধ করতে দ্বারকানাথের ট্রাস্ট সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে হবে না। পাওনাদারদের ডেকে দেবেন্দ্রনাথ সমস্ত অবস্থা খুলে বললেন। তাঁর অসাধারণ সরলতাতে সবাই মুগ্ধ হল। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে জোড়াসাঁকোর বসতবাটী ও সেখানকার যাবতীয় সম্পত্তি থেকে গেল। 'কার ঠাকুর কোম্পানী ইন লিকুইডেশনে' কিছুদিন চলল, দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ কোম্পানী বাড়ীতে এনে যথাসাধ্য সাহায্য করলেন।[২৩] দেবেন্দ্রনাথ নিজের ব্যয় যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে পিতৃঋণের পরিমাণ কমিয়ে আনলেন। তার উপর দেবেন্দ্রনাথের অপর দুই ভাইও ব্যয়শীল ছিলেন। ভায়েদেরও অনেক ঋণ তাঁকে শোধ করতে হল, সে কথা আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন। গিরীন্দ্রনাথ জীবিতকালে নিজের খরচার জন্য অনেক ঋণ করেন। তার কতক অংশ দেবেন্দ্রনাথ পিতৃঋণের সঙ্গে শোধ করেন। কিন্তু তবুও দেবেন্দ্রনাথ উদাসীন। এই বৈরাগ্যের ভাবকে দেবেন্দ্রনাথ নিজের জীবনে অতিশয় মূল্যবান বলে মনে করতেন। দেবেন্দ্রনাথের বাসনাই পূর্ণ হল। তাঁর বিষয় সম্পত্তি সব চলে গেল। সেই শ্মশানের দিনটি থেকে যে ব্যাকুলতা মনে জাগছিল তারই সিদ্ধির পথে তিনি আরও খানিকটা এগোলেন, ঘরে থেকে সন্ন্যাসী হলেন। চাকরের ভিড় কমিয়ে তিনি গাড়ী ঘোড়া সব নিলামে দিলেন।[২৪] রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিতে' (১৯০৯) দেবেন্দ্রনাথের এ সময়ের পরিমিত আচারের উল্লেখ পাওয়া যায় : "প্রতিদিন চর্ব্য— চোষ্য— লেহ্য— পেয় পৃথিবীর যাবতীয় উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য পূরিত টেবিলের পরিবর্তে ফরাসের উপর বসিয়া কেবল রুটি ও ডাল ভক্ষণ ধরিলেন। দেবেন্দ্রবাবু টেবিলে খাবারের সময় একটু একটু সুরাপান করিতেন। এই সময় হইতে তাহা চিরকালের মত পরিত্যাগ করেন।"[২৫] উপনিষদে দেবেন্দ্রনাথ পড়েছিলেন নিষ্কাম পুরুষের সুখ শান্তির কথা, এখন নিজের জীবনে তা অনুভব করলেন। বিষয়মুক্ত হয়ে তিনি ব্রহ্মলোককে অনুভব করলেন। বেদ উপনিষদের সকল সারসত্য নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম

গড়লেন (১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ), তখন তাঁর বয়স ৩১ বছর। ব্রাহ্মধর্মে জীবাত্মা পরমাত্মা পরস্পর পরস্পরের সখা, তাঁরা সর্বদাই যুক্ত হয়ে আছেন। বিশ্বসংসার স্বপ্ন নয়, মানসিক ভ্রমও নয়, আপেক্ষিক সত্য। এর স্রষ্টা সত্যের সত্য, পূর্ণ সত্য। দেবেন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্মচিন্তা তাঁর সন্তানদের প্রভাবিত করেছিল।[২৬] তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২—১৯২৩) পৌত্তলিকতার বাহ্য আড়ম্বরে আধ্যাত্মিকতার ভাব কিছুই পেতেন না।[২৭] কন্যা সৌদামিনী দেবীও বাড়ীর পূজোয় অধ্যাত্মভাবের কিছু দেখতে পেতেন না, তাঁদের মনে হত, পূজোয় আড়ম্বরটাই বড়।[২৮] ঈশ্বর সম্বন্ধে এই সত্য অনুভূতি কন্যা স্বর্ণকুমারীও পেয়েছিলেন পিতার কাছ থেকে। তাঁর বিভিন্ন পত্রাবলীর মধ্যে এই অন্তর সত্যকে অনুভব করা যায়, যেখানে দেখা যায় বিভিন্ন দেবস্থানে গিয়েও পৌত্তলিকতার আতিশয্য স্বর্ণকুমারীর অন্তরানুভূতিকে বিচলিত করতে পারে নি।[২৯] দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপিত হওয়ার দশ বছর পরেও দুর্গা, জগদ্ধাত্রী পূজো হয়েছে, অন্য সবাইয়ের মনে আঘাত দিয়ে পূজো তুলে দিতে তিনি পারছেন না। দেবেন্দ্রনাথ নিজেই পূজোর সময় প্রত্যেক বছর বাইরে চলে যেতেন।[৩০] ক্রমশ: ঠাকুরবাড়ী থেকে পৌত্তলিকতা একেবারে অপসারিত হল, প্রত্যেক বছর ১১ই মাঘ ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠার দিন আমোদ উৎসব উপাসনার দ্বারা পালন করা শুরু হল।

সেকালের রীতিই ছিল পিতাপুত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা কম থাকত। দেবেন্দ্রনাথ আত্মকথায় বলেছেন, ছেলেবেলায় বাবার বৈঠকখানা ঘরের বাইরে ছুটে ছুটে বেড়াতেন। শেষে একদিন দ্বারকানাথ তাঁকে ডেকে বসতে বললে তখন ঘরের ভেতরে ঢুকেছিলেন।[৩১] সত্যেন্দ্রনাথেরও স্মৃতিকথায় আছে, ছেলেবেলায় তাঁরা বাবামশায়ের কাছে বেশি ঘেঁষতেন না। দেবেন্দ্রনাথ কখনও কখনও তাঁদের ডেকে ইংরাজী ও বাংলায় পরীক্ষা করতেন। কখনও বা পিতার মজলিশে গিয়ে শিশুরা চুপটি করে বসে থাকতেন। পিতা ও সন্তানদের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল কেবল ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষার বেলায়। ছেলেমেয়েদের দেবেন্দ্রনাথ নিজেই 'ব্রাহ্মধর্ম' পড়াতেন। ঠাকুরবাড়ীতে রোজ পারিবারিক উপাসনা হত। তাতে ছোটবড় সবাই পট্টবস্ত্র পরে যোগ দিত। উপাসনার পর দেবেন্দ্রনাথ সন্তানদের উপদেশ দিতেন। তাঁদের যা কিছু ত্রুটি দেখতেন কোন কোনদিন উপদেশে তার উল্লেখ করে তা শুধরে দেবার চেষ্টা করতেন।[৩২] সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "আমি যখন বিলেত থেকে ফিরে ইংরাজি রকম চালচলনের বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিলুম তখন তিনি একদিন দালানে উপাসনার সময়ে ইংরাজি রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণ— অতিরিক্ত সাহেবিয়ানার বিরুদ্ধে তীব্র ভর্ৎসনা সহকারে আমায় সাবধান করে দিয়েছিলেন— সে উপদেশটি আমার মনে চিরমুদ্রিত থাকবে। বিলেতে থাকতে আমি তাঁকে একবার নাচ মজলিসে বিবিসাহেবের একসঙ্গে নৃত্য বর্ণনা করে পত্র লিখেছিলুম— তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন যেন আমি সেই রাক্ষসী মায়ায় মত্ত হয়ে লক্ষ্য হারা হয়ে আমার আসল কাজ ভুলে না যাই।"[৩৩]

দেবেন্দ্রনাথের জীবনে আদর্শ ছিল বড়, নিজের সিদ্ধান্তে ছিলেন দৃঢ়। পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নিয়ে তখনকার হিন্দুসমাজে বেশ আলোড়ন উপস্থিত হয়। রাজনারায়ণ বসু এ সম্পর্কে লিখেছেন : "দেবেন্দ্রবাবু শ্রাদ্ধের দিন পিণ্ড দান না করিয়া কেবল দানোৎসর্গ করিলেন। ঠিক যে ব্রাহ্ম প্রণালীতে ক্রিয়া সম্পাদন হইল বলা যায় না। কিন্তু তখনকার

হিন্দুসমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহা অত্যন্ত আধ্যাত্মিক সাহসের কার্য বলিতে হইবে এবং ইহা ব্রাহ্মধর্মের প্রথম অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যাহা হউক একান্ত ব্রাহ্ম প্রণালী অনুসারে না হওয়াতে সংবাদপত্রে বিলক্ষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল।'[৩৪] আবার অপৌত্তলিক ভাবে করাব জন্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেও তাঁর মনোমালিন্য হয়। এ সময়ে দেবেন্দ্রনাথের মনে যখন ঘোরতর সংগ্রাম চলছিল, তখন স্বর্গগতা জননীকে তিনি একদিন স্বপ্নে দেখেছিলেন এবং নিজ সিদ্ধান্তে আশ্বাস পেয়েছিলেন।[৩৫] সাকার উপাসনার মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে অলক্ষিতভাবে ঠাকুর পরিবারে অমূর্তভাবের ঈশ্বর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হল।

আবির্ভাব

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে যখন এমন নব্যভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতির, উপাসনার মরশুম চলেছে সেইসময় ১৮৫৬ খ্রষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট দেবেন্দ্রনাথের দশম সন্তান ও চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারীর জন্ম। বাংলাদেশে তখন স্ত্রীশিক্ষার প্রত্যুষ হলেও, ঠাকুরবাড়ীর অন্তঃপুরে তখন শিক্ষার স্রোত বইতে শুরু করেছে। ঠাকুরবাড়ীতে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন যে অনেকদিন ধরেই রয়েছে সে কথা স্বর্ণকুমারী দেবী বলেছেন: "যখন আমার মাতৃদেবী পুত্রবধূ হইয়া আমাদের গৃহে আসেন, সে প্রায় শতাব্দী কালেরই কথা। তখন আমাদের প্রপিতামহের পরিবারে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং তাঁহার ভ্রাতাভগিনীগণ সকলেই তখন সপরিবারে এক বাড়ীতেই বাস করিতেন। শুনিয়াছি, এই বহু পরিবারের মধ্যে কোন নারীই তখন মূর্খ ছিলেন না। বরঞ্চ ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ বিদ্যাবতী বলিয়া আদরণীয়া ছিলেন। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা তখনো তাঁহারা গৌরবের বিষয় বলিয়াই মনে করিতেন।"[৩৬] মায়ের বয়সী আত্মীয়াকে তিনি দেখেছেন, সুশিক্ষিতা বলে মেয়ে ও পুরুষমহলে যথেষ্ট সম্মানীয়ারূপে।

স্বর্ণকুমারীর ভাইবোনদের বাল্যকালটা প্রায় কেটেছে মেজকাকীমা অর্থাৎ গিরীন্দ্রনাথের পত্নী যোগমায়া দেবীর কাছে। মেজকাকীমা তখনও পৃথক হননি। দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী সারদা দেবী ছিলেন বহু সন্তানের জননী। কিছুটা সেইকারণে ও কিছুটা স্বভাবগত ঔদাস্যবশতঃ তিনি ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো তেমন করতে পারতেন না। ছেলেমেয়েগুলি তাই তাদের আবদার মেটাত মেজকাকীমার কাছে। তাঁকে তারাও যেমন ভালবাসত তিনিও তেমন তাদের ভালবাসতেন। শিশুগুলির আশ্রয় ছিল মেজকাকীমার ঘর। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, এই মেজকাকীমার ঘরই ছিল তাঁদের আড্ডার আসল জায়গা। সেই তাঁদের শিক্ষালয়, সেই তাঁদের বিশ্রামস্থান। বলতে গেলে এই মেজকাকীমাই ছিলেন শিশুগুলির মাতৃস্থানীয়া। তাঁর কাছে সারদাদেবীর ছেলেমেয়েরা তাস খেলতো, গল্প শুনতো, বেছে বেছে বই পড়তো— হাতেমতাই, লয়লামজনু, নবনারী, আরব্য উপন্যাস, ল্যাম্বস টেল, পল ভার্জিনিয়ার অনুবাদ।[৩৭] যেদিন ভোরে মেজকাকীমা গঙ্গাস্নানে যেতেন, তাঁর সঙ্গী হতেন দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭—১৯২০)। ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে মেজকাকীমা ও তাঁর ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে বলতেন হেমেন্দ্রনাথ (১৮৪৪—৮৪)। মেজকাকীমা শ্রদ্ধার সঙ্গে সে কথা শুনতেন। কিন্তু তাঁর মেয়েরা তাতে কান দিতেন না। অবশেষে তাঁরা শালগ্রাম শিলাটিকে নিয়ে সামনের বাড়ীতে উঠে গেলেন। গিরীন্দ্রনাথ (১৮২০—১৮৫৪) হিন্দুধর্মেই রয়ে গেলেন। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মে তিনি আস্থা রাখতে পারলেন না। অর্থাৎ প্রচলিত সমাজকে উপেক্ষা করা তিনি সঙ্গত মনে করেন নি। মেজকাকীমা চলে যাওয়াতে ছেলেমেয়েগুলির আঘাত লাগল খুব বেশি।[৩৮]

শৈশবে ও বাল্যে যে আবেষ্টনীতে স্বর্ণকুমারী মানুষ হয়েছেন, তা তিনি নিজেই বর্ণনা করে গেছেন: "আহার বিরাম পূজা-অর্চ্চনার ন্যায় সেকালেও আমাদের অন্তঃপুরে লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে একটি নিত্যনিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে গয়লানী যেমন দুগ্ধ লইয়া আসিত,মালিনী ফুল যোগাইত, দৈবজ্ঞ ঠাকুর পাঁজি পুথি-হস্তে দৈনিক শুভাশুভ বলিতে আসিতেন, তেমনি স্নান বিশুদ্ধা, শুভ্রবসনা, গৌরী বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইতেন। ইনি নিতান্ত সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি ব্যুৎপত্তিসম্পন্না ছিলেন না। সংস্কৃত বিদ্যায় ইঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল, অতএব বাঙ্গলা ভাষা জানিতেন, ইহা বলা বাহুল্য।"[৩৯] স্বর্ণকুমারীর এই বৈষ্ণব ঠাকুরাণীর কাছে আর পড়া হয় নি। মা, দিদি, মামীমা এঁদের পড়ার বিষয় ও আগ্রহ সম্বন্ধে স্বর্ণকুমারী আরও বলেছেন: "বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী যে পুস্তক হইতে বর্ণবোধ করাইতেন, তাহার নাম শিশুবোধ। পুস্তকখানি আমি বড় হইয়া দেখিয়াছি। অক্ষরমালা, বানান, দেবদেবী বন্দনা, যামবর্ণনা, লিপিলিখন প্রণালী— এ সমস্তই এই একখানি পুস্তকের মধ্যে স্তূপীকৃত। বন্দনা ও বর্ণনার ভাষা এত কঠিন দুর্বোধ্য যে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া পড়িলেই বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা একরকম শেষ হইয়া যায়। তাঁহারা লেখা অভ্যাস করিতেন প্রথমে তালপাতে, তাহার পর কলাপাতে। বালির কাগজে কঞ্চির কলমের মক্‌স সর্বশেষে।

আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা অনুরাগ দেখিয়াছি। মাতাঠাকুরাণীত কাজকর্ম্মের অবসরে সারাদিনই একখানি বই হাতে, আর কোন বই না পাইলে শেষে অভিধানখানাই খুলিয়া পড়িতে বসিতেন। বড়দাদা মহাশয়ের 'তত্ত্ববিদ্যা'র (১৮৬৬—৬৯) সমঝদার তাঁহার মত আর কেহ ছিল না। মামীমা, দিদি, বধূঠাকুরাণীগণ প্রভৃতি নবীন দল অবশ্য কাব্য উপন্যাসেরই অনুরাগিণী ছিলেন।"[৪০] বৈষ্ণবী আসতেন অন্তঃপুরিকা বিবাহিতা কন্যা ও বধূদের পড়াতে। অবিবাহিতা মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে যেত গুরুমশায়ের পাঠশালায়। ফলে শিক্ষার ভিত্তিটা ছেলেমেয়েদের সমান ভাবেই হত।[৪১] স্বর্ণকুমারী বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর ছাত্রী হননি। বাল্যে তিনি পাঠশালায় পড়েছিলেন বলেই অনুমান করা যায়। পড়তে শিখে পর্যন্ত স্বর্ণকুমারীর কাজ ছিল মামীমাকে রামায়ণ, মহাভারত, হাতেমতাই পড়ে শোনানো। বাড়ীতে মালিনী বই আনত বিক্রী করতে। ঘরে ঘরে যেমন পুতুল, কাপড়ের আলমারী থাকত, তেমন সিন্দুকবন্দী বইও থাকত। সে বইয়ের মধ্যে ছিল "মানভঞ্জন, প্রভাসমিলন, দূতী-সংবাদ, কোকিলদূত, রুক্মিণীহরণ, পারিজাতহরণ, গীতগোবিন্দ, প্রহ্লাদ চরিত্র, রতিবিলাপ, বস্ত্রহরণ, অন্নদামঙ্গল, আরব্যোপন্যাস, চাহার দরবেশ, হাতেমতাই, গোলেবকায়লী, লয়লামজনু, বাসবদত্তা, কামিনীকুমার ইত্যাদি।"[৪২]

অন্তঃপুরের সংস্কারসাধন

দেবেন্দ্রনাথ সিমলা পাহাড়ে চলে গেলে অন্তঃপুরে শিক্ষা সংস্কার বন্ধ হয়ে যায়। তিনি ফিরে আসার পর থেকেই (১৮৫৮ সাল) ধর্মসংস্কার, শিক্ষা সংস্কার প্রবল বেগে শুরু হল।[৪৩] সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭—১৯২০) লিখেছেন, কেশব সেনের (১৮৩৮—৮৪) অন্তঃপুরে মিশনারি মেয়েরা পড়াতে আসতেন, তাঁদেরকে দেবেন্দ্রনাথও অন্তঃপুরে নিয়োগ করলেন।[৪৪] তখনই দেবেন্দ্রনাথ শালগ্রাম শিলা বিসর্জন দিলেন, বাড়ীর সকলকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করলেন।[৪৫] বাঙালী খ্রীষ্টান মহিলা প্রতিদিন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে এসে অন্তঃপুরে পড়াতেন, সপ্তাহে একদিন মেম এসে বাইবেল পড়াতেন। এরপর দেবেন্দ্রনাথের কাছে মেমের শিক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদ মনে হল না। দেবেন্দ্রনাথ খৃষ্টধর্ম ও বাইবেলের গোঁড়া বিরোধী ছিলেন সেকথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর মত বিরোধ ও বিচ্ছেদের প্রধান কারণ কেশবচন্দ্রের বাইবেল ও খৃষ্ট ধর্মপ্রীতি। স্ত্রীশিক্ষার জন্য একজন অনাত্মীয় পুরুষ এ সময়ে দেবেন্দ্রনাথের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের নবীন আচার্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশী (? — ১৮৭৪) অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষক পদে নিযুক্ত হলেন (১৮৬২ সালে)। দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের (১৮৪৪—৮৪) তখন বিয়ে হয়ে গেছে। সারদা দেবীর (১৮২৪—৭৫) পুত্রবধূ তিন জন (সর্বসুন্দরী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও নৃপময়ী দেবী), ভ্রাতৃবধূ ও চারকন্যা সৌদামিনী, সুকুমারী (১৮৫০—৬৪), শরৎকুমারী (১৮৫৪—১৯২০) ও স্বর্ণকুমারী অন্তঃপুরে অযোধ্যানাথের কাছে পড়তেন। তাঁদের পড়বার বিষয় ছিল অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরেজি স্কুলপাঠ্য বই।[৪৬] বেথুন স্কুল স্থাপিত হলে (১৮৪৯ সালে) দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫১ সালের মাঝামাঝি কন্যা সৌদামিনী ও একটি ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সেখানে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।[৪৭] তাঁর অনুসরণে তাঁর অনুগত হরদেব চট্টোপাধ্যায়ও স্বীয় দুই মেয়েকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দেন। হরদেবের এ দুটি মেয়ে হল তাঁর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত অন্নদা ও সৌদামিনী। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ কুলীন প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের তিন পত্নী ছিল। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর সন্তানাদি ছিল না, এবং তৃতীয় পত্নী বামাসুন্দরীর ছিল আট কন্যা ও তিন পুত্র।[৪৮] এই আটকন্যার দুজন নৃপময়ী ও প্রফুল্লময়ীর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের দুই পুত্র হেমেন্দ্রনাথ (১৮৪৪—৮৪) ও বীরেন্দ্রনাথের (১৮৪৫—১৯১৫) বিবাহ হয়। স্বর্ণকুমারী স্কুলে যান নি। কিন্তু তাঁর শিক্ষায় যে পিতার বিশেষ সাহচর্য ও উৎসাহ ছিল, তার পরিচয় রয়েছে স্বর্ণকুমারীর নিজের লেখায়: "আমার পূজনীয় ও স্নেহময় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য যেভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তৎকালে হিন্দুবালিকাগণকে সেভাবে শিক্ষাপ্রদত্ত হইত না।"[৪৯] মহর্ষি কন্যাদের বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতও শেখাতেন। উপাসনাকালে দালানে বেদীর সামনে দেবেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক

বসতেন— দুপাশে টানা লম্বা আসনে বসত তাঁর পুত্রকন্যারা। উপাসনান্তে তিনি ছেলেমেয়েদের কাছে ধর্ম ব্যাখ্যা করতেন। স্বর্ণকুমারী তখন অল্পবয়স্ক ছিলেন। তাই তাঁর ব্যাখ্যার প্রতিটি কথা বুঝতে না পারলেও তিনি মুগ্ধ হয়ে তা শুনতেন। এছাড়া দেবেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে অন্তঃপুরে গিয়ে কন্যাদের সরল ভাষায় জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। স্বর্ণকুমারী লিখেছেন, "তিনি যাহা শিখাইতেন তাহা আমাদিগকে নিজের ভাষায় লিখিয়া তাঁহারই নিকট পরীক্ষা দিতে হইত। ছাত্রীদিগের মধ্যে আমিই ছিলাম সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, নগণ্য ব্যক্তি। সেইজন্য পরীক্ষাতে সকলের সমান হইবার জন্য আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিত। কিন্তু পরীক্ষার নম্বর আমরা কেহ জানিতে পারিতাম না। এইরূপে পিতৃদেব তাঁহার অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে শিক্ষার বীজ রোপণ করিয়াছিলেন।"[৫০] মেয়েদের পড়ানোর জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। স্বর্ণকুমারী দ্বিতীয় ভাগ শেষ করে বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতও শিখতে আরম্ভ করেন। দাদাদের কাছেও স্বর্ণকুমারী পড়াশুনায় পেয়েছেন অকুণ্ঠ উৎসাহ। সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ তাঁদের 'মেঘনাদ বধ কাব্য' প্রভৃতি পড়াতেন। বাড়ীর মেয়েদের পড়ানোয় হেমেন্দ্রনাথের খুব উৎসাহ ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের (১৮৪২—১৯২৩) পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫০—১৯৪১) লিখেছেন: "বিয়ের পর আমার সেজদেওর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইচ্ছে করে আমাদের পড়াতেন। তাঁর শেখাবার দিকে খুব ঝোঁক ছিল। ... আমরা মাথায় কাপড় দিয়ে তাঁর কাছে বসতুম আর এক একবার ধমকে দিলে চমকে উঠতুম।"[৫১] বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সীমা ছিল না। তিনি স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি প্রথম প্রথা ভেঙ্গে পত্নী নৃপময়ীকে বাড়ীর গায়ক বিষ্ণুর (১৮১৯—১৯০০) কাছে গান শেখানো আরম্ভ করেন।[৫২] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাতে অবশ্য আপত্তি করেন নি। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভাকে (১৮৬৫—১৯২২) লেখাপড়া, সঙ্গীত সবদিকে পারদর্শিনী করেছিলেন। প্রতিভার সঙ্গে পরে (১৮৮৬ সালে) বিবাহ হয় খ্যাতনামা সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮—১৯৪৬) জ্যেষ্ঠভ্রাতা আশুতোষ চৌধুরীর (১৮৬০—১৯২৪)। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮০) গীতিনাট্য ১৮৮১ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী প্রথম যখন বিদ্বজ্জনসভায় অভিনীত হয় তখন প্রতিভা দেবী 'সরস্বতী' সেজেছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেজেছিলেন 'বাল্মীকি'। সঙ্গীতে প্রতিভা দেবীর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। মেয়েদের মধ্যে তিনি প্রথম সঙ্গীতের স্বরলিপি রচনা ও প্রকাশ করেন। প্রতিভা দেবী সঙ্গীত শিক্ষা দেবার জন্য 'সঙ্গীত সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন ১৯১১ সালে (১৩১৮ বঙ্গাব্দে)। 'বালক' পত্রিকায় (১২৯২ বঙ্গাব্দ) তাঁর 'সহজে গান শিক্ষা' 'গান অভ্যাস' প্রভৃতি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়।[৫৩] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীর সহযোগে পরিচালিত তাঁর 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা'র (প্রথম প্রকাশ ১৩২০ বঙ্গাব্দ) দ্বারা সঙ্গীতচর্চা বাংলা দেশে প্রসারিত হয়েছে। স্বর্ণকুমারীর বাল্য ও শৈশব শিক্ষা বাবা ও দাদাদের কাছেই হয়েছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর বাগান দেশী সুগন্ধী ফুলে ভরে থাকত। সেখানে বিলেতী ফুল ছিল না। রোজ ভোর না হ'তে বাগানে স্বর্ণকুমারী আঁচল ভরে ফুল তুলতেন। তিনি লিখেছেন, "উপাসনার পর পিতৃদেব তেতালায় যাইতেন আমিও ফুল লইয়া তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইতাম। তিনি সহাস্যে থালাটি গ্রহণ করিয়া ফুলগুলি আঘ্রাণ করিতেন, আনন্দে আমার হৃদয়

ভরিয়া উঠিত। জানি না দেবতাকে অর্ঘ্য দান করিয়া কোন সাধকের মনে এইরূপ আনন্দ হয় কিনা।"[৫৩] পিতার প্রতি এই সুগভীর ভালবাসা ও ভক্তি দিয়েই স্বর্ণকুমারীর চরিত্র ও মনের গঠন হয়। মহর্ষি কন্যার কাছে ছোট ছোট কবিতা আবৃত্তি করতেন তাকে মুখস্থ করাবার জন্য। স্বর্ণকুমারীর স্বীয় উক্তি "কেবল কবিতা নহে, তাঁহার এক একটি সুন্দর আদরবাক্যে আমি আহ্লাদে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতাম। আমার উপন্যাসের অনেক স্থলে সেই সকল উপমা আমি ব্যবহার করিয়াছি।"[৫৪] একদিকে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মোপদেশ, তার পাশে পাশে ইংরাজী, বাংলা সংস্কৃত অধ্যয়নের মধ্যে দিয়ে স্বর্ণকুমারীর মানসিক ভিত্তিভূমি ও রুচি সুচারু সুন্দররূপে গড়ে উঠেছিল।

ঠাকুরবাড়ীর পরিবেশটা তখন ছিল সবদিকেই সংস্কারমুখী। সমাজে পরিবারে আচার ব্যবহারে যে পরিবর্তন দেবেন্দ্রনাথ এনেছিলেন তা সমাজের প্রতি নির্মমতা বশতঃ করেন নি, দেশকে সমাজকে তিনি ভালবাসতেন বলেই তা করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের এই দেশপ্রীতি থেকেই স্বর্ণকুমারীও পেয়েছিলেন সুগভীর স্বদেশানুরাগ ও দেশ সেবার উৎসাহ।[৫৫] সামাজিক প্রথার যেগুলির মধ্যে যেখানে যতটুকু সৌন্দর্য ছিল তার প্রতি দেবেন্দ্রনাথের মমতা ছিল। এই জন্য বিবাহের সময় স্ত্রীআচার এবং জামাইষষ্ঠী ভাইফোঁটা প্রভৃতি লৌকিক প্রথাগুলি তাঁর পরিবারে বরাবর চলে এসেছে।[৫৬] এ সম্বন্ধে তিনি অনেকের আপত্তিই শোনেন নি। পরিবারের মেয়েদের বুদ্ধি জ্ঞান ধর্মবৃত্তি মার্জিত ও উন্নত করার দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। বহুকালব্যাপী প্রচলিত স্ত্রীমহলের হীনাচারগুলিও তিনি একটি দুটি করে তুলে দিলেন। মেয়েদের বিয়ের একটি বিশেষ বয়স দেবেন্দ্রনাথ নির্ধারণ করলেন। ব্রাহ্ম ধর্মানুসারে বিয়ের একটি পদ্ধতিও গড়লেন তিনি। দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারীর বিবাহ (১৮৬১) থেকে দেবেন্দ্রনাথ এই নূতন বিবাহ পদ্ধতির প্রচলন করেন।[৫৭] তৃতীয়া কন্যা শরৎকুমারী (১৮৫৪—১৯২০) ও স্বর্ণকুমারী থেকে তিনি নিজের নির্ধারিত বয়সে মেয়েদের বিবাহ দেন। স্বর্ণকুমারীর বড়দিদি সৌদামিনী দেবী বলেছেন: "আমার সেজ এবং ন বোন অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত ছিল বলিয়া আত্মীয়েরা চারিদিক হইতেই মাকে এবং পিতাকে তাড়না করিতেন। মা বিচলিত হইয়া উঠিতেন কিন্তু পিতা কাহারও কোন কথা কানে লইতেন না।"[৫৮]

স্বর্ণকুমাবীর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী। অবরোধ প্রথার প্রতি তাঁর ছিল তীব্র বিতৃষ্ণা। ১৮৬২ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে বিলেতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা দেখে মুগ্ধ হন। বিলেত থেকে এদেশে ফিরে (১৮৬৪ সালের শেষদিকে) স্ত্রীজাতির যথার্থ উন্নতিকল্পে তিনি মনোনিবেশ করেন। স্ত্রীস্বাধীনতা আনতে বদ্ধপরিকর হলেন সত্যেন্দ্রনাথ। অন্তঃপুরে কয়েদখানার মত নবাবী বন্দোবস্ত তিনি সহ্য করতে পারতেন না। "আশৈশব ইনি মহিলা বন্ধু; স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী।"[৫৯] রামমোহন রায়ের বিলেত প্রবাসকালে (১৮৩১—৩৩) মিস মেরী কার্পেন্টারের (১৮০৭—৭৭) সঙ্গে যোগাযোগ হয়। রামমোহনের সূত্রে ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর অনুরাগের সূচনা হয়। রামমোহনকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন যথেষ্ট ও তখনই তিনি ভারতবর্ষ দেখবার জন্য

আগ্রহী হন। কিন্তু তখন তাঁর সে বাসনা কার্যকরী হয় নি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন ঘোষ ইংলণ্ডে থাকাকালে ব্রিষ্টলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মিস কার্পেণ্টার সাদরে এঁদের অভ্যর্থনা করেন। তাঁর ভারতপ্রীতিতে সত্যেন্দ্রনাথ ও মনোমোহন প্রীত হলেন এবং ভারতের তখনকার সামাজিক অবস্থা তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন।[৬০] মেরী কার্পেণ্টার স্বদেশে দরিদ্র ও নারীর হিতসাধনে অনলস পরিশ্রম করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে মেরী কার্পেণ্টারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সবিশেষ মঙ্গলপ্রসূ হয়েছিল ভারতের পক্ষে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে বিলেত থেকে লিখিত পত্রে সত্যেন্দ্রনাথ এঁকে "উদারস্বভাব পরোপকার ব্রতী উৎকৃষ্ট" স্ত্রীলোক বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতে এসে এদেশীয় নারীদের সুশিক্ষিত করা ছিল মেরী কার্পেণ্টারের অন্যতম উদ্দেশ্য। ১৮৬৬ সালে সেপ্টেম্বরে, তিনি মনোমোহনের সঙ্গে ভারতে আসেন, প্রথম বোম্বায়ে নামেন। সত্যেন্দ্রনাথ তখন আহমেদাবাদে সহকারী জজের কাজ করছিলেন। বোম্বায়ে কয়েকদিন থেকে মিস কার্পেণ্টার আহমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান।[৬১] এরপরে তিনি আরও তিনবার ভারতে এসেছিলেন এবং নানাস্থানে ভ্রমণ করে বিদ্যাসাগর প্রমুখ ভারত-প্রগতির তৎকালীন ধারক-বাহকদের সঙ্গে আলোচনা করে নানা উন্নতিমূলক সংস্কারের সূত্রপাত করেন। তার মধ্যে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুতের জন্য ফিমেল নর্মাল স্কুল সংস্থাপন, কারাগার সংস্কারের প্রচেষ্টা প্রধান। বিয়ের (১৮৫৯) কিছুদিন পরে সত্যেন্দ্রনাথ গোপনে বন্ধু মনোমোহন ঘোষকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। অবরোধ প্রথাকে তিনি অনিষ্টকর কুপ্রথা বলে মনে করতেন এবং তা ভাঙতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। বিলেত প্রবাসকালে সেখানে মেয়েদের অবরোধহীন চলাফেরা দেকে চমৎকৃত হতেন সত্যেন্দ্রনাথ, রাত্রে স্বপ্ন দেখতেন— তিনি বাড়ীর ভেতরের কাঠের ঝরকা ভেঙ্গে ফেলতে চেষ্টা করছেন। সেকথা তিনি স্ত্রীকে চিঠিতে লিখেছিলেন।[৬২] সে সময়েই সত্যেন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন বিদেশের তুলনায় আমাদের স্ত্রীজাতির পর্দার অন্ধকারে খর্বীকৃত বদ্ধ জীবনযাপনের দুঃখ। উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে এদেশের মেয়েদের মানসিক সঙ্কীর্ণতা। তাই বিদেশে বাসকালে তিনি পত্রমাধ্যমে এখানে স্ত্রীর যথোপযুক্ত শিক্ষার, মানসিকতা বিকাশের চেষ্টা করতেন। সেজভাই হেমেন্দ্রনাথকে সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে ইংরাজী শিখানোর ভার দিয়েছিলেন। স্ত্রীর মাধ্যমে তিনি বাঙালী নারী জগতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। বাল্যবিবাহের প্রতি তাঁর ছিল প্রচণ্ড বিদ্বেষ। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর বিয়ের সময় (১৮৫৯) বয়স ছিল সাত বছর। পিতা অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় সাত বছরে মেয়ের বিয়ে দিয়ে 'গৌরীদান' করেছিলেন। এই বাল্যবিবাহের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের অসন্তোষ সুপরিস্ফুট হয়েছে ১৮৬৪ সালের ১১ই জুন লণ্ডন থেকে স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে।[৬৩] সত্যেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল স্ত্রীকে ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীপুরুষের অবাধ মেলামেশার বিস্তৃত ক্ষেত্রে রেখে মানুষ করার, শিক্ষা দেওয়ার। বিলেত থেকে ফিরে সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৬৫ সালে বোম্বাইতে সার্ভিস আরম্ভ করলেন। তিনি স্থির করলেন, স্ত্রীকে নিয়ে যাবেন। সামনে তখন পর্বতপ্রমাণ বাধা। ঠাকুরবাড়ীর অন্তঃপুরে তখনও পুরোপুরি সংরক্ষণশীলতা রয়েছে। মেয়েদের তখন একই প্রাঙ্গণে এবাড়ী ওবাড়ী যেতে হলে পালকীতে যেতে হয়। গঙ্গাস্নানে যেতে হলে ঘেরাটোপ দেওয়া পালকীশুদ্ধ ডুবে আসেন তাঁরা। সে সময়

সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানদানন্দিনীকে বোম্বাই নিয়ে গেলেন। জাহাজে পৌঁছনোর পথটুকু তাঁকে পালকীতেই যেতে হল। দুবছর পরে যখন বাড়ী ফিরলেন সত্যেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক, তখন আর কেউ বধূকে পালকীতে গৃহে আসার কথা বলতে পারলেন না। স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন, "কিন্তু ঘরের বৌকে মেমের মত গাড়ী হইতে সদরে নামিতে দেখিয়া সেদিন বাড়ীতে যে শোকাভিনয় ঘটিয়াছিল, তা বর্ণনাতীত।"[৬৪] প্রবাসিনী বধূ বাড়ীতে পুনরায় স্বীকৃতিও সহজে পাননি, বাড়ীতে কিছুদিন তাঁরা প্রায় একঘরে হয়েছিলেন। কয়েকবছর পর দ্বিতীয়বার যখন সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই থেকে এলেন তখন বাঁধাবাঁধি অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে। প্রথমে সত্যেন্দ্রনাথকে অনেক সমালোচনা ও প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি আপন কর্তব্য কর্মে অটল। প্রথমবার বোম্বাই থেকে এসে সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীস্বাধীনতার পথে আরও একটি সোপান উত্তীর্ণ হলেন। স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন গভর্ণমেণ্ট হাউসে। সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "সে কি মহা ব্যাপার। শত শত ইংরাজ মহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী— সেখানে একটিমাত্র বঙ্গবালা— তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি ত ঘরের বৌকে প্রকাশ্যস্থলে দেখে রাগে, লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।"[৬৫]

এর পর পুরুষদের একান্ত আগ্রহে এক একটি ধাক্কায় ঠাকুরবাড়ীর অবরোধ ভাঙতে লাগল। স্বর্ণকুমারীর নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯—১৯২৫) প্রথমে ছিলেন পুরাতন পন্থী। ১৮৭২ সালে (ফেব্রুয়ারী মাসে) কেশবচন্দ্রের 'ভারত আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয়। কেশবচন্দ্র তখন স্ত্রীশিক্ষা স্বাধীনতা প্রসারে গভীর উৎসাহী। এর কয়েক মাস পরে কেশবচন্দ্রকে কটাক্ষ করে মেয়েদের স্বাধীনতার ব্যাপার নিয়ে হাস্যরসের অবতারণা করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনে (১৮৭২)। বিলেত থেকে ফেরার পর সত্যেন্দ্রনাথ যখন ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের আমূল পরিবর্তন সাধন করতে লাগলেন তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথও মেজদাদার প্রভাবে স্ত্রীস্বাধীনতার উগ্র পক্ষপাতী হয়ে উঠলেন। আগে স্ত্রীস্বাধীনতা নিয়ে কটাক্ষ করে লেখার জন্য তাঁর গভীর অনুতাপ এল। এ-বিষয়ে স্মৃতিকথায় তিনি বলেছেন, "স্ত্রীস্বাধীনতার শেষে আমি এত বড় পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম যে গঙ্গার ধারের কোন বাগানবাড়ীতে অবস্থান কালে আমার স্ত্রীকে আমি নিজে অশ্বারোহণ পর্যন্ত শিখাইতাম। তাহার পর জোড়াসাঁকো বাড়ীতে আসিয়া দুইটি আরব ঘোড়ায় দুইজনে পাশাপাশি চড়িয়া বাড়ী হইতে গড়ের মাঠ পর্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে পৌঁছিয়া দুইজনে সবেগে ঘোড়া ছুটাইতাম। ... এইরূপে অন্তঃপুরের পর্দা ত উঠাইলামই, সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের পর্দাটিও একেবারে উঠিয়া গেল।"[৬৬] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্ধুপত্নী শরৎকুমারী চৌধুরাণীকেও (১৮৬১—১৯২০) ঘোড়ায় চড়ানো শেখান দার্জিলিঙে। সময়টা ঠিক জানা না গেলেও ১৮৮৩ সালের আগে ব'লে অনুমান করা যায়। শরৎকুমারী দেবীর ১১৪ আপার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রায়ই সকালে স্ত্রীকে ঘোড়ায় ক'রে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হ'তেন।[৬৭] এই জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ঠাকুরবাড়ীর মেয়েরা পূর্বে যখন গাড়ী করে বেড়াত তখন গাড়ীর দরজা খুলতে দিতেন না। বাইরের কোন পুরুষ তাঁদের বাড়ীর মেয়েদের মুখ দেখলে তাঁর যেন মাথা কাটা যেত। ক্রমশঃ তিনি একটু একটু করে গাড়ীর দরজা খুলতে দিতে আরম্ভ করলেন, "সিকিখানা, আধখানা ক্রমে ষোল আনা।"

ঠাকুরবাড়ীর মেয়েরাও প্রথমে চড়তেন দরজাবন্ধ ঢাকা গাড়ি। পরে দরজা খোলা ঢাকা গাড়ি, পরে টপ ফেলা ফিটন গাড়ী। ক্রমে একেবারে খোলা ফিটন গাড়ী ধরলেন তাঁরা।[৬৮] বাড়ীর মেয়েদের বিদ্যাচর্চার দিকেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল। সন্ধ্যাবেলা মেয়েদের একত্র করে তিনি ইংরাজী থেকে ভাল ভাল গল্প তর্জমা করে শোনাতেন।[৬৯] স্বর্ণকুমারীর দাদারা এমনভাবেই স্ত্রীস্বাধীনতা শিক্ষার পক্ষপাতী হয়ে সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে ঠাকুরবাড়ীতে আনলেন শিক্ষা স্বাধীনতা সভ্যতা সুরুচিতে গড়া এক নূতন নারীজগত।

স্বর্ণকুমারীর ভ্রাতারা এই বিপুল বিস্ময়কর নারীমুক্তি ও স্বাধীনতা আনয়নের প্রেরণা উৎসাহ পরোক্ষ ও অপেক্ষাকৃত স্তিমিতভাবে পেয়েছিলেন পিতার কাছ থেকে। এতখানি পরিবর্তন দেবেন্দ্রনাথ আনতে পারেন নি, চানও নি। তবে তিনি পুত্রদের বাধাও দেন নি। তাঁর অন্তরেও মেয়েদের শিক্ষা সভ্যতা রুচি সংস্কৃতিকে উন্নত করার সজাগ বাসনা ছিল। তার পরিচয় রয়েছে স্বর্ণকুমারীর লেখায়: "বঙ্গমহিলার সাধারণ— প্রচলিত একখানি মাত্র শাড়ী পরিধানে অনাত্মীয় পুরুষের নিকট বাহির হওয়া যায় না, এই উপলক্ষে অন্তঃপুরিকাগণের বেশও সংস্কৃত হইল। দিদি, আমাদের মাতুলানী এবং বৌঠাকুরাণীগণ একরূপ সুশোভন পেশোয়াজ এবং উড়ানী পরিয়া পাঠাগারে আসিতেন। বাঙালী মেয়ের বেশের প্রতি আজীবন পিতামহাশয়ের বিতৃষ্ণা এবং তাহার সংস্করণে একান্ত অভিলাষ ছিল। মাঝে মাঝে মাত্র দিদিদের, কিন্তু অবিশ্রান্ত তাঁহার শিশুকন্যাদের উপর পরীক্ষা করিয়া, এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টারও তিনি ত্রুটি করেন নাই। আমাদের বাড়ীতে সেকালে খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সম্ভ্রান্ত ঘরের মুসলমান বালক বালিকার ন্যায় বেশ পরিধান করিত। আমরা একটু বড় হইয়া অবধি তাহার পরিবর্তে নিত্যনূতন পোষাকে সাজিয়াছি। পিতামহাশয় ছবি দেখিয়াছেন, আর আমাদের কাপড় ফরমাস করিয়াছেন, দরজি প্রতিদিনই তাঁহার কাছে হাজির, আর আমরাও। কিন্তু এত পরীক্ষাতেও তিনি আমাদের জন্য বেশ একটি পছন্দসই বেশ ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই।"[৭০] তাঁর এই বাসনা চরিতার্থ করেছিলেন পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ জ্ঞানদানন্দিনী। সত্যেন্দ্রনাথ যখন বোম্বাইতে স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন, তখন তাঁর পোষাক কেমন হবে সে নিয়ে ভাবনায় পড়লেন। কারণ বাইরে নিয়ে যাওয়ার মত সুরুচিপূর্ণ সুশোভন পোষাক মেয়েদের তখনও হয় নি। এখানকার অনেক দোকান ঘুরে তিনি এক ফরাসী মহিলার পরিকল্পনায় স্ত্রীর জন্য ফুলো ফুলো পায়জামা, পেশোয়াজ, মাথায় উড়ানী প্রভৃতি দিয়ে তুর্কী ধরণের এক পোষাক তৈরী করালেন। বোম্বাইতে এ পোষাক মেমসাহেবদের খুব প্রশংসা পেয়েছিল। কিন্তু এ পোষাকে তাঁদের খেদ ছিল, কারণ শাড়ীর সঙ্গে এর সাদৃশ্য ছিল না, কাজেই বাঙালী ঘরে এ পোষাক যে মর্যাদা পাবে না তা তাঁরা বুঝতেন। অবশেষে বোম্বাইতে থাকাকালে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী গুজরাটী মহিলার অনুকরণে সুশোভন সুদৃশ্যভাবে শাড়ী পরার প্রবর্তন করলেন। এ ব্যাপারে স্বর্ণকুমারী মন্তব্য করেছেন: "মেজবধূঠাকুরাণী বোম্বাই হইতে গুর্জ্জরমহিলার অনুকরণে সুশোভন সুদর্শন পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া যখন দেশে প্রত্যাগমন করিলেন তখনই তাঁহার (দেবেন্দ্রনাথের) ক্ষোভ মিটিল। দেশীয়তা, শোভনতা ও শীলতার সর্বাঙ্গীন সম্মিলনে, এ পরিচ্ছদ যেমনটি চাহিয়াছিলেন

ঠিক সেই রকম মনের মতনটি হইয়া বঙ্গবালাদিগের ঐকান্তিক একটি অভাবমোচনে তাঁহার অনেকদিনের বাসনা পূর্ণ করিল।"[৭১] দেবেন্দ্রনাথের এই স্ত্রীশিক্ষা সভ্যতা ও মুক্তিপ্রসারের প্রচেষ্টাকে আর এক অধ্যায় এগিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁর পুত্রেরা। অন্তঃপুরে আচারবিরুদ্ধ যে কাজই দেবেন্দ্রনাথ করেছেন, অধিকাংশই দ্বিতীয়পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের প্ররোচনায়। এ সমস্ত কাজে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন পিতার ডান হাত। অন্তঃপুরের সংস্কারের জন্য মাকেও তিনি দলে টেনে নিতে চেষ্টা করতেন।[৭২] আবাল্যকাল তাঁর যে উদ্দেশ্য ছিল, নিজে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাকে সফল করতে প্রয়াসী হলেন, সার্থকও হলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী পিতা ও মেজদাদা সম্পর্কে লিখেছেন: "পিতা মহিলাদিগের উচ্চশিক্ষার মূলপত্তন করিয়াছিলেন, পুত্র তদুপরি প্রাসাদ নির্মাণ করিলেন, পিতা তাঁহার অন্তঃপুরে যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, পুত্র তাহা সযত্নে ফলবন্ত করিয়া সে ফল সমাজে বিতরণ করিলেন; পিতা ঘরের সংস্কারে বঙ্গের নেতা, পুত্র ঘরের দৃষ্টান্ত পরকে সমর্পণে ধন্য। একজন স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার জনয়িতা, একজন স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক।"[৭৩]

মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর সঙ্গে শিল্পগত রুচি ও যোগ্যতা গড়ে দেওয়ার দিকেও দেবেন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল। সৌদামিনী দেবী বলেছেন, দেবেন্দ্রনাথ নিজে পরীক্ষা করতেন, তাঁর পিঁড়িতে আলপনা দেওয়া, মেয়েদের বধূদের চুল বেঁধে দেওয়ার পারিপাট্য। ১১ই মাঘের উপাসনায় সুরুচিপূর্ণ সুষমামণ্ডিত করে ঘর সাজানোর ভার থাকত মেয়েদের উপর। মেয়ে বউদের রান্না শেখানোর দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল।[৭৪] সূক্ষ্মরুচি ও অনুভূতিশীল পুরুষ ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ, তার সঙ্গে তাঁর ছিল অগাধ মমতা ও সহানুভূতি। তাই দিয়ে তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর নারীজগতকে নূতন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যপ্রতিভার উন্মেষকালে নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সন্ধ্যাবেলা যে তিনি বাড়ীর মেয়ে বধূদের একত্র করে ইংরাজী গল্প তর্জমা করে শোনাতেন তার থেকেই স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যসেবার আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টার উন্মেষ হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্মৃতিকথায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন: "আমি সন্ধ্যাকালে সকলকে একত্র করিযা ইংরাজী হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জ্জমা করিয়া শুনাইতাম— তাঁহারা সেগুলি বেশ উপভোগ করিতেন। ইহার অল্পদিন পরেই দেখা গেল যে, আমার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প বচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেইগুলি শুনাইতেন। আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিতাম। তখন তিনি অবিবাহিতা।"[৭৫] শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সঙ্গীতের চর্চাতেও ঠাকুরবাড়ীর মেয়েরা এগিয়ে এসেছিলেন। তখন ভদ্রঘরে মেয়েদের মধ্যে সঙ্গীত চর্চার প্রচলন ছিল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রথম হারমোনিয়ম আনিয়ে সঙ্গীতচর্চার প্রচলন করেন বাড়ীতে। অতি শৈশবে স্বর্ণকুমারী ছড়া বেঁধে কবিতাব ছন্দে কথা বলতেন এবং সে ছন্দের মিল অতি সহজেই সম্পন্ন করতেন। বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। নিজে নিজেই তিনি গান শিখেছিলেন এবং নবপ্রচলিত হারমোনিয়াম বাজাতেন। কারুর বাঁশী বাজানো শুনলে তন্ময় হয়ে পড়তেন — তখন তাঁর হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠত কল্পনার বিচিত্র সুন্দর ছবি, আপনা

থেকেই কণ্ঠে আসত গানের সুর। একদিন তিনি নিজের মনে গান গাইছেন, এমন সময়ে আকস্মিকভাবে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। অত্যন্ত খুশী হয়ে তিনি বললেন— "স্বর্ণ। তুমি এমন সুন্দর গাইতে পার তা ত জানতাম না।"[৭৬] এই সঙ্গীতানুরাগই তাঁকে পরবর্তীকালে বিচিত্র সুন্দর গান, কবিতা রচনায় প্রণোদিত করেছে সন্দেহ নেই।

ভাইবোন বধূরা মিলে হাসিগানে আনন্দে সাহিত্য সঙ্গীত চর্চায়, অভিনয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ীটিকে আনন্দময় মধুর করে রেখেছিলেন। এবাড়ীর ছেলেমেয়ে বধূ প্রত্যেকের স্মৃতিচিত্রে সেই আনন্দ উজ্জ্বল মধুর পরিবেশের সুরটি ফুটে উঠেছে। স্বর্ণকুমারীকে দাদারা অপরিসীম স্নেহ করতেন— তাঁর আকর্ষণীয় মধুর স্বভাব, সাহিত্যরচনার নৈপুণ্য ও ব্যক্তিত্বের জন্য। প্রতিদানে ভায়েদের প্রতি স্বর্ণকুমারীরও ছিল অশেষ অনুরাগ ও আন্তরিকতা। নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে যেমন স্বর্ণকুমারী সাহিত্য সৃষ্টিতে, সঙ্গীতচর্চায় উৎসাহ পেয়েছেন, তেমন নতুন বৌঠাকরুণ কাদম্বরী দেবীরও (১৮৫৯—১৮৮৪) তাঁর সঙ্গে গভীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। বহুগুণের অধিকারিণী ছিলেন কাদম্বরী দেবী, ঠাকুরবাড়ীর ছিলেন তিনি লক্ষ্মীস্বরূপা। তিনি নিজে সাহিত্য রচনা করেন নি কিন্তু সাহিত্যানুরাগিণী ছিলেন তিনি এবং সাহিত্য আলোচনায় আনন্দ পেতেন।[৭৭] কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫—৯৪) গুণমুগ্ধ ছিলেন কাদম্বরী দেবী। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্যের (১২৮৬ বঙ্গাব্দ) অনুরাগিণী পাঠিকা ছিলেন তিনি। তিনি কবিকে একটি পশমের আসন বুনে দিয়েছিলেন, সেই উপলক্ষে বিহারীলাল 'সাধের আসন' (প্রথম তিনসর্গ 'মালঞ্চ' পত্রিকায় ১২৯৫—৯৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) লেখেন।[৭৮] কবিকে তিনি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করে এনে খাওয়াতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০—১৯২৬) 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের (১৮৭০) প্রতিও তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল।[৭৯] কনিষ্ঠ দেবর রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১—১৯৪১) প্রতি তাঁর ছিল গভীর স্নেহ ও প্রীতি। রবীন্দ্রপ্রতিভার বিকাশে এই বৌঠাকরুণের দান অনেকখানি। স্বর্ণকুমারীর প্রায় সমবয়সী হিসেবে কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে তাঁর গভীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। সাহিত্যানুরাগ এই সম্পর্ককে দৃঢ়তর করেছিল পরবর্তীকালে 'ভারতী' পত্রিকার (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৭) সৃজনকালে।

সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের সঙ্গে নৃপময়ী দেবীর বিয়ের (১৮৬২) পর নৃপময়ীর বোন প্রফুল্লময়ী (১৮৫৪—১৯৪০) মাঝে মাঝে আসতেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী। তাঁকে দেখে ন দাদা বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য পছন্দ করলেন স্বর্ণকুমারী ও তাঁর সেজদিদি শরৎকুমারী। এ প্রসঙ্গে প্রফুল্লময়ী দেবীর স্ব— উক্তিই উল্লেখ করা যায়: "দিদির বিবাহের পর আমি প্রায়ই মায়ের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়ী আসা যাওয়া করিতাম। সেই সময় আমাকে দেখিয়া আমার ননদ স্বর্ণকুমারী ও শরৎকুমারীর পছন্দ হওয়াতে আমার স্বামীকে বিবাহ করিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে থাকেন। আমার স্বামী সেই কথায় তাঁহাদিগকে বলিয়া ছিলেন যে, তিনি কলা বৌকে বিবাহ করিবেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের মধ্যে খুব একটা হাসাহাসির রোল পড়িয়া যায়। আমি আসিতেই আমাকে তাঁহারা দুজনে মিলিয়া সাজাইয়া আমার স্বামীকে

দেখাইবার জন্য বাহিরের বারান্দায় লইয়া যাইবার অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। তখন লজ্জাই বেশি ছিল কাজেই আমি কিছুতেই বাহিরে তাঁর সামনে যাইতে রাজী হইলাম না, বাড়ীর ভিতর চলিয়া আসিলাম। সেই বছর ফাল্গুন মাসের ৮ই তারিখে আমার বিবাহ হয়।"[৮০] সে বছরটা হল ১৮৬৪ সাল। গানের প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খুব ঝোঁক ছিল। স্বর্ণকুমারীও গান খুব ভালবাসতেন। এই সঙ্গীতপ্রীতি পিতামহ দ্বারকানাথের আমল থেকেই ঠাকুরবাড়ীর ধারায় চলে আসছে। নবৌঠাকরুণ প্রফুল্লময়ী দেবীর গান শুনতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একবার বাসনা জাগল। স্বর্ণকুমারীরও এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন বৌঠাকরুণকে নতুনদাদার কাছে। অনেক ভয় ও লজ্জা কাটিয়ে প্রফুল্লময়ী দেবী শেষে গাইলেন। সে গান শুনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ খুশী হন ও আরও ভাল করে তাঁর গান শেখার ব্যবস্থা করে দেন।[৮১] প্রফুল্লময়ী দেবী বড় জা দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্নী সর্বসুন্দরী দেবী, বড় ননদ সৌদামিনী দেবী, মেজ জা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কাছেও প্রচুর স্নেহ যত্ন পেয়েছেন। তখন ঠাকুরবাড়ীর নিয়ম ছিল বিকেলে মালিনীরা ফুলের মালা গেঁথে আনবে, বৌ মেয়েরা ইচ্ছেমত তা মাথায় গলায় দিয়ে সাজবে। প্রফুল্লময়ী দেবীর বিয়ের পর বড় ননদ সৌদামিনী দেবী রোজ তাঁর খোঁপা বেঁধে মালা জড়িয়ে দিতেন। সবাই একত্রে আহারপর্ব সমাধা করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই প্রফুল্লময়ীর দেবীরই একমাত্র পুত্র স্বনামধন্য সাহিত্যিক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০—৯৯)।

জানকীনাথ ও স্বর্ণকুমারীর বিবাহ

ঠাকুরবাড়ীর এমন উজ্জ্বলমধুর পরিবেশে স্বর্ণকুমারীর জীবনের বারটি বছর কাটল। এমন সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করতে গিয়ে দেখতে পেলেন "সুপুরুষ সুশিক্ষিত নদীয়া জেলার ব্রাহ্মণ জমিদারের পুত্র অথচ কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত উমেশ দত্তের সঙ্গগুণে অনেক পুরনো সংস্কার ছিন্ন করা" জানকীনাথ ঘোষালকে। তাঁকে দেখেই জামাই করার ইচ্ছে হলো মহর্ষির।[৮২] তখন তাঁর তিন মেয়ে সৌদামিনী সুকুমারী ও শরৎকুমারীর বিয়ে হয়ে গেছে। সুতরাং জানকীনাথের সঙ্গে তিনি স্বর্ণকুমারীর বিয়ে দেওয়া স্থির করলেন। জানকীনাথের (১৮৪০—১৯১৩) পিতা নদীয়ার জয়রামপুরের জয়চন্দ্র ঘোষাল। জয়চন্দ্রের দুই পুত্রের মধ্যে জানকীনাথ কনিষ্ঠ। ঘোষালবংশ অসাধারণ বলবীর্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। জানকীনাথের বাল্যশিক্ষাও বংশানুকূল হয়েছিল। তাঁদের লাঠিখেলা. বর্শাখেলা, ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হত। মধ্যে মধ্যে দুদল হয়ে তাঁদের কৃত্রিম যুদ্ধ হত। জানকীনাথ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই দুই বিরোধী দলের অধ্যক্ষ হতেন। তাঁদের দুভায়ের মধ্যে গভীর ভ্রাতৃ স্নেহ থাকলেও যুদ্ধের সময় কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলতেন না।[৮৩] জানকীনাথের বড় ভাই থাকায় বাল্যকালে তাঁকে প্রভূত সম্পত্তিশালী জ্যেষ্ঠতাতের দত্তক করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জানকীনাথের ব্যক্তিত্ব বাল্যকাল থেকে প্রখর। দত্তকপুত্র অপমানজনক মনে হওয়ায় একদিন তিনি কাউকে না বলে সেখান থেকে হেঁটে নিজের বাড়ীতে পালিয়ে এসেছিলেন।[৮৪] তাঁর স্ব-ইচ্ছামত পিতা তাঁকে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পাঠান। কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল ব্রাহ্মসমাজের উমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪০—১৯১৭) তিনি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। এখানেই জানকীনাথ রামতনু লাহিড়ী, রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, কালীচরণ ঘোষ, যদুনাথ রায় বাহাদুর (কৃষ্ণনগর রাজার দৌহিত্র) প্রভৃতি বন্ধুদের সংস্পর্শে আসেন। রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩—৯৮) প্রমুখ মনীষীদের উপদেশে ও অনুপ্রেরণায় জানকীনাথ ও আরও কতকগুলি ছাত্র জাতিভেদে বিশ্বাসশূন্য হন ও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেন। জানকীনাথের ভগ্নীপতি পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ও এঁদের একজন ছিলেন। উপবীত ত্যাগের কথা শুনে জয়চন্দ্র ঘোষাল ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে ত্যাগ করলেন কিন্তু জানকীনাথের মাতা মোটেই রাগ করেন নি। তিনি বলেছিলেন, ছেলের যা সত্য মনে হয় তাই করেছে, করুক। কিন্তু পিতা অনেকদিন পর্যন্ত পুত্র জানকীনাথকে ক্ষমা করতে পারেন নি। এমন কি জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হলে কনিষ্ঠকে বঞ্চিত করার জন্য তিনি অনেক বিষয়সম্পত্তিও বিক্রী করে ফেলেন। তবু জানকীনাথ স্বার্থের জন্য নিজের মত ও বিশ্বাস ত্যাগ করেন নি। পিতার ত্যাজ্যপুত্র হয়ে নিজ ব্যয় নির্বাহার্থ জানকীনাথ পুলিসে কাজ নেন কিন্তু তাঁর মত লোকের পুলিসের সব কাজ অনুমোদন করে সদ্ভাবে চলা বেশি দিন সম্ভব হল না।[৮৫] এইসময়েই দেবেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগর যান এবং সুদর্শন উৎসাহী জানকীনাথকে দেখে আকৃষ্ট হন।

জানকীনাথকে দেখার কয়েক বছর পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬৭ সালের ১৭ই নভেম্বর চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির করলেন।[৮৬] বিবাহের সময় স্বর্ণকুমারীর বয়স এগারো বছর। দেবেন্দ্রনাথ কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানে সপ্তপদীগমন এক নূতন অঙ্গ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন।[৮৭] স্বর্ণকুমারীর বিবাহের সংবাদটি ১৭৮৯ শকাব্দের (১৮৬৭ সালের) পৌষ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়: ''ব্রাহ্মবিবাহ। গত ২ অগ্রহায়ণ রবিবার ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যার সহিত কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী জয়রামপুর নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু জানকীনাথ ঘোষালের ব্রাহ্মবিধানানুসারে শুভবিবাহ হইয়া গিয়াছে।'' এই বিবাহ সভায় বহু গণ্যমান্য ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বিয়ের সময় জানকীনাথ ঠাকুরবাড়ীর দুটি রীতি মানেন নি— প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ ও দ্বিতীয়তঃ ঘর জামাই থাকা। বিয়ের সময় তিনি ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। জানকীনাথের বিবাহের সংবাদ পেয়ে তাঁর পিতা সন্তুষ্ট হন এবং এই সময় থেকে তাঁর প্রতি আবার প্রসন্ন হয়ে তাঁকে পুনর্গ্রহণ করেন এবং কলকাতায় এসে তিনি মূল্যবান অলঙ্কার দিয়ে পুত্রবধূর মুখদর্শন করেন। তখন থেকে মাঝে মাঝে তিনি কলকাতায় এসে পুত্রগৃহে বাস করতেন এবং নাতি-নাতনীদের নিয়ে আহারাদি করে তাদের হাসি আনন্দে ভরিয়ে রাখতেন।[৮৮] স্বর্ণকুমারীর কনিষ্ঠা কন্যা সরলা দেবীর (১৮৭২—১৯৪৫) স্মৃতিকথা 'জীবনের ঝরাপাতা'য় (১৯৫৭) তাঁর স্নেহশীল পিতামহের সুগভীর স্নেহপরায়ণতার অনেক কাহিনীর উল্লেখ আছে। বিয়ের পর স্বর্ণকুমারীর শিক্ষায় ও সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রচুর উৎসাহ দিতেন ও সাহায্য করতেন জানকীনাথ। স্বর্ণকুমারী স্বীয় প্রতিভা বিকাশে স্বামীর সহায়তার উল্লেখ করেছেন: ''আমার প্রিয়তম স্বামীর সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতিরেকে আমার পক্ষে এতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইত না। আজ বহির্জগত আমাকে যেভাবে দেখিতে পাইতেছে, তিনিই আমাকে সেইভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রেমপূর্ণ উপদেশে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রেও যেমন সন্তরণনিপুণ ব্যক্তি সহজে ও অবলীলাক্রমে সন্তরণ করিয়া যায়, সাহিত্যজীবনের ঝটিকাময় ও উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়া আমিও সেইরূপ অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিয়াছি।''[৮৯] স্বর্ণকুমারীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৬৮—১৯২৫) লিখেছেন: ''মাতামহ কন্যার যে শিক্ষা পত্তন করেন, স্বামীর যত্নে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে।''[৯০]

উদারতা, মমতা ও বলিষ্ঠ সাহসিকতা সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন জানকীনাথ। জানকীনাথের বিয়ের আগে যখন দেবেন্দ্রনাথ একবার সপরিবারে সিঁথির বাগানে বাস করছিলেন তখন জানকীনাথ একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। হেমেন্দ্রনাথের একটি দুরন্ত ঘোড়া ছিল, তাতে কেউ চড়তে সাহস পেত না কারণ একবার একটি দারোয়ান সে ঘোড়ায় চড়ার পর পড়ে মারা যায়। জানকীনাথের ফিরবার সময়ে স্টেশনে যাওয়ার ভাড়াটে গাড়ী না পাওয়ায় হেমেন্দ্রনাথ যাওয়ার একমাত্র উপায় হিসেবে ঘোড়াটির উল্লেখ করেন। তিনি ভেবেছিলেন, জানকীনাথ এ প্রস্তাবে সম্মত হবেন না। কিন্তু বাস্তবে ঘটল বিপরীত। জানকীনাথ তখনই সে ঘোড়ায় চড়ে স্টেশনে গেলেন। ঘোড়া আরোহীকে চিনল, তাঁর হাতে চালিত হয়ে সুবাধ্য সন্তানের ন্যায় হৃষ্ট ও প্রফুল্লভাবে গেল।[৯১] জানকীনাথের এই দুষ্ট ঘোড়াকে বশ করার ক্ষমতার

উল্লেখ সত্যেন্দ্রনাথের পত্রে পাওয়া যায়।[১২] জানকীনাথের এমন দুঃসাহসিকতার পরিচয় আরও আছে। স্বর্ণকুমারীর ভায়েদের সঙ্গে বাজী রেখে তিনি একবার জোড়াসাঁকোর বাড়ীর তেতলা ছাদে বাগানের দিকে ত্রিকোণচূড়া আলসের উপর দিয়ে দৌড়ে যান। সামান্য পদস্খলন হলেই তিনি তেতলা থেকে নীচে পড়ে প্রাণ হারাতেন।[১৩] বিয়ের পরই বিলেত যাওয়ার বাসনায় জানকীনাথ ডেপুটী কালেক্টরীর চাকরী ছেড়ে দিলেন। কিন্তু নানাকারণে যাওয়া স্থগিত হওয়ায় তিনি ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করলেন। বেরিণী কোম্পানীর হোমিওপ্যাথিক দোকান কিনলেন তিনি। সেটি খুব লাভজনক ছিল। বিক্রয় করার কিছুদিন পরে পূর্বমালিক তা পুনর্লাভে ইচ্ছুক হয়ে বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হলেন। বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১) জানকীনাথের প্রতি বিশেষ প্রীতি প্রবণ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের অনুরোধে জানকীনাথ দোকান পূর্বমালিককে ফিরিয়ে দিলেন। ত্যাগ ও দয়া জানকীনাথের চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। একবার লাটের নিলামে অল্পমূল্যে তিনি অনেকগুলি বিষয় কেনেন। তা রাখলে লক্ষাধিপতি হতে পারতেন তিনি। কিন্তু যখন পূর্বমালিকগণ গললগ্ন বাসে এসে জমি ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করলেন তাঁকে তখন তার অধিকাংশই তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বন্ধুবাৎসল্যও জানকীনাথের আর একটি গুণ ছিল। একবার এক সহপাঠী বন্ধুকে তিনি কয়েক সহস্র টাকা ধার দেন। উক্ত বন্ধু কিয়দংশ শোধ করে বললেন, "বাকী হাজার কতক আর আমি দিতে পারছিনে, আমায় মাপ করে দাও।"[১৪] জানকীনাথ হাসিমুখে বন্ধুর আবদার মেনে নিলেন। তিনি ছিলেন সুরুচি ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অমায়িক পুরুষ। বিয়ের পর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর অন্তঃপুরে তিনিও পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন। স্বর্ণকুমারীর নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯—১৯২৫) লিখেছেন: "স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষালের বিবাহ হইল তখন আমাদের অন্তঃপুরে আরও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করিল। পূর্বে আমাদের শুইবার ঘরে খাটবিছানা ছাড়া অন্য কোনও তেমন আসবাবপত্র থাকিত না; কিন্তু জানকীনাথবাবু আসিয়াই তাঁহার ঘরটি নানাবিধ চৌকি কৌচ কেদারায় অতি পরিপাটিরূপে যখন সজ্জিত করিলেন, তখন তাঁহার অনুকরণে ক্রমে ক্রমে আমাদের অন্তঃপুরের সমস্ত ঘরগুলিরই শ্রী ফিরিয়া গেল। কক্ষগুলির আমূল সৌষ্ঠব বর্ধিত হইল, এবং রীতিমত সুসজ্জিত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। জানকী আমাদের পরিবারে আরও একটি নূতন জিনিষের প্রবর্তন করেন। সেটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।"[১৫] বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ মহেন্দ্রলাল সরকারকে (১৮৩৩—১৯০৪) জানকীনাথই ঠাকুরবাড়ীতে আনেন। রোগীর সেবা জানকীনাথের একটি প্রধান ব্রত ছিল। গরীবদের জন্য ঘরে বসে তিনি হোমিওপ্যাথি শিখে বিনা পয়সায় ডাক্তারী করতেন। কাশিয়াবাগানে থাকাকালীন রোজ সকালে পাড়ার আর্তলোকে তাঁর বাড়ী ভরে যেত। ভোর থেকে বেলা দশটা এগারটা পর্যন্ত তিনি ওষুধ বিতরণ করতেন। পূর্বে জোড়াসাঁকোর নবাবী প্রথায় দাস দাসীদের অসুখের সময়ে তাদের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ এবং বৈদ্যের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু জানকীনাথ তাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন না, তাদের অসুখের সময় নিজে বারবার খোঁজ নিতেন। আবশ্যক হলে নিজেও তাঁদের সেবা করতেন। জানকীনাথ দেশবিদেশে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যত সেবা করেছেন, এমন আর কেউ করেন নি। দেবেন্দ্রনাথ চুঁচুঁড়াতে অসুস্থ থাকাকালে একদিন রাত্রে তাঁর মশারীতে আগুন লাগে। জানকীনাথ

তাঁকে একলাই কোলে করে উঠিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। ১৮৮৫ সালে বোম্বাইয়ে সমুদ্রতীরে দেবেন্দ্রনাথ হাওয়া বদলাতে যান। তাঁর শুশ্রূষার্থে সহগমন করেছিলেন তাঁর জামাতা জানকীনাথ, জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী ও কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ।[১৬]

ব্যবহারের সৌজন্যে, অন্তরের ঔদার্যে শীঘ্রই জানকীনাথ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের অন্তরঙ্গ শুভার্থী হয়ে উঠলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ স্নেহ করতেন জানকীনাথকে। বোম্বের বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর স্ত্রীকে লেখা পত্রাবলীতে প্রায় প্রতিটিতেই কোন না কোন প্রসঙ্গে জানকীনাথের উল্লেখ দেখা যায়। তিনি স্ত্রীকে কখনও তাঁর যে কোন প্রয়োজনে জানকীনাথকে জানাতে আশ্বাস দিয়েছেন, কখনও তাঁর বোম্বেতে স্বামীর কর্মস্থলে যাওয়ার কালে জানকীনাথকে সঙ্গী করতে পরামর্শ দিয়েছেন। জানকীনাথ চাকরী ছেড়ে দিলে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ব্যয় নির্বাহার্থ অর্থ সাহায্য করতে উৎসুক ছিলেন। কখনও তিনি স্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর বন্ধু তারকনাথ পালিত (১৮৩১—১৯১৪), মনোমোহন ঘোষের (১৮৪৪—৯৬) সংবাদ নিতে জানকীনাথকে অনুরোধ জানাতে। তাঁর ক্যালকাটা হাইকোর্ট রিপোর্টসের (reports)-এর প্রয়োজন হলে জানকীনাথকেই তার দাম জানাতে বলেছেন। বিলেত যাওয়ার বাসনায় এই ভগ্নীপতিটি চাকরী ছেড়ে দিয়ে নানাবিধ পরিকল্পনা করতে থাকলে স্নেহপ্রবণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে উৎকণ্ঠা অনুভব করেছেন, বোম্বেতে তাঁর কাজের জন্য অনুসন্ধান করেছেন। আবার কখনও তিনি স্নেহপূর্ণ তিরস্কার করেছেন জানকীনাথকে: ''জানকী কেবল প্ল্যান'ই করিতেছেন, কার্য্যত কিছুই হইতেছে না।''[১৭] আহমেদনগরে বাসকালে সত্যেন্দ্রনাথের জনৈক সহচর ছিল 'জানকীনাথ বসাক' নামে। সে জানকী তাঁর কাছ থেকে হঠাৎ প্রস্থান করলে জ্ঞানদানন্দিনীকে তিনি লিখছেন: ''আমি দেখিতেছি জানকী নামেরই কি দোষ আছে। এক জানকী ইংলণ্ড যাইবার লোভে কর্মকাজ ছাড়িয়া দিয়া নিরাশ্বাস হইলেন, আর এক জানকী একটা কর্ম পাইবার প্রত্যাশায় খরচপত্র করিয়া শূন্যহাতে পলায়ন করিলেন।''[১৮] এই অকৃত্রিম স্নেহের প্রতিদানে জানকীনাথও সত্যেন্দ্রনাথের বোম্বাই প্রবাসকালে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর দেখাশোনা করতেন এবং নিয়ম মত সত্যেন্দ্রনাথকে তাঁর সংবাদ দিয়ে কর্তব্য পরায়ণতার পরিচয় দিয়েছেন। স্বকীয় মধুর ব্যক্তিত্বের দ্বারা জানকীনাথ ঠাকুরপরিবারের মানুষগুলিকে আপন করে নিয়েছিলেন এবং তাঁদের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। অনেকবছর তিনি মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন। জানকীনাথ 'Celebrated trials in India' (Vol. 1, 2. Pt. 1, 1902–10) নামক একটি গ্রন্থও পরবর্তী কালে সংকলন করেন। শিয়ালদহ ও লালবাজার দুই কোর্টেই তিনি অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর তীব্র কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল।[১৯]

সাহিত্যসাধনায় স্বর্ণকুমারীর প্রেরণা

জোড়াসাঁকোর বাড়ীর অনেকেই সত্যেন্দ্রনাথের কাছে বোম্বাই বা পুণায় গিয়ে প্রবাস জীবনযাপন করে আসতেন। তাঁদের মধ্যে বেশি যেতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী। ভাইবোনদের মধ্যে এই তিনটি ভাইবোনের প্রতি তাঁর একটু বেশি টান ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮—১৯৪৬) পত্নী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭৩—১৯৬০) এবিষয়ে লিখেছেন, "জানিনে, কোন সূত্রে, কিন্তু বৃহৎ পরিবারের ভিতর ভাইয়েদের মধ্যে রবিকাকা ও জ্যোতিকাকামশায়ের এবং বোনেদের মধ্যে স্বর্ণপিসিমার সঙ্গে বাবার বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল।"[১০০] স্বর্ণকুমারীকে সত্যেন্দ্রনাথের এই অধিক স্নেহ করার একটা কাবণও ইন্দিরা দেবী নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন: "বাবা চিরদিনই স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। সেইজন্যই বোধহয় বোনেদের মধ্যে স্বর্ণপিসিমাকে বেশি ভালবাসতেন।"[১০১] বোনেদের মধ্যে অসাধারণ প্রতিভাশালিনী মননসম্পন্না এই বোনটি নিজ গুণেই হয়ত মেজদাদার স্নেহের অধিকাংশটাই দখল করে নিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারীর জীবনের অনেক অংশই কেটেছে মেজদাদার কাছে প্রবাসে। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী, জানকীনাথ আসার পর মণিকাঞ্চন যোগ হল। জানকীনাথও স্ত্রীশিক্ষা স্বাধীনতার অনুগামী ছিলেন। স্ত্রীকে তিনি সাহিত্যচর্চায়, নারীজগতের মুক্তি আনয়নের প্রচেষ্টায় সব রকম সাহায্য করতেন ও উৎসাহ দিতেন। স্বর্ণকুমারীকে বাড়ীতে সেতার শেখার ব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছিলেন।[১০২] দ্বিতীয়বার সত্যেন্দ্রনাথ যখন বোম্বাই থেকে এসে স্ত্রীস্বাধীনতার অন্তরায় অবরোধ ভাঙতে উদ্যোগী হলেন তখন তাঁর কাজে জানকীনাথেরও সাহচর্য পেয়েছিলেন তিনি। স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন: "তখন সবেমাত্র আমার বিবাহ হইয়াছে। স্বামী স্ত্রীশিক্ষানুরাগী, উন্নতি প্রবর্তক। বিশ্বাসানুসারে কার্য করিয়া তাঁহাকেও জীবনে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে, তিনি মেজদাদার সঙ্গে পূর্ণ প্রাণে মিশিয়া তাঁহার দল পুষ্ট করিলেন এবং বাড়ীর আর সকলেরও মতামত অনেক পরিবর্তিত হইয়া আসিল।"[১০৩] পরে আর একস্থানে তিনি বলেছেন: "যদি স্বামী মেজদাদার সহায়তা না করিতেন তাহা হইলে এত শীঘ্র স্ত্রীজাতির এতদূর উন্নতি হইত কি না সন্দেহ। অন্ততঃ তিনি যে অনেক পরিমাণে এ উন্নতি অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।"[১০৪] স্বর্ণকুমারীর বিয়ের পরও বোনের প্রতি মেজদাদার স্নেহব্যাকুল অন্তরটি প্রকাশিত হয়েছে স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে লেখা চিঠিগুলির মধ্যে। বোন স্বর্ণকুমারীর পছন্দসই বাগানের অনুরূপ জব্বলপুরে নীলকমল মিত্রের বাগানে থেকে খুশী হয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীর কাছে।[১০৫] বিয়ের পর স্বর্ণকুমারী তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রয়েছেন ভাইবোন বৌঠাকরুণদের আনন্দময় পরিবেশে। বর্ষার দিনে সবাই মিলে সাঁতলাভাজি খাওয়ার খবরটিও বোন পাঠাচ্ছেন চিঠিতে মেজদাদার কাছে

আহমেদনগরে।[১০৬] জ্ঞানদানন্দিনী দেবী স্বামীর সঙ্গে মিলে ঠাকুরবাড়ীর অন্তঃপুরে এনেছিলেন বিপুল পরিবর্তন। তাঁর কৃত বহুবিধ সংস্কারের একটি হল, বাইরের দর্জি, স্যাকরা প্রভৃতি ব্যক্তিকে অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার দেওয়া। পূর্বে বাড়ীর দাসদাসী ছাড়া বাইরের কেউ অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার পেত না, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ধীরে ধীরে সে নিয়ম ভঙ্গ করলেন। তিনিই প্রথম ফটোগ্রাফার বাড়ীতে এনে বড়জা সর্বসুন্দরী দেবী, মহর্ষি পত্নী সারদাদেবীর ও বাড়ীর সকলের ছবি তুলিয়েছিলেন।[১০৭] তারপর থেকে বাড়ীতে ছবি তোলার রীতির প্রচলন হয়। বহুদিনের অসাক্ষাতে ভগ্নী স্বর্ণকুমারীর প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহব্যাকুলতার প্রকাশ ১৮৬৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর আহমেদনগর থেকে লেখা চিঠিতে। যেখানে তিনি লিখেছেন, স্বর্ণের যদি কোন নুতন ছবি নেওয়া হয় তাহলে তার কপি যেন জ্ঞানদানন্দিনী তাঁকে পাঠিয়ে দেন।[১০৮] এ বছরেই ১৭ই অক্টোবর সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে তিনি 'কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস' মারাঠী ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। (প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস' নামক প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৭৯ শকাব্দের পৌষ সংখ্যা বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায়।) জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে বইটি তিনি পাঠাবেন এবং তিনি যেন বইটি স্বর্ণকুমারীকেও দেখান।[১০৯] দাদার সাহিত্যচর্চায়ও বোনটির ছিল অপরিসীম উৎসাহ, আগ্রহ। তাই কৃষ্ণকুমারী অনুবাদ করে সত্যেন্দ্রনাথ বইটি স্বর্ণকুমারীকে দেখাবার জন্য উৎসুক। ১৮৬৮ সালে স্বর্ণকুমারীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ীর জন্ম হলে, তিনি ২১ জুলাই স্ত্রীকে লিখছেন: "স্বর্ণের সকল আপদ কাটিয়া গিয়া নির্বিঘ্নে একটা মেয়ে হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। স্বর্ণের মেয়ে সুন্দরী হইবার ত কথাই আছে।"[১১০] 'পুরাতনী' গ্রন্থে সঙ্কলিত জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের অনেক চিঠিতেই এই প্রিয় ভগ্নীটির জন্য গভীর স্নেহ উৎকণ্ঠা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হয়েছে। এই স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ সত্যেন্দ্রনাথ 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' (১৯১৫) গ্রন্থটিও স্বর্ণকুমারীকেই উৎসর্গ করেছেন। উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখেছেন: "তোমাকে খুশী করবার জন্যে আমার এই বাল্যকথা স্মৃতির মায়াপুরী থেকে উদ্ধার করে তোমার মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেছি— তুমি নাছোড়বান্দা হয়ে না ধরলে এ কথাগুলি স্মৃতিতেই থেকে যেত। তা ছাড়া, আমার বোম্বাই কাহিনীর সঙ্গে তুমি কত রকমে জড়িত, তার বর্ণিত অনেক ঘটনা তোমার চোখের সামনে ঘটেছে। তাতে যে সকল লোকের কথা পাড়া হয়েছে তারা অনেকে তোমার সুপরিচিত কেন না কত সময় তুমি আমার বোম্বাই প্রবাস সঙ্গিনী হয়ে কত আদর যত্নে প্রবাস যন্ত্রণা যে কি তা আমাকে জানতেই দাও নি— এই সকল কারণে এই কথামালা যেমন তোমার কাছে আদরণীয় হবে এমন আর কোথায়?" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, গ্রন্থটির বিষয়বস্তু স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় দীর্ঘকাল ধরে (১৯০৯—২০) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

বিয়ের পর স্ত্রীকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করার অভিপ্রায়ে জানকীনাথ স্ত্রীকে ১৮৭০ সালে বোম্বাইতে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বিলেতী শিক্ষা ও আদবকায়দায় সত্যেন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধি ছিল। রবীন্দ্রনাথও প্রথমবার বিলেত যাওয়ার (১৮৭৮) আগে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে বোম্বাইতে গিয়েছিলেন ইংরাজি শিক্ষা ও আদবকায়দা রপ্ত করার জন্য।

মেজদাদার কাছে যাওয়ার কথা স্বর্ণকুমারী লিখেছেন: "১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আমার চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় শিক্ষার সৌকয্যার্থে স্বামী আমাকে বোম্বাই রাখিয়া আসিলেন। তখনও আমি ইংরাজী জানি না বলিলেই হয়, অতি সামান্যই শিখিয়াছি। শিশুকন্যা হিরণ্ময়ীকে লইয়া আমি একবৎসর সেখানে ছিলাম।"[১১১] পরে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে পুণায় যান হিরণ্ময়ীকে নিয়ে। সেখানে ১৮৭১ সালে তাঁর প্রথম পুত্র ও দ্বিতীয় সন্তান জ্যোৎস্নানাথ জন্মান।[১১২] তারপরে ১৮৭২ সালে ৯ই সেপ্টেম্বর সরলা দেবী জন্মান জোড়াসাঁকোর বাড়ীর তেতলার রোদফাটা কাঠের ঘরে।

বিয়ের পর স্বর্ণকুমারী থাকতেন শিয়ালদা বৈঠকখানার বাড়ীতে। সে বাড়ীর আশেপাশে ফিরিঙ্গীদের বাস। তার পর সেখান থেকে উঠে যান সিমলার বাড়ীতে। এ বাড়ীতে জানকীনাথেব পিতা প্রায়ই আসতেন নাতি-নাতনীদের কাছে একটা মধুর স্নিগ্ধ স্নেহের স্পর্শ নিয়ে।

সরলার চোখে

স্বর্ণকুমারীর সন্তানদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে আর মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রায় থাকত না। সন্তানদের প্রতি এ ঔদাস্য স্বর্ণকুমারী হয়ত মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ীর ছেলেমেয়েরা মায়েদের থেকে দূরে চাকর ঝির কাছেই মানুষ হয়েছে বেশি, শিশুদের তাই অনেক সময়ই অন্যায় অযথা লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে। এই দূরত্ব যে শিশুদের মনে কতখানি বেদনাদায়ক হত তার উল্লেখ সরলা দেবীর আত্মকথায় পাওয়া যায়: "সেকালের ধনীগৃহের আর একটি বাঁধা দস্তুর জোড়াসাঁকোয় চলিত ছিল— শিশুরা মাতৃস্তন্যের পরিবর্তে ধাত্রীস্তন্যে পালিত ও পুষ্ট হত। ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মায়ের কোলছাড়া হয়ে তারা এক একটি দুগ্ধদাত্রী দাই ও এক একটি পর্যবেক্ষণকারিণী পরিচারিকার হস্তে ন্যস্ত হত, মায়ের সঙ্গে তাদের আর কোন সম্পর্ক থাকত না। আমারও রইল না। ...

বলেছি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই মায়ের সঙ্গে আমাদের আর সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকত না। তিনি আমাদের অগম্য রাণীর মত দূরে দূরে থাকতেন। দাসীর কোলই আমাদের মায়ের কোল হত। মায়ের আদর কি তা জানিনে, মা কখনো চুমু খান নি, গায়ে হাত বোলান নি। মাসিদের ধাতেও এসব ছিল না। শুনেছি কর্তাদিদিমার কাছ থেকেই তাঁরা এই ঔদাসীন্য উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। বড় মানুষের মেয়েদের এই ছিল বনেদি পেট্রিশিয়ন চাল। গরীবের ঘর থেকে আসা ভাজেরা কিন্তু তাঁদের প্লিবিয়ানের হৃদয় সঙ্গে করে আনতেন— ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার আর একরকমের দেখতুম।"[১১৩] "সিমলার বাড়ীতে ভিতর দিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ছিল স্বর্ণকুমারীর শয়নঘর। ঘরে এক প্রকাণ্ড পালঙ্ক ছিল। জোড়াসাঁকো থেকে আগত বোন, বৌঠাকরুণ, বোনঝি ভাইঝিদের পার্টি জমত সেখানে। জোড়াসাঁকো থেকে আলাদা বাড়ীতে থাকলেও দুবাড়ীতে যাতায়াত এবং যোগাযোগটা ছিল বেশি। পার্টিতে কখনও হত তাসখেলা। সরলা দেবীর কথায়, "তাস খেলার অবসরে কাঁচা সরষে তেল মাখা টাটকা মুড়ি, ফুলুরি ও বেগুনির রসাস্বাদন, বর্ষা হলে সাত্‌লাভাজি— এই ছিল পার্টির মূল প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামে কোন কোন দিন একটু বৈচিত্র্য ঢোকান হত গানে বা মায়ের রচিত কবিতা আবৃত্তিতে। আমরা তিনটি ভাইবোন ঘুরে ফিরে সেখানে ফস করে এক একবার হাজির হতুম যদি একমুঠো মুড়ি বা এক আধটা ফুলুরি ভুলে আমাদের মুখে কেউ পুরে দেয়। কিন্তু আমরা তাঁদের গ্রাহ্যর মধ্যেই বড় একটা আসতুম না, বেশিক্ষণ দাঁড়াবার হুকুমও ছিল না, চকিতেই সরে পড়তে হত। বড়দের মজলিসে ছোটদের দখল দেওয়া নিয়ম বহির্ভূত ছিল।

এই পালঙ্ক সম্মিলনী দেখে আমার মনে মনে একটা ধারণা বসে গিয়েছিল পালঙ্কই হল

প্রত্যেক মায়ের স্বাভাবিক বসবার জায়গা, মায়েরা কখনো মাটিতে বসে না।"[১১৪] দাসীরা যখন তাদের মায়ের কথা বলত কল্পনার চোখে সরলা দেবী দেখতে পেতেন তাদের মায়েরাও কোন্ সুদূর পল্লীতে বৃহৎ পালঙ্কে পা ছড়িয়ে বসে আছে। সরলা দেবীর শিশুবয়সে মায়ের স্নেহ বঞ্চিত একটা ক্ষুব্ধ তীব্র অভিমান ছিল। এখানে থাকাকালীন জানকীনাথের বিলেত যাওয়া স্থির হয়। বিলেত যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর অনেক আগে থেকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একবার ভ্রাতৃজায়া (নগেন্দ্রনাথের পত্নী) প্রমুখর সঙ্গে বৈষয়িক মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন। তখন জানকীনাথ আইনের সূক্ষ্ম জাল ভেদ করে যে নীতি বের করেন তার দ্বারা তাঁর বিষয় রক্ষার বিশেষ সাহায্য হয়। সে সময়ে আইনে জানকীনাথের বিশেষ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টারি পড়বার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[১১৫] স্ত্রী ও সন্তানদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রেখে তিনি বিলেত যাত্রা করলেন।

স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যচর্চা

ইতিমধ্যে ঠাকুরবাড়ীর ছেলেমেয়েদের মিলিত প্রচেষ্টায় বঙ্গ সাহিত্যের উজ্জ্বলতম নিদর্শন 'ভারতী' পত্রিকা বেরল (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৭)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একদিন তাঁর তেতলার ঘরে বসে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১—১৯৪১) ও বন্ধু অক্ষয় চৌধুরীর (১৮৫০—৯৮) সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন, তাঁরা সাহিত্য বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করবেন। তাঁরা বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথকে (১৮৪০—১৯২৬) জানালেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় (১৩২৭ বঙ্গাব্দ) বলেছেন, নূতন পত্রিকা প্রকাশের তাঁর ততটা ইচ্ছা ছিল না। তিনি বলেছেন, "আমার ইচ্ছা ছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে ভাল করিয়া জাঁকাইয়া তোলা যাক। কিন্তু জ্যোতির চেষ্টায় 'ভারতী' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র মত একখানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা।"[১১৬] দ্বিজেন্দ্রনাথকে সম্পাদক হতে বলা হল। তিনি মত দিলেন। পত্রিকার নামও তিনি দিলেন 'সুপ্রভাত'। নামটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পছন্দ হল না। কারণ এতে যেন একটু স্পর্ধার ভাব আসে, অর্থাৎ এঁদের দ্বারাই যেন বাঙ্গলা সাহিত্যের সুপ্রভাত হল। তখন দ্বিজেন্দ্রনাথই আবার নাম দিলেন 'ভারতী'।[১১৭] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অকৃত্রিম সুহৃদ অক্ষয় চৌধুরীর পত্নী শরৎকুমারী চৌধুরানী (১৮৬১—১৯২০) লিখেছেন: "যদিও শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামটি কখনও 'ভারতী'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'ভারতী' জ্যোতিবাবুরই মানস কন্যা।"[১১৮] 'ভারতী'র সম্পাদকীয় চক্রে তখন অক্ষয় চৌধুরী ও তাঁর পত্নী শরৎকুমারী চৌধুরানীও ছিলেন। শরৎকুমারী বিয়ের (১৮৭১) পরই পিতার সঙ্গে পাঞ্জাব চলে যান। বছর পাঁচেক পরে ফিরে তিনি 'ভারতী'র গোষ্ঠীতে যোগ দিলেন। পাঞ্জাব থেকে এসে তিনি শুনলেন একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের জল্পনা কল্পনা চলেছে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। 'ভারতী'র জন্মস্থান ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের বাড়ী তখন সরগরম। এর পরিবেশের আন্তরিকতা ও আপ্যায়নের উত্তাপ অনেকটাই ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী সৃষ্ট। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঘরের সামনে তেতলার ছাদ ছিল সন্ধ্যার সময় পরিবারের ও শুভার্থী বন্ধুদের মিলবার স্থান। কাদম্বরী দেবী খুব সূক্ষ্ম সুন্দর ভাবে বাগান করে ছাদটি সাজিয়েছিলেন। এই মিলনোৎসবে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতেন তিনি স্বয়ং উৎসাহে আন্তরিকতায় সাহিত্য সঙ্গীত আলোচনার ধারাকে প্রবহমান রেখে। অক্ষয় চৌধুরী ছাদটির নামকরণ করেছিলেন 'নন্দন কানন'।[১১৯]

এই মজলিশ আবার কখনও হত স্থানান্তরে, রামবাগানে স্বর্ণকুমারীর বাড়ী। সেখানে প্রফুল্লময়ী দেবী, কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী, শরৎকুমারী সবাই যেতেন। শরৎকুমারী যখনই যেতেন দেখতেন, স্বর্ণকুমারী কখনও শেক্সপীয়ার পড়ছেন, বা

সেতার বাজাচ্ছেন, আবার কখনও মিষ্টি তৈরী করছেন বা ভাঁড়ার দিচ্ছেন।[১২০] শরৎকুমারী দেবী চৌধুরানীর দৌহিত্রী ও শ্রীঅতুল বসুর স্ত্রী শ্রীমতী দেবযানী বসুর কাছে শোনা যায়, ঘাড় সোজা করার জন্য ও হাঁটার stepping ঠিক করার জন্য স্বর্ণকুমারী মাথায় জলের কলসী নিয়ে বাড়ীতে হাঁটা অভ্যাস করতেন বলে তিনি শুনেছেন। আবার সংসারের গৃহস্থালী অতিথির আদর আপ্যায়নেও স্বর্ণকুমারীর ত্রুটি ছিল না। অবসর সময় তিনি কাটাতেন সাহিত্য শিল্পচর্চায়। একদিকে সংসারী কল্যাণময়ী গৃহিণী অপরদিকে শিল্পী এই দুটি সত্তাই মিলেছিল স্বর্ণকুমারীর অসামান্য প্রতিভায়। সান্ধ্য মজলিশে 'ভারতী'র নূতন প্রবন্ধ পড়া ও আলোচনা হত, কখনও বা রবীন্দ্রনাথ গান গাইতেন। তারপর আহারাদি সেরে সবাই রাত ১০-১১টা নাগাদ বাড়ী ফিরত।[১২১]

অবশেষে 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যা বেরল ১৮৭৭ সালে (১২৮৪ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ মাস)। হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৬৮—১৯২৫) লিখেছেন: "আমার পূজনীয় নতুন মামা শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী' বাহির হইবামাত্র পত্রিকাখানি হাতে লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া সহাস্যমুখে মাতৃদেবীর হাতে দিলেন। তাঁহাদের সেদিনকার আনন্দ উৎসাহের ভাব শিশু আমাকেও এতটা আনন্দ প্রদান করিয়াছিল যে সেদিনটি আমার মনে একটা শুভদিন বলিয়াই অঙ্কিত আছে।"[১২২] পত্রিকাটির নামে সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, কার্যতঃ সম্পাদনা করতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং সম্পাদনা গোষ্ঠীতে ছিলেন অক্ষয় চৌধুরী, শরৎকুমারী, স্বর্ণকুমারী।

ইতিমধ্যে ঔপন্যাসিকরূপে বাংলা সাহিত্য জগতে আবির্ভাব হল স্বর্ণকুমারীর। বিয়ের পর তিনি লিখেছিলেন পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীর সংঘর্ষ কাহিনী নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস 'দীপনির্ব্বাণ'। এটি গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা স্বর্ণকুমারী প্রথম বইটি উপহার দিয়েছেন মেজদাদাকেই। উপহারে দাদার স্নেহবিমুগ্ধ ভগ্নীর কোমল হৃদয়ানুভূতি ও আত্মতৃপ্তির ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে :

"উপহার সমর্পিনু সোহাগে যতনে
লহ হাসিমুখে নিরখিব সুখে,
সে মধুর স্নেহহাস্য সদা জাগে মনে।
যে হাসি দেখিলে হৃদয় সলিলে,
ফুটিবে হরষ পদ্ম অপূর্ব শোভায়;
হাস সে বিনোদ হাসি বড় সাধ যায়।"

কিন্তু সাহিত্যরসিক দাদা বোনের এই গভীর স্বদেশপ্রেমানুভূতিজাত 'দীপনির্ব্বাণ' উপন্যাস পড়ে হাসবেনই বা কেমন করে, কারণ এর কাহিনী হল আর্য-অবনতির কথা, যা পড়লে স্বদেশপ্রেমিক রসিক পাঠকের হৃদয় বেদনায় মথিত হবে। তাই তারপরেই লেখিকা বলছেন :—

"কিন্তু বা কেমনে কহি হাসিতে আবার?

আর্য্য-অবনতি-কথা, পড়িয়ে পাইবে ব্যথা,
বহিবে নয়নে তব শোক— অশ্রুধার।
কেমনে হাসিতে বলি, সকলি গিয়াছে চলি,
ঢেকেছে ভারত ভানু ঘন মেঘজাল
নিভেছে সোনার দীপ, ভেঙেছে কপাল।"

'দীপনির্ব্বাণ' উপন্যাস সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা জানতে পারা যায় হিরণ্ময়ী দেবীর লেখায়। উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণে লেখিকার নাম ছিল না। হিরণ্ময়ী লিখছেন, "মেজমামা পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদেশে এই বইখানি হাতে পাইয়া ভাবিলেন, নতুন মামার রচনা। তিনি লিখিলেন, "জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?"[১২৩] 'দীপনির্ব্বাণ' পাঠ করে সত্যেন্দ্রনাথ যে মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হয়েছিলেন তার পরিচয় এই উক্তিতে রয়েছে।

'ভারতী' প্রথম সংখ্যায় (১২৮৪) ফাল্গুন মাসে স্বর্ণকুমারীর 'বাল্যসখী' কবিতা প্রকাশিত হয়। 'ভারতী'তে এটি স্বর্ণকুমারীর প্রথম প্রকাশিত রচনা।

'ভারতী'র দ্বিতীয় বর্ষ থেকে স্বর্ণকুমারীর অনেক রচনায় 'ভারতী'র পৃষ্ঠা পূর্ণ হতে লাগল। 'ছিন্নমুকুল' উপন্যাস ১৮৭৮ সালের (১২৮৫ পৌষ সংখ্যা) 'ভারতী'তে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ধারাবাহিক ভাবে বার হতে থাকে, ১৮৭৯ তে (১২৮৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যায়) শেষ হয়। 'ছিন্নমুকুল' গ্রন্থাকারে বার হয় ১৮৭৯ সালে। স্বর্ণকুমারী বইটি উৎসর্গ করেন নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে, যে দাদা স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য সঙ্গীত সৃষ্টি ও চর্চায় অনেক উৎসাহ দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন ভগ্নীর শিল্পী জীবনে। উপন্যাসটিতে ভাইবোনের স্নেহ রোমান্সে নূতনত্বের অবতারণা করেছে। উপন্যাসের চরিত্র বোন 'কনকে'র দুঃখী জীবনের জন্য লেখিকা নতুনদাদার সহানুভূতি প্রার্থনা করেছেন। তাই 'উপহারে' লিখেছেন :—

"হৃদয় উচ্ছ্বাস-ভরে আজিকে তোমার তরে
দলিত কুসুমকলি সঁপিনু যতনে
কি আর চাহিতে পারি? এক বিন্দু অশ্রুবারি
মিশাইও কনকের অশ্রুবারি সনে।"

'ভারতী'র বয়স যখন দুবছর তখন জানকীনাথ স্ত্রীপুত্রকন্যাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রেখে ইংলণ্ড যাত্রা করলেন ব্যারিষ্টারি পড়তে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকে (১৮৭৫) রবীন্দ্রনাথ 'জ্বল্‌জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গানটি রচনা করে দেন। সেই থেকে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে প্রমোশন দিয়ে সমশ্রেণীতে উঠিয়ে নিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তারপর এলেন স্বর্ণকুমারী— তিনিও ভায়েদের এই সাহিত্য সঙ্গীত চর্চাব গোষ্ঠীতে একটি সংখ্যা বাড়ালেন। আগে ছিলেন শুধু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অক্ষয় চৌধুরী— তারপর এলেন রবীন্দ্রনাথ— তারপর স্বর্ণকুমারী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্মৃতিকথায় লিখেছেন: "এখন হইতে সঙ্গীত ও সাহিত্য চর্চাতে আমরা হইলাম তিনজন— অক্ষয় (চৌধুরী) রবি ও আমি! পরে জানকী বিলাত যাইবার সময় আমার কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসায় সাহিত্য চর্চায়

আমরা তাঁহাকেও আমাদের আর একজন যোগ্য সঙ্গীরূপে পাইলাম।"[১২৪] অন্যত্র "এই সময় আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেনসিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুর রচনা করিতাম, অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন সুর তৈরী হইবামাত্র সেটি আরও কয়েকবার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে শুনাইতাম। ... সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুর-সংযোগ করাই প্রচলিত রীতি! কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিল উল্টা। সুরের অনুরূপ গান তৈরী হইত। ... স্বর্ণকুমারীও অনেক সময় আমার রচিত সুরে গান প্রস্তুত করিতেন। সাহিত্য এবং সঙ্গীতের চর্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দিবারাত্রি পূর্ণ হইয়া থাকিত।"[১২৫] ১৮৭৮ সালে ২০শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথও বিলেত যাত্রা করেন। তখন 'ভারতী'র পুরো ভার পড়ল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতে। তাঁর প্রধান সহায়িকা হলেন স্বর্ণকুমারী। অক্ষয় চৌধুরীও অন্যতম সহায়ক ছিলেন।

ঠাকুরবাড়ীর অন্তঃপুরে একনজর

জোড়াসাঁকোয় স্বর্ণকুমারী এসে যখন রইলেন, তাঁর থাকবার জায়গা হল বাইরের তেতলার অর্ধেকটায়। তাঁর ছেলেমেয়েদের আস্তানা ছিল তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে বাড়ীর ভেতরের তেতলায়। বাইরের তেতলার অর্ধেকটায় স্বর্ণকুমারী অর্ধেকটায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সস্ত্রীক থাকতেন। বাইরের তেতলা তখন তাই সাহিত্য সঙ্গীত চর্চার আবহাওয়ায় দিবারাত্র পূর্ণ থাকত। স্বর্ণকুমারীর সন্তানরা থাকত সম্পূর্ণ দাসী ও মাষ্টারের অভিভাবকতায়। সিমলার বাড়ীতে তাদের মায়ের সঙ্গে সম্পর্কের দূরত্বটা বরঞ্চ বোধ হত। এখানে বাড়ীর পরিবেশের বিরাটত্ব, অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সংসর্গ, দাসদাসী, মাষ্টার, পণ্ডিত প্রভৃতি বিভিন্ন রকম ভাবের দোলায় মায়ের সেই দূরত্বের অভাবটা অনেকটা মিটে যেত। স্বর্ণকুমারীর তিন ছেলেমেয়ের প্রত্যেকের এক একটি স্বতন্ত্র পরিচারিকা ছিল— তা ছাড়া ছিল তাদের 'গৃহ টিউটর' যা ও বাড়ীর আর কোন ছেলেমেয়েরই ছিল না। সে টিউটর চব্বিশ ঘণ্টাই বাড়ীতে থাকতেন। ছেলেমেয়েদের বাড়ীর ভেতরের অভিভাবক দাসী, বাইরের মাষ্টার। বাইরের মাষ্টার সতীশ পণ্ডিতের পর্যবেক্ষতায়ই তাদের জীবনধারা চলত। মায়ের স্নেহ বঞ্চিত এই মাষ্টারের পর্যবেক্ষণে থাকার জন্য অনেক বেদনা নিগ্রহ স্বর্ণকুমারীর সন্তানদের সহ্য করতে হত, অনেক আনন্দ থেকে অনাবশ্যক বঞ্চিত হত এই ছেলেমেয়েগুলি। সরলা দেবীরা সংস্কৃত পড়তেন সতীশ পণ্ডিতের কাছে ও গান শিখতেন অক্ষবাবুর কাছে।[১২৬] গান শেখায় সরলার পারদর্শিতার খবর পেলেন স্বর্ণকুমারী। তখন থেকে গান শেখার ব্যাপারে মায়ের সাক্ষাৎ পরিদর্শকতায় এলেন সরলা। তাঁকে শুধু পিয়ানো শেখানোর জন্য একজন মেম নিযুক্ত হল— সপ্তাহে দুদিন এসে তিনি শেখাতেন। শিখবার পর একঘণ্টা করে রেওয়াজ করতে হত সরলাকে মায়ের ঘরে বসে। মায়ের ঘরে অতক্ষণ বসে থাকাটা সবলাব পক্ষে আবামদায়ক ছিল না কারণ মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বা হৃদয়ের কোনরকম নৈকট্য মেয়ের গড়ে উঠে নি তখনও। এ ব্যাপারে সরলার সহায়িকা হলেন, সেজমাসিমার (শরৎকুমারী) মেয়ে সুপ্রভা। দিদিটি এসে রোজ ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিয়ে যেতেন বোনের রেওয়াজের সময়। স্বর্ণকুমারীর বিচক্ষণ দৃষ্টিতে সেটি ধরা পড়ল, বুঝলেন অন্যায়টা তাঁরই আত্মজা সরলার। তাই দিদির মেয়েকে তিনি শাসন করলেন না, নিজের মেয়েকেই শাসন করলেন। তিনি ঘর থেকে সবাইকে বার করে দিয়ে সকলের আড়ালে মেয়ের গালে বসিয়ে দিলেন একটি কোমল চপেটাঘাত। "মঙ্গলা দাসীর বিরাশী সিক্কার ওজনের চড় ও মায়ের এই চড়ে কত তফাৎ।"[১২৭] এতে মেয়ের কাছে ফুটে উঠল মায়ের হৃদয়বৃত্তির সৌকুমার্য, আত্মমর্যাদাবোধ ও শোভনরুচি। কারুর সামনে মারায় স্বর্ণকুমারী আত্মমর্যাদার হানি অনুভব করতেন।

সরলা দেবীর থেকে দুবছরের ছোট একটি মেয়ে ছিল স্বর্ণকুমারীর, তার নাম ঊর্মিলা (জন্ম ১৮৭৪)। জোড়াসাঁকোয় থাকাকালীন সে থাকত নতুনমামী কাদম্বরী দেবীর তত্ত্বাবধানে বাইরের তেতলায়। সন্তানহীনা কাদম্বরী দেবী তাকে মাতৃস্নেহে পালন করতেন। দাদা দিদিদের সঙ্গে তার কোন যোগ ছিল না। কেবল স্কুলে সে যেত দিদিদের সঙ্গে এক পাল্‌কীতে। সেইটুকুই যা তার যোগ ছিল দিদিদের সঙ্গে। ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার দু একমাস পরেই একদিন কাদম্বরী দেবীর ছাদের বাঁকা সিঁড়ি দিয়ে গোলাবাড়ির দিকে নিজে নিজে নামতে গিয়ে সে নীচে পড়ে গিয়ে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মারা যায়। তার বয়স তখন ছ-বছর।[১২৮] জানকীনাথ তখন বিলেতে। মেয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি দেশে ফিরলেন। তখনও তাঁর পরীক্ষা শেষ হয় নি। ইচ্ছা ছিল আবার গিয়ে তিনি শেষ পরীক্ষা দেবেন। তারজন্য তিনি বরাবর ফি দিয়ে নাম বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁর আর যাওয়া হয় নি।[১২৯] কন্যার মৃত্যুতে স্বর্ণকুমারীও দারুণ শোক পেয়েছিলেন। অন্যতম প্রসিদ্ধ লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর স্নেহধন্য সরোজকুমারী দেবীকে (১৮৭৫—১৯২৬) পরে এ প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারীকে লিখতে দেখি। সরোজকুমারী দেবীর কনিষ্ঠ সন্তানটি যখন মারা গেছে, (আনুমাণিক ১৮৯২) তখন তাঁকে চিঠিতে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে স্বর্ণকুমারীর নিজের সেই শিশুকন্যাটির অকালমৃত্যুর কথা মনে পড়ে মাতৃহৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠেছে। তিনি লিখছেন, "তোমার সেই বুকফাটা কষ্ট আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমারো একটি ছ-বছরের মেয়ে মারা গিয়েছিল, সে আজ ১২ বছর, তবু যখন মনে পড়ে কি ভয়ানক কষ্ট হয়।"[১৩০]

ইস্কুলে ভর্তি করার পর ছেলে মেয়েদের পড়াশুনো মাঝে মাঝে স্বর্ণকুমারী দেখতেন। তখন থেকেই পড়াশুনোর মধ্যে দিয়ে মায়ের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের যোগাযোগ আরম্ভ হল। পিতৃগৃহে বাসকালে ঘরসংসারের কাজকর্মে স্বর্ণকুমারী যোগ দিতেন না। তিনি দাদাদের সাহিত্য সঙ্গীত চর্চাতেই থাকতেন, অন্যসময় কাটাতেন পড়াশুনো করে। সরলা দেবী স্মৃতি কথায় লিখেছেন, জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তরকারী কোটার গৃহস্থালী কাজে থাকতেন বড় মাসিমা (সৌদামিনী দেবী ১৮৪৭—১৯২০), সেজ মাসিমা (শরৎকুমারী দেবী ১৮৫৪—১৯২০), ছোট মাসিমা (বর্ণকুমারী দেবী ১৮৫৮—১৯৪৮) বড়মামী (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী সর্বসুন্দরী দেবী (১৮৪৭—১৮৭৮) নতুন মামী (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী ১৮৫৯—৮৪), ন মামী (বীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রফুল্লময়ী দেবী ১৮৫৪—১৯৪০), সরোজা দিদি (দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী), দিদি (স্বর্ণকুমারীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী) ইত্যাদি ঠাকুরবাড়ীর কন্যা বধূ পৌত্রী ও দৌহিত্রীরা। কিন্তু ঐ মহলে কেবল কখনও যেতেন না স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি নিজের মহলে লেখাপড়া বই লেখার কাজেই সবসময় ব্যাপৃত থাকতেন। দৈবাৎ কোন উৎসব উপলক্ষ ছাড়া ঐ মহলে তিনি নামতেন না।[১৩১]

ঠাকুরবাড়ীর অভিনয়

স্বর্ণকুমারীর 'বসন্ত উৎসব' গীতিনাট্য প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ সালে। হিরণ্ময়ী দেবীর মতে "জোড়াসাঁকো হইতে কাব্যনাট্যের সৃজন প্রথম এই 'বসন্ত উৎসব'ই।"[১৩২] ইংলণ্ডে রবীন্দ্রনাথ বইটি পড়ে আনন্দিত হয়ে একটি চিঠি লেখেন ন দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীকে। হিরণ্ময়ী দেবী লিখেছেন, "ইংলণ্ডে বইখানি পাড়িয়া রবিমামা মাকে যে আনন্দপূর্ণ পত্র লেখেন, বড়ই দুঃখের বিষয় সে পত্রখানি মা রাখেন নাই।"[১৩৩] 'বসন্ত উৎসব' স্বর্ণকুমারী উৎসর্গ করেছেন তাঁর সাহিত্যসঙ্গিনী অক্ষয় চৌধুরীর (১৮৫৮—৯৮) স্ত্রী শরৎকুমারী চৌধুরাণীকে (১৮৬১—১৯২০), যাঁর সঙ্গে তাঁর পাতান ছিল 'বিহঙ্গিনী'। শরৎকুমারী দুবছর বয়স থেকেই পিতা শশিভূষণ বসুর (মহর্ষির ভক্ত) কাছে লাহোরে থাকতেন। ১৮৭১ সালে অক্ষয় চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ের পর শরৎকুমারী আবার পিতার সঙ্গে লাহোরে চলে যান। ষোল বছর বয়সে স্বামীর ঘর করতে তিনি কলকাতায় আসেন। শৈশব ও কৈশোরের বেশির ভাগ তাঁর লাহোরে কাটে বলে ঠাকুরবাড়ীতে তিনি 'লাহোরিণী' নামে পরিচিত ছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের পুত্রকন্যা এবং বধূদের সঙ্গে তাঁর গভীর প্রীতি ও অনুরাগের সম্পর্ক ছিল। ১৮৬৭ সালে মার্চ মাসে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন শশিভূষণ বসুর কাছে লাহোরে গিয়ে থাকেন। তাঁর পরামর্শে শশিভূষণ কন্যা শরৎকুমারীকে ১৮৬৭ সালে ইউরোপীয়ান গার্লস স্কুলে দেন। পনেরো ষোল বছর বয়স থেকে শশিভূষণের আদি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী অক্ষয় চৌধুরীও তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। শরৎকুমারী দেবীর বিয়ের জন্য পাত্র হিসেবে অক্ষয় চৌধুরীকে তিনিই পছন্দ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাদম্বরী দেবীর সঙ্গেই অক্ষয় চৌধুরী ও শরৎকুমারীর আসল হৃদ্যতা ছিল। কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে শরৎকুমারীর 'শ্যাম্পেন' পাতানো ছিল, কারণ দুজনেব স্বামীই শ্যাম্পেন ভালবাসতেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে শরৎকুমারীর পাতানো ছিল 'চাঁদনী'।[১৩৪] শরৎকুমারীর প্রতি স্বর্ণকুমারীর সুগভীর হৃদয়প্রীতি 'বসন্ত উৎসবে'র উপহার-পত্রে পরিস্ফুট :—

"ভাই বিহঙ্গিনী,
সখি লো জনম ধোরে
ভাল যে বেসেছি তোরে।
নে, লো, তার নিদর্শন এই উপহার,
হৃদয়ের আদরিনি— বিহগি আমার।"

রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরবার (১৮৮০) পর ঠাকুরবাড়ীর অন্তঃপুরে 'বসন্ত উৎসবে'র

অভিনয়ও হয়েছিল। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "স্বর্ণপিসিমার গীতিনাট্য 'বসন্ত উৎসবে'র সঙ্গেও আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতি জড়িত। তার গোড়ার দিকের গান—

"ধর্ লো ধর্ লো ডালা, এই নে কামিনী ফুল" এখনও কানে বাজে। অন্যগানগুলিও কতক কতক মনে আছে—

"লীলা। চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথ চেয়ে
দুর্ভেদ্য অন্ধকারে হৃদয় রয়েছে ছেয়ে।"...

ঢালা বাগেশ্রী রাগিনীতে এই শোকসংগীত নতুনকাকিমা বসে গাইছেন, তাঁর বড় বড় চোখ আর দীর্ঘ ঘন কেশ ছিল বলে তাঁকে বেশ মানিয়েছিল। জ্যোতিকাকা আর রবিকাকা দুজনে মিলে টিনের তলোয়ার নিয়ে এই গানটি গেয়ে যুদ্ধ করেছিলেন—

কিরণ। লও এই লও, লও প্রতিফল।
কুমার। দেখিব বীরত্ব তোর থাকে কি অটল।
কিরণ। মূঢ় হরে সাবধান।
কুমার। এ অমোঘ সন্ধান।
কিরণ। এ আঘাতে অবশ্যই বধিব পরাণ।"[১৩৫]

এই অভিনয় সম্পর্কে সরলা দেবীও লিখেছেন: "সঙ্গীতের এক মহাহিল্লোলে হিল্লোলিত হয়ে উঠেছিল বাড়ী তখন। আমাদের শিশু কর্ণে ও প্রতিধ্বনিত হতে থাকত বড় বড় ভাবে বড় বড় কথায় বড় বড় রাগ। "চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথে য়ে য়ে য়ে য়ে"— বাগেশ্রীর তানে আমাদের গলা ও মন খেলিয়ে খেলিয়ে উঠত।[১৩৬] তিনি আরও মন্তব্য করেছেন, "বসন্তোৎসব বাস্তবিকই একখানি অপূর্ব জিনিষ।"[১৩৭]

ঠাকুরবাড়ীর ছেলেমেয়েদের জন্মোৎসব পালন

নদানন্দিনী দেবী বিলেত থেকে ফিরে (আনুমানিক ১৮৮০) পুত্র ও কন্যা সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীর বিলেতী ধরনে জন্মদিন পালন করতে লাগলেন। এ উৎসবটি ঠাকুরবাড়ীতে তিনিই নূতন আনলেন। জোড়াসাঁকো থেকে জানকীনাথ স্ত্রীপুত্রকন্যাদের যখন কাশিয়াবাগানের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন (১৮৮০/৮১) হিরণ্ময়ী দেবী তাঁদের বাড়ীতেও এ উৎসবটি পালন করতে শুরু করলেন। হিরণ্ময়ী দেবী পিতামাতার জ্যেষ্ঠা কন্যা ও তাঁদের বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন। তিনি মা ভাইবোনদের জন্মদিন পালন করতে শুরু করলেন। জানকীনাথের জন্মদিন পালন হত না, কারণ তাঁর জন্মের মাস তিথি বছর জিজ্ঞাসা করলেও বলতেন না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জন্মদিন পালনও সরলা দেবীই করেন। তখন রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথসহ সত্যেন্দ্রনাথ সপরিবারে থাকতেন ৪৯ নং পার্ক স্ট্রীটে। সরলা দেবী কাশিয়াবাগান থেকে গেলেন পার্ক স্ট্রীটে, বকুল আর বেলফুলের মালা নিয়ে। তার সঙ্গে ধুতিচাদর দিয়ে তিনি প্রণাম করলেন রবিমামাকে।[১৩৮] কাশিয়াবাগানের পরিবেশ তখন ছিল জমজমাট। সুরেন ঠাকুর (১৮৭২—১৯৪০), ইন্দিরা দেবী প্রায়ই মা বাবার সঙ্গে কাশিয়াবাগানে যেতেন।[১৩৯] সুরেন ঠাকুর ইন্দিরা দেবী ইংরাজী আদব-কায়দায় ও জ্যোৎস্নানাথ সরলা দেবী বাঙালী আদব-কায়দায় মানুষ হলেও দুটি জোড়া ভাইবোনে বাড়ীর মধ্যে ভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। রবীন্দ্রনাথও প্রায়ই কাশিয়াবাগানে গিয়ে আমোদ উৎসবে যোগ দিতেন। কাশিয়াবাগানে এ ছাড়া যেতেন মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৮—১৯৩৬) ও তাঁর চার ভাই রমনীমোহন, যোগিনীমোহন, রজনীমোহন ও সজনীমোহন।[১৪০] এঁরা আপনার লোকের মতই আনাগোনা করতেন কাশিয়াবাগানে। ১৮৭৬ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজাদেবীর সঙ্গে মোহিনীমোহনের বিবাহ হয়। এঁদেরই পুত্র তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। রমনীমোহনের (১৮৬০—১৯১৯) সঙ্গে পরে দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা ঊষা দেবীর বিবাহ হয়। মোহিনীমোহন বিলেত গেলে (১৮৮৩) রজনীমোহনের উপর পরিবার পালনের ভার পড়ে। তখন জানকীনাথ তাঁকে মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে একটি বড় চাকরী করে দিয়েছিলেন। রজনীমোহনের (১৮৬৫—-১৯৩৪) সঙ্গে হিরণ্ময়ী দেবীর ভাব ছিল বেশি। পরে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬৭—-১৯৩৮) ছোট বোন সুনয়নী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হলে কাশিয়াবাগানে তাঁর যাতায়াত কমে যায়। যোগিনীমোহনের (১৮৬৩—-১৯৩১) গতিবিধিটা ছিল বেশি। জীবনের শেষ ভাগে তিনি স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহায্যে ব্যারিষ্টার হতে বিলেত যান, সেখানেই তিনি এক

ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করেন। এঁদেরই ভগ্নী দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬২—১৯২২) দ্বিতীয়া স্ত্রী হেমলতা দেবী। আশুতোষ চৌধুরী ও তাঁর অনুজদেরও যাতায়াত ছিল কাশিয়াবাগানে। তারকনাথ পালিতের (১৮৩১—১৯১৪) পুত্র লোকেন পালিতও (জন্ম ১৮৬৫) প্রায়ই যেতেন।[১৪১]

স্বর্ণকুমারীর জীবনে থিয়জফি ও রাজনীতি

বিখ্যাত থিয়জফিষ্ট কর্ণেল হেনরী স্টিল অলকট (১৮৩২—১৯০৭) ও হেলেনা পেট্রোভ্না ব্লাভাট্স্কি (১৮৩১—৯১) ১৮৭৯ সালে প্রথম ভারতে থিয়জফি প্রচারকল্পে আসেন। অলকট জাতে আমেরিকান। ব্লাভাট্স্কি জাতে জার্মান কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষেরা রাশিয়ায় এসে বসতিস্থাপন করেন। ১৮৭৪ সালে আমেরিকায় ব্লাভাট্স্কির সঙ্গে অলকটের প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং ১৮৭৫ সালের ১৭ই নভেম্বর তাঁরা নিউইয়র্কে 'থিয়জফিক্যাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন।[১৪২] ভারতে তাঁরা প্রথম বোম্বাইতে এসে উপনীত হন। ১৮৮২ সালের শেষের দিকে থিয়জফিক্যাল সোসাইটি বোম্বে থেকে মাদ্রাজের আডিয়ারে উঠে যায়।[১৪৩] বছরে একবার করে মাদ্রাজে এই সোসাইটির অধিবেশন হত। প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪—৮৩) ১৮৭৭ সালে নিউইয়র্কের 'থিয়জফিক্যাল সোসাইটি'র করেসপণ্ডিং ফেলো নির্বাচিত হন। ১৮৮২ সালের ১৯শে মার্চ অলকট কলকাতায় আসেন এবং ১লা এপ্রিল কলকাতায় তাঁর সম্মান প্রদর্শনের জন্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১—১৯০৮) এক সান্ধ্য বৈঠকের আয়োজন করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২—৯১) প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তি সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র অতিথিকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। ঐ বছরে ৬ই এপ্রিল মাদাম ব্লাভাট্স্কি কলকাতায় এসে পৌঁছান। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা অল্কটের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় ও থিয়জফিক্যাল সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা গঠিত হয়। পরবর্তী ১৭ই এপ্রিলের সভায় কর্মাধ্যক্ষগণ নির্বাচিত হলেন। সভাপতি হলেন প্যারীচাঁদ মিত্র, সহ-সভাপতি হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজা শ্যামাশঙ্কর রায়। সভার সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হলেন রামকমল সেনের পৌত্র নরেন্দ্রনাথ সেন (১৮৪৩—১৯১১)। ইনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ১৮৬৩ থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত।[১৪৪] বলাইচাঁদ মল্লিক ও মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। প্যারীচাঁদের সভাপতিত্বে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' কার্যালয়ে এই সমিতির একটি করে পাক্ষিক অধিবেশন হত।[১৪৫] ১৮৮৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে ব্লাভাট্স্কির সেক্রেটারী হয়ে মোহিনীমোহন ইউরোপ যান।[১৪৬] উইলিয়ম পেজ উডের কন্যা ও ধর্মযাজক ফ্রাঙ্ক বেসাণ্টের পত্নী অ্যানি বেসাণ্টও (১৮৪৭—১৯৩৩) থিয়জফিষ্ট ছিলেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রধানত উৎসাহী হলেও অ্যানি বেসাণ্ট ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে দীর্ঘকাল বিশিষ্ট অংশ নিয়েছিলেন। ব্লাভাট্স্কির 'দি সিক্রেট ডক্ট্রিন' গ্রন্থের দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে। গ্রন্থটি সমালোচনার জন্য তিনি মিসেস ষ্টিডের মাধ্যমে ১৮৮৯ সালে অ্যানি বেসাণ্টকে পাঠান। অ্যানি বেসাণ্ট তখনই ব্লাভাট্স্কির সঙ্গে আলাপে আগ্রহী হন। তারপরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে থিয়জফির আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন।[১৪৭] ১৯০৭ সালে অ্যানি 'থিয়জফিক্যাল সোসাইটি'র প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়ে সোসাইটির এবং সোসাইটির পত্রিকা 'দি থিয়জ্ফিষ্ট'— এর কাজে

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পর্যটন করেন।[১৪৮] অলকট ও অ্যানি বেসান্ট ১৮৯৮ সালে কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।[১৪৯] থিয়জফিক্যাল সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা প্রতিষ্ঠিত হলে (১৮৮২), জানকীনাথ থিয়জফিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হন। থিয়জফিস্টদের অন্যতম সদস্য ছিলেন মিঃ হিউম।[১৫০] মাদ্রাজে যে থিয়জফিস্টদের সম্মিলনী অনুষ্ঠান হত, তার থেকে হিউম পরিকল্পনা করেন, সমস্ত ভারতবাসীর এমন একটা পলিটিক্যাল সম্মিলনী গড়তে পারলে তাদের পক্ষে মঙ্গল হবে। এই ভাব থেকে কংগ্রেসের উৎপত্তি এবং ভাবটিকে কাজে পরিণত করার মূলে ছিলেন জানকীনাথ। এবিষয়ে হিরণ্ময়ী দেবী লিখেছেন: "পাবলিক কার্যের মধ্যে তাঁহার সবচেয়ে প্রিয় কার্য ছিল— ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস। হিউমের উদ্বোধনে এটি জানকীনাথের স্বহস্তে রোপা স্বহস্তে জলসেচন করা ও স্বহস্তে বাড়ান জাতীয় মহীরুহ।"[১৫১] ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজীবন জানকীনাথ কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। The Calcutta Municipal Gazette -এ স্বর্ণকুমারীর জীবনীতে অমিয়ভূষণ বসু লিখেছেন— "While attending the all India Theosophical gathering at Madras in 1884, Mr. Hume suggested to young Janaki Nath and the Late Mr. Narendranath Sen of the Indian Mirror fame, the idea of having a similar annual but purely political all India gathering. The trio at once set to work, and the first session of the Indian National Congress was held the next year (1885) in Bombay under the presidency of the late Mr. W.C. Bennerjee, when Mr. Ghosal became the secretary of the All India Congress Committee, which office he held till his death in 1913." (1932, 9th May, Saturday.)

কংগ্রেস শুরু করার সময় কিছুদিন তিনি এলাহাবাদ থেকে 'ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন।[১৫২] জানকীনাথের অধ্যাত্ম বিশ্বাসের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহসিক্ত লঘু রসিকতার একটি নিদর্শন রয়েছে তাঁর স্ত্রীকে লেখা পত্রে। আহমেদনগরে বাসকালে তিনি জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখছেন, যে জ্যোৎস্নার সময় তাঁর জ্ঞানদানন্দিনীকে মনে পড়ে। তাঁর অনুমান, হয়ত এই মনে পড়ার মধ্যে স্বামী স্ত্রী দুজনেরই একটা মানসিক যোগাযোগ আছে। তিনি লিখছেন, 'ইহার যদি কোন প্রমাণ পাওয়া যায় তবে বেশ হয়। জানকীকে জিজ্ঞাসা কর তাহার Spiritualism কিছু বলে কি না?"[১৫৩] ১৯০৩/০৪ সাল নাগাদ সময়ে জানকীনাথের জীবন সর্বাপেক্ষা কর্মবহুল ছিল। এ সময়ে তিনি বেথুন কলেজের কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন (১৯০৫ সাল পর্যন্ত)। ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের পিছনে গড়পারে খালের ধারে একটি Flour Mill ছিল। তার ডিরেক্টার ছিলেন জানকীনাথ। ১৯০৪ সালে মিলটির অবস্থা খারাপ হওয়ায় তিনি সেখানে থেকে এর পরিচালনা করতেন।[১৫৪]

স্বামীর সঙ্গে স্বর্ণকুমারীও থিয়জফিতে বিশ্বাসী হন। কাশিয়াবাগানে স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়ীতে মহিলা থিয়জফিক্যাল সোসাইটির অধিবেশন বসত। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত এই সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। যাঁদের স্বামী বা বাড়ীর পুরুষেরা থিয়জফিস্ট

ছিলেন সেই মহিলারাই এই সভায় আসতেন। এই উপলক্ষে কলকাতার নানা পরিবারের মহিলাদের আনাগোনায় স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে তাঁদের বেশ সখিত্ব স্থাপিত হল। শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কাশীশ্বর মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথ মিত্রের স্ত্রীর সঙ্গে স্বর্ণকুমারী পাতিয়ে ছিলেন 'বকুলফুল'। বৌবাজারের এটর্ণী শ্রীনাথ দাসের পুত্র 'সময়' সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের পত্নীর সঙ্গে তাঁর পাতানো ছিল 'মিষ্টি হাসি'। মেয়েমহলে এই পাতানো তখন একটা চলতি রেওয়াজ ছিল। স্বর্ণকুমারীরও পাতানো সখি অনেকে ছিলেন। মাদাম ব্লাভাট্স্কি ও কর্ণেল অলকট প্রায়ই আসতেন কাশিয়াবাগানের বাড়ীতে, এবং মেয়েদের দীক্ষা দিতেন। প্রথম কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৪—১৯০৬) স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবীও থিয়জফিক্যাল সোসাইটির সদস্যা ছিলেন। তাঁর বাড়ীতেও মাঝে মাঝে সমিতির অধিবেশন বসত। সরলাদেবী সেখানে গান গাইতেন। উমেশচন্দ্রের ভগ্নীরাও এই সমিতির সদস্যা ছিলেন। ভবানীপুরের নবীন ব্যানার্জীর বোন কাশিয়াবাগানে থিয়জফির সভায় সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করতেন। নবীন ব্যানার্জীর ছেলে 'মেস্‌মেরিজমে' সিদ্ধ হয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের প্রথমা স্ত্রী সুশীলা দেবীও (বরিশালের রাখালচন্দ্র রায়ের কন্যা ও কবি দেবকুমার রায়চৌধুরীর ভগ্নী ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জননী) থিয়জফিক্যাল সোসাইটির সভ্যা ছিলেন। নির্মলা নাম্নী তাঁর একটি পালিতা দাসীপুত্রী ছিল। তাকে মাঝে মাঝে তিনি মেস্‌মেরাইজ করতেন। তিনি আড়াল থেকে তিত-মিষ্টি যা কিছু খেতেন ঘুমন্ত নির্মলার মুখে সেই স্বাদ আসত। স্বর্ণকুমারীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীও (১৮৬৮—১৯২৫) থিয়জফিতে দীক্ষিত হন।[১৫৫] স্বামীর শিক্ষায় স্বর্ণকুমারী রাজনীতি চর্চাও করতেন। স্বর্ণকুমারীর জীবনকে দিন দিন নানাবিধ চিন্তায় কাজে নতুন করে গড়ে তোলায় জানকীনাথের উৎসাহ ছিল সবথেকে বেশি। ১৮৮৯ সালে বোম্বাইতে কংগ্রেসের যে পঞ্চম অধিবেশন হয় তাতে ছ'জন মহিলা ডেলিগেটরূপে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী কাদম্বিনী দেবী (১৮৬১/৬২—১৯২৩)। কাদম্বিনীর পিতা মনোমোহন ঘোষের মাতুল ব্রজকিশোর বসু। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা (১৮৭৮) প্রথম ভারতীয় মহিলা। ১৮৮২ সালে উত্তীর্ণা প্রথম বঙ্গমহিলা গ্র্যাজুয়েটদ্বয়ের অন্যতমা তিনি, যার অপর জন হলেন চন্দ্রমুখী বসু। ছ'জন ডেলিগেটের মধ্যে কাদম্বিনী ছাড়াও ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের পত্নী রমাবাই ও স্বর্ণকুমারী দেবী। আহমেদাবাদের প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক মহীপত্‌রাম রূপরাম নীলকণ্ঠের পত্নী লেডি বিদ্যাগৌরী নীলকণ্ঠও ডেলিগেটরূপে সভায় ছিলেন।[১৫৬] পরের বছর ১৮৯০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনেও স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিনিধি ছিলেন।[১৫৭] এ অধিবেশন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অমিয়ভূষণ বসু লিখেছেন—

"The sixth session of the Indian National Congress was held in Calcutta at the Tivoli Gardens, in 1890 when the late Sir (then Mr.) Pherozshah Mehta was the President, and the late Mr. Monomohon Ghosh, Bar-at-law was the Chairman of the receiption Committee."

স্বর্ণকুমারী দেবী ও কাদম্বিনী গাঙ্গুলী অধিবেশনে ডেলিগেটরূপে উপস্থিত ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্বর্ণকুমারী জাতীয় সঙ্গীত রচনা দ্বারা দেশবাসীকে স্বদেশীমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ :—

"ঐ আহ্বান-গীতি বাজে,
জয় জয় জয় জয় প্রণমি রাজরাজে,
সবে জাগি, এস লাগি জন্মভূমির কাজে।
হের দূরিত তিমির রাত্রি,
মোরা দীপ্ত প্রভাতের যাত্রী,
চলি উৎসাহে কোটি ভ্রাতৃ
বীর সৈন্যের সাজে;
যাপি বৃথা আলস্য ঘুমে,
আর লুণ্ঠিত না রব ভূমে,
সব আসন লব করমে
জগত জাতির মাঝে।"[১৫৮]

আর একটি সঙ্গীত :—

"শত কণ্ঠে কর গান জননীর পূত নাম,
মায়ের রাখিব মান-লয়েছি এ মহাব্রত।
আর না করিব ভিক্ষা, স্ব-নির্ভর এই শিক্ষা,
এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত।
সাক্ষী তুমি মহাশূন্য, না লব বিদেশী পণ্য,
ঘুচাব মায়ের দৈন্য,— করিলাম এ শপথ।
পরি ছিন্ন দেশী সাজ, মানি ধন্য ধন্য আজ।
মায়ের দীনতা-লাজ হবে দূর-পরাহত,
এই আমাদের ধর্ম, এই জীবনের কর্ম
এই বস্ত্র, এই ধর্ম, এই আমাদের মুক্তিপথ।
নমো নমো বঙ্গভূমি, মোদের জননী তুমি,
তোমার চরণে নমি, নরনারী মোরা যত।"[১৫৯]

সখিসমিতি

ক্রমশঃ ব্লাভাট্স্কির অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে অনেকেই সন্দিহান হয়ে উঠলেন— বিশ্বাস প্রাবল্যে মন্দা পড়ল। স্বর্ণকুমারী প্রমুখ সম্ভ্রান্ত মহিলারাও থিয়জফিক্যাল সোসাইটির সংস্রব ত্যাগ করলেন। সোসাইটির মহিলা সদস্যাদের নিয়ে স্বর্ণকুমারী 'সখিসমিতি' স্থাপন করলেন ১৮৮৬ সালে। 'সখিসমিতি' নামটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া।[১৬০] 'সখিসমিতি' প্রতিষ্ঠায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও শরৎকুমারী চৌধুরাণীর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। 'সখিসমিতি' গড়ে তোলার গোড়ার কথা শরৎকুমারী লিখেছেন :— "... একদিন সন্ধ্যার সময় আমরা তিনজনে তেতলার ঘরের খাটের উপর কেহ বসিয়া কেহ শুইয়া গল্প করিতেছিলাম। শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বলিলেন যে, 'দেখ, আমার মনে হয়, আমরা চেষ্টা করিলে দেশের ও জনসাধারণের অনেক কাজ করিতে ও করাইতে পারি। মনে কর, তোমার স্বামী ডাক্তার, — কোন দরিদ্র বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাইতেছে, তুমি স্বামীকে বলিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলে, কাহারও স্বামী ব্যারিষ্টার— স্বামীকে বলিয়া সুবিচারের প্রার্থী কোন দরিদ্রের তিনি কাজটি উদ্ধার করিয়া দিলেন।' সকল কথা মনে নাই, কিন্তু বেশ মনে পড়ে, সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত এই বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে আমরা এই কথাবার্তায় এমন নিমগ্ন ছিলাম যে, কখন যে ঘর চাঁদের আলোতে ভরিয়া উঠিয়াছে তাহা জানিতেও পারি নাই। সেদিনের আর সব কথা ভুলিয়া গিয়াছি, কেবল সেই চাঁদের আলো মনে আছে, আর মনে আছে— তাহার অল্পদিন পরেই শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কর্তৃক সখি-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

আশ্চর্যের বিষয় এই আমাদের কথোপকথন স্থলে সেদিন স্বর্ণকুমারী দেবী উপস্থিত ছিলেন না, — অথচ এই একই সময়ে এই স্ত্রীশক্তির ভাবটি তাঁহার মনে স্বতঃজাগরিত হইয়া উঠে— এবং আমাদের কল্পনা-জল্পনা তাঁহার যত্নে কার্যে পরিণতি লাভ করে। সখি-সমিতি স্থাপিত হয় ১২৯৩ সালের বৈশাখে; — ইহার উদ্দেশ্য ছিল, মেয়েতে মেয়েতে আলাপ-পরিচয় দেখাশুনা, মেলামেশা স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার ও উন্নতির চেষ্টা, বিধবা রমনীকে সাহায্য করা, অনাথাকে আশ্রয় দান ইত্যাদি।"[১৬১] স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর মেজবৌঠাকুরাণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী উভয়েরই নারীহিতৈষণামূলক কর্মধারা ও চিন্তার মধ্যে একটা সাদৃশ্য অনুভব করা যায় এখানে। তার প্রমাণ, স্বর্ণকুমারী প্রতিষ্ঠিত 'সখি-সমিতি'র মূল প্রেরণা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও অনুভব করেছিলেন। দুর্গামোহন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়ের (১৮৪৯—১৯৩২) পত্নী সরলা রায় (১৮৬১—১৯৪৬) 'সখি-সমিতি'র অন্যতম সদস্যা ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৮৭৮ সালে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়' বেথুন স্কুলের সঙ্গে মিলিত হলে সরলা দাস ও ব্রজকিশোর বসুর কন্যা কাদম্বিনী বসু

(১৮৬১/৬২—১৯২৩) উভয়েই প্রবেশিকা পরীক্ষার টেস্ট দেন ও উত্তীর্ণ হন। এ সময়েই সরলার বিবাহ হওয়ায় এণ্ট্রান্স পরীক্ষা আর তিনি দিতে পারেন নি। সরলা রায়ের প্রধান কীর্তি মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলের (১৮৬৬—১৯১৫) প্রেরণায় 'গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল ও কলেজ' প্রতিষ্ঠা। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের প্রথম মহিলা সদস্যা ছিলেন। 'সখি-সমিতি'র সম্পাদিকা ছিলেন, স্বর্ণকুমারী দেবী। 'সখি-সমিতি'র অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সদস্যারা হলেন স্যার আশুতোষ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ও কৃষ্ণকুমার বাগচীর পত্নী স্বনামধন্যা লেখিকা প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭—১৯৩৯), স্বর্ণকুমারীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ও সারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী সৌদামিনী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী, মনোমোহন ঘোষের স্ত্রী স্বর্ণলতা ঘোষ, স্বর্ণকুমারীর 'মিষ্টি হাসি' পাতানো সখি বসন্তকুমারী দাস। ডাক্তার অন্নদা চরণ খাস্তগিরের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও আই. সি. এস. বিহারীলাল গুপ্তের (১৮৪৮—১৯১৬) পত্নী সৌদামিনী দেবীও 'সখি-সমিতি'র সদস্যা ছিলেন। এ ছাড়া অন্যতম সদস্যা ছিলেন চন্দ্রমুখী বসু। চন্দ্রমুখী বসু ছিলেন যুক্তপ্রদেশের একজন বাঙালী খ্রীষ্টান ভুবনমোহন বসুর কন্যা। ১৮৮২ সালে তিনি ও কাদম্বিনী বসু প্রথম বঙ্গমহিলা গ্র্যাজুয়েট হন। কাদম্বিনীর পরে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়। চন্দ্রমুখী ১৮৮৪ সালে এম. এ. পাশ করেন। তিনিই প্রথম এম. এ. উত্তীর্ণা বঙ্গ মহিলা। চন্দ্রমুখী এম. এ. পাশ করলে বিদ্যাসাগর খুশী হয়ে এক প্রস্থ শেক্সপীয়ার গ্রন্থাবলী উপহার দেন তাঁকে। ১৮৮৪ সাল থেকে বেথুন কলেজে চন্দ্রমুখী অধ্যাপনা করেন। শেষে অধ্যক্ষতা করার কালে তিনি ১৯০১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। অন্যান্য সভ্যাদের মধ্যে ছিলেন, ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বার আই. সি. এস. কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের স্ত্রী ও 'পারিবারিক জীবন' গ্রন্থ (১৯০৩) রচয়িত্রী প্রসন্নতারা গুপ্তা (১৮৫৪—১৯০৮), স্বর্ণকুমারীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী, ও কবি গিরীন্দ্রমোহিনী (১৮৫৮—১৯২৪)। রজনীনাথ রায়ের পত্নী বিধুমুখী দেবী, 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের পুত্র অতুলচন্দ্র ঘোষের পত্নী সুরবালা ঘোষ (১৮৬৭—১৯৩৩), মনোমোহিনী দেবী, ললিতা রায়, বরদাসুন্দরী ঘোষ প্রভৃতি মহিলারাও 'সখি-সমিতি'র সভ্যা ছিলেন।[১৬২] 'সখি-সমিতি'র উদ্দেশ্য ছিল :—

১। "সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের সম্মিলন ও সদ্ভাব-বর্ধন।

২। যে কোন সঙ্গতিহীনা কি বিধবা কি কুমারী— সখি-সমিতির উদ্দেশ্যানুমোদিত সদনুষ্ঠানে ব্রতপালনে ইচ্ছুক তাহাকে আশ্রয় ও শিক্ষাপ্রদান, অন্যতঃ অনাথাদিগকে সাধ্যমত অর্থসাহায্য করা।

৩। সমিতির পালিতাগণ সুশিক্ষিতা হইলে তাহাদিগকে বেতন দিয়া অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার।"[১৬৩]

নিগৃহীতা মেয়েদের জন্য প্রয়োজন হলে উকিল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করে মামলা মোকদ্দমা চালানো, বিভিন্ন স্থান থেকে শিল্পকাজ সংগ্রহ করে মেলা করা ইত্যাদি সমাজের মঙ্গলকারক কাজও ছিল 'সখি-সমিতি'র অন্য উদ্দেশ্য।[১৬৪] 'মহিলা শিল্প-মেলা'ও স্বর্ণকুমারীর দ্বারাই উদ্ভাবিত। "অন্তঃপুর-মহিলাগণের হৃদয় মনের প্রসারতা সম্পাদন এবং তাঁহাদের শিল্পোন্নতি সাধন উদ্দেশ্যে

কেবল মহিলাদিগের জন্য এবং মহিলাগণ কর্তৃক বৎসরান্তে উক্ত নামে একটি ক্ষুদ্র প্রদর্শনী সংগঠিত হইত। এই প্রদর্শনীতে বোম্বাই, আগ্রা, দিল্লী, জয়পুর, কানপুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানের শিল্পাদি রক্ষিত হইত এবং মহিলাগণ তাঁহাদের রচিত নানারূপ শিল্পও প্রেরণ করিতেন। শিল্পনৈপুণ্যের তারতম্য অনুসারে তাঁহারা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন। অন্তঃপুর-মহিলাগণের নিকট 'মহিলা-শিল্পমেলা' একটি বিশেষ আনন্দ উৎসব বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহারা প্রতি বৎসর ইহার জন্য আগ্রহভরে অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। এই মেলা হইতে যে অর্থলাভ হইত, তাহা 'সখি-সমিতি'র ভাণ্ডারে যাইত।"[১৬৫] 'সখি-সমিতি'র পক্ষ থেকে সরলা রায় সমিতির সাহায্যার্থে 'মহিলা শিল্পমেলা'য় মেয়েদের অভিনয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথকে একটি নাটক লিখে দিতে অনুরোধ করেন। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮)। সরলা রায়ের অনুরোধে লেখা বলে রবীন্দ্রনাথ গীতিনাটকটি উপহারও দেন তাঁকে এবং 'সখি-সমিতি'কে এর উপস্বত্ব প্রদান করেন। কেবল মেয়েরা শিল্পমেলায় অভিনয় করবেন বলে নাটকটির অধিকাংশ ভূমিকাই মেয়েদের। যে কটি পুরুষ চরিত্র আছে, এমন নিরীহ যে মেয়েরা অভিনয় করলেও সেগুলি বেমানান হয় না। বেথুন স্কুল গৃহের প্রশস্ত আঙিনায় ১৮৮৮ সালে (১২৯৫ বঙ্গাব্দের ১৫ই পৌষ) মহিলা শিল্পমেলার দ্বার উন্মোচন করেন তৎকালীন ছোটলাট বেলীর পত্নী লেডী বেলী। লেডী ল্যান্সডাউনও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। এই মেলাতেই 'মায়ার খেলা'র প্রথম অভিনয় হয়। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা এই সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ অভিনয় করলেন এবং দর্শকও ছিলেন শুধু মহিলারা।[১৬৬] অভিনয় করেন ঠাকুর বাড়ীর মেয়েরা। এই অভিনয় প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী লিখেছেন : "সখাদের বেশ ছিল খুব টকটকে রঙের সাটিনের পাঞ্জাবী ও ধুতি, তার সঙ্গে ঈষৎ গোঁফের রেখা। আর মায়াকুমারীদের হাতের দণ্ডের মুণ্ডে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছিল আর নিভছিল, বোধ হয় বিলিতী পরীর অনুকরণে।"[১৬৭] অভিনয়ের গান শেখানোয় প্রধান অংশ ছিল রবীন্দ্রনাথের এবং প্রতিভা দেবীও তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।[১৬৮] এ অভিনয় — অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে সরলা দেবী চৌধুরাণী লিখেছেন— "মায়ার খেলা'র প্রথম অভিনয় সখি-সমিতি'তে হয়। সেবার দাদা ও সুরেন স্টেজ ম্যানেজার ছিলেন। মায়াকুমারীদের মাথায় অলক্ষ্য তারে বিজলীর আলো জ্বালান তাঁদের একটি বিশেষ কারিগরি ছিল। আর সবাই অতি ভয়ে ভয়ে ছিল— পাছে বিজলীর তার জ্বলে উঠে মায়াকুমারীদের shock লাগে। কিন্তু তাঁরা নূতন বৈজ্ঞানিক, নির্ভীক।"[১৬৯] এই অভিনয়ের কথা গিরীন্দ্রমোহিনীর লেখাতেও জানা যায়: "বেথুনে প্রথম উদ্‌ঘাটিত শিল্প মেলায় যেদিন মহিলাগণ কর্তৃক 'মায়ার খেলা'র অভিনয় হয় এবং মেয়েরা পুরুষদের মত সম্মুখে গ্যালারিতে বসিয়া সে অভিনয় দর্শন করেন। সে কি এক নূতন আমোদ সকলে অনুভব করিয়াছিলেন : মনে আছে আমারই পার্শ্বোপবিষ্টা একটি মেয়ে বলিয়াছিলেন, "এঁরা যদি সকলে চরিত্রবতী হন, তাহা হইলে এরূপ সুচারু অভিনয় ক্ষমতা বিশেষ প্রশংসা ও বাহাদুরির বিষয়।"[১৭০]

স্বর্ণকুমারীর ঘরোয়া জীবন ও সাহিত্যসাধনা

বাইরের বৃহত্তর কর্মজগতের পাশে চলেছে স্বর্ণকুমারীর সংসার জীবন। বড় মেয়ে হিরণ্ময়ী দেবী বেথুন স্কুল থেকে ১৮৮২ সালে মাইনর পরীক্ষা পাশ করলেন।[১১১] বাড়ীর বড় মেয়ে বলে সংসারের দায়িত্ব কর্তব্য অনেকটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে তিনি মায়ের সাহায্য করতেন। নিজে যেমন মা বাবার আদর পেয়েছেন বেশি, তেমনি তিনিও ভাইবোনদের ভালবাসতেন প্রাণভরে। কাশিয়াবাগানের বাড়ীতে তিনিই ছিলেন পরিবারের কর্ণধার। 'একটি সুবাসের মত' তাঁর স্মৃতি দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিলেন ছোট বোনের হৃদয়কে। ছোট বোনের মাতৃস্নেহের অভাব অনেকটা পূর্ণ হয়েছিল দিদিকে দিয়ে। মায়ের পরিচালন ক্ষমতা মেয়েদের মধ্যে বাল্যকাল থেকেই স্ফুরিত হচ্ছিল। কাশিয়াবাগানে দুবোনে একটি পাঠশালা খোলেন। তখন সরলার (১৮৭২—১৯৪৫) বয়স দশ এগারো, হিরণ্ময়ীর (১৮৬৮—১৯২৫) চোদ্দ পনেরো। হিরণ্ময়ী তখন মাইনর পরীক্ষা পাশ করেছেন। পাড়ায় মেয়েরা খিড়কির দরজা দিয়ে পুকুরে জল নিতে যাতায়াত করত, তাদে. দেখেই এই স্কুল খোলার পরিকল্পনা জাগে দুবোনের মাথায়। স্কুলের পাঠরতা মেয়েরা বসত চাঁদনির সিঁড়িতে ধাপে ধাপে। হিরণ্ময়ী হলেন স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী— সরলা হলেন তাঁর অ্যাসিস্টাণ্ট। দুবোন দুপুর বেলা বেথুন স্কুলে যেতেন। সকাল সন্ধ্যায় বাড়ীতে সতীশ পণ্ডিতের কাছে তাঁরা পড়তেন এবং সংস্কৃত পড়তেন শশী পণ্ডিতের কাছে। ওস্তাদ ও মেমের কাছে তাঁরা গান, সেতার ও পিয়ানো শিখতেন। আর স্কুল থেকে ফিরেই মুখ হাত ধুয়ে কিছু খেয়ে নিয়ে বিকেল সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে ছটা পর্যন্ত তাঁরা স্কুল চালাতেন। ছাত্রীদের কেউ কুমারী, কেউ ছিল বাল্যবিধবা। প্রায় কুড়িটি মেয়ে এই স্কুলে আসত। বাংলা, ইংরাজী, অঙ্ক, সেলাই এই চারটি বিষয়ই হিরণ্ময়ী ও সরলা শেখাতেন। সন্ধ্যের আগে প্রতিদিনই জোড়াসাঁকোর মামাবাড়ির যে আত্মীয়রা আসতেন তাদের দিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হত এই ছাত্রীদের। একবার রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে প্রাইজ দেওয়াও হয়েছিল।[১১২] এ-বিষয়ে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর মন্তব্য স্মরণযোগ্য : "স্বর্ণ পিসিমারা জোড়াসাঁকো ছেড়ে একসময়ে কাশিয়াবাগান অঞ্চলে একটি বাগানবাড়ীতে গিয়ে ছিলেন। সেখানে আমাদের সকলের খুব যাওয়া আসা ছিল। রবিকাকাও মাঝে মাঝে যেতেন এবং আমাদের আমোদ-প্রমোদে যোগ দিতেন। ... আর একটি কথা মনে পড়ে— অঙ্কুরেই যেমন বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি সরলাদি আর হিরণদিদিও এইখানেই পাড়ার মেয়েদের শিখিয়ে পড়িয়ে তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সূচনা করেছিলেন।[১১৩]

স্বর্ণকুমারীর 'মালতী' উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৮৮০ সালে ('ভারতী'তে প্রথম প্রকাশিত ১২৮৬ বঙ্গাব্দের মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায়)। এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু হল ভাইবোনের অকৃত্রিম গাঢ় ভালাবাসা। অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্যের (১৮৭৪) অনুসরণে লেখা স্বর্ণকুমারীর

'গাথা' কাব্যও এই বছরেই বার হয়। এটি প্রথম 'ভারতী'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে (বাংলা ১২৮৫,' ৮৬ সালে) প্রকাশিত হয়। এ কাব্যে ছন্দে বিহারীলালের অনুসরণ দেখা যায়। 'গাথা' কাব্য উপহার দিয়েছেন স্বর্ণকুমারী প্রিয়তম ছোটভাই রবীন্দ্রনাথকে। উপহারে এই ভাইটির প্রতি ন'দিদি স্বর্ণকুমারীর প্রাণের গভীর স্নেহ বাঙ্ময় রূপ নিয়েছে :—

"ছোট ভাইটি আমার,
যতনের গাথা হার, কাহারে পরাব আর?
স্নেহের রবিটি, তোরে আয়রে পরাই,
যেন রে খেলার ভুলে, ছিঁড়িয়ে ফেল না খুলে
দুরন্ত ভাইটি তুই— তাইতে ডরাই।"

স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ভারতী'তে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি 'পৃথিবী' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়ে বার হয় ১৮৮২ সালে।

কাশিয়াবাগানের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন সরলা দেবীর পিসেমশায় পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর দাদা অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও (১৮৬০—১৯২৭) প্রায়ই কাশিয়াবাগানে যেতেন কাকার সঙ্গে।[১৭৪] গিলক্রিষ্ট স্কলারশিপ নিয়ে ফণিভূষণ বিলেত গেলেন ১৮৭৮ সালে, এবং লণ্ডন ইউনির্ভাসিটি থেকে বি.এস.সি পাশ করলেন ১৮৮১ সালে।[১৭৫] ভারতীয় মেধাসম্পন্ন ছাত্রদের বিদেশে উচ্চতর শিক্ষালাভের সাহায্যার্থে গিলক্রিষ্ট স্কলারশিপ প্রবর্তিত হয় ১৮৬৭—৬৮ সালে। এর প্রথম পরীক্ষা হয় ১৮৬৯ সালে জানুয়ারী মাসে। প্রথম গিলক্রিষ্ট স্কলারশিপ পেয়েছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ডক্‌টর প্রসন্ন কুমার রায় (১৮৫৯—১৯৩২) ও সরোজিনী নাইডুর পিতা ডক্‌টর অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৫০—১৯১৫); ১৮৭৪ সালে গিলক্রিষ্ট স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত যান রমেশচন্দ্র দত্তর (১৮৪৮—১৯০৯) জ্যেষ্ঠ জামাতা প্রখ্যাতনামা ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু (১৮৫৫—১৯৩৪)[১৭৬]। আর যাঁরা এই স্কলারশিপ পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৭—১৯৩৮)। ফণিভূষণের পরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-ও (১৮৬১—১৯৪৪) গিলক্রিষ্ট স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত যান ১৮৮২ সালে। ফণিভূষণ উদ্ভিদ বিদ্যা ও দর্শনে অনার্স পান এবং রসায়নে স্বর্ণপদক পান।[১৭৭] ১৮৮৩ সালে তিনি দেশে ফিরে সরকারী শিক্ষা বিভাগের কাজ নিলেন এবং রাজসাহী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করলেন। হুগলী ও প্রেসিডেন্সি কলেজেও তিনি অধ্যাপনা করেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেছেন ১৮৮৭ জুন—১৮৯৩ আগষ্ট : ১৮৯৩ নভেম্বর—১৮৯৫ এপ্রিল, ১৮৯৫ নভেম্বর—১৯০১। অধ্যাপনার পর ফণিভূষণ স্কুলের ইন্সপেক্টর হন এবং এই পদে কাজ করতে করতেই ১৯১৫ সালে অবসর নেন।[১৭৮] এরপর ১৯১৭ সাল থেকে তিন বছর তিনি ইন্দোর স্টেটে 'শিক্ষা অধিকর্তা' বা ডি.পি.আই-এর কাজ করেন।[১৭৯] অধ্যাপনার সঙ্গে তিনি সাহিত্য চর্চাও করতেন। রাজসাহী কলেজে অধ্যাপনা কালে স্বর্ণকুমারীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় ১৮৮৪ সালে, রবীন্দ্রনাথের বিয়ের তিন মাস পরে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্য নাতনীদের মত হিরণ্ময়ীরও

বিয়ে হল জোড়াসাঁকোর উপাসনার দালানে। স্বর্ণকুমারী জ্যেষ্ঠা কন্যার বিয়ে দেওয়ার জন্য কাশিয়াবাগান থেকে এসে জোড়াসাঁকোয় রইলেন কিছুদিন। দুর্গামোহন দাসের ছোট মেয়ে, সরলা অবলার ছোট বোন শৈল বা খুসি হল 'নিতকনে', কারণ বাড়ীর মেয়েদের দালানে বিয়ের সভায় যাওয়ার নিয়ম তখনও হয় নি। বিয়ের আসরে রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত 'বিবাহোৎসব' নামক একটি গীতিনাট্য অভিনয় করালেন হিরণ্ময়ীর বয়সী ও তাঁর চেয়ে কিছু বড় ঠাকুরবাড়ীর মেয়েদের দিয়ে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজা দেবী হলেন নায়িকা, আর অন্য মেয়েরা তার সখী। সরোজা তখন বিবাহিতা (বিবাহ ১৮৭৬)। নাটকটির পুরুষ চরিত্র ছিল দুটি একজন নায়ক আর একজন তার আমুদে সখা। এই চরিত্র দুটি রূপ দিয়েছিলেন যথাক্রমে দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথমা স্ত্রী সুশীলা দেবী ও মহর্ষির তৃতীয়া কন্যা শরৎকুমারীর মেয়ে এবং সুকুমার হালদারের স্ত্রী সুপ্রভা দেবী (এঁরই পুত্র চিত্রশিল্পী অসিতকুমার হালদার)।[১৮৩]

"ভারতী"- সম্পাদনা

হিরণ্ময়ীর বিয়ের মাস কয়েক আগে স্বর্ণকুমারী মেজদাদার সঙ্গে গেলেন কারোয়ারে (১৮৮৩)। সত্যেন্দ্রনাথ তখন বোম্বাইপ্রদেশের কারোয়ারে ছিলেন। সরলা দেবী লিখেছেন: "... কতদিন ধরে তার জন্যে উদ্যোগ আয়োজন চলেছিল। বাড়িতে দর্জি বসে গিয়েছিল ও মায়ের জন্য নূতন নূতন কাপড় সেলাই চলছিল। সঙ্গে সঙ্গে দিদিরও দুচারখানা হয়ে যাচ্ছিল।"[১৮১] কারোয়ার যাত্রায় স্বর্ণকুমারীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী সৌদামিনী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথও তাঁদের সঙ্গী ছিলেন। কারোয়ার থাকতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪)। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে কারোয়ার স্মৃতিচিত্রণ আছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র প্রকৃতি চেতনার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "প্রকৃতির সৌন্দর্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেইজন্যই যে এই সৌন্দর্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই, এই কথাটা নিশ্চয় করিয়া বুঝাইবার জায়গা ছিল বটে সেই কারোয়ারের সমুদ্রবেলা।"[১৮২] কারোয়ার থেকে ফিরে আসার কিছু পরে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয় (১৮৮৩, ডিসেম্বর) মৃণালিনী (ভবতারিণী) দেবীর (১৮৭৩—১৯০২) সঙ্গে। স্বর্ণকুমারীর কারোয়ারে যাবার দুদিন আগে বড় মেয়ে হিরণ্ময়ী মায়ের আসন্ন বিচ্ছেদে কাতর হলেন, চোখে জল এল। মা ও বড় মেয়ের মধ্যে তখন ঘনিষ্ঠতাটা ছিল বেশি, যে ঘনিষ্ঠতা মূলতঃ গড়ে উঠেছিল হিরণ্ময়ীর মা বাবার প্রতি অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা সমন্বিত কর্তব্যপরায়ণতার যত্নের মধ্যে দিয়ে। হিরণ্ময়ীর তখনকার নিকট সঙ্গিনী ছিলেন মা স্বর্ণকুমারী দেবী। কিন্তু মায়ের বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় ব্যথাকাতর হল না ছোট মেয়ে সরলার মন. কারণ মায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা তখন দূরের ছিল— দুজনে দুজনের নিকট সান্নিধ্যে আসেন নি তখনও। সরলার কাছে মা বাড়ীতে থাকা আর কারোয়ারে থাকা একই ব্যাপার। ছোট বোনের ভালবাসার অনুভূতি নেই ব'লে দিদি হিরণ্ময়ী সেদিন সরলাকে খোঁটা দিয়েছিলেন।[১৮৩] পরে দিদির বিয়ে হয়ে গেলে, দাদা জ্যোৎস্নানাথ বিলেত গেলে মা ও ছোট মেয়ে সরলার সম্পর্কটা কাছাকাছি হল।

১৮৭৭ থেকে (১২৮৪) ১৮৮৪ সাল (১২৯০) পর্যন্ত সাত বছর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সহোদর সহোদরাদের সহযোগিতায় যথার্থ যোগ্যতা সহকারে ও কৃতিত্বের সঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যানুরাগিণী এবং বহু রমণীয় গুণের অধিকারিণী সুযোগ্যা সহধর্মিণী কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যু হলে (৮ই বৈশাখ ১২৯১ বঙ্গাব্দ) ঠাকুরপরিবারের সকলে শোকে মোহ্যমান হয়ে পড়েন। 'ভারতী'র সেবকেরা তখন পত্রিকাটির প্রচার বন্ধ করাই স্থির করলেন। ১৮৮৪ সালে (১২৯১ বঙ্গাব্দে) দ্বিজেন্দ্রনাথের হাত থেকে 'ভারতী'র দায়িত্ব তুলে নিলেন তাঁর অনুজা স্বর্ণকুমারী দেবী। এ-প্রসঙ্গে শরৎকুমারী

চৌধুরাণী মন্তব্য করেছেন : "ফুলের তোড়ার ফুলগুলি সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে তাহা বাঁধা থাকে তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন ছিড়িল— 'ভারতী'র সেবকেরা আর ফুল তোলেন না, মালা গাঁথেন না, 'ভারতী' ধূলায় মলিন। এই দুর্দিনে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী নারীর পালন-শক্তির পরিচয় দিলেন। ধূলা ঝাড়িয়া সস্নেহে 'ভারতী'কে কোলে তুলিয়া লইলেন; সেই সঙ্কটকালে তিনি রক্ষা না করিলে আজ 'ভারতী'র নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইত।"[১৮৪] ১৮৮৪ সালে 'ভারতী' নূতন গৃহে পদার্পণ করল। সম্পাদকীয় দায়িত্ব নিয়ে স্বর্ণকুমারী 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যায় (১২৯১, বৈশাখ) একটি দীর্ঘ ভূমিকায় 'ভারতী'র জীবনের এই বিশেষ পরিবর্তনের উল্লেখ ক'রে লিখেছিলেন: "আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাদা মহাশয় বর্তমান বৎসর হইতে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরিবর্তে আমরা উক্ত ভার গ্রহণ করিলাম। ... আরম্ভ হইতে এ পর্যন্ত যিনি এই পত্রিকা এমন সুন্দররূপে চালাইয়া আসিয়াছেন, অন্য কার্যবশতঃ এখন তাঁহার সময় অভাব হইয়াছে, সে নিমিত্ত তিনি যখন সম্পাদকীয় ভার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন তখন ভারতী উঠাইয়া দেওয়াই স্থির হইল। আমাদের দেশের এবং বাঙালাভাষায় বর্তমান অবস্থায় ভারতীর ন্যায় কোন একখানি পত্রিকার অকালমৃত্যু বড়ই কষ্টকর। এই অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছাতেই আমরা ভারতীর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছি।" বিয়ের পর কন্যা যখন শ্বশুরবাড়ি যায় তখন সে নিজেও অশ্রুজল ফেলতে থাকে, তার আত্মীয়স্বজনও দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু কন্যা যখন পরে দেখে শ্বশুরবাড়িতে তাকে আদর যত্ন করার, তার দুঃখে ব্যথা পাবার লোক আছে তখন সে সান্ত্বনা পায় তার আত্মীয়বর্গও সুখী হয়। স্বর্ণকুমারী বলেছেন 'ভারতী' পিতৃতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথের হাত থেকে স্বর্ণকুমারীর গৃহে এসেও সেইরকম যত্ন পাবে, আন্তরিকতা পাবে। এই আশ্বাসবাণী থেকে স্বর্ণকুমারীর সুগভীর আত্মবিশ্বাস ও গাঢ় অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। 'ভারতী' হাতে নিয়ে স্বর্ণকুমারীকে অসাধারণ পরিশ্রম করতে হত। "ছোট গল্প বড় গল্প ত লিখিতেনই, হাস্যকৌতুক হইতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পর্যন্ত অনেক সময় তাঁহাকে নিজেকে লিখিতে হইত। ইহা ছাড়া সমালোচনা, অন্যের লেখা নির্বাচন সংশোধন এবং প্রুফ দেখার কাজ ত ছিলই, ঘরকন্নার কাজ, লোক লৌকিকতা— এসবও ত বাদ যাইবার নয়, তাহার উপর সখি সমিতির পর্ব!"[১৮৫] কাঁচা লেখকের লেখাকে পাকা করতে তাঁকে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হত। "যে লেখার মধ্যে একটুও ক্ষীর তিনি দেখিতেন, তাহা নীর বর্জিত করিয়া লইতেন। অনেক সময় এমন হইত যে সংশোধনের পর লেখক বুঝিতে পারিতেন না যে লেখাটি তাঁহার কি না!"[১৮৬] 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যার সুষ্ঠু সুন্দর প্রকাশের পর ভায়েরা খুশী হলেন। কাশিয়াবাগানে এসে তাঁরা প্রফুল্ল মুখে সার্টিফিকেট দিয়ে গেলেন।[১৮৭] এ সময় থেকে স্বর্ণকুমারীর প্রতিভার বিচিত্র অভিনব প্রকাশ হতে থাকে। অন্তঃপুরিকা-সত্তা ও সাহিত্যস্রষ্ট্রী ও সম্পাদিকা সত্তার অভিনব সঙ্গম ঘটল স্বর্ণপ্রতিভায়। একদিকে সংসারের কর্তব্য কারণ বড় মেয়ের তখন বিয়ে হয়ে গেছে যে মেয়ে সংসারের কর্ণধার হয়েছিলেন। সরলা তখনও স্কুলের ছাত্রী। তাই গৃহকর্ম, অতিথি অভ্যাগতের আদর আপ্যায়নের সঙ্গেই স্বর্ণকুমারী পত্রিকা সম্পাদনা

করেছেন, লিখেছেন ও লেখক তৈরী করেছেন। 'সখি সমিতি'র মাধ্যমে তিনি নারী সমাজের উন্নতিকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। স্বর্ণকুমারীর গৃহ ও সাহিত্যজীবন দুই ধারাই পাশাপাশি বইতে পেরেছিল অনেকটাই তাঁর উদারহৃদয় স্বামীর আন্তরিক সহানুভূতিশীল উৎসাহ ও সাহায্যের জন্য। স্বামীর কাছে এই উৎসাহ ও প্রেরণা প্রাপ্তিকে স্বর্ণকুমারী চিরকাল গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর প্রেম স্বামী জানকীনাথই সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। স্বামীর উৎসাহ পূর্ণ সমর্থনেই তিনি 'ভারতী'র সম্পাদনার দায়িত্বপূর্ণভার নিতে অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন। মানসিক স্বাধীনতার সুখ জানকীনাথই স্ত্রীকে উপলব্ধি করিয়েছিলেন, যার দ্বারা স্বর্ণকুমারী স্বদেশবাসীর হিতসাধনে উদ্দীপনা অনুভব করেছিলেন।[১৮৮] স্বামীর এই উদার মহানুভব প্রীতিকে স্মরণ করে 'নবকাহিনী' নামক ছোটগল্পের বই স্বর্ণকুমারী স্বামীকেই উপহার দিয়েছেন। লিখেছেন, —

"সংসারের অন্ধকার ঝটিকা পীড়নে
যখনি কাতর দেহ অবসন্ন প্রাণ,
প্রীতিদীপ্ত পুণ্যরূপে নয়ন ভরিয়া
দাঁড়াও সমুখে দেব, কর শান্তি দান।
প্রেমের পরশে তব দলিত হৃদয়,
নবীন জীবন লভে, ফুলে ফুলময়।
স্বর্গের প্রভাত তুমি প্রশান্ত বিমল।
বিধাতার মূর্তিমান আশীষ মঙ্গল।
তোমারি প্রসাদে এ যে তোমারি কল্যাণ—
তোমারে করিনু আজি উপহার দান।"

যাঁর প্রসাদে তিনি এই সাহিত্যিক প্রতিভা অর্জন করেছেন, তাঁকেই উপহার দিয়েছেন 'নবকাহিনী'। 'নবকাহিনী'র গল্পগুলি 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় ১৮৯০ ও '৯১-র (১২৯৭, ১২৯৮) বিভিন্ন সংখ্যায় ও গ্রন্থাকারে বেরোয় ১৮৯২ সালে।

স্বর্ণকুমারীর 'মিবাররাজ' উপন্যাস 'ভারতী'তে বেরোয় 'কলঙ্ক' নামে (১২৯৩ আষাঢ়—পৌষ), এবং সেখানে উপন্যাসটি সমাপ্ত হওয়ার পর পৌষ সংখ্যায় তিনি লিখছেন, "'কলঙ্ক' শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু এই নামটি সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার সময় ইহা ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইবে।" 'কলঙ্ক' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে ও তখন এর নামকরণ হয় 'মিবাররাজ'। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি স্বর্ণকুমারী দেবী উপহার দিয়েছেন তাঁর প্রিয় মেজদাদার একমাত্র কন্যা ইন্দিরা দেবীকে। উপহার পত্রে ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রতি স্বর্ণকুমারীর গভীর স্নেহ ও মমতা পরিস্ফুট:

"স্নেহময়ি ইন্দিরা,

তুই স্নেহময়ি, যেন বরষার ফুল,—
কোমল মাধুরী মাখা বিমল বকুল।

বিকশিত অশ্রুজলে, সুবাসিত শুষ্কদলে
বিধাতার দিব্য সৃষ্টি অপূর্ব অতুল
যে তোমার কাছে আসে, জুড়াও মধুর বাসে,
ক্ষুদ্র হৃদে উথলিত প্রণয় আকুল।
যে যায় দলিত রেখে, সে-ও গন্ধ যায় মেখে,
স্বরগের পুণ্য তুমি ধরণীর ভুল।
এনেছি এ শোকগীতি তোমার পরশ-প্রীতি
ফুটাবে বিরাগমাঝে সুরাগ মুকুল।"

১৮৮৮ সালে বেরোয় স্বর্ণকুমারীর অপর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'হুগলীর ইমামবাড়ী' ('ভারতী'তে প্রথম প্রকাশিত ১২৯১ পৌষ থেকে ১২৯৩ বৈশাখ)।

হিরণ্ময়ী দেবীর বিয়ে হয়ে গেলেও যখনই কলকাতায় আসতেন মার কাছে থাকতেন ও সব রকমে তাঁকে সাহায্য করতেন। 'ভারতী'তে প্রবন্ধ কবিতা লিখে মায়ের সাহায্য করতেন। হিরণ্ময়ী দেবী লিখেছেন, "আমার প্রধান কাজ ছিল ইংরাজী পুস্তক হইতে 'চয়ন' সংগ্রহ্ করা। নিজে কবিতা এবং ছোটগল্পও লিখিতাম। তখন আমি স্বামীর নিকট হইতে বিজ্ঞান দর্শন যাহা শিখিতাম তাহাও মধ্যে মধ্যে অনুবাদ করিয়া দিতাম।"[১৮৯] স্বামীর কলেজের ছুটির সময় বছর বছর হিরণ্ময়ী মা ও ছোটবোন এবং স্বামীকে নিয়ে দেশভ্রমণে যেতেন। ভাই জ্যোৎস্নানাথ তখন বিলেত চলে যাওয়ায় (১৮৮৮) ও জানকীনাথ তাঁদের সঙ্গে যেতে অনিচ্ছুক থাকায় হিরণ্ময়ী মা ও বোনকে নিয়েই যেতেন। এ ব্যাপারে হিরণ্ময়ীর ব্যবস্থা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় সরলা দেবীর লেখায় : "ফণিদাদাকে টেনে হিঁচড়ে দিদিই নিয়ে যেতেন। যা কিছু বন্দোবস্ত করার দিদিই করতেন। ষ্টেশনে ষ্টেশনে নামা, ব্রেকভ্যান থেকে লগেজ নামানো, সঙ্গী চাকরকে দিয়ে খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করা— এ সবেরই কর্তা দিদি। ফণিদাদা বড় ষ্টীমারে জোড়া ঢেউয়ে ঢেউয়ে ধাক্কা খাওয়া একখানা জলিবোটের মত বিরক্ত হয়ে গজর গজর করতে করতে চলতেন। শেষ গন্তব্যে পৌঁছে থিতিয়ে বসে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচতেন। আমি দিদিকে ঝঞ্ঝাট পোহাবার কতকটা সাহায্য করতুম।"[১৯০]

বাণীসাধনায় স্বর্ণকুমারীর সহায় ছিলেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫—৯৪)। কাশিয়াবাগানে তিনি আসতেন প্রায়ই এবং স্বর্ণকুমারীর রচনা শুনে উৎসাহ দিতেন।[১৯১] জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতেও তাঁর বিশেষ আদর ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন।[১৯২] তাঁর 'সঙ্গীত শতক' (১৮৬২) পড়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবির সঙ্গে আলাপ করবার আগ্রহ জাগে ও সেই আগ্রহ ক্রমে সুগভীর ভ্রাতৃবৎ বন্ধুত্বে পরিণত হয়।[১৯৩] ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে বিহারীলালের এই ঘনিষ্ঠতা অন্তরঙ্গ আত্মীয়তায় পর্যবসিত হয় তাঁর পুত্র মজঃফরপুরের উকীল শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার (১৮৮৬—১৯১৮) বিবাহে (১৯০১)। বিহারীলাল স্বর্ণকুমারীর একজন 'ভক্ত' ছিলেন বলা যায়। 'বসন্ত উৎসবে'র গানগুলি তাঁর নিজের রচিত গানের মতই ভাববিহ্বল কণ্ঠে তিনি গাইতেন। বিহারীলালের

মতে স্বর্ণকুমারীর ‘ছিন্নমুকুলে’র মত উপন্যাস বাঙ্গলা সাহিত্যে আর বার হয় নি। কিন্তু এ প্রশংসাতে স্বর্ণকুমারী চঞ্চল হতেন না।[১১৪] নিজের আদর্শে সব সময় তিনি নম্র বিনীত থাকতেন এবং চেষ্টা করতেন স্বীয় সাহিত্য সৃষ্টিকে উন্নতির পথে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু স্বর্ণকুমারীর প্রশংসায় গর্বিত হত তাঁর সন্তানরা। স্বামী জানকীনাথও স্ত্রীর সার্থকতায় প্রীত হতেন।

স্বর্ণকুমারীর আর একজন অকৃত্রিম সাহিত্যবন্ধু ছিলেন কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়। এঁর স্ত্রী স্বর্ণকুমারীকে বলতেন ‘দিদি’, স্বর্ণকুমারীও তাঁকে ভগ্নীর মত স্নেহ করতেন।[১১৫]

হিরণ্ময়ী দেবী বিয়ের পর কলকাতার বাইরে গেলেন। সরলা এল মায়ের কাছাকাছি। মা ও মেয়ের হৃদয়ের দূরত্বটা ঘুচে ঘিরে এল নৈকট্য। সরলা তখন মায়ের কাছে প্রায় একা। দাদা জ্যোৎস্নানাথ পুরুষ--- বাইরের জীবনটাই তাঁর কাছে বড়। তাঁর সখ অনুসারে পেয়েছিলেন আরবী ঘোড়া। ভোরে উঠে ঘোড়ায় চড়ে তিনি বেড়াতে বেরোতেন। বিকেলে হয় সুরেন ঠাকুরদের বাড়ী যেতেন, নয়ত তাদের নিয়ে আসতেন নিজেদের বাড়ী।[১১৬] সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীর ‘‘মাষ্টার ছাড়াবার দরকার হলেই জ্যোৎস্নাদাদার ডাক পড়ত; তিনি সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গিয়ে অবলীলাক্রমে বলে দিতেন— কাল থেকে আর আপনাকে আসতে হবে না।’’[১১৭] সন্ধ্যাবেলায় মাঝে মাঝে জ্যোৎস্নানাথ বাগানে গর্ত থেকে বেরোনো শিয়াল শিকার করতেন। তাঁর পড়াশুনোটা ছিল সবশেষে।[১১৮]

সরলার প্রথম কবিতা

'সখা' পত্রিকায় ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় ১১ থেকে ১৩ বছরের বালক বালিকাদের জন্য ৩০ লাইনের মধ্যে একটি কবিতা রচনার প্রতিযোগিতা ঘোষিত হয়। প্রমদাচরণ সেন (১৮৫৯—১৮৮৫) ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম 'সখা' পত্রিকা প্রচার করেন। প্রমদাচরণের পৈতৃক নিবাস যশোরের অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামে। ১৮৮০ সালের মার্চ মাসে তিনি সিটি স্কুলে কাজ নিয়ে কলকাতায় বাস করতে আরম্ভ করেন। ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে প্রমদাচরণের এ সময় থেকেই ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। শিশুবাৎসল্য প্রমদাচরণের স্বভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, যে অনুভূতি থেকে 'সখা'র উৎপত্তি।[১৯৯] প্রমদাচরণ ব্রাহ্ম হলেও তাঁর পত্রিকায় উদার আদর্শবোধ, ও সুশিক্ষার সামঞ্জস্য হয়েছিল। 'সখা'র প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক একমাত্র লেখক ছিলেন। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য তখন ছিল একটাকা। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে প্রমদাচরণ এক তরুণ সহযোগী পেলেন, যিনি তখনও বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। ইনি হলেন উপেন্দ্রকিশোর রায় (১৮৬৩—১৯১৫), পরবর্তী কালে শিশুসাহিত্যে মহান গৌরবের যিনি অধিকারী। তিনি তখনও 'চৌধুরী' ব্যবহার করতেন না। তিনি 'সখা'র শেষ পর্যন্ত নিয়মিত লেখক ছিলেন। আড়াই বছর 'সখা'র পরিচালনার পর ১৮৮৪ সালের ২১শে জুন খুলনায় ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রমদাচরণের দেহান্ত হয়।[২০০] অতঃপর জুলাই মাসে পত্রিকা সম্পাদনার ভার নিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭—১৯১৯)। দুবছর যোগ্যতার সঙ্গে তিনি পরিচালনা করলেন পত্রিকা। হেয়ার স্কুলে প্রমদাচরণ শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রিয় ছাত্র ছিলেন।[২০১] 'আত্মচরিতে' (১৯১৮) শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমদাচরণকে তাঁর 'ধর্মপুত্র' বলে উল্লেখ করেছেন।[২০২] ইতিমধ্যে উপেন্দ্রকিশোর বি.এ. পাশ করে (১৮৮৪) 'রায়চৌধুরী' হয়েছেন। 'সখা'র পঞ্চম বর্ষের, দায়িত্ব নিয়েছেন অন্নদাচরণ সেন। ১৮৯৫ সালে 'সখা' ভুবনমোহন রায়ের 'সাথী'র সঙ্গে মিলে 'সখা ও সাথী' হয়। 'সখা'র কবিতা প্রতিযোগিতায় কন্যা সরলাকে কবিতাটি লেখার জন্য উৎসাহ দিলেন জননী স্বর্ণকুমারী দেবী। কবিতাটির বিষয় হল— একটি ছোট মেয়ে মারা গেছে, তার মা পাশে বসে দুঃখশোক প্রকাশ করছেন। সরলা কবিতা পাঠালেন। 'সখা'র ১৮৮৪ সালের জুলাই সংখ্যায় পুরস্কার ঘোষিত হল, সরলা দেবীই প্রথম হলেন। উক্ত সংখ্যায় তাঁর কবিতাটি প্রকাশিত হল, এবং তাঁর বয়স তখন ১১ বছর ৯ মাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সরলা পুরস্কার পেলেন একটি ইংরাজী ক্ল্যাসিকাল ডিক্সনারী। এতে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান মিথলজির অনেক গল্প ছিল। প্রকাশ্য রচনায় মায়ের উৎসাহে এই হল সরলার হাতেখড়ি।[২০৩]

বোলপুর ভ্রমণ

১৮৮৩ সালেরই কোন সময়ে স্বর্ণকুমারী সপরিবারে যান বোলপুরে। সরলা দেবী লিখেছেন, তখন তাঁর শৈশব কাল এবং সেখানে তাঁদের সত্যিকার সখা ছিল 'সখা' পত্রিকা। তাঁদের পার্টিতে অন্যান্য সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা সরোজা দেবী ও তাঁর স্বামী মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয় চৌধুরী ও তাঁর পত্নী শরৎকুমারী চৌধুরাণী।[২০৪] 'সখা' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালের জানুয়ারীতে। ১৮৮৩-র মাঝামাঝি সময়ে মোহিনীমোহন ব্লাভাট্স্কির সেক্রেটারী হয়ে ইউরোপ যান এবং স্বদেশে ফেরেন ১৮৮৯ সালে।[২০৫] তাই শান্তিনিকেতন ভ্রমণ কাল ১৮৮৩ সালের প্রথমদিকে কোন সময়ে বলে অনুমান করা যেতে পারে। বোলপুরে 'সখা' পড়ে সরলা দেবী লেখার উৎসাহ পান ও তার পরে তিনি পূর্বোক্ত কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। সেখানে সারা সকাল সরলা দেবীরা ঘুরে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে 'খাবার ঘরে লম্বা টেবিলের ধারে বসে সকলে মিলে স্তূপীকৃত লুচি তরকারী ও বোলপুরের প্রসিদ্ধ পাত্রক্ষীরের প্রতি সদাচরণ করে' সবাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতেন।[২০৬] জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে জানকীনাথের প্রভূত প্রভাব ছিল। সেই প্রভাবের পরিচয় এ-সময়ে বোলপুরের জীবনধারাতেও সুস্পষ্ট। জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতার প্রতি জানকীনাথের বিরূপতা এ-সময়ের তাঁর আচার ব্যবহারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সরলা দেবী লিখেছেন, "... বোলপুরে বাবামহাশয় বিনা বাক্যব্যয়ে ডোম বরকন্দাজ স্বরূপ সর্দারের পুত্রকে নিজের খানসামা নিযুক্ত করে, ট্রেনিং দিয়ে দিব্যি উপযুক্ত চাকর তৈরি করে নিলেন। সে-ই টেবিলে আমাদের সবাইকে খাওয়াত, দরকার হলে লুচি ভাজা, মাংস রোস্ট প্রভৃতিও সে-ই করত। এতে উপস্থিত দলের কারো কোন আপত্তি হল না।"[২০৭]

স্বর্ণকুমারীর মেজবৌঠাকরুণ সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ১৮৮৫ সালের (১২৯২ বঙ্গাব্দ) এপ্রিল মাসে 'বালক' পত্রিকা প্রকাশ করতে অগ্রণী হলেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, "ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমল'- এর মাঝখানে 'বালক' নামক একখানি মাসিকপত্র একবৎসরের ওষধির মতো ফসল ফলাইয়া লীলাসম্বরণ করিল।

বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করিবার জন্য মেজবউঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল সুধীন্দ্র, বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু, শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় কাগজ চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।"[২০৮] ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (মার্চ, ১৮৮৫) জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় কলকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত 'বালক' আত্মপ্রকাশ করে। ১২৯৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখে 'ভারতী'র

সঙ্গে 'বালক' যুক্ত হয়। 'বালক'-এর শুরুতে (বৈশাখ সংখ্যায়) রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কবিতাটি। এছাড়া ছিল সৌদামিনী দেবীর পুত্র সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৫৯—১৯৩৩) ভ্রমণ কাহিনী 'দার্জিলিঙ যাত্রা', তাঁর স্ত্রী নরেন্দ্রবালা দেবীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 'সূর্যের কথা'। সহজ সরল ভাষায় ও উদাহরণে তিনি পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব, সূর্যের ব্যাস ও আলোক উত্তাপের বিশ্লেষণ করেছেন। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৪—৮৪) জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভাসুন্দরী দেবী (১৮৬৫—১৯২২) লিখেছেন 'সহজে গান শিক্ষা'। 'বালকে'র প্রথম দুটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' শেষ হয়। এছাড়া 'বালকে'র বিভিন্ন সংখ্যায় অন্যান্য লেখক লেখিকাদের মধ্যে ছিলেন, বলেন্দ্রনাথ (১৮৭০—৯৯) ('একরাত্রি' প্রবন্ধ— জ্যৈষ্ঠ, 'চন্দ্রপুরের হাট'— শ্রাবণ, 'বনপ্রান্ত'— আশ্বিন ও কার্তিক), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ('বোম্বায়ের গান বাজনা'— আষাঢ়, 'বোম্বাই সহর'— শ্রাবণ, ভাদ্র— ফাল্গুন) দ্বিজেন্দ্রনাথ ('রেখাক্ষর বর্ণমালা'— শ্রাবণ) , জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ('মুখচেনা', 'বরিশালের পত্র'— শ্রাবণ, 'বীরজননী'— ভাদ্র), নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের (১৮৬১—১৯৪০) 'প্রবাসের চিঠি' (ভাদ্র) শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের (১৮৬০—১৯০৮) 'পাঠশালা' (আশ্বিন ও কার্তিক) 'নদীয়া ভ্রমণ', 'সন্ধ্যা' (ফাল্গুন) প্রভৃতি। নরেন্দ্রবালা দেবীর অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ যা 'বালকে' প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি হল 'সূর্য্যকিরণে ঢেউ' (জ্যৈষ্ঠ) , সূর্য্যকিরণের কার্য' (আষাঢ়) 'বায়ুস্তরের চাপ' (আশ্বিন ও কার্তিক)। প্রতিভা দেবী 'কাল মৃগয়া' (১৮৮২)-র স্বরলিপি প্রকাশ করেন (পৌষ. মাঘ)। সুধীন্দ্রনাথের (১৮৬৯—১৯২৯) প্রবন্ধ ছিল 'স্বাধীনতা' বৈশাখ সংখ্যায়। সম্পাদিকারও কয়েকটি লেখা ছিল 'আশ্চর্য পলায়ন' (বৈশাখ) , 'ব্যায়াম' (জ্যৈষ্ঠ)। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'ব্যায়াম'-এর উত্তরে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'লাঠির উপর লাঠি'। এর উত্তরে আষাঢ় সংখ্যায় দক্ষিণেশ্বর থেকে 'শ্রীকেদার' লিখলেন 'লাঠালাঠি'। 'বালকে'র তৃতীয় সংখ্যা থেকে রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাস বার হতে থাকে, শেষ হবার আগে 'বালক' অস্তমিত হয়। বালিকা সরলা দেবীও লিখলেন 'দুর্ভিক্ষ' (জ্যৈষ্ঠ), 'বাবলা গাছের কথা' (আশ্বিন ও কার্তিক)। ফাল্গুন সংখ্যায় স্বর্ণকুমারী লিখলেন বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ 'ছায়াপথ'। শিশুপাঠ্য সহজ সরল ভাষায় 'ছায়াপথ' বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। 'বালক' 'ভারতী'র সঙ্গে মিলিত হওয়ার উপলক্ষে ১২৯৩ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যার (বৈশাখ) ভূমিকায় সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী লিখেছেন "দুই বৎসর পূর্বে ভারতীর জীবনে একটি পরিবর্তন ঘটিয়াছে, আজ তাহার আর একটি পরিবর্তন। সেদিন তিনি বালিকা বেশে গৃহ হইতে গৃহান্তরে পদার্পণ করিয়াছিলেন— আজ তিনি বালক ক্রোড়ে আর এক নূতন বেশে দেখা দিলেন। আজ হইতে 'বালক' ভারতীর সহিত মিলিত হইল। পাঠকেরা মনে করিবেন না ইহাতে ভারতীর গাম্ভীর্য নষ্ট হইল— কিম্বা ইহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। কারণ 'বালক' নামে মাত্র বালক ছিল— প্রকৃতপক্ষে ইহা বয়স্ক পাঠকদিগেরই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল। এরূপ স্থলে এই মিলনে ভারতীর বল বৃদ্ধি হইবে আশা করিয়া আমরা সুখী হইতেছি, ভরসা করি পাঠকেরাও সুখী হইবেন।" সুন্দর উপমার মধ্যে দিয়ে এমনভাবে স্বর্ণকুমারী 'ভারতী'র জীবনের বিভিন্ন পরিবর্তনকে পরিস্ফুট করেছেন।

স্বর্ণকুমারী ও গিরীন্দ্রমোহিনী

বাংলা সাহিত্যজগতে একটি স্মরণীয় ঘটনা দুই প্রতিভাশালিনী লেখিকার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব— তা হল স্বর্ণকুমারী ও গিরীন্দ্রমোহিনীর (১৮৫৮—১৯২৪) 'মিলন' পাতানো। সাহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রেও তাঁদের আজীবন এই গভীর সখ্য বিস্ময়কর। গিরীন্দ্রমোহিনী বৌবাজারের সম্ভ্রান্ত জমিদার অক্রুর দত্তের প্রপৌত্র দুর্গাচরণ দত্তের ছোটছেলে নরেশচন্দ্র দত্তের পত্নী। কলকাতার ওয়েলিংটন স্ট্রীটের নিকট অক্রুর দত্তের গলি। কোম্পানির আমলে কমিশেরিয়েট বিভাগে কাজ করে অক্রুর দত্ত ধনবান হন।[২০৯] গিরীন্দ্রমোহিনীর শ্বশুরালয়ে সাবিত্রী লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যিকগোষ্ঠী জমে উঠেছিল তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[২১০] স্বর্ণকুমারী যখন 'ভারতী' সম্পাদনা করেন (১৮৮৪) তখনও উভয়ের পরিচয় ছিল না। গিরীন্দ্রমোহিনীর স্বামী তাঁকে লেখায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য বাংলা সাহিত্যজগতে নারীর অসামান্য কীর্তি হিসেবে স্বর্ণকুমারীর উল্লেখ করেছিলেন স্ত্রীর কাছে।[২১১] তখন থেকেই গিরীন্দ্রমোহিনী ভারতী-সম্পাদিকার সঙ্গে পরিচিত হতে উৎসুক হন। গিরীন্দ্রমোহিনী ও স্বর্ণকুমারীর সখ্যের সূত্রপাত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে। তখনও তাঁদের পরিচয় হয়নি। এই ঘটনাটি স্বর্ণকুমারী ব্যক্ত করেছেন, "... সে আজ ৪০ বৎসর পূর্বেকার কথা; তখন আমরা থাকিতাম শ্যামবাজার অঞ্চলে কাশিয়াবাগান বাগানবাটীতে; সবে মাত্র সেই বৎসর ১২৯১ সালে আমি ভারতীর সম্পাদনাভার গ্রহণ করিয়াছি, শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ একদিন এখানে আসিয়া একটি কবিতা আমাকে দিয়া বলিলেন, "কবিতাটি অক্রুর দত্তের বাড়ীর একটি অন্তঃপুরিকার রচনা, লেখাটি ভালই হয়েছে, ভারতীতে দিও।"[২১২] কবিতাটি রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু সাবিত্রী লাইব্রেরী ও 'আলোচনা' পত্রিকার সম্পাদক এবং গিরীন্দ্রমোহিনীর দেবর গোবিন্দলাল দত্ত। বলাবাহুল্য কবিতাটি লেখা গিরীন্দ্রমোহিনীর। কবিতাটি হল "সরসী জলে শশী"। ১২৯১ বঙ্গাব্দের (১৮৮৪) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'ভারতী'তে কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবির 'অশ্রুকণা' কাব্যগ্রন্থে (১৮৮৭) সঙ্কলিত হয়েছে কবিতাটি। 'ভারতী'তে এর পরে গিরীন্দ্রমোহিনীর অজস্র কবিতা বার হতে থাকে। ইতিমধ্যে তাঁর 'কবিতাহার' (১৮৭৩) ও ভারতকুসুম' (১৮৮২) কাব্যগ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করেছে। এরপরে স্বর্ণকুমারী গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সূত্রপাত 'সখিসমিতি'র প্রতিষ্ঠা থেকে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে গিরীন্দ্রমোহিনী সমিতির সভ্য হতে স্বর্ণকুমারীর কাছে যান। তারপরেই পরিচয় থেকে ক্রমেই ঘনিষ্ঠতা আসে।[২১৩] "লিপি-দূতীর সেকি আনাগোনা।"[২১৪] ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে দুই সখির মধ্যে। কিন্তু এ বন্ধুত্ব গিরীন্দ্রমোহিনীর স্বামী আর দেখে যেতে পারেন নি, এর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে (১৮৮৪)। ক্রমশঃ দুই সখির 'আপনি'র ব্যবধান ঘুচে গেল— দুজনে দুজনের সঙ্গ কামনায় ব্যাকুল। গিরীন্দ্রমোহিনী নিজেই তাঁদের এই প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন; "আমাদের প্রেমের

'আদব কায়দা' বলিয়া কোন কথা ছিল না। আমাদের এই প্রণয়াভিসারকে শ্রীমতীর অভিসার হইতে কিছুতেই ছোট বলিতে পারি না। কতদিন আষাঢ়ের সেই ঘনঘোর, সেই মেঘ আঁধিয়ার, সেই মৃদু বর্ষণ সেই কনকনিকষ বিদ্যুৎ দীপ্তি আমাদের এই অভিসারকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে। বাস্তবিক টিপিটিপি মেঘান্ধকার স্নিগ্ধ দিবস দেখিলেই উভয়ের হৃদয় যে উভয়কে চাহিত, তাহা একদিনকার একটি ঘটনায় প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল। সেদিন মেঘমেদুর দিবসে উভয়েই উভয়ের সন্ধানে বাহির হইয়াছি। শেষে পথে সাক্ষাৎ।

দুঁহু লাগি দুঁহু মনে বাহিরায় পন্থ।
জনু চাঁদ লাগি ফিরে রাহু, রাহু লাগি চন্দ্র।"[২১৫]

স্বর্ণকুমারী দেবীও লিখেছেন: "বলিতে কি সংকীর্ণতার ভাবদ্বন্দ্বের মধ্যে কোনদিনই আমাদের মতবিচ্ছেদ হয় নাই। তাই বুঝি আমাদের সখ্যতা সম্বন্ধ এমন মধুর এমন স্থায়ী হইয়াছিল। মিলনদিনে আমরা কি আনন্দই না উপভোগ করিতাম। দেখা হইলেই নীরব উল্লসিত দৃষ্টিতে উভয়ের প্রাণ যেন কোলাকুলি করিয়া উঠিত। তাহার পর তাঁহার পালায় তিনি আমার হাত ধরিয়া সাগ্রহ সমাদরে পালঙ্ক একখানির উপর বসাইতেন, আর আমার পালাতে আমিও সেইরূপ সাদর যত্নে তাঁহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া আমার ঘরের শ্রেষ্ঠ শোফাসনের উপর তাঁহার শুভ্র প্রতিষ্ঠা করিতাম। অতঃপর মুখোমুখি হইয়া বসিবামাত্র দুজনের অদর্শনকালের মনের চাপা উৎস খুলিয়া যাইত। কত না রঙ্গরস রহস্যে, কত না গোপন মনের কথায়, প্রকাশ্য সুখ দুঃখ কাহিনীতে, সমাজ ও কাব্যসমালোচনায় দিবসের আলো ক্রমশ যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘনীভূত হইয়া পড়িত তখনো কিন্তু আমাদের কথা ফুরাইত না; বিদায় লইতে মন চাহিত না।"[২১৬] চিঠির বন্ধুত্ব যখন সাক্ষাৎ কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠল সে সময়ের মনোভাব স্বর্ণকুমারীর লেখায় নিবিড় ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। "কিন্তু লেখালেখিতেই আর ত মন বাঁধে না। দেখাশুনার জন্য আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এখন উপায়।"[২১৭] গিরীন্দ্রমোহিনী অন্তঃপুরের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ, তাঁর স্বামীও তখন জীবিত নেই, যাঁর কাছে তিনি অভিলাষ ব্যক্ত করতে পারেন। তখনকার কর্তৃপক্ষদের কাছে মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করতে তিনি কুণ্ঠিতা হলেন। স্বর্ণকুমারী অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। কিন্তু সেখানেও বাধা। তাঁর নিজের কথায় "তিনি আমার বাড়ী নাই আসুন আমি যদি দত্তবাড়ীর অন্তঃপুরে যাইতাম তাহা হইলে কি কেহ আমার পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইতেন? তাহা ত আর নহে। কিন্তু এখানে সমাজ সমস্যা আসিয়া দেখা দিল। তিনি এখানে আসিবেন না আর আমি সেখানে যাইব ইহা স্বামী অপমানজনক জ্ঞান করিলেন।" গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রাণেও সখির এই সম্ভাবিত অপমান সাড়া দিয়ে উঠল। শেষে উপায় করে দিল গিরীন্দ্রমোহিনীর বাপের বাড়ী, এবং দত্তবাড়ীও শেষপর্যন্ত এ বন্ধুত্ব সানন্দে অনুমোদন করেছিল। স্বর্ণকুমারী লিখছেন, "তখন মেয়েতে মেয়েতে দেখাশুনো হওয়াতেও কত বাধা ছিল তাই হয়ত দুটি হৃদয় এমন অনুরাগদীপ্ত হয়েছিল।" 'ভারতী'তে গিরীন্দ্রমোহিনীর দু-একটি লেখা ছাপাবার পরই ক্রমশঃ উভয় সখির পত্র লেখালেখি আরম্ভ হয়, এবং চিঠিতে চিঠিতে ভাবটা ক্রমশঃই জমাট বেঁধে উঠে। স্বর্ণকুমারী এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "... সে সব চিঠিপত্র আমরা ধরিয়া রাখিলে

সেকালের সখি প্রণয় কাহিনী একালে খুব সম্ভব উপন্যাসের ন্যায়ই সমাদৃত হইত।"[২১৮] কিন্তু চিঠিগুলি কেউই রাখেননি।

গিরীন্দ্রমোহিনী 'মিলনে'র প্রতিভা ও মানসিকতার নানাদিক স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন তাঁর লেখায়। পত্রিকা সম্পাদনার সময় স্বর্ণকুমারী যে বহু লেখক গড়ে তুলেছেন সে সম্বন্ধে গিরীন্দ্রমোহিনী মন্তব্য করেছেনঃ তাঁর "কোমল করে বলয়ের মিষ্ট মধুর আহ্বান ধ্বনিই চির মুখরিত হইত, কখনও সে হস্ত সমালোচনার কঠোর আঘাতে নবীন লেখকের উদ্যম ভঙ্গ করে নাই। বলিতে কি এখনকার অনেক প্রথিতযশা লেখকদের তিনিই গঠিত করিয়া তুলিয়াছেন।"[২১৯] সাহিত্যসৃষ্টি, অন্তঃপুরের বাইরে বৃহৎ কর্মজগতে নারীর মঙ্গল সাধন, পত্রিকা সম্পাদনা, সঙ্গীত অভিনয় চর্চা সবের মধ্যেও স্বর্ণকুমারীর সেবাপরায়ণা নারীর সুকুমার বৃত্তিটি অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই কখনও কখনও তিনি কাশিয়াবাগান ছেড়ে আসতেন জোড়াসাঁকোয় পিতার শুশ্রূষার্থে। ১৮৮৭ সালে দেবেন্দ্রনাথ চুঁচুড়ায় গিয়ে অসুস্থ হন তখন স্বর্ণকুমারী সৌদামিনী দেবীর সঙ্গে গিয়ে পিতার সেবা করেছিলেন।[২২০] স্বর্ণকুমারী একবার যখন জোড়াসাঁকোয় এসেছেন পিতার সেবার জন্য, সেখানে দুপুরবেলা গিরীন্দ্রমোহিনী গিয়ে উপস্থিত হলেন। নিছক লঘু আমোদ প্রমোদে অবসর কাটিয়ে সময়ের বৃথা অপব্যয় স্বর্ণকুমারী করতেন না। অবসর সময় তিনি সাহিত্য সঙ্গীত চর্চাতেই অতিবাহিত করতেন। সেদিন দুপুরে গিয়ে গিরীন্দ্রমোহিনী দেখলেন স্বর্ণকুমারী 'টডের রাজস্থান' পড়ছেন। 'মিলন'কে দেখে তিনি হেসে বইটি মুড়ে ফেললেন। এদিনের কথা গিরীন্দ্রমোহিনী লিখেছেনঃ "সেদিনের কথা ভুলিবার নয়। সে কি দামিনী চমক, কি হাওয়ার দমক, কি ভয়ঙ্কর মেঘগর্জন, কি মুষলধারে বৃষ্টি। আমরা দুইজনেও দারুণ গল্পে নিমগ্না হইয়া গিয়াছিলাম। কখন যে আমার স্খলিত কবরী লোহার কাঁটাদুটী তাঁহার শয্যায় পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা কিছুই টের পাই নাই। পরদিন কাঁটাদুটি সমেত এই মধুময়ী পত্রিকাখানি পাই :—

অধরে মোহন হাসি নয়নে অমৃত ভাসে,
বিরহ জাগাতে শুধু মিলন পরাণে আসে।
কইরে মিলন কোথা, সে কি হেথা আছে আর।
রাখিয়া গিয়াছে শুধু সরল পরশ তার
ফুলটি সে দিয়ে গেছে প্রভাতের আলো নিয়ে
হাসি যত নিয়ে গেছে, অশ্রুজল গেছে দিয়ে।
সন্ধ্যা কবে দিয়ে গেছে, নিয়ে গেছে সন্ধ্যা তারা,
আঁধার পড়িয়া আছে সুষমা হইয়া হারা।
ফুলটি সে নিয়ে গেছে, ফেলে গেছে কাঁটাদুটি,
বিরহ কাঁদিয়া সারা নয়ন মেলিয়া উঠি।"[২২১]

গিরীন্দ্রমোহিনী 'আভাষে' (১৮৯০) স্বর্ণকুমারীকে লিখেছিলেন :—

"মিলন মিলন কত বারই বলি, কই রে মিলন কই?
মিলন চাহিতে বিরহ সায়রে, ডোব ডোব তরী সই!

ভাসা ভাসা নদী আশা ভরা তরী বেয়ে চলি ধীরি ধীরি
অনন্তের কূলে মধুর মিলনে, যদি রে মিশিতে পারি।
লইয়া বিদায় সবে চ'লে যায় দেখা না হইতে শেষ—
বুঝি তাই ভয়ে মরি, যাই সরি সরি করিতে প্রাণে প্রবেশ।
লাগে যদি বোঝা ফেলে যেও সোজা, গিয়াছে ফেলিয়া সবে,
একা আসিয়াছি যাব চ'লে একা, ভেসে ভেসে ভবার্ণবে।"

কাঁটা সমেত মিলনের চিঠি পেয়ে গিরীন্দ্রমোহিনী উত্তর দিলেন :—

"দূর হতে কাছে আনা স্বভাব আমার,
ফুরাইয়া যায় কাজ মিশে গেলে দুটি।
জগত রয়েছে দূরে হইতে আমার,
আনিতে পরাণে তায় করি ছুটাছুটি।
প্রেমের জগতে আমি মাধ্য আকর্ষণ,
বিরহ রূপেতে আমি সম্পূর্ণ মিলন।"

উত্তরে স্বর্ণকুমারী লিখলেন :—

"বিরহে থাকে প্রেম মরমে মিশি,
তাই অদরশনে সুখ সাধে ভাসি,
বিরহে আঁখি, জাগে, সকলি জেগে থাকে
আঁখিতে আঁখিতে হলে শুধু জাগে হাসি।"[২২২]

এই প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ স্বর্ণকুমারী তাঁর 'স্নেহলতা' উপন্যাস (১ম খণ্ড—১৮৯২, ২য় খণ্ড—১৮৯৩ সাল) 'মিলন'কে উপহার দেন। গিরীন্দ্রমোহিনীও সখিকে প্রত্যুপহার দেন 'শিখা' কাব্যগ্রন্থ (১৮৯৬)। 'শিখা'র উপহার পত্রে মিলনের প্রতি কবির সুগভীর প্রেমানুভূতির অভিব্যক্তি রয়েছে—

"সখিঃ

বদ্ধ মুকুলের মাঝে সুরভির মত
অবরুদ্ধ প্রেমরাশি হৃদে করে বাস;—
কি অভিসম্পাতে কার জানি নাক তাহা,
বাহিরে ফোটে না কভু ক্ষুদ্র এক শ্বাস।
বিরহের কারাগারে বটে বাস ক'রে,
নিশিদিন চেয়ে তবু মিলনের পানে—
কে করে বন্ধন মুক্তি; কে ফুটাবে তারে—
নির্দয় মিলন সে ত শত ব্যবধানে!

'শিখা' প্রকাশ করেন বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র ও 'সাহিত্য' পত্রিকার (১৮৯০ সালে প্রথম প্রকাশ) সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০—১৯২১)।

স্বর্ণকুমারীর কন্যাদ্বয়কে গিরীন্দ্রমোহিনী অত্যন্ত স্নেহ করতেন। হিরণ্ময়ীকে উদ্দেশ্য করে তিনি 'আভাষে' (১৮৯০) 'কেন' কবিতাটি লিখেছিলেন। হিরণ্ময়ীর প্রতি তাঁর স্নেহের অভিব্যক্তি রয়েছে এ কবিতায়—

"কে জানে কেনই বাছা ভাল বাসি তোরে,
নব কিশলয় নত,
বসন্ত বল্লরী মত,
শ্যামল মাধুরী— খানি দুলে আঁখি পরে;
মৃদুল সুরভি বাসে মন মুগ্ধ করে।"

হিরণ্ময়ীকে দেখে কবির একান্ত আপনার জন বলেই মনে হয়—

"প্রথম যে দিনে দেখি
আঁখিতে মিলিত আঁখি,
স্নেহের পুলকে প্রাণ ছেয়ে গেল ধীরে।
মোর আপনার কেহ
যেন দূরে ত্যজে' গেহ
গিয়াছিল! এত দিনে পাইলাম ফিরে।"

স্বর্ণকুমারীর কনিষ্ঠা কন্যা সরলাও গিরীন্দ্রমোহিনীর স্নেহকোমল মাতৃহৃদয়ের অনেকখানি অধিকার করে নিয়েছিলেন। সরলাকে লক্ষ্য করে তিনি 'আভাষে' 'সরলা' কবিতাটি লেখেন। সরলাকে দেখলে গিরীন্দ্রমোহিনীর মাতৃহৃদয় তাকে স্নেহালিঙ্গনে বাঁধবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে—

"কেন রে হেরিলে তোরে হৃদয় আমার
স্বভাব গাম্ভীর্য স্বীয় ফেলে হারাইয়া?
বালিকার মত ক'রে বাহুর বিস্তার
ছুটে যায় মিশাইতে হৃদয়েতে হিয়া।"

গিরীন্দ্রমোহিনীর পুত্র "শ্রীমান প্রকাশচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যে হাতে খড়িও তাঁহার মিলন-মার প্রদত্ত এবং ভারতীর পত্রেই তিনি প্রথম মক্‌স করিতে শেখেন।"[১১৩] সম্পাদকীয় কর্তব্যের গুরু দায়িত্বেও স্বর্ণকুমারীই প্রকাশকে দীক্ষিত করেন। বাংলা কাব্যসাহিত্যের জগতে প্রথম মহিলা সুকবি হলেন গিরীন্দ্রমোহিনী। মাত্র ১৫ বছর বয়সে 'কবিতাহার' কাব্যগ্রন্থ (১৮৭৩) নিয়ে তাঁর আবির্ভাব। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কবিত্বের প্রশংসা করেছিলেন (বঙ্গদর্শন ১২৮০ বঙ্গাব্দ, জ্যৈষ্ঠ)। প্রথম মহিলা কবি ও ঔপন্যাসিকদ্বয়ের (যথাক্রমে গিরীন্দ্রমোহিনী ও স্বর্ণকুমারী) এই সখ্য বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান নিয়ে আছে। গিরীন্দ্রমোহিনীর সাহিত্য

রচনায় স্বর্ণকুমারী যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। শ্রীমতী মেরী কার্পেণ্টার যখন এদেশে আসেন 'কবিতাহারের' 'জনৈক হিন্দুমহিলা'র সঙ্গে তিনি তখন সাক্ষাৎ করতে চান। গিরীন্দ্রমোহিনী লঘু কৌতুকভরে লিখেছেন, "আমার এই সাহিত্যিক রহস্য অবগুণ্ঠন দুষ্টা ভারতী সম্পাদিকাই উন্মুক্ত করিয়া দেন।"[২২৪] এই দুই সখির সখ্যের সূচনা থেকে প্রায় দুইযুগ পরে স্বর্ণকুমারী গিয়েছিলেন ওয়ালটেয়ারে— বেশ কিছুদিন তিনি সেখানে ছিলেন। তেলেগুভাষা না জানার জন্য স্থানীয় লোকদের সঙ্গে মিশবার পক্ষে তিনি প্রচণ্ড বাধা অনুভব করছিলেন। তাঁর সেখানে মনে পড়ছিল ভাষার প্রচণ্ড মোহিনী শক্তির কথা, যে ভাষা বেঁধে দিয়েছিল বহুযুগ আগে দুটি হৃদয়— স্বয়ং তাঁর ও গিরীন্দ্রমোহিনীর। সে সময় তিনি সখি 'মিলন'কে যে চিঠি লিখেছিলেন তার একটির কিয়দংশ :—

"ভাবিতাম ভাষার দুয়ারে হয় সদা চিত্ত বিনিময়,
ঐ দূতী হয়ে অগ্রসর মাঝে থেকে করে পরিচয়!
শুভক্ষণে কোন সুপ্রভাতে
ঘটেছে যা, তোমায় আমায়;—
মনে পড়ে সে দিনের কথা
দুই যুগ পূর্ণ হলো প্রায়!
লিপি দূতী করে আনাগোনা
দুটি হৃদি করিল বন্ধন,
দেখিবার আগেই দোঁহার
ঘটাইল অপূর্ব মিলন।
কুসুমের পরাগ যেমন
সমীরণে হইয়া বাহিত,
ঘটায়ে ফুলের পরিণয়
দূর হতে করে সম্মিলিত।
বসে এই সুদূর প্রবাসে
স্মরি সেই ভাষার প্রভাব
মূক যেথা সুনিপুণ দূতী
নিত্য সেথা প্রেমের অভাব।"[২২৫]

গিরীন্দ্রমোহিনীর দেবর গোবিন্দলাল দত্ত প্রথমে অবরোধের মধ্যে শাস্ত্রসম্মত স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। পরে স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে যখন তাঁর আলাপ হয় তখন তিনি তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েন। গিরীন্দ্রমোহিনী ও স্বর্ণকুমারীর মিলনযজ্ঞের তিনি অন্যতম উত্তরসাধক হয়েছিলেন পরে।[২২৬]

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গেও গিরীন্দ্রমোহিনীর মধুর স্নিগ্ধ সম্পর্ক ছিল। তাঁর সম্পর্কেও তিনি লিখেছেন, "মনের মত লোক পাইলে, এক

মুহূর্তের আলাপে একেবারে আপনার করিয়া লইতে তাঁহার জোড়া কেহ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমাদের বর্তমান কৃত্রিম সভ্যতার ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ ব্যবহার ইঁহার নিকট মোটেই আমল পায় না। ইঁহার সুমধুর অথচ সপ্রতিভ তৎপরতায় সঙ্কোচ সহজেই দূর হয়। ইঁহার ব্যবহারের গুণে এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িতে হয় যে ইঁহাকে অদেয় বা অস্বীকার করিবার কিছুই থাকে না।" স্বর্ণকুমারীর কাশিয়াবাগানের বাড়ীতে একদিন সখিসমিতির অধিবেশনে গিরীন্দ্রমোহিনী উপস্থিত ছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মধুর ব্যবহারের যে পরিচয় তিনি সেদিন পেয়েছিলেন তাতে তিনি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনী পরিচ্ছদে 'সেফটিপিন' কখনও ব্যবহার করতেন না। একটি থান ও তদুপরি একটি মোটা চাদর তিনি ব্যবহার করতেন। সেদিন মাথায় কাপড় টানতে তাঁর চুল খুলে গিয়েছিল, চুল বাঁধতে চাদর খসে যাচ্ছিল। তারপরে তিনি লিখছেন : "আমি তাহাতে একটু সন্ত্রস্তা হইয়া পড়িতেছি দেখিয়া মাননীয়া শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাড়াতাড়ি আসিয়া নিজের কবরী হইতে কাঁটা খুলিয়া আমার চুলগুলি আঁটিয়া ও চাদর কাপড় প্রভৃতি যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া কিরূপে আমার লজ্জা রক্ষা করিয়াছিলেন! এই মেজ বধূঠাকুরাণীর সরলতা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।" গিরীন্দ্র-মোহিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর ছবি তুলিয়েছিলেন। তাঁর প্রতি গিরীন্দ্রমোহিনী অন্তরের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা অকপটে প্রকাশ করেছেন— "আমার সেকালের বালিকার শিক্ষাকে সম্পূর্ণতর করিবার দিকে তাঁহার যে আগ্রহ দেখিয়াছি তাহাতে তাঁহার নিকট আমি ঋণী ও তাঁহার জ্ঞানদা নামের সার্থকতারও পরিচয় পাইয়াছি। আমার চিত্রকলানুরাগ বৃদ্ধির মূলেও তিনি। অপরাধের মধ্যে গড়ার ওপর সেক্সপীয়ারের একখানি ও রবির একখানি ছবি বুনিয়া যথাক্রমে তাঁহাকে ও রবির স্ত্রীকে উপহার দি। পশমে তোলার হিসাবে উক্ত চিত্রিত ব্যক্তিদের সৌসাদৃশ্য নাকি একটু বিশিষ্ট ভাবেই ধরা দিয়াছিল; এই উপলক্ষে মেজবধূঠাকুরাণীর উৎসাহ আবার নতুন করিয়া তাঁহাকে পাইয়া বসিল এবং সে উৎসাহ সংক্রামক হইয়া আমাকেও আক্রমণ করে।" গিরীন্দ্রমোহিনীর লেখায় জ্ঞানদানন্দিনী চরিত্র সবিশেষ ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত একটি মধুর স্মৃতি চিত্রণ রয়েছে গিরীন্দ্রমোহিনীর লেখায়— "মেজবধূঠাকুরাণী রহস্যেও অতুলনীয়া। আমাকে গান শুনাইবার জন্য আজিকার স্যর রবীন্দ্রনাথকে তিনি যে একদিন একটি পয়সা পেলা দিয়াছিলেন তাহাও এই মধুর স্মৃতির হিসাবে টোকা আছে।"[২২৭]

স্বর্ণকুমারীর কনিষ্ঠা কন্যা সরলা এন্ট্রেন্স পরীক্ষার টেস্টে মায়ের উৎসাহ ও আন্তরিকতার জোরে ফার্স্ট হলেন। ১৮৮৬ সালে বেথুন স্কুল থেকে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করলেন। সরলা দেবী বি. এ পাশ করেন ১৮৯০ সালে। বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা মহিলাদের মধ্যে সর্বাধিক নম্বর পেয়ে তিনি এই বছরে সর্বপ্রথম 'পদ্মাবতী মেডাল' পান। উক্ত পদকটির দাতা হলেন ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ। তাঁর মায়ের নামে পদকটি দেওয়ার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি অর্থ দান করেছিলেন।[২২৮] দাদা জ্যোৎস্নানাথও সরলার সঙ্গে একই বছর পড়তেন। কিন্তু তিনি সে বছর পাশ করতে পারলেন না। জ্যোৎস্নানাথ (১৮৭১—১৯৬২) তখন ব্যস্ত থাকতেন মায়ের 'সখি সমিতি'র বিভিন্ন অনুষ্ঠান উৎসবে অভিনয় সরঞ্জামের

আয়োজনের তদ্বিরে। এই তদ্বিরে সব সময় থাকতেন জ্যোৎস্নানাথ ও সুরেন ঠাকুর দুই ভাই। এই অভিনয় অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সখিসমিতির পক্ষ থেকে কোন বাগান বাড়িতে স্বর্ণকুমারীর 'বসন্তোৎসবে'র অভিনয়। সেখানে যদিও পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, তবু জ্যোৎস্নানাথ ও সুরেন্দ্রনাথকে বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছিল স্টেজ বাঁধার জন্য। ইন্দিরা দেবী এ ঘটনার কথা লিখেছেন : "এই নাটকে সুরেন আর জ্যোৎস্নাদা আমাদের প্রধান সহকারী ছিলেন। ষ্টেজের পশ্চাদপটকে বনের উপযোগী করে সাজাতে গিয়ে তাঁরা দুই ধনুর্ধরে মিলে বাঁশের জাফরির উপর শুকনো মস্ গুঁজে তার মধ্যে জায়গায় জায়গায় ডিমের খোলাতে সলতে জ্বেলে জোনাকির ভাব আনতে চেয়েছিলেন। আগুন ও ঘাসের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তাঁদের ছেলেমানুষী বুদ্ধিতে বুঝতে পারেন নি, তা শীঘ্রই প্রকাশ পেল। পশ্চাদ্‌পটের মাঝে মাঝে আগুন ধরে গেল। চারিদিকে হৈহল্লা পড়ে গেল। আমরা মেয়েরা ছুটাছুটি করে নাবার ঘরের টব থেকে জল আনতে লাগলুম, আর সুরেন ও জ্যোৎস্নাদা অগত্যা কামিজের আস্তিন গুটিয়ে পর্দা ছেড়ে বাইরে আসতে বাধ্য হলেন। সে এক হাস্যকর ব্যাপার, যদিও আর একটু বেশিদূর গড়ালে কান্নাকাটি পড়ে যেতে পারত।"[২২৯] এমনভাবে জ্যোৎস্নানাথের পড়াশুনো না হওয়াতে তিনি পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেন না। পরের বছরও পরীক্ষার সময় তাঁর জ্বর হল। সরলা দেবী যে বছর এফ. এ দিলেন (১৮৮৮) জ্যোৎস্নানাথ সে বছর এন্ট্রান্স দিলেন। সে বছরই তাঁকে বিলেত পাঠানো হল। ক বছর পরে তিনি সিভিল সার্ভিস পাশ হয়ে ফিরলেন ও বোম্বাইতে চাকরীতে নিযুক্ত হলেন।[২৩০]

সরলা দেবী যে বছর (১৮৮৬) এন্ট্রান্স পাশ করলেন, সে সময়ে হিরণ্ময়ী দেবীর স্বামী ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় রাজসাহী কলেজে অধ্যাপনা করছিলেন। কয়েকমাসের জন্য সেখানে মাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন হিরণ্ময়ী। জানকীনাথ তখন এলাহাবাদে, প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন চলছে সেখানে। সরলা দেবী মা, দিদিকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে গেলেন। গাড়ী ছাড়বার সময় হঠাৎ মাকে ছাড়বার বেদনাটা তাঁর তীব্র হয়ে চোখে জল এল। মায়েরও মায়া হল। তখনও সময় ছিল, তাড়াতাড়ি টিকিট কেটে সরলা দেবীকেও গাড়ীতে তুলে নেওয়া হল। তাঁর জামাকাপড় গেল পরের ট্রেনে।[২৩১] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশিষ্ট বন্ধু তারকনাথ পালিতের পুত্র সিভিলিয়ান লোকেন পালিত তখন রাজসাহীতে অ্যাসিষ্টান্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি প্রায়ই এ সময়ে হিরণ্ময়ীর বাড়ীতে আসতেন ও গল্প জমাতেন।[২৩২]

স্বর্ণকুমারী ও কবি সরোজকুমারী

স্বর্ণকুমারীর স্নেহধন্য আর একজন মহিলাকবি হলেন সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫—১৯২৬)। সরোজকুমারী হলেন সাহিত্যিক ও রবীন্দ্রসুহৃদ নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের (১৮৬১—১৯৪০) ভগ্নী ও সম্বলপুরের উকীল যোগেন্দ্রনাথ সেনের স্ত্রী। স্বর্ণকুমারীর নিয়মিত সান্নিধ্যে যাঁরা থাকতেন তাঁদের মধ্যে সরোজকুমারীও একজন। দেবেন্দ্রনাথ সেনকে (১৮৫৮—১৯২০) স্বর্ণকুমারী এ বিষয়ে লিখেছিলেন, "... যেমন আপনাকে আমি নিয়মিত পত্র লিখি, আরও দুইজনকে নিয়মিত পত্র দিই। তাঁহাদের নাম— গিরীন্দ্রমোহিনী ও সরোজকুমারী।[২৩৩] সরোজকুমারীর সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮৮৮ সালে (১২৯৫ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে) বেথুন স্কুলে 'সখি সমিতি'র অনুষ্ঠিত শিল্পমেলায়। সরোজকুমারী স্বর্ণকুমারীর কন্যা সরলা দেবীর সঙ্গে বেথুন স্কুলে পড়তেন। মহিলা শিল্পমেলায় যখন সরোজকুমারী উপস্থিত হন তখন তিনি বিবাহিতা। তাঁদের বাড়ীতে বিবাহের পর মেয়েদের বাইরে যাবার অনুমতি ছিল না। কিন্তু বাল্যবয়সে যে স্কুলে তিনি পড়েছেন, সেই স্কুলে অনুষ্ঠিত মেলায় যাবার জন্য তিনি জিদ ধরলেন।[২৩৪] শেষে খুড়তুতো ভাই 'মুন্নিদা'র চেষ্টায় তাঁর যাওয়া হল। এই 'মুন্নিদা' হলেন রমেশচন্দ্রের জামাতা ও জীবনী 'Life and work of Ramesh Chunder Dutt C.I.E. (London 1911)- প্রণেতা আই. সি. এস জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত। রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮—১৯০৯) চতুর্থ কন্যা সরলার সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রনাথের ১৮৯৪ সালে বিবাহ হয়। সেই বাল্যের পাঠগৃহে পৌঁছে অপরিসীম আনন্দে সরোজকুমারীর হৃদয় ভরে উঠল। মেলায় পৌঁছেই তিনি দেখলেন প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে সখিসমিতির সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী সবায়ের অভ্যর্থনা করছেন। সরলা দেবী এসে মায়ের সঙ্গে সরোজকুমারীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। কবি নগেন গুপ্তের বোন বলে তখন অনেকেই তাঁকে জানতেন।[২৩৫] নগেন্দ্রনাথ বিহারের মোতিহারিতে জন্মগ্রহণ করেন— পিতা মথুরনাথ ছিলেন বিহারের সাবজজ। নগেন্দ্রনাথের বাল্য কৈশোর কেটেছে বিহারের নানাস্থানে। রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ সেনের (১৮৫৪—১৯১৬) সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। কবি বিহারীলাল ছিলেন তাঁদের গুরুস্থানীয়। নগেন্দ্রনাথের পেশা ছিল সাংবাদিকতা। সাহিত্যচর্চায় তিনি আনন্দ পেতেন। 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল নগেন্দ্রনাথের। সম্ভবতঃ প্রিয়নাথের মধ্যস্থতায় নগেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। তিন বন্ধুর সাক্ষাৎ হত কখনও জোড়াসাঁকোয়, কখনও মথুর সেন গার্ডেন লেনে প্রিয়নাথ সেনের বাড়ীতে, কখনও গ্রে স্ট্রীটে নগেন্দ্রনাথের বাড়ীতে। কখনও কখনও তাঁরা অক্রুর দত্ত স্ট্রীটে সাবিত্রী লাইব্রেরীতে সমবেত হতেন। 'ভারতী' ও 'বালক'কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।[২৩৬] কথাশিল্পী নগেন্দ্রনাথের সৃজনীপ্রতিভা প্রধানত

উপন্যাস ও ছোটগল্পেই আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর স্নেহের হাসিতে সেদিন বিস্মিত মুগ্ধ হয়েছিলেন সরোজকুমারী। তারপরে তিনি 'মায়ার খেলা'র অভিনয় দেখলেন। পরবর্তী কালে তাঁর প্রিয়বন্ধু প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীও অভিনয়ে ছিলেন। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা, 'পুণ্য' পত্রিকার (১৮৯৭) সম্পাদিকা ও 'আমিষ ও নিরামিষ আহার' (১৯০০) গ্রন্থ রচয়িত্রী। "শ্রীমতী প্রতিভা দেবী, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী সকলেই অভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবী শান্তা ও শ্রীমতী অভিজ্ঞা দেবী প্রমদা সাজিয়া তাঁহাদের সেই সুমিষ্ট কণ্ঠের গীতধারায় সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। হয়ত সেই বিস্ময় বিমুগ্ধ ভাবই মহিলা দর্শকদের মনে প্রশ্ন তুলেছিল এঁরা পেশাদারী অভিনেত্রী কি না! "অভিনয় শেষে বাড়ী ফিরবার সময় স্বর্ণকুমারী দেবী এসে সরোজকুমারীর সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন দেখিলে, বেশ ভাল লাগিল?" সরোজকুমারী সেই স্মৃতিচারণা করেছেন, "... আমি এমন আশ্চর্য হইয়া গেলাম! তিনি আমার সহিত কথা কহিলেন! তিনি ভারতীর সম্পাদিকা, কত তাঁর নাম, কত বড় তিনি! আর আমি সামান্য বালিকা, আমার সহিত তাঁহার আলাপের ইচ্ছা দেখিয়া আমি ত একেবারে অবাক! এই বিস্ময় ও তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের পর্বের আনন্দ লইয়া সেদিন গৃহে ফিরিলাম।"[২২৭]

তারপর থেকেই সরোজকুমারীর স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার আগ্রহ জন্মায়। কিন্তু তাঁদের তখন বাড়ী থেকে বেরবার বিশেষ অবকাশ হত না। কিন্তু হঠাৎই একদিন তাঁর অদম্য বাসনা পূর্ণ হল। শিল্পমেলার অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পরে হঠাৎ আবার ভারতী- সম্পাদিকার সঙ্গে তাঁর ষ্টার থিয়েটারে দেখা হল। সেদিনের কথা সরোজকুমারী লিখেছেন, "সহসা সেদিন তাঁহাকে নিকটে পাইয়া আমার ভারি আনন্দ হইল। লৌহ ও চুম্বকের আকর্ষণ শক্তি মনুষ্যের মধ্যেও আছে। নতুবা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি স্নেহ ভালবাসা কেন এমন প্রবল হয়? সেদিন অভিনয়ের বিশেষ কিছুই দেখা হইল না, নানা প্রকার গল্পগুজবে সময় কাটিয়া গেল।" এর একবছর পরে সরোজকুমারীর বাল্যবন্ধু হেমলতা দেবীর (দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী) পিত্রালয়ে তাঁদের আবার দেখা হয়। তখন স্বর্ণকুমারীর 'স্নেহলতা বা পালিতা' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে 'ভারতী'তে বার হচ্ছে (১২৯৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ), উপন্যাসের শেষটা কি হবে সেই নিয়ে তাঁদের আলোচনা হল। স্বর্ণকুমারী বললেন, "শেষটা এখন বলব না; দেখে নিজে বোলো কেমন হয়েছে।" হৃদয়ের, অনুভূতির যোগাযোগের ক্ষেত্রে তাঁদের বয়সের তফাৎটা বাধা হয় নি। তাই স্বর্ণকুমারী মেয়ে সরলার থেকেও ছোট সরোজকুমারীর হৃদয়ের অনেক কাছাকাছি এসে গেলেন। সেদিন নিজের লেখা দুটি গান স্বর্ণকুমারী গাইলেন। তাঁর গান গাওয়া সম্পর্কে সরোজকুমারী মন্তব্য করেছেন: "তাঁহার গান যিনিই শুনিয়াছেন তিনিই জানেন তাঁহার গাহিবার ক্ষমতা সামান্য নহে।" এরপর সরোজকুমারী বাঁকিপুর চলে যান। কিন্তু পত্রের মাধ্যমে দুটি অসমবয়সী হৃদয় এল আরও কাছাকাছি, আরও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে! উপলব্ধির সামঞ্জস্য, প্রাণের নিবিড় ঐক্য সেখানে ভুলিয়ে দিল বয়সের তারতম্য। "এই পত্রের ভিতর কত মনের কথা, কত উপদেশ আশ্বাস, কত সান্ত্বনা সমবেদনা, কত সাহিত্য আলোচনা

থাকিত!" স্বর্ণকুমারী একবার সরোজকুমারীকে লিখেছিলেন : "আমায় কবিতা লিখতে বলেছ আমার কি আর সেদিন আছে; এখন গলা ভাঙ্গা কখনো কখনো কষ্টে এক আধটা বার হয় বইতো নয়—

আমি নীরব বীণা
অতি দীনা
ভাঙ্গা হৃদয়খানি;
আমাব ছেঁড়া তার
নাহি আর, মধুর বাণী।
প্রাণের কথা যত
আগে-গেয়েছি ত
সকলি,
মনে নাহি যার
এখন— তারে আর কি বলি?
গান গাহে যারা, গাক্ তারা
জানাক ব্যথা,
আমার নাহি ভাষা, নাহি আশা
শুধু আকুলতা।
সবাই বোঝে হেথা, বলা কথা
কে বোঝে নীরব প্রাণে
কেহ কি বুঝিবে না, একো জনা?
কে জানে?"

কবিতাটি 'ভারতী'তে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় বার হয়। স্বর্ণকুমারীর এই কবিতাটির ছন্দের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০—১৯২৬) 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের (১৮৭৫) ছন্দের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন :—

"কখনো বনে পশি', দেখে শশী, গাছের ফাঁকে।
কখনো হেরে দিক্, কোথা পিক্, না জানি ডাকে।।
উপরে শাখা ঝুলে, পদ-মূলে, বিছান' ঘাস।
শোভা বলিল, "এই কাননেই মায়ের বাস।"
(দ্বিতীয় সর্গ, নন্দনপুরে প্রয়াণ, ১১৭ সংখ্যক স্তবক)।

সরোজকুমারী দেবীর পুত্র মারা গেলে (১৮৯২) তাঁর চিঠি পেয়ে স্বর্ণকুমারী চিঠিতেতাঁকে সান্ত্বনা দেন। পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছেই স্বর্ণকুমারী সরোজকুমারীর শোকে সান্ত্বনার জন্য প্রার্থনা করেছেন। তিনি লিখেছিলেন, "তোমার এই প্রথম সন্তান, আর এমন সুস্থ, কখনো ওরূপ মনেও হয় নি, হঠাৎ কি হোল? যা হোক সবি তাঁরি হাত, জীবনমৃত্যু আমরা কি কাউকে

দিতে পারি? আমাদের কেবল মনের ভ্রান্তি। ঈশ্বর তোমার কাছ থেকে নিয়েছেন, তিনি তোমায় সান্ত্বনা দিন, এই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।'' এই চিঠির মধ্যেও স্বর্ণকুমারীর আর একটি সত্তা— গভীর ঈশ্বর বিশ্বাস ধরা পড়েছে। মর্ত্য জগতের সব কিছুর উপর যে পরম করুণাময়ের ঐশ্বরিক প্রভাব বিরাজ করছে, সেই শক্তির উপরই স্বর্ণকুমারীর ছিল সুগভীর আস্থা, নিবিড় বিশ্বাস। এর কয়েকবছর পর সরোজকুমারী তখন কলকাতায় ছিলেন। স্বর্ণকুমারী থাকতেন কাশিয়াবাগানের বাগানবাড়িতে। সরোজকুমারীর খবর পেয়ে তাঁকে নিতে গাড়ী পাঠালেন স্বর্ণকুমারী। সেবারে প্রায় মাসখানেক সরোজকুমারী কলকাতায় ছিলেন এবং সপ্তাহে দু তিনবার তাঁর দেখা হত বহু আকাঙ্ক্ষিত ভারতী— সম্পাদিকার সঙ্গে। সরোজকুমারীর নিজের লেখায় এ সময়ের কথা রয়েছে : ''দুপুরে গিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁহার কাছে থাকিতাম, অনেক উপদ্রব করিতাম, বড় বোনের মত তিনি আমার সব উপদ্রবই সহ্য করিতেন। তাঁর সেই ছাদটিতে বিকালে বসিয়া কত গল্প করিতাম, কত আবোল তাবোল বকিতাম।'' সরোজকুমারীর 'হাসি ও অশ্রু' গ্রন্থ প্রকাশনা কালে (১৮৯৫ সাল) নানাভাবে স্বর্ণকুমারী তাঁকে সাহায্য করেছেন। সরোজকুমারী প্রুফ দেখতে জানতেন না, স্বর্ণকুমারী দেবী নিজেই সব করে দিতেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে, যে বইটি স্বর্ণকুমারীর সম্পাদনাতেই প্রকাশিত হয়। স্বর্ণকুমারীর পারিবারিক জীবনের সঙ্গে সরোজকুমারী বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। সরোজকুমারী স্বর্ণকুমারী দেবীকে দেখে সর্বসুখে সুখী বলে মনে করতেন। কোন নারী স্বামীর ভালবাসা ভিন্ন এমন সুখী হতে পারে না। স্বামীর ভালবাসা স্বর্ণকুমারী পেয়েছেন অকৃপণ উদারভাবে, প্রাণভরে। সরোজকুমারী দেখেছেন স্বর্ণকুমারীর প্রতি জানকীনাথের ভালবাসা: ''তাঁর প্রতি তাঁর স্বামীর ব্যবহার দেখিবার জিনিষ ছিল বটে;— মনে হইত যেন পূজা করিতেছেন। একবার ভারতী সম্পাদিকার অসুখের সময় গিয়াছিলাম, সেই সময় তাঁর স্বামীর সেবা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলাম।'' স্বর্ণকুমারী পেয়েছেন স্বামীর সমীহপূর্ণ প্রগাঢ় ভালবাসা, আর সেই ভালবাসায় বিকশিত হয়েছে তাঁর যে গুণাবলী— তাই তাঁর মেয়েদের জীবনকে করে তুলেছে উজ্জ্বল। মেয়েদের সাহিত্য রচনায়, নারীহিতকর কাজে সবসময় স্বর্ণকুমারীর ছিল অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও উৎসাহ। তাঁর সেই আগ্রহ পূর্ণ উৎসাহ সরোজকুমারীও পেয়েছেন। কোথাও সরোজকুমারীর খ্যাতি হলে তাঁরও আনন্দের সীমা থাকত না।

স্বর্ণকুমারীর স্বভাবটি ছিল সৌজন্যে পূর্ণ, খুব অমায়িক ধরণের। মানুষের সঙ্গে মিশবার, তাকে আপন করে নেবার ক্ষমতা তাঁর যথেষ্ট ছিল। একটা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর স্বভাবে। স্বর্ণকুমারীর এই স্বভাব বৈশিষ্ট্যের সরোজকুমারী দেবী উল্লেখ করেছেন : ''এত লেখাপড়া জানিয়া, এত সুশিক্ষিতা ও অমন উচ্চবংশের কন্যা হইয়াও (পৃথিবীতে লোকে যাহা কিছু চায়,— বংশ রূপ গুণ কিছুরই অভাব তাঁর নাই) তাঁর স্বভাব কখনো গর্বিত হইতে দেখি নাই, এইটেই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। তিনি যখনি আমাদের বাটীতে আসিতেন, হিন্দু বাড়ীর মেয়েরা সকলেই তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত, তিনি সকলকার সহিত সমানভাবে কথা কহিয়াছেন, যখনি কেহ গান গাহিতে অনুরোধ করিয়াছে, গান গাহিয়াছেন। আমার সকল আত্মীয়েরাই

তাঁহার ব্যবহারে মোহিত হইয়াছেন, সকলেই বলিয়াছেন এমন মেজাজ কখনো দেখি নাই।"[২৩৮]
স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসের চরিত্রগুলির সজীবতার মূলে এই বিভিন্ন শ্রেণীর পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে হৃদ্যভাবে মিশতে পারার ফল বলেই সরোজকুমারীর ধারণা। বিভিন্ন ধরণের মানুষের সঙ্গে মিশে স্বর্ণকুমারী মানবচরিত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অনেকটা অর্জন করেছিলেন। তাঁর চরিত্রের বড় জিনিস ছিল সবরকমের মানুষকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতে পারার ক্ষমতা। সেই ভালবাসার অনুভূতিই তাঁর প্রকৃতিতে এনে দিয়েছে নমনীয় সৌকুমার্য তথা গভীরতা।

দার্জিলিঙ ভ্রমণ

১৮৮৭ সালের অক্টোবরে (১২৯৪ বঙ্গাব্দের শরৎকালে) স্বর্ণকুমারী গেলেন দার্জিলিঙে। সরলা দেবী তখন বেথুন কলেজে পড়ছেন। হিরণ্ময়ীর বিয়ে বছর চারেক হল হয়েছে। দার্জিলিঙ যাত্রী হলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী ও এক বছরের শিশুকন্যা বেলা, সৌদামিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর দুই কন্যা। এই ভ্রমণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিঙ পৌঁছে ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন: "সারাঘাটে স্টীমারে ওঠবার সময় মহা হাঙ্গামা। রাত্রি দশটা, জিনিষপত্র সহস্র, কুলি গোটাকতক, মেয়ে মানুষ পাঁচটা এবং পুরুষমানুষ একটি মাত্র। ... ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয় নি, তবু নদিদি বলেন আমি কিছুই করিনি, অর্থাৎ একখান আস্ত মানুষ একেবারে আস্তরকম খেপলে যেরকমটা হয় সেইপ্রকার মূর্তি ধারণ করলে ঠিক পুরুষ মানুষের উপযুক্ত হত। কিন্তু এই দুদিনে আমি এত বাক্স খুলেছি এবং বন্ধ করেছি এবং বেঞ্চির নীচে ঠেলে গুঁজেছি, এবং উক্ত স্থান থেকে টেনে বের করেছি, এত বাক্স এবং পুঁটুলির পিছনে আমি ফিরেছি এবং এত বাক্স এবং পুঁটুলি আমার পিছনে অভিশাপের মত ফিরেছে, এত হারিয়েছে এবং এত ফের পাওয়া গেছে এবং এত পাওয়া যায় নি এবং পাবার জন্য এত চেষ্টা করা গেছে এবং যাচ্ছে যে, কোন ছাব্বিশ বৎসর বয়সের ভদ্র সন্তানের অদৃষ্টে এমনটা ঘটেনি। আমার ঠিক বাক্স phobia হয়েছে; বাক্স দেখলে আমার দাঁতে দাঁত লাগে। যখন চার দিকে চেয়ে দেখি বাক্স, কেবলই বাক্স, ছোটো বড় মাঝারি, হাল্কা এবং ভারী, কাঠের এবং টিনের এবং পশুচর্মের এবং কাপড়ের— নীচে একটা, উপরে একটা, পাশে একটা, পিছনে একটা— তখন আমার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি এবং ছুটোছুটি করবার স্বাভাবিক শক্তি একেবারে চলে যায় এবং তখন আমার শূন্যদৃষ্টি শুষ্কমুখ এবং দীনভাব দেখলে নিতান্ত কাপুরুষের মতো বোধ হয়; অতএব আমার সম্বন্ধে নদিদির যা মত দাঁড়িয়েছে তা ঠিক। ... শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙ পর্যন্ত ক্রমাগত সরলার উচ্ছ্বাস উক্তি, 'ওমা' 'কী চমৎকার' 'কী আশ্চর্য' 'কী সুন্দর'— কেবলই আমাকে ঠেলে আর বলে, 'রবিমামা' দেখো দেখো।"[২৩৬] পত্রটির তারিখ রয়েছে ১৮৮৭ সাল।

দার্জিলিঙ ভ্রমণ ও সেখানে কাটানো দিনগুলির বর্ণনা স্বর্ণকুমারী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেছেন ১২৯৫ বঙ্গাব্দের 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায়, (বৈশাখ-ভাদ্র, কার্তিক, সংখ্যায়) 'দারজিলিঙ পত্র' নাম দিয়ে। দার্জিলিঙে গিয়েই কিছুদিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন স্বর্ণকুমারী। দার্জিলিঙে তাঁদের সব থেকে বড় আকর্ষণ ছিল— সন্ধ্যাবেলা পড়ার মজলিস। সে সময়টার জন্যই সারাদিন তাঁরা প্রতীক্ষায় থাকতেন, অসুখ বোধই তখন আর স্বর্ণকুমারীর থাকত না। তাঁরা থাকতেন 'ক্যাসলটন হাউসে'। বাড়ীটিতে ছিল একটা বিরাট হলঘর। হলের সরঞ্জাম হ'ল "এই মস্ত হলে জিনিষপত্র নিতান্ত টিমটিমে গোছ, হলের এক টেরে একটা গোল টেবিল—

আর অন্য টেরে দু দেয়ালে দুখানা কৌচ আর এদিক ওদিক খানকতক চৌকি।"[২৪০] সন্ধ্যাবেলা সাহিত্য চর্চার মজলিসটি যখন বসে তখন "সমস্ত চৌকি একখানা কৌচের কাছে জড় হয়, আর মধ্যে একটা ছোট টিপয়ে আলো জ্বলে তার চারিদিকে কেহ চৌকিতে কেহ কৌচে সুবিধা মত বসে শুয়ে নিলে আমাদের সঙ্গী অভিভাবকটি টেনিসন থেকে ব্রাউনিঙ থেকে খাবার আসা পর্যন্ত আমাদের কবিতা পড়ে শোনান। বাস্তবিক তিনি কি সুন্দর করে পড়েন, ...।"[২৪১] বলা বাহুল্য এই অভিভাবকটি হলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁরই টেনিসন ও ব্রাউনিঙের কবিতাপাঠে মুগ্ধ হতেন নদিদি স্বর্ণকুমারী দেবী। স্বর্ণকুমারী এই কাব্যপাঠে স্বীয় হৃদয়ানুভূতির প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছেন: "টেনিসন শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে যখন কান্না পায় তখন শিশিরের মতো দুএকফোঁটা জল ধীরে ধীরে চোখে দেখা দেয়। কিন্তু ব্রাউনিঙের লেখা কি জোরাল, শুনতে শুনতে হৃদয়ের মধ্যে একটা কারখানা হতে থাকে। ... এক একটা কার্যের অনিবার্য ফল, মনুষ্য হৃদয়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবের খেলা তিনি জ্বলন্ত রূপে চিত্রিত করেছেন। ... ব্রাউনিঙ পড়তে পড়তে যে কান্না পায়, সে যেন জমাট বরফ গলতে আরম্ভ হয়। সে কান্না হঠাৎ থামান যায় না!"[২৪২] লেখিকার যথার্থ কাব্যরসিক স্পর্শকাতর অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়টি এখানে উন্মোচিত হয়েছে। রবিমামার এই কাব্যপাঠেই সরলা দেবীও ব্রাউনিঙের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হলেন। একথা সরলা দেবী নিজেই লিখেছেন, "মনে পড়ে দার্জিলিঙের Castleton House— এ যখন মাস কতক রবিমামা, মা, বড়মাসিমা, দিদি ও আমি ছিলুম— প্রতি সন্ধ্যাবেলায় Browning এর A Blot in the Scutcheon মানে করে করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে পড়ে (রবীন্দ্রনাথ) শোনাতেন। ব্রাউনিঙের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়।"[২৪৩] ধীরে ধীরে সরলাদেবীর সাহিত্যগত রুচি রবীন্দ্রনাথই গড়ে দিয়েছিলেন। দার্জিলিঙে একদিন পার্কে যেতে গিয়ে পথ হারিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী, দলছাড়া হয়ে অনেক হেঁটে শেষে তিনি পথ চিনে বাড়ী ফিরেছিলেন।[২৪৪] সে কাহিনী সরসভাবে 'দার্জিলিঙ পত্রে' স্বর্ণকুমারী বর্ণনা করেছেন। 'দার্জিলিঙ পত্র' লেখিকার সাহিত্যরুচি ও মানসিক বিশিষ্টতার অনেকখানি পরিস্ফুট করেছে। ঈশ্বরের করুণা, মানব জীবনে শান্তির পথপ্রদর্শক। দুঃখ সম্পর্কে স্বর্ণকুমারীর অনেক নিবিড় অনুভূতি এ পত্রগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে। দার্জিলিঙ থেকে তাঁরা গিয়েছিলেন সিঞ্চল, সেখানে তাঁদের দেখে কেউ কেউ নেপাল রাজপরিবারের লোক বলে মনে করেছিলেন। সে অনুমানের মূল কারণটি স্বর্ণকুমারীর লেখনীতে গভীর স্নেহসহকারে অভিব্যক্ত হয়েছে : "আমাদের অভিভাবকটিকে সাজগোজে অনেকটা রাজার মতই দেখাইতেছিল। একে সুশ্রী সুন্দর মুখ, তাতে চুলগুলি কোঁকড়া কোঁকড়া লম্বা লম্বা— তার ওপর হিন্দুস্থানী পাগড়ি— রাজা মনে করা কিছুই আশ্চর্য ছিল না।"[২৪৫] এ সস্নেহ মন্তব্য স্বর্ণকুমারীর ছোট ভাই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে। সেখানে বেড়ানোর সময়ে মৃণালিনী দেবী খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতেন। তার জন্য টাইগার হিলে উঠতে গিয়ে তিনি যে বিপত্তি বাধিয়েছিলেন, তাও পত্রলেখিকা বলেছেন: "আমাদের যে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াটি এখানে আসিয়াছেন তিনি একটি মহা নাম লাভ করিয়াছেন, সবাই বলে আমাদের অপেক্ষা চলিতে তিনি মজবুত। এ নামটি পাছে হারাইয়া ফেলেন সর্বদাই এই তাঁর এক আশঙ্কা; এই ভয়ে আমরা দুই পা না চলিতে চলিতে তিনি দশ পা অগ্রসর হইয়া চলেন–— আর কথায় কথায় আমাদিগকে পদযুদ্ধে আহ্বান

করেন। সেদিন সেই নামের জোরে দম্ভ ভরে শ্রান্তি ক্লান্তি চাপা দিয়া কোনরূপে অগ্রসর হইয়া চলিতেছেন— হঠাৎ পথের মধ্যে তাঁর মূর্চ্ছার উপক্রম হইল।" সৌভাগ্যবশতঃ কাছেই জল পেয়ে তিনি মাথায় মুখে দিয়ে সুস্থ হয়ে টাইগার হিলে উঠলেন। টাইগার হিল থেকে নামবার সময় এক আধবার একটু আধটু আছাড় সবাই খেয়েছেন।

সব মানুষেরই অন্তরে থাকে একটা চিরন্তন ছেলেমানুষী সত্তা। সেই সত্তাই মানুষকে রাখে প্রাণোচ্ছল, সজীব। তাই দার্জিলিঙে একদিন বেড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ী ফিরলেন স্বর্ণকুমারী। তাঁরই কথায়: "বর্ষাকালে ভিজিতে আরাম আছে কিন্তু সে এরকম লোকের মধ্যে না। বাড়ীর সকলে বকিবেন, রাগ করিবেন— আমরা ছুটিয়া ছুটিয়া পলাইয়া পলাইয়া ছাতে ছাতে বাগানে বাগানে খালি পায়ে খালি মাথায় ভিজিয়া বেড়াইব— তবেই যেন ভিজিয়া আমোদ!"[২৪৬] প্রথিতযশা সাহিত্যিক সম্পাদিকা একত্রিশ বছরের স্বর্ণকুমারীর মধ্যেও চিরন্তন অবাধ্য শিশু মানসিকতার অপরূপ বিকাশ হয়েছে এই পত্রে। কল্পনাটা বেওয়ারিশ— নিরুপায় স্বর্ণকুমারী তখন কল্পনায় বাঁধনছাড়া হয়ে শাসন না মেনে বৃষ্টিতে ভিজতে থাকেন। এই প্রবাস জীবনে আনন্দের খোরাক জোটে নানাভাবে। এক ভদ্র লামার সঙ্গে তাঁদের সেখানে পরিচয় হয়— যাঁর স্ত্রী আদর্শ সুন্দরী বলে সেখানে খ্যাত। স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর সঙ্গীরা একদিন তাঁকে দেখতে গেলেন। সে মহিলাকে দেখে তাঁদের স্বীয় সুরুচি ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধে আঘাত পেলেন। মৃণালিনী দেবী আড়ালে স্বর্ণকুমারীর কাছে মন্তব্য করলেন সে মহিলা সম্পর্কে, "আমাদের গোয়ালিনী ইহার চেয়ে ঢের ভাল দেখিতে।" লেখিকা বলেছেন, "ভ্রাতৃ জায়ার এ মন্তব্য তা ব'লে সঠিক নয়, এবং গোয়ালিনীর প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরক্তিই এই মন্তব্যের মূলে রয়েছে। ... কি শুভক্ষণে যে তিনি গোয়ালিনীকে দেখিয়াছেন জানিনা— তার রূপে তিনি নিতান্তই মুগ্ধ। সে আসিলে তাহাকে দেখিতেই তাঁহার সময় কাটে, সে না আসিলে তাহার রূপের প্রশংসায় তাঁহার অন্যকাজ করিবার অবসর থাকে না। অন্য গোয়ালার দুধের দর আর গোয়ালিনীর জলের দর সমান, কিন্তু বৌঠাকুরাণীর হাসি দেখিবার আশায় সেই জলই অমৃত বলিয়া আমাদের হাসিমুখে পান করিতে হয়।"[২৪৭]

স্বর্ণকুমারী ও কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন

মানুষকে ভালবেসে আপন করে নেওয়ার যে অসামান্য ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন স্বর্ণকুমারী তার আর একটি নিদর্শন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের (১৮৫৮—১৯২০) সঙ্গে তাঁর ভাই বোনের মতো গভীর আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপনা। তার কথা দেবেন্দ্রনাথ নিজেই রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখেছেন: "... আপনি ও আপনার শ্রদ্ধেয় দিদি শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী আমার ভাইবোন হইয়া পড়িয়াছেন। আপনি আশ্চর্য ভাবিবেন না— এমন দিন যায় না, যেদিন আপনাদের কথা না মনে পড়ে।"[২৪৮] দেবেন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারীকে বলতেন 'দিদি' এবং স্বর্ণকুমারীও তাঁকে ভায়ের মতই স্নেহ করতেন। তাঁদের এই পরিচয়ের সূত্রপাত গাজিপুরে ১৮৮৮ সালে। এ সময়ে প্রথমে রবীন্দ্রনাথ গাজিপুরে গিয়েছিলেন। তারপর একবার কলকাতায় এসে তিনি সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীকে নিয়ে যান আষাঢ়ের শেষাশেষি। তারপর তাঁদের কলকাতায় রেখে শ্রাবণ মাসে নদিদি স্বর্ণকুমারী দেবীকে নিয়ে আবার তিনি গাজিপুরে যান।[২৪৯] দেবেন্দ্রনাথ সেনও তখন গাজিপুরে ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে শুনলেন ভারতী সম্পাদিকা তখন গাজিপুরে রয়েছেন, এবং 'ভারতী'তে প্রকাশ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে কতকগুলি কবিতা চাইলেন। অনুরোধ শুনে দেবেন্দ্রনাথ কৃতার্থ হলেন, কারণ এর আগে তাঁর কোন লেখা প্রখ্যাত কোন কাগজে বার হয় নি।[২৫০] স্বর্ণকুমারী তখন সাহিত্যরচনা ও সম্পাদনায় সুদক্ষ নিপুণা। দেবেন্দ্রনাথের লেখার সূত্রপাতে এই মহীয়সী মহিলার যথেষ্ট প্রভাব আছে। গাজিপুর থেকে তিন মাইল দূরে একটি বাংলোয় তখন রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীও তখন গাজিপুরে ছিলেন। ১২৯৬ বঙ্গাব্দের 'ভারতী'তে (জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায়) 'গাজিপুর পত্রে' স্বর্ণকুমারী এ সময়ের অনেক কথা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর স্নেহ ও কৌতুক মিশ্রিত বক্তব্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কলকাতা থেকে তিনজনে হাওড়ায় মেল ট্রেনে উঠলেন— সৌদামিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথ। সৌদামিনী যাবেন কাশীধামে শ্বশুরালয়ে ও অপর দুই ভাইবোনে হলেন গাজিপুর যাত্রী। রাতটা তাঁদের ঘুমিয়ে কাটল, পরের দিন সকালটাও পথের দৃশ্য দেখতে দেখতে বেশ কাটল। ক্রমে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রাবণের কাঠফাটা রোদে তাঁদের কষ্ট হতে লাগল। এই রোদে বেলা প্রায় দেড়টার সময় তাঁরা নামলেন দিলদারনগরে, তাড়িঘাটের ট্রেনে উঠবেন বলে। খর রোদে তপ্ত বালি পায়ে ভেঙ্গে দিলদারনগরের অন্য পাশের গাড়ীতে উঠে তাঁরা শুনলেন ট্রেন আধঘণ্টা পরে ছাড়বে। স্বর্ণকুমারীর ক্রোধ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কিন্তু ক্রোধটা যে কার উপর তা আর তিনি অনুধাবন করতে পারছিলেন না। গার্ডরা যাতায়াত করছিল, অপরিচিত কিছু ব্যক্তি দূর থেকে তাঁদের গাড়ীর দিকে দেখে সেলাম করল, কুলিগুলো জিনিষপত্র ট্রেনে তুলে দিয়ে দ্বিগুণ ভাড়া পেয়েও বকসিসের জন্য ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছিল। স্বর্ণকুমারী

লিখছেন, 'ইহার মধ্যে কে যে আমার রাগের পাত্র তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম, কিন্তু যখন দেখিলাম চারিদিকের এই সকল মহামারী ব্যাপারের মধ্যেও আমার ভায়াটি কাপুরুষের মত অবিচলিত ভাবে বসিয়া আছেন, তখন সমস্ত রাগ তাঁহার উপর গিয়া পড়িল। তাঁহা হইতে কখনো যে ভারত উদ্ধার হইতে পারিবে না ইহা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে লাগিলাম। রাগে দুঃখে আমার চোখ দিয়া জল পড়িল না, কিন্তু মুখখানা শুকাইয়া যে আধখানা হইয়া গিয়াছে, সম্মুখে আয়না না থাকাতেও বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু ভ্রাতার এমনি মনুষ্য চরিত্র জ্ঞান— তিনি বুঝিলেন আর একরকম! তিনি ভাবিলেন পথশ্রমে আমি বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, কথাবার্তায় আমাকে তিনি উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইল না, তিনি কথা আরম্ভ করিতেই আমাদের তর্ক উঠিল, আমরা দুজনে একত্র হইলে এরূপ না হইয়া বড় যায় না। তিনি আরম্ভ করিলেন, "যদি চাও সুখ, আগে লও দুখ।" সবুরে মেওয়া ফলে, তাহা ভুলিলে দিদিমণি?"

আমি বলিলাম, "যে সুখ চায় সে দুঃখ ভোগ করুক, আমি নির্বাণ মুক্তির ভিখারী।" ক্রমে ঠাট্টা হইতে গম্ভীর তর্ক উঠিল। সুখ দুঃখ মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি না, মঙ্গল অমঙ্গল অনন্য সাপেক্ষ (absolute) কি না, হিন্দুর মোক্ষ বৌদ্ধের নির্বাণ এক কি না, এই সকল বিচারে আধঘণ্টা ছাড়া দেড় ঘণ্টা যে কোথা দিয়া চলিয়া গেল আমরা জানিতেও পারিলাম না।"[২৫১] ট্রেন তাড়িঘাটে এসে থামল, তখনও তাঁরা বিচার্য বিষয়ে মশগুল। এখানে স্বর্ণকুমারী উঠলেন পালকীতে রবীন্দ্রনাথ চললেন হেঁটে। প্রথমে পাল্কী দেখে লেখিকা বিরক্ত হয়েছিলেন, ষ্টেশন থেকে হেঁটে গিয়ে কি আর তিনি স্টীমারে উঠতে পারতেন না? কিন্তু পথটা দেখে তাঁর সে ভাব চলে গেল। স্টীমার থেকে ঘাটে নেমে ধূলোয় ভর্তি একটা ক্ষুদ্র গলি হেঁটে তাঁরা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠলেন। ঘণ্টাখানেক যাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ আশ্বাস দিলেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁরা বাড়ী পৌঁছবেন। স্বর্ণকুমারীর লেখাতেই তার পরের বিবরণ পাওয়া যায়: "... কিন্তু ক্রমাগত নামাউঠা করিয়া ট্রেন স্টীমার গাড়ীর দোলায় অনবরত পাক খাইয়া খাইয়া আমার শরীর মন এতই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল যে, এই অস্থির জগতের কোথায় স্থির মাটি আছে কি না— যদিই বা থাকে তাহা আমাদের পায়ের নীচে কখনো আসিবে কি না— যদিই বা আসে ত এত শীঘ্র আসিবে কি না তাহাতে তখনো আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হইতে লাগিল। অবশেষে গাড়ী যখন একটি বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া এক বড় বাংলোর কাছে লাগিল, বেলুরানীর টুকটুকে মুখখানি ফুলের মত আমাদের চোখে ফুটিয়া উঠিল, তাহার হাত ধরিয়া আমার ভ্রাতৃজায়া যখন বারান্দায় অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন সে সন্দেহ ত মুহূর্তে অপহৃত হইল, পথ শ্রান্তিও ভুলিয়া গেলাম, নির্বাণমুক্ত হইবার জন্যও আর আকুলতা রহিল না।"[২৫২] বর্ষায় তখন গাজিপুরের স্বতন্ত্র শ্রী। গাজিপুর থেকে কাশী ৪/৫ ঘণ্টার পথ। এখান থেকে রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারীকে কাশী নিয়ে গিয়েছিলেন। কাশীতে নৌকায় ঘাটের ধারে ধারে তাঁরা ঘুরেছেন। একটি রাত তাঁরা সেখানে থেকে পরদিনই গাজিপুরে এসে কলকাতায় ফিরলেন।[২৫৩] বেশ কয়েকমাস স্বর্ণকুমারী গাজিপুরে ছিলেন। স্বর্ণকুমারী লিখিত এই 'গাজিপুর পত্র' গুলির সম্পর্কে

দেবেন্দ্রনাথ সেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "সেই পত্রগুলির রচনাভঙ্গি এমন সুন্দর যে বোধ হয় যেন উপন্যাস পাঠ করিতেছি। অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলিকে সাজাইয়া মহিমান্বিত করিতে স্বর্ণকুমারী সিদ্ধহস্তা। যে সব অতি সামান্য বস্তু সামান্য লোকের দৃষ্টি আদপেই আকর্ষণ করে না, তাহা এই উজ্জ্বল চক্ষু লেখিকার দৃষ্টি এড়াইতে অসমর্থ। হিন্দুস্থানী দাসী জাঁতা পিষিতে পিষিতে যে গান গাহিয়াছে তাহাও তাহার পূর্ব জন্মার্জিত সুকৃতির ফলে এই আলোকসামান্যা মহিলার প্রতিভাবলে অমরত্ব লাভ করিয়াছে।"[২৫৪] দেবেন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যেরও একজন মুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। 'দীপ নির্ব্বাণ' উপন্যাস প্রকাশিত হলে, এটি পড়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, আনন্দে বিভোর হয়েছিলেন। 'গাথা' কাব্যও তিনি যতবারই পড়তেন, আনন্দ পেতেন, মুগ্ধ হতেন, এর ছন্দ ঝঙ্কারে। এই ছন্দ অনুসরণে কাব্য রচনাতেও প্রয়াস করেছেন বলে দেবেন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের 'অদ্ভুত সুখ' কবিতাটি (ভারতী ও বালক' ১২৯৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত ও দেবেন্দ্রনাথের 'অশোকগুচ্ছ' কাব্যগ্রন্থে (১৯০০) ১৯১২ সালের দ্বিতীয় সংস্করণে সঙ্কলিত) পড়ে স্বর্ণকুমারী তাঁকে লিখেছিলেন, "শিশুর কান্না দেখিয়া হাসি আসিতে পারে কিন্তু বিধবার রোদন দেখিয়া হাসা অস্বাভাবিক। উহা কবিজনোচিত সহানুভূতির অভাব জ্ঞাপন করে।"[২৫৫] তাঁর এই গভীর অনুভূতিশীল মন্তব্য অনুযায়ী দেবেন্দ্রনাথ কবিতাটি সংশোধন করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের 'গোলাপসুন্দরী' কবিতার ('ভারতী ও বালক' ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গীকৃত 'গোলাপগুচ্ছ' কাব্যে ১৯১২ সঙ্কলিত) একটি জায়গায় ছিল—

"ক্ষম মোরে দেব পাতঞ্জল
চাহি না করিতে আমি যোগশিক্ষা।"

স্বর্ণকুমারী চিঠিতে দেবেন্দ্রনাথকে জানালেন : "এ দুটি ছত্রে মহর্ষি পাতঞ্জলকে অসম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে।" শ্রদ্ধার সঙ্গে এ মন্তব্য মেনে নিয়ে কবি ছত্র দুটিকে বাদ দিলেন। এ কবিতাটির আরও একটু সংশোধন তাঁকে করতে হয়েছিল : "কবিতাটির আর এক স্থলে ঠিক অশ্লীল না হউক, দুটি একটি সুরুচি বিরুদ্ধ শব্দ ছিল। তাহাও বাদ দিতে হইল। এ বিষয়ে সম্পাদিকার খুবই দৃষ্টি ছিল। তিনি রুচিবাগীশ ছিলেন না। তাঁহার কোন phobia ছিল না। কিন্তু প্রকৃত অশ্লীলতার ছায়ারও তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।"[২৫৬] দেবেন্দ্রনাথের এ মন্তব্য স্বর্ণকুমারীর চরিত্র তথা রুচির একটি বিশিষ্ট দিককেই ইঙ্গিত করছে। স্বর্ণকুমারীর স্বভাবের এই শালীনতা সুরুচি সৌন্দর্যজ্ঞান তাঁর শিক্ষা দীক্ষায়, আচারে ব্যবহারে, সংসার জীবনে ছেলেমেয়েদের প্রদত্ত শিক্ষায় সর্বোপরি সাহিত্য সৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এ সুরুচিবোধ স্বর্ণকুমারীর পরিবারঅর্জিত, তার উপর জলসেক করেছেন তাঁর স্বামী। এর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে তাঁর স্বকীয় সংস্কারমুখী মন।

১৩০৩ বঙ্গাব্দের (১৮৯৬) 'ভারতী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত (গ্রন্থাকারে ১৯১২ সালে প্রকাশিত) দেবেন্দ্রনাথের 'দগ্ধকচু' রসরচনায় লেখকের নাম ছিল না। লেখকের ছদ্মনাম ছিল 'মেঘনাদ শত্রু, এম.এ.'। তাই এটি প্রকৃতপক্ষে কার লেখা কেউই অনুধাবন করতে

পারছিলেন না। স্বর্ণকুমারী দেবীও দেবেন্দ্রনাথের নাম গোপন রেখেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে লিখেছেন, "যেমন Political Secrets থাকে, স্বর্ণকুমারী দেবীরও literary secrets থাকিত। 'দগ্ধকচুর' লেখক শ্রীমেঘনাদ শত্রু কে, ইহা কাহারও কাছে তিনি প্রকাশ করেন নাই। রবিবাবু দেখিলেন যে, 'দগ্ধকচু'তে রঙ্গব্যঙ্গ উপহাসের প্রাচুর্য্য আছে— অতএব ইহা নিশ্চয় দ্বিজেন্দ্রবাবুর লেখা— ইহা ঠাওরাইয়া তিনি দ্বিজেন্দ্রবাবুকে একখানি প্রশংসা পূর্ণ পত্র লেখেন।" পরে অবশ্য জানা যায় দেবেন্দ্রনাথের রচনা বলে। স্বর্ণকুমারী দেবেন্দ্রনাথের ভাইবোনের প্রীতিমধুর সম্পর্ক স্থাপনের কথা এবং স্বর্ণকুমারীর চরিত্রের অনেক আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্বপূর্ণ মাধুর্যের উল্লেখ দেবেন্দ্রনাথ করেছেন : "আমি একখানি পত্রে স্বর্ণকুমারী দেবীকে লিখিয়াছিলাম যে আপনাকে দেখি নাই বটে, কিন্তু আমি আমার হৃদয় মন্দিরে একটি আদর্শ নারী মূর্তির পূজা করি, উহা আপনারই মূর্তি ও মাতৃমূর্তি। তদুত্তরে পূজনীয়া সম্পাদিকা আমাকে 'ভ্রাতা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া পত্র লেখেন। এত অকৃত্রিম যত্ন ও এত সুমিষ্ট আদর। তাঁহার পেটে এক, মুখে আর এক নাই। তিনি artificality-র আদপেই ধার ধারেন না। আমি তাঁহাকে 'দিদি' বলিয়া পত্রাদি লিখিতাম। তাঁহার সহিত পরিচয় ক্রমেই আত্মীয়তায় পরিণত হয়।" মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে সোলাপুরে থাকাকালীন একসময়ে স্বর্ণকুমারী দেবেন্দ্রনাথকে পত্র লিখেছিলেন, যে পত্রে দেবেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর সস্নেহ নিবিড় ভালবাসা ও আন্তরিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছিলেন : "আপনাকে যখন ভ্রাতা বলিয়াছি তখন আপনিও আমাদের আত্মীয়। আমার দাদা এখানকার Session Judge- আপনি আসিলে আপনাকে আমরা খুব যত্ন করিব। আপনার শরীর ভাল থাকে না। এখানে আপনি আসিলে বায়ুপরিবর্তনে নিরাময় হইবেন। আপনি নিঃসঙ্কোচে এখানে আসুন।" স্বর্ণকুমারীর কাব্যরসবোধ সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়ে দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে. স্বর্ণকুমারী দেবী কোন্ কবিতা সাচ্চা আর কোন্ কোন্ কবিতা ঝুঠা, যেমন বোঝেন এমন অল্পলোকেই বাঙ্গলাদেশে বোঝে। তাঁহার সৌন্দর্যবোধ শক্তি অসাধারণ।" স্বর্ণকুমারী নিজের সব বইয়ের একসেট উপহার দিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথকে। তাঁর উপন্যাসগুলি পড়ে মুগ্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ এগুলির নায়িকাদের উপর কতকগুলি কবিতা লেখেন, এবং সম্পাদিকাকে 'ভারতী'তে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করেন। স্বর্ণকুমারী তাঁকে লেখেন, "নিজের পত্রিকায় নিজের প্রশংসার কথা কেমন করিয়া মুদ্রিত করি?" আত্মপ্রচারে স্বর্ণকুমারী ছিলেন স্বভাবকুণ্ঠ; যথার্থ প্রতিভা ও আত্মোপলব্ধি তাঁর এই বিনম্র সুকুমার স্বভাববৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছিল। তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাঁরাই এসেছেন, তাঁরাই তাঁর এই স্বভাব সৌকুমার্যে মুগ্ধ হয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ একান্ত নাছোড়বান্দা হয়ে কবিতাগুলি শেষ পর্যন্ত 'ভারতী'তে প্রকাশ করিয়েছেন। 'ভারতী ও বালক' ১২৯৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় "নববর্ষ উপহার" নামে এই কবিতাগুলি বার হয়। বৈশাখ থেকে চৈত্র এই বারোটি মাসের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসের বিভিন্ন নায়িকাদের সাদৃশ্য নিরূপণ করে কবিতাগুলি লেখা। যেমন 'হুগলীর ইমামবাড়ী' (১৮৮৮) উপন্যাসের নায়িকা 'মুন্নার'

নারীত্বকে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন বৈশাখের প্রকৃতি চিত্রণের মধ্যে। এই কবিতাগুলি পরে দেবেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ "পারিজাতগুচ্ছে (১৯১২) সঙ্কলিত হয়। ভক্ত ভ্রাতার ঐকান্তিক অনুরোধে স্বর্ণকুমারী কবিতাগুলি 'ভারতী'তে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন কিন্তু ফুট নোটে তিনি একান্ত বিনয়ের সঙ্গে লিখেছিলেন, "কবি দেখিতেছি আমাদের কাব্যগুলিকে সূতা করিয়া তাঁহার সুগন্ধি ফুলে এই মালা গাঁথিয়াছেন। মালার সৌন্দর্য ফুলে, সূতায় নহে, সুতরাং ইহার গৌরব যাহা তাহা কবিরই।" এই নিরহঙ্কার বিনয় ও সারল্য স্বর্ণকুমারীর প্রকৃতিরই বৈশিষ্ট্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথের 'অপূর্ব নৈবেদ্য' কাব্যে (১৯১২) স্বর্ণকুমারী দেবীকে লক্ষ্য করে দুটি কবিতা আছে : একটি হল "শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতি" ও অপরটি হল "ভারতী"। স্বর্ণকুমারীর 'গল্পস্বল্প' গ্রন্থ (১৮৮৯) পাঠ করেও দেবেন্দ্রনাথ যে কবিতাটি লিখেছিলেন, সেই "আনন্দ" কবিতাটিও এ গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের 'অশোকগুচ্ছ' কাব্যগ্রন্থ (১৯০০) -টিও উৎসর্গ করা হয়েছে স্বর্ণকুমারী দেবীকে। উৎসর্গ পত্রে কবি লিখেছেন—

"পূজনীয়া,
শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী,
স্বসৃ— কল্পাসু।
যুগে যুগে জন্মে জন্মে,
নবোৎসাহে দেবেন্দ্র— বন্দিতা,
ধর দেবি, অর্ঘ্য পুষ্প,
ভক্তের এ সাধের কবিতা!"

দেবেন্দ্রনাথের লেখা থেকে স্বর্ণকুমারীর প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় : "পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর শরীরে অহঙ্কারের নামগন্ধ নাই। তিনি রাজকন্যা। দেবতুল্য নানাগুণালঙ্কৃত জানকীনাথের প্রিয়তমা সহধর্মিণী, বাংলাদেশের প্রসিদ্ধা লেখিকা, ইংরাজি ভাষায় পারদর্শিনী, তথাপি তাঁহার ব্যবহারে আমি কোনদিন বিন্দুমাত্র অ-বিনয় দেখি নাই।.. সরল শিশুপ্রকৃতি স্বর্ণকুমারীর চরিত্রে জ্যাঠামির লেশমাত্র নাই।" স্বর্ণকুমারী যে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রসারে অগ্রণী হয়েছিলেন তাতে আতিশয্য বা উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না। তাঁর আদর্শ যথার্থ কর্মের। "গীতোক্ত কর্মযোগ— যাহাতে কামনার লেশমাত্রও নাই— তাঁহার আদর্শ।"

স্বর্ণকুমারীর আকাঙ্ক্ষিত স্ত্রীস্বাধীনতা হল যথার্থ জ্ঞান শিক্ষায় যুক্তি নিষ্ঠ হয়ে মেয়েদের আত্মমর্যাদা পূর্ণ স্বাবলম্বনে। তাঁর অনুসৃত স্ত্রীস্বাধীনতা পুরুষকে অস্বীকার করে নয়। স্বর্ণকুমারীর এ উপলব্ধি পিতার সস্নেহ সাহচর্যে আবাল্য অর্জিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন তিনি। প্রায়ই তাই তিনি কন্যাকে বলতেন, "স্বর্ণ, তোমার রচনার উপর দেবতার পুষ্পবৃষ্টি হউক।" এ উক্তি মহর্ষির নিবিড় কন্যাস্নেহেরেই পরিচায়ক। দাদারা ও স্বামী স্বর্ণকুমারীর জীবনকে পূর্ণ আদর্শনিষ্ঠ করে তোলায় সহায়ক হয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারীর সব কাজে স্বামীর অনুমোদন থাকত। দেবেন্দ্রনাথ সেনকেও তিনি প্রথম যখন 'ভাই' বলে চিঠি লিখছেন, তাতে লিখেছিলেন,

''আমার স্বামী মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া আপনাকে পত্র লিখিতেছি। আজি হইতে আপনি আমার ভ্রাতা।''[২৫৭] রবীন্দ্রনাথও দেবেন্দ্রনাথ সেনকে 'কবিভ্রাতা' বলতেন এবং তাঁকে তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যটি (১৩০০ বঙ্গাব্দ) উৎসর্গ করেন।

বোম্বাই ভ্রমণ

স্বর্ণকুমারীর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সুদীর্ঘকাল (১৮৬৫—৯৭) বোম্বায়ে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। স্বর্ণকুমারী মেজদাদার কাছে বোম্বাইয়ের নানা স্থানে মাঝে মাঝে প্রবাস জীবন যাপন করে এসেছেন। সোলাপুর অঞ্চলে সত্যেন্দ্রনাথ অনেক বছর (১৮৮৪—৮৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ অক্টোবর- ১৮৯৩ মার্চ) ছিলেন। এর মধ্যে স্বর্ণকুমারী অনেকবার গেছেন সোলাপুরে। এখানে মতিবাগ ছিল তাঁদের বিকেলে বেড়াবার জায়গা। এখানকার "তরুবিরল অ-শ্যামল, মরুবৎ মুক্ত দৃশ্যও" স্বর্ণকুমারীকে আকৃষ্ট করেছিল। এখানকার পথে বেড়ানোর কথা স্বর্ণকুমারী লিখেছেন, "মুক্তপথে কি ভয়ঙ্কর বাতাস, এখানে হাঁটিয়া চলা দায়, সম্মুখে চুলগুলো নিশানের মত উড়িতে থাকে; কাপড় পালের আকার ধরিতে চায়; ঠিক থাকিয়া চলা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে; তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া বসিতে পারিলে তবে নিশ্চিন্ত।" বরোদার রাজা নীলগিরি যাবার পথে একবার দুদিন সোলাপুরে থেকে যান। ইউনিয়ন ক্লাবের নিমন্ত্রণে গিয়ে স্বর্ণকুমারী রাজদর্শন করলেন। সুশ্রী রাজার সঙ্গে আলাপ করে তিনি প্রীত হয়েছিলেন।[২৫৮] কন্যা সরলা দেবীও মায়ের সঙ্গে ছিলেন, বছর খানেক আগে (১৮৯০) তিনি বি.এ. পাশ করেছেন। ইউনিয়ন ক্লাবের অনুষ্ঠানটি হল দশেরা বা বিজয় উৎসব উপলক্ষে। উৎসবে লাঠি, তলোয়ার খেলা ব্যায়াম প্রদর্শনী হল। এই খেলা দেখেই সরলা দেবীর মনে এদেশে 'বীরাষ্টমী' ব্রত করার উৎসাহ জাগে। সোলাপুরে তাঁদের বাড়ীতে প্রতি মঙ্গলবার একটি করে টেনিসপার্টি হত। টেনিসের পর হত গানবাজনা। বর্ষাবাদলে টেনিসখেলা না হলে হত 'মিউজিক্যাল চেয়ার, তাসখেলা, হেঁয়ালি প্রভৃতি।[২৫৯]

১৮৯১ সালে স্বর্ণকুমারী অল্পদিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলেন পুনায়। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের অঘ্রাণ সংখ্যায় 'ভারতী'তে প্রকাশিত পত্রে এই ভ্রমণের বর্ণনা রয়েছে। ঐ বছরেই পুনায় স্বর্ণকুমারী রমাবাই-এর বক্তৃতা শুনলেন। রমাবাই কোঙ্কণের মঙ্গলুর জেলার ক্ষুদ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৫৮ সালে। ১৮৮২ সালে তাঁর শ্রীহট্ট জেলার বিপিনবিহারী দাসের সঙ্গে বিবাহ হয় এবং ষোল মাস পরে বিধবা হয়ে তিনি স্বদেশের নারীকল্যাণকার্যে আত্মনিয়োগ করেন ও 'আর্য মহিলা সমিতি' গঠন করেন। পরের বছর তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। ইউরোপ আমেরিকার নানাস্থানে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করে হিন্দু বিধবাদের জন্য তিনি ১৮৮৯ সালের ১১ই মার্চ (১২৯৫ বঙ্গাব্দের ২৬ ফাল্গুন) 'সারদা সদন' প্রতিষ্ঠা করেন। পণ্ডিতা রমাবাইয়ের সরল হৃদয়গ্রাহী বাগ্মীতায় স্বর্ণকুমারী মুগ্ধ হন। রমাবাইয়ের প্রতি স্বর্ণকুমারীর অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অকপটে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখায়। "বাস্তবিক সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য সেদিন খুব অনুভব করিয়াছিলাম। পণ্ডিতার সেই আত্মদানের আনন্দ, পরোপকার ব্রত পালনের অদম্য উৎসাহ দেখিলে নিজের অযোগ্যতা ক্ষুদ্রতা পূর্ণমাত্রায় বুঝা যায়। অথচ তাহাতে ঈর্ষা নাই, আত্মগৌরবের

অভাব অনুভব নাই, কেননা সেই গৌরব জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া আমিও তখন সেই গৌরবভাগী হইয়াছি, তবে তখনো দুঃখ কেবল এই ভাবিয়া সেই জ্যোতি একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না।'' পুনায় আসার আগে স্বর্ণকুমারী দেবীরা ছিলেন সোলাপুরে। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যার 'ভারতী'তে দুটি পত্র স্বর্ণকুমারী লিখেছেন সোলাপুর থেকে। আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যার পত্রে তিনি লিখছেন, এর দুবছর আগেও একবার সোলাপুরে তিনি গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ট্রেনের সময় পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তার জন্য যে বিভ্রাট ঘটে তা স্বর্ণকুমারীর সরস লেখনী থেকেই জানা যায়— ''দুই বৎসর আগে আমরা যখন সোলাপুরে আসি, তখন ট্রেন এখানে বিকালে পৌঁছিত, আমরা জানি, এবারো সেই সময় সোলাপুরে আসিব, পূজনীয় জজসাহেবেরও সেইরূপ ধারণা ছিল,— ইতিমধ্যে যে রেলওয়ে কোম্পানি ৬/৭ ঘণ্টা কাল চুরিতে বাহাদুরী করিয়া বসিয়াছে— তাহা কে জানে। ... কাজেই বিকালের পরিবর্তে সকালে ৯টার সময় যখন সোলাপুরে ট্রেন থামিল আমরা মহা আগ্রহভরে জানলায় মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ষ্টেশন জনশূন্য— এই অপরিচিত জনতার মধ্যে সেই বহু— আকাঙ্ক্ষিত স্নেহময় সহাস্য মুখটি দেখিতে পাইলাম না।'' ভাদ্র সংখ্যায় (১২৯৮ বঙ্গাব্দের) 'ভারতী'তে তিনি লিখছেন, সোলাপুরে 'ফ্যান্সি ড্রেস বল' অনুষ্ঠানে তাঁর ইচ্ছা ছিল ওদেশী রাণী সাজার। ওখানকার এক ভদ্রলোককে তিনি গহনা জোগাড় করে দিতে বললে, তিনি জানালেন তাহলে নাকে বড় বড় মুক্তোর নথ ও পায়ে মণ খানেক আন্দাজ মল পরতে হবে। তা শুনে রাণী সাজার বাসনা থেকে স্বর্ণকুমারী বিরত হলেন। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'ভারতী'তে স্বর্ণকুমারী পুনা থেকে পত্র লিখেছেন। সেখানে সিভিলিয়ানদের যে 'ফ্যান্সি ড্রেস বলে' তিনি যোগ দিয়েছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। সমস্ত ঘর ভর্তি মেমসাহেবদের মধ্যে তিনজন ছিলেন ভারতীয়— সত্যেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী ও সরলা। এই 'ফ্যান্সি ড্রেসে' স্বর্ণকুমারী গিয়েছিলেন সন্ন্যাসিনীর বেশে আর সরলা সরস্বতীর বেশে। রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরবার (১৮৮০) পর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে অভিনীত 'বসন্ত উৎসব' গীতিনাট্যেও স্বর্ণকুমারী সন্ন্যাসিনীর ভূমিকা নিয়েছিলেন আর কাদম্বরী দেবী হয়েছিলেন উপেক্ষিতা নায়িকা। সন্ন্যাসিনীর বেশে স্বর্ণকুমারী দেবীকে খুব মানাত বলেই সরলা দেবী অভিমত প্রকাশ করেছেন।[২৬০] পাণ্ডারপুর আকেলকোট যাত্রাকালে ট্রেনে জনৈক ইংরাজ মহিলার অনাবশ্যক ক্রোধ, অশালীন ব্যবহার স্বর্ণকুমারীকে উত্তেজিত করতে পারে নি। উদার মানবদরদী সহৃদয় পত্রলেখিকা সে বিসদৃশ আচরণ যে বেশ উপভোগ করেছেন তা তাঁর পত্র থেকেই ('ভারতী' অগ্রাণ ১২৯৯ বঙ্গাব্দ) উপলব্ধি করা যায়। ট্রেনে কোন কামরায় উঠতে না পেরে স্বর্ণকুমারী তাঁর সঙ্গিনীসহ উঠলেন একটি 'লেডিজ কম্পার্টমেন্টে', যেখানে ''একটি বেঞ্চে অর্ধলীন'' হয়ে চা পান করছিলেন উক্ত ইংরাজ মহিলা। উক্ত মহিলা এই ধারণা নিয়েই ছিলেন যে তাঁর কম্পার্টমেন্টে আর কেউ উঠবে না কিন্তু ধারণা ভ্রান্ত হওয়ায় তিনি কুপিত হন। স্বর্ণকুমারীর লেখার মধ্যে মহিলার অদ্ভুত চরিত্রটি চমৎকার প্রস্ফুটিত হয়েছে। পরিশেষে স্বর্ণকুমারী লিখছেন,

"সেদিন সুন্দরীর ক্রোধবিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া জ্ঞানোদয় হইল যে, সুন্দর মুখে উগ্র বিকৃত ভাবের মত বীভৎস এবং আশ্চর্যজনক দৃশ্য সংসারে আর কিছুই নাই। সুন্দরীগণ এই কথাটি মনে রাখিলে সংসারের অনেকটা উপকার সাধন করিতে পারেন। আমার তখন এমনটা ইচ্ছা করিতেছিল একখানা আয়না লইয়া তাঁহার মুখের সামনে ধরি।"

কাশিয়াবাগানের বাড়ীতে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র

স্বর্ণকুমারীর কাশিয়াবাগানের বাড়ীতে সরলা দেবীর ভক্তির টানে বিদ্যাসাগরও এসেছিলেন। সরলা দেবী উনিশ বছর বয়সে কতকগুলি সংস্কৃত নাটকের এমন সুন্দর জ্ঞানসমৃদ্ধ আলোচনা করেন যে সেগুলি পড়ে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র লেখিকাকে ধন্যবাদ দিয়ে একটি চিঠি লিখলেন ও নিজের রচিত একসেট গ্রন্থ তাঁকে উপহার দিলেন। লেখাগুলি হল 'মালবিকাগ্নিমিত্র'('ভারতী' ১২৯৮ বঙ্গাব্দের পৌষ, ফাল্গুন, চৈত্র সংখ্যায় মুদ্রিত) রতিবিলাপ ('ভারতী ১২৯৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত) প্রভৃতি গবেষণাপূর্ণ রচনা। তারপরেই বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮—৯৪) আমন্ত্রিত হয়ে একদিন কাশিয়াবাগানে স্বর্ণকুমারীর বাড়ীতে এলেন। তিনি চায়ের ভক্ত ছিলেন, জানকীনাথও ছিলেন চায়ের মর্মজ্ঞ। স্বর্ণকুমারীর বাড়ীর চা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাল লাগাতে তাঁর বাড়ীতে উপহার গেল সেই চায়ের একটি প্যাকেট ও একগুচ্ছ গোলাপ ফুল। সরলা দেবীকে তিনি 'মৃণালিনী' উপন্যাসের (১৮৬৯) 'সাধের তরণী' গানটিতে সুর বসাতে বলেছিলেন। সেই গান শুনতে তিনি আরও একদিন এলেন এবং খুশি হলেন গান শুনে। সরলা দেবী কৃত 'সাধের তরণী' গানটির স্বরলিপি 'ভারতী'তে ১৩০১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তারপরে একদিন বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণকুমারী দেবী ও সরলাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ীতে। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী ও সরলা। তারপর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দুই দৌহিত্র দিব্যেন্দু ও পূর্ণেন্দুকে নিয়ে প্রায়ই কাশিয়াবাগানে আসতেন।[২৬১]

স্বর্ণকুমারীর সংসার জীবন

'ভারতী'র সম্পাদনায় স্বর্ণকুমারীকে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী নানাভাবে সাহায্য করতেন। মায়ের 'সখি-সমিতি'তেও তাঁর অনেক সহায়তা ছিল। 'ভারতী'র সম্পাদনার দায়িত্ব নেওয়ার (১৮৮৪ সাল) কয়েকবছর পরে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে স্বর্ণকুমারীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হল। ১৮৯৪ সালের (১৩০১ বঙ্গাব্দের) চৈত্র মাসে হিরণ্ময়ী দেবী চুঁচুড়া থেকে কাশিয়াবাগানে এসে দেখলেন 'ভারতী' বন্ধ হওয়ার জোগাড় হয়েছে। ম্যানেজার সতীশবাবু নোটিশ ছাপিয়ে ফেলেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবী তখন খুব অসুস্থ। হিরণ্ময়ী তখন মায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার কর্তব্যই করলেন। তিনি নোটিশ বন্ধ করিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন 'ভারতী'র সম্পাদনার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য।[২৬২] সরলা দেবী তখন মহীশূর মহারাণীর স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। বি.এ. পাশের (১৮৯০ সালে) পর দুতিন বছর তিনি মাকে 'ভারতী'র কাজে সাহায্য করেছেন। সংস্কৃতে এম.এ. দেওয়ার জন্য তিনি বাড়ীতে পড়ছিলেন। কিন্তু ভায়েদের মত স্বাধীন জীবিকা অর্জনের নিমিত্ত বাইরে যাবার অদম্য বাসনা জাগল সরলার। মাকে বাবাকে বারবার বিরক্ত করে তিনি বাবার সক্রোধ সম্মতি পেলেন। জানকীনাথ মত দিয়েছিলেন এই ভেবে চাকরী আর সরলা কোথায় পাবে? দাদামশায় দেবেন্দ্রনাথকে সরলা দেবী মনোবাসনা জানালেন, তিনি কোন আপত্তি করলেন না, শুধু জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনীকে বললেন, "সরলা যদি অঙ্গীকার করে জীবনে কখনো বিয়ে করবে না, তাহলে আমি তার তলোয়ারের সঙ্গে বিয়ে দিই যাবার আগে।" এ প্রস্তাবে সরলা দেবীর মনে বিদ্রোহ জাগল। নিজেকে তিনি যাচিয়ে দেখলেন, এমন প্রতিজ্ঞা নিয়ে চিরকৌমার্য নিতে তাঁর মন প্রস্তুত নয়। "কোন মেয়েই সেইটে তার অন্তিম লক্ষ্য করতে পারে না। যতদিন স্বচ্ছন্দে বিহার চলে চলুক, কিন্তু একদিন যে পরচ্ছন্দে নিজেকে চালানর ইচ্ছে হতে পারে"— অতএব ইচ্ছের পথে নিজের হাতে চিরকালের মত বেড়া তুলে দিতে পারলেন না সরলা দেবী।[২৬৩] চাকরী সরলা দেবীর হল। বহু আগে বাল্যবয়সে যখন (আনুমানিক ১৮৮৫/৮৬) সরলা রায়ের (মিসেস পি. কে. রায়) দলের সঙ্গে তিনি মহীশূর বেড়াতে গিয়াছিলেন তখন সেখানে দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী বলে তিনি খুব খাতির পেয়েছিলেন। মহীশূর মহারাজের প্রিয়পাত্র, মহারাণী গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার রামস্বামী আয়েঙ্গারের মাতুল নরসিংহ আয়েঙ্গারকে সরলা পত্র লিখেছিলেন— যদি স্কুলটিতে কাজ পান। চাকরীটি পেলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তখন (১৮৯৪ সালে) ছিলেন সেতারায়। মা স্বর্ণকুমারী মেয়ের সঙ্গে সেতারা পর্যন্ত গেলেন। তারপব মেজোমামা সত্যেন্দ্রনাথ সরলাকে মহীশূরে পৌঁছে দিতে গেলেন, সব সুবন্দোবস্ত দেখে শুনে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরলেন।[২৬৪] সরলার আগে কুমুদিনী খাস্তগির কিছুদিন এ স্কুলে চাকরী করেন। ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগিরের কন্যা কুমুদিনী (এঁর অন্য দুই ভগ্নী আই. সি. এস বিহারীলাল গুপ্তের স্ত্রী সৌদামিনী দেবী ও

কেশব চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র করুণা চন্দ্রের স্ত্রী মোহিনী দেবী) বেথুন কলেজের কৃতী ছাত্রী ছিলেন। ১৮৬৫ সালে কুমুদিনী জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮১ সালে বেথুন স্কুল থেকে তিনি এন্ট্রান্স পাশ করেন। তিনি ১৮৯১—৯৩ সালে বেথুন স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ১৮৯৪ সালে কিছুদিন তিনি মহীশূর মহারাণী গার্লস স্কুলে শিক্ষকতা করে পুনরায় বেথুন স্কুলে ফিরে আসেন এবং ১৮৯৫—৯৭ সালে তৃতীয় অধ্যাপিকার পদে কর্মরত অবস্থায় তাঁর বিবাহ হয় ১৮৯৭ সালে। ১৯০১—১২ সাল পর্যন্ত তের বছর তিনি বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন।[২৬৫] জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে ঘরের মেয়ে চাকরী করতে যাওয়ার প্রথম নিদর্শন দেখালেন সরলা দেবী। কিছুদিন তিনি বরোদার মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারীও হয়েছিলেন। ১৯০৩—০৪ সালে সরলা দেবী কিছুদিন বেথুন স্কুলে গান শিখিয়েছেন।[২৬৬] হিরণ্ময়ী দেবী মাকে অসুস্থ দেখে হাওয়া বদলাতে নীলগিরি নিয়ে গেলেন ১৮৯৫ সালে। ৬ই মে বেলা দ্বিপ্রহরের পর 'ডুনেরা' ষ্টীমারে তাঁরা নীলগিরির পথে যাত্রা করলেন। স্বর্ণকুমারীর এই ষ্টীমার-যাত্রার সরস সুন্দর বর্ণনা রয়েছে 'ভারতী'র ১৩০২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যার 'সমুদ্রে' শীর্ষক রচনায়। স্বর্ণকুমারীর সমুদ্রযাত্রা এই প্রথম নয়, এর প্রায় বারো বছর আগে (১৮৮৩ সালে) তিনি বোম্বে থেকে তিন দিনের সমুদ্রপথে গিয়েছিলেন কারোয়ারে মেজদাদার কাছে। তখন তাঁরা গিয়েছিলেন বন্দরগামী ছোট ষ্টীমারে, এবার চলেছেন ইউরোপগামী প্রচণ্ড জাহাজ 'ডুনেরা'তে। এই জাহাজে চড়ে তাই লেখিকার বিলেত যাবার বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছিল পরিবেশের প্রভাবে। তাঁরই লেখা: "এই জাহাজে চড়িলেই ইয়োরোপের গন্ধে নাসিকা এমন পূর্ণ হইয়া উঠে যে, তাহার প্রত্যক্ষ স্বাদ গ্রহণের জন্য মনের বিশেষতর একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়; অন্ততঃ আমার ত এই জাহাজে উঠিয়া ভারী বিলাত যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল।" 'ভারতী'র ১৩০২ বঙ্গাব্দের পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত যথাক্রমে 'নীলগিরি' ও 'নীলগিরির টোডা জাতি' প্রবন্ধদ্বয়ে স্বর্ণকুমারী নীলগিরি ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করেছেন— যে ভ্রমণ পথের সৌন্দর্যানুভূতিতে, বিভিন্ন মানবচরিত্র অভিজ্ঞতায় ও নানাবিধ ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে সমুজ্জ্বল। হিমালয়ের সুগম্ভীর সৌন্দর্য দূরের, সে যেন দেবালয়, আর নীলগিরি যেন মর্ত্যের নন্দনকানন— এই হল লেখিকার নীলগিরি সম্পর্কে উপলব্ধি। একটি প্রাণস্পর্শী উপমায় এই দুয়ের সৌন্দর্যের পার্থক্য স্বর্ণকুমারী স্পষ্ট করেছেন: "ইংরাজের সুন্দর শিশু অপেক্ষা নিজের কাল ছেলেটিতে আত্মীয়তার যে তৃপ্তি সুখ, দার্জিলিঙ ও উৎকামন্দ সম্বন্ধেও কতকটা সেইরূপ বলা যাইতে পারে।" মহীশূরের দেওয়ান প্রাসাদে স্বর্ণকুমারী ছিলেন। ১৩০২ বঙ্গাব্দে 'ভারতী'র ভার ত্যাগ করলেন স্বর্ণকুমারী। হিরণ্ময়ী মাকে মহীশূরে সরলার কাছে রেখে এসে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন 'ভারতী'র দায়িত্ব নিতে। অস্বীকৃত হলেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি বললেন, হিরণ্ময়ী দায়িত্ব নিলে তিনি তাঁকে সাহায্য করবেন। হিরণ্ময়ীই নিলেন 'ভারতী'র ভার, পরে স্বর্ণকুমারী ও সরলা ফিরে এলে, দুবোনে 'ভারতী'র কাজ চালাতে লাগলেন (১৩০২—৪ বঙ্গাব্দ)। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে একবছর 'ভারতী'র সম্পাদনা করলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর 'ভারতী'র ভার সরলা দেবী একাই নিলেন এবং যোগ্যতার সঙ্গে নয় বছর (১৩০৬—১৪ বঙ্গাব্দ) তিনি সম্পাদনা করলেন। ১৩০২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যার 'ভারতী'তে প্রকাশিত হল স্বর্ণকুমারীর অবসর গ্রহণের সংবাদ। স্বর্ণকুমারী

লিখলেন, ''এতদিন আমি আমার সাধ্যমতে ভারতীর সম্পাদন কার্য নির্বাহ্ করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে শরীর অসুস্থ্ হওয়াতে আমার কন্যাদ্বয়ের প্রতি 'ভারতী'র ভার সমর্পণ করিয়া বর্তমান বৎসর হইতে আমি অবসর গ্রহণ করিলাম।''

স্বর্ণকুমারীর একমাত্র পুত্র জ্যোৎস্নানাথ (জন্ম ১৮৭১) আই. সি. এস হয়ে বিয়ে করলেন কেশব কন্যা কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবীর (১৮৬৪—১৯৩২) কন্যা সুকৃতিকে। সুকৃতির পিতা হলেন নৃপেন্দ্রনারায়ণ (১৮৬২—১৯১১)। ১৮৯৯ সালে ২৯ নভেম্বর যখন এই বিয়ে হল তখন সুকৃতির বয়স ষোলর কাছাকাছি (জন্ম ১৮৮৪, জানুয়ারী)। সুনীতি দেবীর কলকাতার বাড়ী 'উডল্যাণ্ডসে' বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হল। সুনীতি দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে (১৯২১) জামাতা জ্যোৎস্নানাথ সম্বন্ধে বলেছেন :

"..... after twenty two years I can still say that I could not wish for a better son-in-law."[২৬৭]

স্বর্ণকুমারী ও অনুরূপা দেবী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৫—৯৪) বাড়ীর পাশের বাড়ীতে কিছুদিন (১৮৮৭ সালে) অসুস্থ হয়ে ছিলেন সেইসময় এই উভয় পরিবারের ঘনিষ্ঠতা হয়। স্বর্ণকুমারী তখন প্রায়ই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী যেতেন। এ সময়ে ভূদেবের পৌত্রীদ্বয় পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ লেখিকা ইন্দিরা ও অনুরূপার বয়স যথাক্রমে আট ও পাঁচ। ইন্দিরার (১৮৭৯—১৯২২) প্রকৃত নাম সুরূপা, কিন্তু তিনি 'ইন্দিরা' রাশি নামেই লিখতেন। তাঁর লেখায় স্বর্ণকুমারী যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। পরবর্তীকালে চুঁচুঁড়াতে স্বর্ণকুমারী যখনই যেতেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। চুঁচুঁড়াতে থাকাকালে দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬২—১৯২২) প্রথমা স্ত্রী সুশীলা দেবীর সঙ্গে অনুরূপার (১৮৮২—১৯৫৮) মা ধরাসুন্দরীর খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়। দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দিনেন্দ্রনাথ (১৮৮২—১৯৩৫) ও কন্যা নলিনী ছিল অনুরূপার খেলার সাথী। দশ বছর বয়সে (১৮৯২— সালে) অনুরূপার বিয়ে হয় শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বিয়ের পরেই অনুরূপা যখন একবার চুঁচুঁড়ায় গিয়ে ভূদেব ভবনে ছিলেন, স্বর্ণকুমারী সরলাকে নিয়ে সেখানে জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ীর কাছে যান। হিরণ্ময়ীর স্বামী ফণিভূষণের কর্মস্থল তখন চুঁচুঁড়াতে ছিল। স্বর্ণকুমারী দেবী একদিন নিমন্ত্রিত হয়ে কন্যাদের নিয়ে ভূদেব-ভবনে গেলেন। বি. এ. পাশ সরলা দেবী সম্পর্কে সে সময়ে অনুরূপা দেবীর যে কৌতূহল ছিল, তারই পরিচয় পাই তাঁর লেখায় : "দেখিয়া বিস্মিত ও আশ্বস্ত হইলাম। তবে বি. এ. পাশ করিলে মেয়েরা একটা অদ্ভুত কিছু হয় না। বই লিখিয়া তা ছাপাইলেও না!"[২৬৮] এরপরে একসময়ে (আনুমানিক ১৮৯৬ সাল) অনুরূপা দেবী দিন কয়েকের জন্য ভবানীপুরে মামার বাড়ীতে এলেন, এবং তাঁর মাসিকে নিয়ে গেলেন স্বর্ণকুমারী দেবীর কাশিয়াবাগানে বাড়ীতে। 'এশকর্ট' করে তাঁদের নিয়ে গেলেন পরবর্তীকালের খ্যাতনামা সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপ্যাধায় (১৮৮৪—১৯৬৬)। বারো বছরের সৌরীন্দ্রমোহন মা ও মাসতুতো ভগ্নী অনুরূপা দেবীকে নিয়ে স্বর্ণকুমারীর বাড়ী উপস্থিত হলেন। তখন 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা হিরণ্ময়ী ও সরলা। ছোটদিদি অনুরূপা স্বর্ণকুমারী দেবীর কাছে সৌরীন্দ্রমোহনের পরিচয় দিয়ে বললেন, "ও কবিতা লেখে।" শুনে স্বর্ণকুমারী দেবী বলেছিলেন "বটে! রবি এখানে মাঝে মাঝে আসেন। যেসব ছেলেমেয়ে কবিতা লেখে, তাদের উপর রবির ভারী মায়া! এবারে রবি এলে ওকে নিয়ে আসবো ... রবির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।" সৌরীন্দ্রমোহন লিখেছেন, "স্বর্ণকুমারী দেবী একথা রক্ষা করেছিলেন। এ ঘটনার দিন দশ বারো পরেই একদিন মায়ের নামে স্বর্ণকুমারী দেবীর চিঠি নিয়ে কাশিয়াবাগান থেকে এলো তাঁর গাড়ী। চিঠিতে লেখা— "রবি এসেছে ... সৌরীনকে পাঠিয়ে দেবেন। গাড়ী পাঠালুম ... এই গাড়ীতে।"[২৬৯] অনুরূপা দেবী আর একদিন গেছেন— হিরণ্ময়ী দেবী তখন ম্যালেরিয়ায়

আক্রান্ত, সরলা দেবী বেরোবার জন্য বেশবাস করছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী অনুরূপা দেবীকে আদর আপ্যায়ন করে একরাশ বই দিলেন পড়তে, ও বললেন, "তুমি বাংলা লিখতে চেষ্টা কর— একদিন ভারতীতে তোমার লেখা ছাপা হবে।"[২৭০] 'ভারতী'তে অনুরূপা দেবীর প্রথম গল্প বার হল ১৯০৫ সালে 'পরাজয়' (১৩১৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে আশ্বিন সংখ্যায়)। এর আগে অনুরূপা দেবীর প্রথম উপন্যাস 'টিলকুঠী' বার হয়েছে 'নবনূর' পত্রিকায় (১৩১১ বঙ্গাব্দে)। অনুরূপা দেবীর লেখায় স্বর্ণকুমারী আন্তরিক সাহচর্য ও উৎসাহ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র লিখতে বলেছিলেন রমেশচন্দ্রকে, তাই রমেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে হাত দিয়েছিলেন। 'অনুরূপা' প্রথমে অনুপমা' ছদ্মনামে লিখতেন। তার জন্য স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁকে অভিযোগ করেছিলেন, "অনুপমা নাম কেন দেয়? ... কেন লেখাটা কি মন্দ কাজ যে নাম লুকিয়ে রাখতে হয়?" অনুরূপা দেবীকে তিনি বার বার বলেছেন, যে তাঁর লেখার শক্তি আছে, সে শক্তি যেন তিনি নষ্ট না করেন। নিজের কয়েকটি লেখার 'ভারতী'তে প্রকাশ করার যোগ্যতা সম্বন্ধে অনুরূপার দ্বিধা হলে, স্বর্ণকুমারী লিখলেন, "তুমি নিজেই যে নিজের লেখার সমালোচক হলে দেখছি। যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচারের ভারটা আমায় দিয়ে লেখাগুলো সব পাঠিয়ো দেখি।"[২৭১] অনুরূপা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কন্যা বেলার (মাধুরীলতা) বন্ধু। অনুরূপা দেবীর স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আইন ব্যবসা উপলক্ষে সস্ত্রীক মজঃফরপুরে বাস করতেন। রবীন্দ্রনাথের জামাতা বেলার স্বামী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীও ১৮৯৪ সালে আইন পাশ করে মজঃফরপুরে ওকালতি করছিলেন। ১৯০১ সালে বিবাহের পর বেলা স্বামীগৃহে মজঃফরপুরে গেলে অনুরূপা দেবীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। মজঃফরপুরে মেয়েদের জন্য একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় অনুরূপা দেবী বেলার সঙ্গে সংযুক্ত ভাবে কাজ করেন।[২৭২] সেইসূত্রে স্বর্ণকুমারী দেবীকে অনুরূপা বলতেন 'স্বর্ণপিসিমা'। স্বর্ণপিসিমার পরকে আপন করার সহজ শক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন অনুরূপা। কলকাতায় এলেই স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করলে অনুরূপার মন ভরত না। স্বর্ণকুমারী দেবী অনুরূপার লেখা উপন্যাসগুলি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সাহিত্যসৃষ্টিতে অনুরূপা স্বর্ণকুমারী দেবীর কাছে যে সস্নেহ উৎসাহ পেয়েছেন সে কথা তিনি লিখেছেন : "যখন গিয়াছি, কত স্নেহ আদর উৎসাহ পাইয়া আসিয়াছি। তাঁর কাছে অত উৎসাহ না পাইলে হয়ত সাহিত্য ক্ষেত্রে এমন সাহসের সহিত নামিতে পারিতাম না।" 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাসের নামটি স্বর্ণকুমারীর দেওয়া, যেটি 'ভারতী'তে ধারাবাহিক ভাবে বার হয় (১৩১৬—১৮ বঙ্গাব্দ)। 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাস বার হবার পর স্বর্ণকুমারী দেবী অনুরূপাকে লেখেন, "আমি তোমার লেখা ভালবাসি। 'পোষ্যপুত্রে'র মত আর একখানি উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করো। আমার মাসে মাসে পাঠাইলেই চলিবে। বেশ ঘরকরণার কথা লইয়াই ওইভাবে লিখিবে।" 'ভারতী'তে অনুরূপা দেবীর 'চোর' গল্প প্রকাশিত হয় ১৯১১ সালে (১৩১৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায়)। এরপর ১৯১৩ সালে (১৩১৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ১৩২০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন পর্যন্ত) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর 'বাগদত্তা' উপন্যাস। অনুরূপা দেবীর 'বাগদত্তা' উপন্যাস সম্বন্ধে ভারতী-সম্পাদিকা লিখেছিলেন "অনুরূপা, তুমি অমন করালীচরণটিকে কোথায় পেলে? আমি বোধহয় ও চিত্র আঁকিতে পারিতাম না।

বাস্তবিক চরিত্র চিত্রণ বিষয়ে তোমার শক্তিটা খুব সামান্য নয়। এত কম বয়সে তুমি কিন্তু অনেক দেখেছ ও বুঝেছ তো?"[২৭৩] যার লেখায় যেটুকু ভাল দেখতেন স্বর্ণকুমারী সস্নেহ উৎসাহ দিয়ে তাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে আন্তরিক চেষ্টা করতেন। তাঁর সেই সস্নেহ উৎসাহ পেয়েছেন সরোজকুমারী, অনুরূপা।

স্বর্ণকুমারীর জীবনের টুকরো টুকরো ছবি

স্বর্ণকুমারীর 'বিদ্রোহ' উপন্যাস ইতিমধ্যে বার হয়েছে ১৮৯০ সালে (ভারতীতে প্রকাশিত ১২৯৪ থেকে '৯৫ বঙ্গাব্দে)। তাঁর 'নবকাহিনী'র গল্পগুলি 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯৭—৯৮ বঙ্গাব্দে ও গ্রন্থাকারে বার হল ১৮৯২ সালে। 'নবকাহিনী'র একটি ইংরেজী অনুবাদও স্বর্ণকুমারী করেন Short Stories নামে। 'অতৃপ্তি'কাব্য নাটকটি 'ভারতী'তে বার হয় ১২৯৫ বঙ্গাব্দে বৈশাখ থেকে আশ্বিন সংখ্যায়। ১২৯৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত 'ভারতী'তে বার হল তাঁর 'স্নেহলতা বা পালিতা' উপন্যাস, যে উপন্যাসের প্রথম খণ্ড গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৯০ ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৯৩ সালে।

সরলা দেবী ১৮৯৪ সালে মহীশূরে গিয়েছিলেন স্কুলে চাকরী করতে। সেখানে গিয়ে ছমাস পরে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ওখানকার সিভিল সার্জেনরা তাঁর চিকিৎসা করতে লাগলেন। এর আগে অ্যালোপ্যাথি ওষুধ সরলা দেবী খাননি কখনো। জানকীনাথ ছিলেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ভক্ত— তাই তাঁর বাড়ীতে অসুখ হলে আসতেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বা মল্‌জার। মহীশূরেই সরলা দেবীর অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হল। স্বর্ণকুমারী ছিলেন তখন সাতারায় মেজদাদার কাছে। টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি মহীশূরে মেয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য গেলেন। ডাক্তারের পরামর্শে স্বর্ণকুমারী দেবী সরলাকে নিয়ে সাতারায় ফিরলেন। তিন মাসে সুস্থ হয়ে সরলা দেবী আবার গেলেন মহীশূরে। তিন মাস চাকরী করে, চাকরীর একবছর পূর্ণ করে সরলা দেবী ঘরে ফিরলেন।[২৭৪] 'ভারতী'র সম্পাদনা তিনবছর (১৩০২—৪ বঙ্গাব্দ) করলেন হিরণ্ময়ী ও সরলা দেবী, একবছর (১৩০৫ বঙ্গাব্দ) নিলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর 'ভাবতী'র ভার পুরোপুরি একা নিলেন সরলা দেবী (১৩০৬ বঙ্গাব্দে)। 'ভারতী'তে স্বর্ণকুমারীর 'ফুলের মালা' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বার হয় ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র থেকে ১৩০০ বঙ্গাব্দের পৌষ পর্যন্ত এবং গ্রন্থাকারে বার হয় ১৮৯৫ সালে। স্বর্ণকুমারীর 'কবিতা ও গান' গ্রন্থও প্রকাশিত হয় ঐ একই বছরে। 'কাহাকে' উপন্যাস ১৮৯৮-এ ও 'কৌতুকনাট্য ও বিবিধ কথা' ১৯০১ সালে বার হয়। সাহিত্য গগনে বহুযুগের অন্ধ সংস্কারজনিত ধারণা ভেঙে উজ্জ্বল জ্যোর্তিময়ী স্বর্ণ-প্রতিভা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করল।

নাট্যকার অমৃতলাল বসু (১৮৫৩—১৯২৯) শিক্ষিতা মেয়েদের সম্পর্কে সাধারণতঃ বিদ্রূপই করেছেন। কিন্তু স্বর্ণকুমারীর প্রতিভাকে তিনিও অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়েছেন তাঁর 'কৃপণের ধন' নাটকে (১৩০৭ বঙ্গাব্দ)। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে নায়িকা কুন্তলার মুখে নাট্যকারের স্বীকৃতি অভিব্যক্ত হয়েছে। স্বর্ণকুমাবীর 'গল্পস্বল্প' (১৮৮৯) গন্থ প্রসঙ্গে নায়িকার

উক্তি— "... মন্মথ— ছি ছি মাষ্টারমশাই যাই বলুন, আমার এই বইখানি বেশ ভাল লাগে, নামটিও যেমনি— বইটিও তেমনি, গল্প-স্বল্প, কি মিষ্টি নাম! মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে আজ ঝগড়া করব, আমায় এমনতর লিখতে শেখায় না কেন? মেয়েমানুষ যদি লেখাপড়া শেখে, যেন স্বর্ণকুমারীর মতই শেখে দেখ দেখি কেমন লিখেছেন, যেখানটা পড়ি সেইখানটাই মিষ্টি, আর মিষ্টি।" (পৃঃ ৬৯—৭০)। বীরাষ্টমী ব্রত, 'ভারতী'র মধ্যে দিয়ে সরলা দেবী যে জাতীয়তা বোধ দেশের মধ্যে জাগাতে চেষ্টা করছিলেন, তা স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩—১৯০২) দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্রমশই উভয়ের পরিচয় হয়। সুরেন ঠাকুরকে সঙ্গে করে সরলা দেবী প্রায়ই যেতেন বেলুড় মঠে। সরলা দেবীর শিক্ষা সম্পর্কে বিবেকানন্দ নিবেদিতার কাছে প্রশংসা করেছিলেন এবং ১৮৯৯ সালে তিনি পুনরায় (প্রথমবার ১৮৯৩ সালে গিয়ে তিনি আমেরিকায় শিকাগো শহরে ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা করেন) আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণে যাওয়ার সময়ে সরলা দেবীকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন "ভারতের মেয়েদের প্রতিনিধি হয়ে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক বার্তা প্রতীচ্যের মেয়েদের শোনাবার জন্য।" কিন্তু সরলা দেবীর যাওয়া হল না বাধা দিল তাঁর মনের অপ্রস্তুতি, সঙ্কোচ ও অভিভাবকদের অমত। স্বামীজি নিবেদিতাকেই সঙ্গী করে নিলেন।[২৭৫] বিবেকানন্দের মৃত্যুর (১৯০২) পর সরলা দেবী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত হিমালয়ের মায়াবতী আশ্রমে অনেকদিন ছিলেন।

সুরের সাধনাক্ষেত্রে সরলা দেবী ছিলেন সার্থক সাধিকা। গান রচনা ও সুর যোজনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত অধিকাংশ বিভাগেই তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল। কন্যা সরলার সঙ্গীতে পারদর্শিতা ও খ্যাতি অর্জনে মায়েরও যথেষ্ট প্রেরণা ছিল। চোদ্দ বছরেরও কম বয়স থেকে সরলা মায়ের উৎসাহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, পার্টিতে গান গাইতেন।[২৭৬] জাতীয়তাবোধ উদ্দীপনে 'বন্দেমাতরম' গাওয়া সরলা দেবীই শুরু করেছিলেন। আলমোড়া পাহাড়ের উপর বিবেকানন্দের আশ্রমের অধিনেত্রী মিসেস সেভিয়াব সরলা দেবীকে বলেছিলেন, "আর কিছু না, শুধু যদি জাতীয় গান গেয়ে গেয়ে ফেরো তুমি ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে সমগ্র দেশকে মাতাতে পার।" নিত্য নতুন সঙ্গীত রচনা ও সংগ্রহ, জাতীয়তার আন্দোলন ও 'ভারতী'কে তার বাহন করার নানাবিধ প্রয়াসে যখন সরলা দেবী নিমগ্ন তখন মায়াবতী আশ্রমে তাঁর কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এল দিদি হিরণ্ময়ীর চিঠি, ১৯০৫ সালে। বিয়ের কথা এর আগে সরলা দেবী ভাবেননি। স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়ীতে থিয়সফির প্রভাব কালে কাশী থেকে এক মাতাজীর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁকে দেখে স্বর্ণকুমারী বলতেন, "সরলার বিয়ে দেব না, ঐ মাতাজীর মত দেশের কাজে উৎসর্গিত থাকবে।"[২৭৭] কিন্তু এখন স্বর্ণকুমারীর শরীর ভেঙ্গে গেছে— মতেরও পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর একান্ত ইচ্ছা সরলা বিয়ে করেন। স্বর্ণকুমারী দেবী তখন স্বাস্থ্যান্বেষণে বড় মেয়ে হিরণ্ময়ীর সঙ্গে ছিলেন বৈদ্যনাথে। হিরণ্ময়ী দেবী চিঠিতে বোনকে অনুরোধ জানালেন যে তিনি যেন মায়ের ইচ্ছায় বাধা না দেন। পাত্র হিসেবে হিরণ্ময়ী পছন্দ করেছিলেন পাঞ্জাবের বড় ঘরের ব্রাহ্মণ বিপত্নীক রামভুজ দত্ত চৌধুরীকে। হিরণ্ময়ী সরলাকে লিখলেন, তিনি যেন বিবাহের পাত্রকে না

দেখে গোড়া থেকেই আপত্তি না করেন। শেষে অনুনয় করে তিনি লিখলেন, "তুই একবারটি আয়, দেখ, তারপরে শেষ যা বলবার বলিস, একেবারে গোড়াতেই বেঁকে বসিসনে, মার বুকে মৃত্যুশেল হানিস নে।" সরলা দেবী দিদির অনুরোধে হিমালয়ের আশ্রম ছেড়ে বৈদ্যনাথে যাত্রা করলেন, পৌঁছে দেখলেন দিদি ষড়যন্ত্র করে বিয়ের সব বন্দোবস্ত পাকা করে রেখেছেন। ট্রেন থেকে নেমে প্রায় 'কনে' হয়ে পাল্কীতে উঠলেন সরলা দেবী। তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠানে বৈদ্যনাথে সবাই এসে মিলিত হলেন। রাঁচী থেকে এলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, বোলপুর থেকে এলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। মধুপুর থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র ও পুত্রবধূ কৃতীন্দ্রনাথ ও সুকেশী দেবীকে নিয়ে এলেন সৌদামিনী দেবী ও কলকাতা থেকে গেলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ও তাঁর স্বামী প্রমথ চৌধুরী (বিবাহ ১৮৯৯ সালে) সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইতিমধ্যে পরলোকগমন করেছেন (১৯০৫ সালের ১৯ জানুয়ারী)। স্বর্ণকুমারী দেবীর একমাত্র পুত্র জ্যোৎস্নানাথের কুচবিহার রাজপরিবারে বিবাহে (১৮৯৯ সালে) দেবেন্দ্রনাথ খুশী হন নি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদেশে ঠাকুরবাড়ীর কেউই এ অনুষ্ঠানে যে যোগ দেন নি সে তথ্য পাওয়া যায় শ্রীযুক্ত অমিয়ভূষণ বসুর নিকট। সরলা দেবী লিখেছেন, "দাদার কুচবিহার রাজগৃহে অসবর্ণ বিবাহে দাদামশায় মর্মাহত হয়েছিলেন সবাই জানে। আজ তিনি বেঁচে থাকলে আমার এ বিবাহ সম্বন্ধে কত উল্লসিত হতেন।" কারণ রামভুজ পাঞ্জাবের বড় ঘরের ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথের বাসনা ছিল সমস্ত ভারতের ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে বৈবাহিক সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে ঐক্য স্থাপিত হোক। যে আর্য সমাজের সঙ্গে আদিব্রাহ্মসমাজের যোগ স্থাপনের জন্য দেবেন্দ্রনাথ পৌত্র বলেন্দ্রনাথকে (১৮৭০—৯৯) পাঞ্জাবে পাঠিয়েছিলেন, সেই আর্যসমাজেরই একজন বড় নেতা রামভুজ এবং তিনি 'ন্যাশনাল পেট্রিয়ট'।[২৭৮] সরলার বিয়ে হল ১৯০৫ সালে। বিয়ের পর জানকীনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবী কলকাতায় কন্যার বিবাহ উপলক্ষে এক সান্ধ্যভোজে বন্ধু বান্ধবীদের আপ্যায়িত করলেন। তারপর সরলা দেবী স্বামীগৃহে গেলেন পাঞ্জাবে।

'ভারতী'র ভার তখন সরলা দেবীর হাতে। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের (১৯০৭ সালে) আষাঢ় মাসে-ও বৈশাখ সংখ্যা বেরলো না ভারতীর। সরলা দেবী কলকাতায় এলেন ছমাসের শিশুপুত্র দীপককে নিয়ে, 'ভারতী'র ভার কার হাতে দেবেন সেই ভাবনা নিয়ে। দীনেশ চন্দ্র সেন (১৮৬৬—১৯৩৯) সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে বললেন— সরলা দেবী লাহোর থেকে এসেছেন 'ভারতী'র ভার কোন তরুণ লেখকের হাতে দিয়ে তিনি ফিরে যেতে চান। সরলা দেবী জোর করে সৌরীন্দ্র মোহনকেই দায়িত্ব দিলেন। তারপর অর্থ, সামর্থ্য অনেক দিক দিয়েই সৌরীন্দ্রমোহনের পক্ষে 'ভারতী' চালানো সম্ভব হল না, তিনি স্বর্ণকুমারীকে ধরলেন দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। উত্তরে স্বর্ণকুমারী দেবী বললেন, " অনেক কাল হলো এ কাজ ছেড়েছি ... এখনকার পাঠক পাঠিকার মতিগতি জানি না ... তবু ভার নেবো ... কিন্তু তোমাকে লেগে থাকতে হবে। সৌরীন্দ্রমোহন এ প্রস্তাবে রাজী হলেন।[২৭৯] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী সবাই লেখা দিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের কতকগুলি ক্ষুদ্র নিবন্ধ— 'অরিসিংহ' (বৈশাখ), 'কি ও কেন' (কার্তিক), 'পরিচয়' (চৈত্র), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পালি থেকে অনুবাদ 'ধনিয়া সুত্ত' (শ্রাবণ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একজন বহিষ্কৃতের দৈনিকলিপি' (চৈত্র), 'আধুনিক জাপান' (ধারাবাহিকভাবে) রবীন্দ্রনাথের 'দুই ইচ্ছা' (ফাল্গুন), 'নান্দী' (কার্তিক) কবিতা, শরৎকুমারী চৌধুরাণীর 'শ্রীপঞ্চমী' (আষাঢ়), 'মেয়েযজ্ঞি' (ভাদ্র) নিবন্ধ, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কবিতা 'মিলনের আশা' (ভাদ্র) প্রভৃতি বার হল ১৩১৫ বঙ্গাব্দের 'ভারতী'তে। স্বর্ণকুমারী দেবী সাময়িক প্রসঙ্গ সম্পর্কে মত দিতেন— গুছিয়ে 'এডিটোরিয়াল' লিখতেন সৌরীন্দ্রমোহন।[২৮০]

স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য সাধনার মধ্যে একাত্ম হয়ে মিশে ছিল তাঁর স্বদেশচেতনা যে স্বদেশচেতনা উত্তরাধিকার সূত্রে তীব্রভাবে পেয়েছিলেন সরলা দেবী। দেশের শক্তি তরুণরা স্বদেশের উদ্ধারসাধনে যে হত্যাকার্যে, বোমা বিস্ফোরণে নিযুক্ত ছিল, সে আন্দোলনে স্বর্ণকুমারীর আন্তরিক সমর্থন ছিল না। তাঁর মতে "উত্তেজনার মুহূর্তে প্রাণদান অপেক্ষাকৃত সহজ বীরত্ব, কিন্তু আমৃত্যু কষ্টকর অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগই অধিকতর বীরত্বের পরিচায়ক।"[২৮১] ভারতবাসীর পক্ষে এই ব্রতই প্রশস্ত পথ। স্বদেশী গ্রহণ বিদেশী বর্জন নীতি প্রচার করে, দেশে ব্যাপকভাবে দেশভক্তি, জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার করে, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির মধ্যে দিয়ে এবং সর্বোপরি একতার মহাবল সঞ্চয় করেই বিনা রক্তপাতে ভারতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে। এইভাবেই স্বর্ণকুমারী তাঁর স্বদেশ চেতনাকে নিঃসঙ্কোচে দৃপ্তভাবে ব্যক্ত করে স্বদেশবাসীর কর্তব্য নির্দেশ করেছিলেন 'ভারতী' পত্রিকার "কর্তব্য কোন পথে" প্রবন্ধে (১৩১৫ বঙ্গাব্দ, পৌষ)। এই সংখ্যারই 'ভারতী'তে 'রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' আলোচনায়ও (শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত) এই অভিমতই দীপ্তকণ্ঠে তিনি প্রচার করেছিলেন। প্রিয়নাথ বসুর 'স্বদেশী সার্কাস' দেখে এসে "স্বদেশী সার্কাস" প্রবন্ধে (১৩১৫ বঙ্গাব্দ, মাঘ) এই সার্কাসকে অকুণ্ঠ সমর্থন ও উৎসাহ জানিয়ে স্বদেশীয়ানার বোধকেই তিনি তীব্র করতে চেয়েছেন। ইংরেজ সরকারেরও এদেশবাসীর সঙ্গে যথার্থ সহযোগিতা বা সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের অভাব দেখিয়ে স্বর্ণকুমারী স্পষ্ট ভাষায় আলোচনা করেছেন লর্ড কার্জনের শাসন থেকে উদ্ভূত অশান্তির।[২৮২]

আচারে ব্যবহারে বেশভূষায় হিন্দুয়ানা বজায় রাখলেও স্বর্ণকুমারী ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে মিশতেন। ইংরেজ মহিলাদের বিভিন্ন পার্টি, অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিতা হয়ে যেতেন তিনি। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতী'তে 'কল্প্যবেশ সম্মিলন' নামক রচনায় এমন একটি পার্টির কথা স্বর্ণকুমারী বলেছেন। নিমন্ত্রণকর্ত্রী ছিলেন লেডি জেঙ্কিন্স। পুরুষ ছাড়া নানাদেশের মহিলারা নানাবেশে সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দিবা, রাত্রি, বসন্ত ঋতু, শরৎ ঋতু, পৌরাণিক কোন দেবতা, ঐতিহাসিক ব্যক্তি ইত্যাদি নানারকম সাজে মহিলারা সম্মিলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। লেডি মিণ্টো, লেডি বেকার প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা সেখানে গিয়েছিলেন। লেডি জেঙ্কিন্স বিলেত যাওয়ার আগে এদেশীয় মেয়েদের আনন্দ দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিলেন এবং তিনি নিজে বারাণসী শাড়ী মণিমুক্তা অলঙ্কারে বাংলাদেশের মহারাণী সেজেছিলেন। তাঁর আতিথ্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যার 'ভারতী'তেও

এমন আর একটি অনুষ্ঠানের কথা লিখেছেন স্বর্ণকুমারী। সেটি হল চিফ জাষ্টিস জেঙ্কিন্সের পত্নী উক্ত লেডি জেঙ্কিন্সের প্রদত্ত গঙ্গার উপর 'রোডাস' জাহাজের জেনানা পার্টি। কড়া পর্দার মধ্যে উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নিমন্ত্রিতাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলারা, ভূপালের বেগম, হাতুয়ার মহারাণী প্রভৃতি মহিলারা ছিলেন। বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে মিশবার আগ্রহে ইংরেজ মহিলাদের বাংলা বলার প্রচেষ্টায় প্রীত হন লেখিকা। স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়ীতেও ইউরোপীয়ানদের অভ্যর্থনা করবার জন্য সুবিস্তৃত ড্রয়িংরুমে থাকত চেয়ার টেবিল, যেখানে বন্ধুদের তিনি আপ্যায়ন করতেন। প্রথমেই অতিথিদের সুন্দর জাপানী কাপে চা দেওয়া হত, তারপর কেক, স্যাণ্ডউইচ, ফ্রায়েড রাইস, বিস্কিট উইথ হটচিজ স্যালাড, ফ্রুট, ক্রিম, শরবৎ প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য আনা হত তাঁদের জন্য এবং স্বর্ণকুমারী নিজেই অতিথিদের খাবার দিয়ে যেতেন যতক্ষণ না তাঁরা বাধা দিতেন।[২৮৩]

১৯১১ সালে Greer Park-এ কংগ্রেসের অধিবেশনের পর ঐ মণ্ডপেই 'সোস্যাল কনফারেন্স' হয়। কনফারেন্সের সভাপতি হয়েছিলেন আশুতোষ চৌধুরী। সভায় সরলা দেবী বাংলায় বক্তৃতা করেন। সরোজিনী নাইডুও বক্তৃতা করেন। স্বর্ণকুমারী দেবী সভায় উপস্থিত ছিলেন। Indian Marriage Act-এর প্রথমেই যে declaration টি ছিল "I am neither a Hindu, a Mahomedan, nor a Christian" সেটি তুলে দেওয়ার পক্ষে সভায় একটি প্রস্তাব আনেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু। কিন্তু ঐ প্রস্তাবের বিপক্ষে অর্থাৎ declaration টি থাকার পক্ষে ভোট দেন স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী ও রামভুজ দত্তচৌধুরী। হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে বর্ধমান মহারাজার আপত্তি থাকায় গভর্ণমেন্ট এ বিল সমর্থন করে নি।[২৮৪]

১৯১২ সালে স্বর্ণকুমারী এলাহাবাদ যান। সেখানে খসরুবাগ ও অলোপীবাগের স্বর্ণচুড়া মন্দির, সুজানদ্বীপ প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানের বর্ণনা করেছেন তিনি, 'ভারতী' পত্রিকায়। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যার 'ভারতী'তে রয়েছে 'খসরুবাগ'-এর চিত্রবর্ণনা, ও 'ভাদ্র' সংখ্যায় রয়েছে 'প্রয়াগের কয়েকটি মন্দিরের' বর্ণনা। উক্ত বছরেই 'জ্যৈষ্ঠ' সংখ্যায় 'প্রয়াগের দুএকটি দৃশ্য' প্রবন্ধে সঙ্গমের ভাষাচিত্র অঙ্কন করেছেন লেখিকা। স্বর্ণকুমারী প্রয়াগে যমুনাবক্ষে বড়ুয়াঘাট থেকে নৌকায় গিয়েছিলেন সুজান দ্বীপ নামক পাহাড় দ্বীপে, এবং এই ভ্রমণকাহিনী তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন ১৩১৯ বঙ্গাব্দেরই শ্রাবণ সংখ্যায় 'সুজান দ্বীপ' নামক রচনায়। এরপর স্বর্ণকুমারী গিয়েছিলেন 'পুরী'তে এবং পুরী ভ্রমণ কাহিনীও তিনি লিখেছেন ১৩২০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী'তে। পুরী মন্দিরেব কারুকার্য দেখে তিনি বিস্মিত হন এবং চিরকাল ধরেও এর বর্ণনা করা যায় না বলেই তাঁর ধারণা জন্মায়। জগন্নাথের দারুময় মূর্তিতে তিনি শিল্পসৌন্দর্যের অভাব দেখলেন, "বস্তুতঃ এ মূর্তি নিরাকার ব্যঞ্জক,— তাই ভক্ত এই মূর্তিতেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রূপ দেখিয়া থাকেন। চৈতন্য এইরূপ দেখিয়াই পাগল হইয়াছিলেন।" অন্নছত্রের দৃশ্য দেখে তিনি আনন্দ পেলেন। আঠারনলা, চন্দন সরোবর কিছুই দেখতে তিনি বাদ দেন নি।

স্বর্ণকুমারী দেবী কাশিয়াবাগান থেকে এসে উঠেছিলেন ২৬ নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে—যেটা ছিল যদু মল্লিকের সম্পত্তি। সেখান থেকে তিনি ৩ নং সানি পার্কে নিজের বাড়ীতে উঠে এলেন। এবাড়ীতে আসতেন "ত্রিপুরার বড় ঠাকুর, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়, তারকনাথ পালিত প্রভৃতি কলকাতার যাবতীয় গুণীমানী ব্যক্তি।" আর যেতেন প্রায়ই স্বর্ণকুমারীর সেজদি শরৎকুমারীর কন্যা সুপ্রভার (স্বামী সুকুমার হালদার) পুত্র পরবর্তী কালের বিখ্যাত শিল্পী অসিত কুমার হালদার (১৮৯০—১৯৬৪)। এছাড়া আসতেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২—১৯২২), ঔপন্যাসিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭—১৯৩৮)। এসময়ে স্বর্ণকুমারীর বাড়ীতে প্রায়ই নানারকম অনুষ্ঠান হত। ছেলেমেয়েরা Fancy dress, Tableau প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠান করত। একবার ফ্যান্সি ড্রেসে হিরণ্ময়ী দেবীর ৪/৫ বছরের মেয়ে কল্যাণীকে অসিত হালদার সাজিয়েছিলেন মেটারলিঙ্কের 'ব্লু বার্ড'-এর শিশু তিতিল (Titil), সবাই তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।[২৮৫]

অসিত হালদার ছিলেন স্বর্ণকুমারীর বিশেষ স্নেহের পাত্র। ১৯১৮ সালের ১০ই অক্টোবর তাঁকে লেখা চিঠিতে স্বর্ণকুমারীর স্নেহপ্রবণ কৌতুকপরায়ণ স্বভাবটি প্রকাশিত হয়েছে :—

"স্নেহাস্পদেষু,

তবু মনে পড়েছে সেও ভাল,
আমার মনে জাগরূক রয়ে
সে কি ভোলা যায় কেমনে ভুলি!
আধেক নয়নে মুখ তুলে চাওয়া
ধীরে ধীরে এসে মনোকথা কওয়া
ছবিটি আঁকিতে প্রেমগান গাওয়া
মোহন আঙ্গুলে ধরিয়া তুলি,
হায়! সে ভুলেছে কেমনে ভুলি!
.. একবার এস দেখা দাও। বিরহে
যে প্রাণ অধীর হয়ে উঠেছে! ...
আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর।
তোমার নদিদি।"[২৮৬]

অসিত হালদারের বিবাহ উপলক্ষে স্বর্ণকুমারী 'পাকচক্র' প্রহসনটি (১৯১১) তাঁকে উৎসর্গ করেছিলেন। উপহার পত্রে তিনি লিখেছিলেন :—

"হাসিতে রচি দিলাম গাছি এই, কৌতুক নব ধাঁধা
তোরে যৌতুক উপহার।
তুমি, যতনে যত খুলিবে তত পড়িবে পাকে বাঁধা
প্রাণে ছুটিবে হর্ষাধার।"

স্বর্ণকুমারীর 'ফুলের মালা' উপন্যাসের (১৮৯৫) জন্য অসিত হালদার একটি ছবি এঁকেছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী ১৯১৪ সালে একটি চিঠিতে তাঁকে লিখেছিলেন "একখানি ছবি আমার খুব দরকার আছে— একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে চাই। শক্তিকে যে রকম বর্ণনা করেছি সেই রকম। Fatal Garland ('ফুলের মালা'র ইংরাজী অনুবাদ) বিলাতে ছাপতে পাঠাচ্ছি। একখানি ছবি পেলে ঠিক হোতো। তিনরঙা ছবি আছে— তাতে শক্তির মুখটি ভারি ভোঁতা হয়েছে— একেবারে অচল। একরঙা বেশ পরমাসুন্দরী একটি চেহারা কি আঁকতে পার? এ ছবিখানা পাঠাই। এইরকম দুজনার ছবি কিন্তু একরঙা হবে আর শক্তিকে অপূর্ব রূপসী বলে মনে হবে। যদি এঁকে পাঠাতে পার তো চেষ্টা করো ...।"[২৮৭] 'ভারতী'র ১৩১৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখে 'শক্তিময়ীর স্বপ্ন' নামে শক্তির একটি একার ছবি, ও শ্রাবণ সংখ্যায় 'রাজকুমার ও শক্তিময়ী' নামে আর একটি ছবি মুদ্রিত হয়েছে— দুটিই অসিত হালদারের অঙ্কিত। 'রাজকুমার ও শক্তিময়ী' চিত্রটির বিষয় হচ্ছে বহুদিন পরে নদী তীরে বাল্যসখা গণেশদেবের সঙ্গে শক্তিময়ীর সাক্ষাৎ হয়েছে "সূর্য অস্তে গিয়াছে, কিন্তু তখনো সন্ধ্যার ধূম্রবর্ণে পৃথিবী আচ্ছাদিত হয় নাই। পশ্চিম গগনে উজ্জ্বল লাল মেঘের স্তর জমিয়াছে— তাহার আভায় জলস্থল উজ্জ্বল লাল হইয়া উঠিয়া শক্তির মুখমণ্ডল অপূর্ব শোভিত করিয়া তুলিয়াছে।" অনুমান করা অসঙ্গত নয় অসিত হালদারের অঙ্কিত এই ছবি দুটিই উপরিউক্ত বিশেষ ছবি।

মায়ের 'সখি-সমিতি'তে নানাভাবে সাহায্য করতেন হিরণ্ময়ী দেবী। সখি-সমিতির নারীকল্যাণ কাজে তিনি ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবীর ডান হাত। ধীরে ধীরে সখি-সমিতির আয়ু শেষ হলে এটিকে পরিণত আকারে সঞ্জীবিত করলেন হিরণ্ময়ী দেবী ১৯০৬ সালে 'বিধবা শিল্পাশ্রমে'। সরলা দেবী লিখেছেন, "উপর্য্যুপরি অনেকগুলি সন্তানবিয়োগ হয় দিদির। তাঁর হৃদয় স্নেহদানের জন্য বুভুক্ষিত ছিল। তিনি সখি-সমিতির আশ্রিত কোন কোন অনাথ বালিকাকে নিজের কাছে রেখে পালনের জন্য উন্মুখ হলেন, তারাই তাঁকে 'মা' বলে। ঠিক নিজের মেয়ের মতো তাদের জন্য সব করেন তিনি। এই সময়ে বরানগরে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত বিধবাশ্রমের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। মায়ের প্রতিষ্ঠিত সখি-সমিতি যখন কালপ্রভাবে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল, তখন তাকে সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টায় দিদি তাকে নাম ও আকারের নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে চালিয়ে বর্তমান বিধবা শিল্পাশ্রমে পরিণত করলেন। এই শিল্পাশ্রমটি তাঁর একান্ত উদ্যম, বিপুল অধ্যবসায় অনেক দ্বন্দ্ব ও অনেক প্রীতি দিয়ে গড়া। তাঁর দেশসেবার অনুপ্রেরণা মাতৃভক্তি হতে এসেছিল, মাতার কীর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে সখি-সমিতিকে কালোপযোগী রূপান্তর দেওয়ার প্রচেষ্টায় বিধবা শিল্পাশ্রমের জন্ম।"[২৮৮] শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০—১৯২৪) ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী কর্মী। ১৮৬৫ সালে ১৯ মার্চ তিনি বরানগর নিবাসী মহিলাদের শিক্ষার জন্য দীননাথ নন্দীর দালানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই স্কুলের সঙ্গে বালিকাদের বাসের জন্য তিনি একটি বোর্ডিংও করেন, কিছুদিন পরে ১৮৮৭ সালে এই বোর্ডিং বরানগর বিধবাশ্রমে পরিণত হয়।[২৮৯] এঁরই কন্যা 'অন্তঃপুর' পত্রিকায় (১৮৯৮) প্রথম সম্পাদিকা বনলতা দেবী (১৮৭৯—১৯০০), অন্তঃপুরে আবদ্ধ বঙ্গমহিলাদের

হিতসাধনে ১৮৯২ সালে বরানগরে 'সুমতি সমিতি' স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮—৮৪) কন্যাদ্বয় সুনীতি দেবী (১৮৬৪—১৯৩২) ও সুচারু দেবী (১৮৭৪—১৯৫৯) হিরণ্ময়ীর বিধবা শিল্পাশ্রমের অধ্যক্ষ সভার সদস্যা ছিলেন এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর অধ্যক্ষতায় এটি পরিচালিত হত।[২৩০] আশ্রমের অধ্যক্ষ সভার নাম ছিল 'সখি-শিল্প সমিতি'। হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যুর (১৯২৫ সাল) পর বিধবাআশ্রমের নাম হল 'হিরণ্ময়ী বিধবা আশ্রম'। ১৯৩১ সালে স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর যাবতীয় বইয়ের স্বত্ব এই প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে যান।[২৩১]

স্বর্ণকুমারীর 'দেবকৌতুক' কাব্যনাট্য (১৯০৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) 'উর্বশী ও তুকারাম' নামে 'ভারতী'তে বার হয় ১৩১১ বঙ্গাব্দে বৈশাখ থেকে কার্তিক পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে, 'কনেবদল' প্রহসনটি 'ভারতী'তে বার হয় ১৩১২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে। তাঁর ছাত্রপাঠ্য বইগুলি 'গল্পস্বল্প' (১৮৮৯), 'সচিত্র বর্ণবোধ ১ম—২য় ভাগ' (১৯০২), 'বাল্যবিনোদ' (১৯০২), 'আদর্শ নীতি' (১৯০৪), 'প্রথম পাঠ্য ব্যাকরণ' (১৯১০) প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে আশ্বিন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে বার হল স্বর্ণকুমারীর 'রাজকন্যা' নাট্যোপন্যাস যেটি গ্রন্থাকারে বার হয় ১৯১৩ সালে। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর 'নিবেদিতা' নাটকটি (১৯১৭) উৎসর্গ করেছেন কেশবচন্দ্রের কন্যা কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবীকে। কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের হৃদ্যতা অনেকদিনের। হিন্দুকলেজে কেশবচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সহপাঠী, এবং সেই সূত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে পুত্রেব ন্যায় স্নেহ করতেন। ১৮৬২ সালের ১৩ই এপ্রিল নববর্ষের দিনে কেশবচন্দ্রকে দেবেন্দ্রনাথ কলকাতা ব্রাহ্মসমাজের 'আচার্য' পদে অভিষিক্ত করেন এবং তাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দেন। উক্ত দিবসে কেশবচন্দ্র পত্নী জগন্মোহিনী দেবীকে (১৮৪৭—৯৮) নিয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে যান ও তিন চারমাস সেখানে অতিবাহিত করেন। তখন থেকেই উভয় পরিবারের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। কেশবচন্দ্রের স্ত্রীর সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন, "কেশববাবুর স্ত্রীর ভারী একটি অমায়িক মধুর মুখশ্রী ছিল। আমি যদিও তখন মাত্র ছয় বৎসরের বালিকা তথাপি তাঁহার সেই রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। সর্বদাই তাঁহার কাছাকাছি থাকিতে আমার বড় ভাল লাগিত। তিনি দিদিদের সহিত গল্প করিতেন আমি চুপ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। প্রীতি আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিত। মাঝে মাঝে সুবিধা পাইলে তাঁহার হাত ধরিয়া আবোল তাবোল কত কি বকিয়া যাইতাম। ইহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেছেন কি না তাহা বুঝিবার শক্তি তখনো আমার জন্মায় নাই।" কেশব সেন তাঁদের ভাইবোনেদের গল্প বলতেন নানান রকম।[২৩২] সুনীতি দেবীকে উৎসর্গ করে 'নিবেদিতা' নাটকের উপহার পত্রে স্বর্ণকুমারী লিখেছেন,—

"হাসি অশ্রু দিয়ে গাঁথা এই মালাগাছি,
তোমারে পরাতে, হের— সখি, আনিয়াছি।
এ নহে রতন গুচ্ছ— হীরা মুক্তা রাশি—
— বচন রচন তুচ্ছ;— তবু ধর হাসি।"

প্রায় সমবয়সী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও সুনীতি দেবীর ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুনীতি, সুচারু রবীন্দ্রনাথকে বহুবার ভাইফোঁটা দিয়েছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে' উপন্যাসটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী হেমেন্দ্রনাথের কন্যা (সপ্তম সন্তান ও চতুর্থ কন্যা) শোভনা দেবী ১৯১০ সালে। শোভনা দেবীর বিয়ে হয় নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শোভনা দেবী ইংরেজীতে পাকা ছিলেন। সুনীতি দেবীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। বইয়ের ভূমিকায় লেখিকা বলেছেন এস. কে র‍্যাটক্লিফ বইটির ম্যানুসক্রিপ্ট কিছু সংশোধন করে দিয়েছেন। অনুবাদটি পড়ে খুশী হন সুনীতি দেবী এবং বইটির একটি সুন্দর ভূমিকা তিনি লিখে দেন। বইটির নাম হল 'To Whom'

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর বৃহৎ পরিবারে একটি দৃঢ় আসন করে নিয়েছিলেন জানকীনাথ ঘোষাল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে স্বর্ণকুমারীর প্রায় প্রতিটি ভাইবোনই জানকীনাথকে ভালবাসতেন, সমীহ করতেন। স্বর্ণকুমারীর ভাইবোনেদের যাঁরাই স্মৃতিকথা রেখে গেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই স্মৃতিচারণে কোন না কোন প্রসঙ্গে এসে গেছে এই উদার সহমর্মী ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষটির কথা। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রীকে লিখিত পত্রগুলির অধিকাংশতেই এই ভগ্নীপতিটি সম্পর্কে সস্নেহ মন্তব্য আছে। স্বর্ণকুমারীর নদাদা বীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রফুল্লময়ী দেবী তাঁর 'আমাদের কথা' নামক স্মৃতিকথায় (১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত) জানকীনাথের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। বিয়ের চার বছর পরে (১৮৬৮) বীরেন্দ্রনাথ যখন মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হন, সেই অসময়ে জানকীনাথ প্রফুল্লময়ীর ভায়ের মত কর্তব্য করেছেন। স্বর্ণকুমারীর নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি হাটখোলায় পাটের ব্যবসা করেছিলেন (আনুমানিক ১৮৮০/৮১)। দুজনেই পাটের আড়তের অংশীদার ছিলেন। প্রতিদিন দুজনে সকালে হাটখোলায় গিয়ে অফিস করতেন। কিন্তু পাটের বাজার খারাপ হয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাঁরা এ কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।[২২৩] ১৮৯১ সালে কংগ্রেসের প্রচার কাজের জন্য 'হিতবাদী' সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করা হয় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের (১৮৪৩—১৯৩২) সম্পাদনায়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সতেরোজনের মধ্যে জানকীনাথও 'হিতবাদী' প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোম্পানির অন্যতম অংশীদার ছিলেন।[২২৪] জানকীনাথ ১৯১৩ সালে ২রা মে দেহত্যাগ করলেন। স্বামীশোকে ভেঙ্গে পড়লেন স্বর্ণকুমারী। যে স্বামী স্বর্ণকুমারীর জীবনের সব উন্নতির মূল, যাঁর প্রচেষ্টায় তিনি এতখানি যশস্বিনী হয়েছেন, তাঁকে হারিয়ে শোকে মোহ্যমান হয়ে পড়লেন স্বর্ণকুমারী, শূন্য হয়ে গেল তাঁর জীবন। সরোজকুমারী দেবী এসময়ে তাঁকে চিঠি লিখলে তিনি প্রত্যুত্তরে লিখলেন ''তোমার চিঠিগুলি পড়ে চোখের জল আর থামতে চায় না। কতদিন মনে করেছি উত্তর দেব, পারিনি। সত্যি এমন স্বামী পাওয়া বহু পুণ্যের ফল; চিরদিন আমার সুখ কিসে হবে তাই দেখেছেন, মৃত্যুর সময়ও আমার কথা ভাবতে ভাবতেই গেছেন, ছেলেমেয়ে আর কাউকে চাননি। এমন স্বামীকে কি করে ভুলবো। তবুও তাঁকে ছেড়ে বেঁচে আছি,—আশ্চর্য বলেই মনে হয়।''[২২৫] জীবনের সব আনন্দ শেষ হয়ে গেছে বলে তখন তিনি মনে করতেন, আর আশা করতেন আবার পরজন্মে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবেন।[২২৬]

স্বীয় আড়ম্বরপূর্ণ বেশ, অলঙ্কার সব মেয়ে নাতনীদের দিয়ে তিনি রিক্ত হলেন। তখন তাঁর বেশ ছিল সাদা সিল্ক শাড়ী। অতি প্রত্যুষে উঠে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন স্বর্ণকুমারী— প্রত্যেককে সুখ ও জ্ঞান দেবার জন্য, অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে আলো দেওয়ার জন্য। তখন স্বর্ণকুমারী থাকতেন তাঁর সানি পার্কের বাড়ীতে। ঈশ্বর প্রার্থনার পর তিনি দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে একগ্লাস দুধ পান করে সকালের সাহিত্যচর্চার কাজে মন দিতেন। একদিকে লেখা, সমালোচনা, সম্পাদনা তার সঙ্গে অন্যের লেখা সংশোধন প্রভৃতি নানাবিধ কর্তব্য তিনি সুষ্ঠুভাবে পালন করতেন। বেলা এগারোটায় তিনি স্নান ও লঘু আহারের পর দৈনিক পত্রিকা বা গ্রন্থাদি পাঠে নিযুক্ত হতেন। বেলা চারটের সময় এককাপ দুধ পান করে বাড়ীর বাগানে বেড়াতেন তিনি, বা অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। স্বামীর মৃত্যুর আগে এ সময়ে কখনোও তিনি গাড়ী করে বেড়াতে যেতেন। রাত্রে আহারের পরই ছিল স্বর্ণকুমারীর বিশ্রামের সময়। এইভাবেই দৈনন্দিন কর্তব্য ও নিষ্ঠার মধ্যে কেটেছে তাঁর বাকী জীবন।[২২৭] স্বামী হারিয়ে অসহায় ক্লান্ত হয়ে স্বর্ণকুমারী 'ভারতী'র দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। হিন্দু বৈধব্যের কঠোর নিয়ম না মানলেও এসময় থেকেই তিনি বহির্জগৎ থেকে নিজেকে সঙ্কুচিত করে নেন।

সাহিত্যচর্চায় ও নানাবিধ কাজে স্বর্ণকুমারী জীবনের শেষ দিকে বিশেষ সাহায্য পেয়েছেন তাঁর 'বিহঙ্গিনী' সখি শরৎকুমারী দেবী চৌধুরাণীর কন্যা উমারাণীর কাছে। উমার জন্মের সময় শরৎকুমারীর বয়স বাইশ বছর। এর আগে সতেরো বছর বয়সে শরৎকুমারীর একটি মেয়ে হয় ও তার আট মাস বয়সেই মারা যায়। রাঁচী থেকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী উমার (১৮৮৩, ৭ই নভেম্বর—১৯৪৫, ১৭ই সেপ্টেম্বর) নামকরণ করেন। পাঁচ বছর বয়সেই উমাকে শরৎকুমারী লরেটোতে ভর্তি ক'রে দেন। চন্দ্রমাধব ঘোষের নাতনী বীণা ছিল উমার সহপাঠিনী। উমারাণী চমৎকার ইংরেজী বলতে পারতেন এবং ইংরেজী ও বাংলা দুই-ই সুন্দরভাবে লিখতেন। কিন্তু তার 'ইঙ্গবঙ্গ' ভাব একেবারে ছিল না, বরঞ্চ তিনি শান্ত, মৃদু ধীর স্বভাবের ছিলেন। উমার বিয়ে হয় পনেরো বছর বয়সে ১৮৮৯ সালে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে। বিয়ের পর স্বামীর কার্যোপলক্ষে তিনি আট বছর ত্রিপুরা ছিলেন। কন্যাসমা উমার সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, যার জন্য মনের অনেক গোপন কথাই তিনি তাঁকে বলতেন। স্বর্ণকুমারী প্রায় তাঁর সব লেখাই উমাকে দেখাতেন আবার অনেক বিষয়ে উমাকে লিখতে বলতেন। যে কোন লেখা অনেকবার সংস্কার বা সংশোধন না ক'রে স্বর্ণকুমারীর মন উঠত না। তাঁর অনুবাদ চিঠিপত্র, সব কারেসপণ্ডেন্স, পাবলিকেশন ইত্যাদি সমস্ত লেখাই একবার উমাকে দিয়ে মনের মত ক'রে সাজিয়ে নিতেন। সপ্তাহে দুদিন ক'রে উমারাণী স্বর্ণকুমারীর সানি পার্কের বাড়ী যেতেন। উমারাণী প্রথমে থাকতেন ঝাউতলা রোডে। ৫৪/১ হাজরা রোডে থাকাকালে যখন উমার একবার খুব শরীর অসুস্থ হয় তখন স্বর্ণকুমারী তাঁর কাছে আসতেন প্রত্যেক মঙ্গলবার। স্বর্ণকুমারীর সময় জ্ঞান ছিল খুব। ঠিক ছটায় জলযোগ করতেন, ড্রাইভার সঙ্গে ক'রে খাবার নিয়ে আসত। একাধারে লেখা, লেখা ছাপানো, পাবলিশারদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা, হিসেবপত্র দেখা— বাড়ীর মালিকানার সব দায়িত্ব, ভাড়া আদায় মামলা ইত্যাদি সব কাজ স্বর্ণকুমারী

নিজে করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর ওল্ড বালিগঞ্জের একটা বাড়ীতে মশাররফ হোসেন ভাড়া থাকতেন। সব বিষয় তাঁর ফাইলের মধ্যে সুন্দর ব্যবস্থা করা থাকত। তাঁর চিঠি ড্রাফট করে দিতেন উমা দেবী। অনুবাদেও অনেক সাহায্য করেছেন তিনি। ১৯২৭—৩৭ সালে উমারাণী হিরণ্ময়ীর বিধবাশ্রমের সেক্রেটারী ছিলেন। স্বর্ণকুমারীর প্রায় সমস্ত লেখাতেই উমার সাহায্য থাকলেও ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর বিদ্যাবুদ্ধির উপর তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, তাই তাঁর সাহায্যও বহুক্ষেত্রে নিয়েছেন।[২৯৮]

১৯০৮ সালে একবার 'ভারতী'র দায়িত্ব নিয়েছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন, ঐ বছরের জানুয়ারী মাসে তিনি বার করেছিলেন ১৩১৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী'। তারপরে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে 'ভারতী'র দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন স্বর্ণকুমারী। কিন্তু স্বামীকে হারিয়ে মনের এমন কাতর অবস্থায় তাঁর পক্ষে পত্রিকা সম্পাদনা কঠিন হয়ে পড়লো। মাসিক পত্রিকা চালানোয় ব্যবসাদারী বুদ্ধিরও কিছু দরকার। সৌরীন্দ্রমোহনের পত্রিকাসম্পাদনের কাজে হাতেখড়ি হয়েছিল স্বর্ণকুমারী ও তাঁর আত্মজা সরলা দেবীর কাছে। ১৩২১ বঙ্গাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী'র ভার ছাড়লে, নবীনরা সে দায়িত্ব তুলে নিলেন হাতে। এই নবীনরা হলেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮—১৯২৯)। মণিলাল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১—১৯৫১) দ্বিতীয়াকন্যা করুণাময়ী দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। ১৯০৭ সালে বিবাহের পর তিনি সিমলা পাহাড়ের সরকারী চাকরী ছেড়ে কলকাতায় আসেন এবং ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে অবনীন্দ্রনাথের গৃহেই তখন থেকে তিনি রইলেন। সিমলা পাহাড়ে তাঁর দাদা রায়বাহাদুর মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে কাছে রেখে সরকারী কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। কলকাতায় আসার থেকেই তিনি সরলা দেবীর পত্রিকা সম্পাদনায় নানাভাবে সহযোগিতা করতেন। নাট্যকার অমৃতলাল বসু (১৮৫৩—১৯২৯), ক্ষীরোপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৩—১৯২৭) লেখা 'ভারতী'র জন্য তিনিই নিয়ে এসেছিলেন।[২৯৯] এ লেখাগুলি হল ১৩১২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'নববর্ষ' কবিতা এবং জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ—- মাঘ সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'ঘরের কথা' শীর্ষক অমৃতলালের দুটি লেখা এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নির্বাসিত' গল্প (আশ্বিন. ১৩১২) ও 'শিরীফরীদ' নাটক (বৈশাখ-ফাল্গুন, ১৩১৩)। বাঙালী ছেলেদের কাপুরুষতা দূর করে দেশের তরুণ শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সরলা দেবী যে ব্যায়াম সমিতি স্থাপন করেন এবং তরুণদের নিয়ে 'বীরাষ্টমী' ব্রত করতেন তার একজন সদস্য ছিলেন মণিলাল। লাঠি ও তলোয়ার খেলায় তাঁর খ্যাতি ছিল।[৩০০] ১৩২২—৩০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত নয় বছর সুদক্ষ নৈপুণ্যের সঙ্গে এই দুই নবীন সম্পাদক 'ভারতী'র কাজ চালালেন। বিদায় কালে মণিলালকে আশীর্বাদ করে স্বর্ণকুমারী লিখলেন (১৩২২ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ) "পুরাতনের প্রধান ধর্ম নতুনকে অনুগামী করা অর্থাৎ পথ দেখান, অন্য কথায় নতুনকে গঠিত করিয়া তোলা। ইহাতে যে সফলতা লাভ করে, তাহার জীবনই সার্থক। আমার বহুদিনব্যাপী সাহিত্যসেবায় যদি এই উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সার্থক হইয়া থাকে. তবেই আমি ধন্য, কিন্তু বিচারের ভারও নতুনেব হস্তে।...

সুরুচিসুশীল সাহিত্যের মধ্য দিয়া জ্ঞানের ক্ষেত্র ও মনের প্রসার বৃদ্ধি করাই ভারতীর প্রধানতম কর্তব্য ছিল, আর আনুষঙ্গিক একটি কর্তব্য ছিল, নতুন লেখকদিগকে গড়িয়া তোলা। ... যখন এই সম্পাদনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম তখন ফলাফল লাভক্ষতি গণনা করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হই নাই। কর্মের আনন্দই কর্মে উত্তেজিত উৎসাহিত করিয়াছিল। আজ সে উৎসাহ উত্তেজনার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। আজ আমি বড়ই একাকী, বড় অসহায়, আজ শ্রান্ত ক্লান্ত দেহমন একান্তই নিবৃত্তিলোলুপ। ... বিদায়ের দিনে আজ আমার নয়ন যদিও অশ্রুপূর্ণ, কিন্তু হৃদয় নিষ্কাম নিশ্চিন্ত প্রফুল্ল। সযত্নপালিতা ভারতীকে নবীনের উৎসাহযুক্ত, কার্যক্ষম বলশালী হস্তে সমর্পণপূর্বক আজ আমি মাতার ন্যায়ই কৃতার্থ। ... নবীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় আমার স্নেহভাজন আত্মীয়, তাঁহার প্রতি আশীর্বাদ এই, বিধাতা একার্যে তাঁহাকে কৃতকার্য ও জয়যুক্ত করুন।" এই সংখ্যাতেই 'আমার কথা' নামক সম্পাদকীয় নিবন্ধে মণিলাল স্বর্ণকুমারীর প্রতি অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন, "যখনি তাঁর কাছে গিয়াছি, দেখিয়াছি পূজারিণীর মতো তিনি ভারতীর পুষ্পপাত্র সাজাইতেছেন। ... তিনি বাংলা দেশের নারীজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং বিশ্ব-নারীসভায় বাঙালী নারীকে বরেণ্য করিয়া তাঁহাদের গৌরব-আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।"

সরলা দেবী এসময়ে পাঞ্জাবে। স্বামীর সঙ্গে তিনি সেখানে জাতীয় আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন এবং সমগ্র ভারত জুড়ে এক নব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র তখন সমস্ত বোম্বাই প্রদেশ ও উত্তর ভারতে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। ১৯১০ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে সরলা দেবীর উদ্যোগে এক নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন হয়। সেখানে সভানেত্রীত্ব করলেন জাজিরার মহারাণী। অধিবেশনে সরলা দেবী 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' নামক একটি নারীকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন, এবং তাঁর স্বচেষ্টায় লাহোরে এই প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা স্থাপন করলেন। ক্রমে অমৃতসর, দিল্লী, করাচী, কানপুর, মেদিনীপুর, কলকাতা প্রভৃতি নানাস্থানে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের শাখা সমিতি স্থাপিত হল। ১৯১৯ সালে লাহোরে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সরলার পরিচয় হল, সে সময়ে গান্ধী তাঁর বাড়ীতে অতিথিরূপে ছিলেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে তিনি যোগ দিলেন। বাঙালী যুবকদলের সৈন্যদলে ভর্তির জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন (১৯১৭ সালে)।[৩০১]

স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যসাধনা তখনও অনলস, বিরামহীন। বাণীসেবায় তাঁর কখনও ক্লান্তি ছিল না। কত সময়ে প্রেসের সামনে গাড়ীতে বসে তিনি প্রুফ সংশোধন করে দিতেন। স্বর্ণকুমারীর ড্রাইভার ছিল সোহন, এবং অনুগত ভৃত্য ছিল বিহ্বল। তাঁর একটি পুরণো আয়া ছিল, নাম 'দর্জিনী'। তাঁর যুগান্ত কাব্যনাট্য' বার হল ১৯১৮ সালে, 'বিচিত্রা' উপন্যাস ১৯২০ সালে, 'স্বপ্নবাণী' উপন্যাস ১৯২১ সালে, 'মিলনরাত্রি' উপন্যাস ১৯২৫ সালে, 'দিব্যকমল' নাটক ১৯৩০ সালে বার হয়। মন্মথনাথ ঘোষকে (১৮৮৪—১৯৫৮) লেখিকা তাঁর একখানি 'মিলন রাত্রি' উপন্যাস উপহার দেন। মন্মথ নাথ ঘোষ উপন্যাসটি পড়ে বিস্মিত হয়েছিলেন, "এই প্রবীণা উপন্যাস রচয়িত্রী কিরূপে আধুনিক রাজনীতিক সমস্যা ও তরুণ বাঙ্গালীর আশা

আকাঙক্ষার অভিব্যক্তি নিপুণতা সহকারে উপন্যাসখানির মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।"[৩০২]
স্বর্ণকুমারীর 'ফুলের মালা' উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ হয় ১৯১০ সালে 'The Fatal Garland' নামে এবং 'কাহাকে'র অনুবাদ হয় ১৯১৩ সালে An Unfinished Song নামে। 'রাজকন্যা' নাট্যোপন্যাসের Princess Kalyani নামে ইংরেজীতে অনুবাদ হয় মাদ্রাজ থেকে ১৯৩০ সালে, এবং জার্মাণ ভাষায় অনূদিত হয় 'Kalyani' নামে ১৯২৭ সালে।

স্বর্ণকুমারী ছিলেন প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ও অত্যন্ত methodical। তাঁর উপন্যাসগুলির অনুবাদকাজে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী, ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুত্র জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল প্রভৃতি অনেকের কাছেই সাহায্য নিতেন। উমারাণীর কন্যা, শিল্পী অতুল বসুর স্ত্রী শ্রীমতী দেবযানী বসু স্বর্ণকুমারীর সানিপার্কের বাড়ীতে দেখেছেন, স্বর্ণকুমারী ঘরে ব'সে অনুবাদ করছেন আর জ্যোৎস্নানাথকে জিজ্ঞাসা করছেন— জ্যোৎস্নানাথ বারান্দায় পায়চারী করতে করতে সাহায্য করছেন মাকে।

১৯১৫ সালে স্বর্ণকুমারী 'বেঙ্গলী' জাহাজের নামকরণের অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রিন্সেপ ঘাটে ৮ই মে তারিখে অনুষ্ঠানটি হয়। স্বর্ণকুমারী এই অনুষ্ঠান দৃশ্যের কথা লিখেছেন: "সভাদৃশ্য— সে সুগম্ভীর সুমোহন। বৃহদাকার সুগোল সুদৃশ্য স্তম্ভাবলী-শোভিত চন্দ্রাতপশীর্ষ, সুসজ্জিত প্রিন্সেপ ঘাট মণ্ডপে সপারিষদ গভর্ণর সাহেবের স্থান, তৎপার্শ্বে সামিয়ানার নিম্নে দর্শকমণ্ডলী সমাসীন, স্ত্রী-পুরুষের স্থান পৃথক। তাঁহাদের পার্শ্বে উন্মুক্ত ময়দানে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান খাকি-পোষাকধারী স্বেচ্ছাসেবক বাঙ্গালী যুবকবৃন্দ। ইহারাই আহত সৈনিকদিগের সেবার জন্য বেঙ্গলী জাহাজে আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবে। বেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চেহারারও কি আশ্চর্য পরিবর্তন! বাঙ্গালী বলিয়া আর চেনাই যায় না, অন্ততঃ আমি ত চিনিতে পারি নাই।"[৩০৩] এদের মধ্যে অফিসের ক্লার্ক, প্লীডার নানারকম ব্যক্তি ছিলেন, স্বদেশ পরিবার ছেড়ে যাঁরা আত্মদানে প্রবাসে চলেছেন। এদের দেখে লেখিকার চক্ষু হয়ে উঠল অশ্রু সজল। "কিন্তু সে আনন্দ হিল্লোলের মধ্যে অশ্রুর স্থান নাহি আজ, নয়নের জল নয়নেই লীন হইয়া পড়িল।" মানবদরদী দেশ[?]মিক স্বর্ণকুমারীর হৃদয়ের গভীর সহমর্মিতাই এখানে পরিস্ফুট। গভর্ণর সাহেব জাহাজ [?]খে চলে যাবার পর লেখিকারা জাহাজ দেখতে গেলেন— দেখলেন জাহাজের নামকরণ সর্বতোভাবে সার্থক। জাহাজের ডাক্তার, স্বেচ্ছাসেবক, খালাসীরা সব বাঙ্গালী। কাপ্তেন ইংরাজ হলেও বাঙ্গালীর বেতনভোগী। জাহাজের ইলেকট্রিক কারখানাও বাঙালী কৃত এবং জাহাজের সমস্ত খরচ বাঙালী প্রদত্ত। এই জাহাজটির উদ্যোগের সর্বময় কর্তা সুরেশচন্দ্র সর্বাধিকারী প্রমুখ বাঙ্গালী দল। বাঙ্গালীর এই গৌরবে স্বর্ণকুমারী যথার্থ আনন্দ অনুভব করলেন। কয়েকটি বাঙ্গালী ছেলের সহায়তায় সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে ক্যাবিনে গিয়ে তাঁরা [?]লেন, হঠাৎ কাঁচ ভাঙ্গার ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ শুনলেন। পাশের ক্যাবিনে দুজন ইংরাজ চা পান করছিলেন, তাঁদের পেয়ালা পড়ে টুকরো হয়ে গেছে। স্বর্ণকুমারীর নারীহৃদয় শঙ্কিত হয়ে উঠলো: "শুনিয়াছিলাম, কাচভাঙ্গা কুলক্ষণ, হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম।" তারপর

২৩ মে-র সংবাদপত্রে তাঁরা দেখলেন 'বেঙ্গলী' জাহাজ ডুবে গেছে যদিও মানুষ কেউ প্রাণ হারায় নি। ঐ একই বছরে চৈত্র মাসে মেরী কার্পেণ্টার হলে গান্ধী পত্নী কস্তুরাবাই দেবীর সম্বর্ধনা উদ্দেশ্যে এক সভা হয়। সভায় কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের ইংরাজী অভিভাষণের পর স্বর্ণকুমারী দেবী অভিনন্দন পাঠ করেন। সেই অভিনন্দন বাণীটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে। গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে (১৮৬৬—১৯১৫) বলেছিলেন "বঙ্গদেশ ধন্য। কেন না, জগদীশ বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" সে উক্তির উল্লেখ করে স্বর্ণকুমারী বললেন, "মহারাষ্ট্র ধন্য, কেন না গান্ধী, গোখলে, রাণাডে প্রভৃতি মহাত্মাগণের জন্মভূমি মহারাষ্ট্র দেশ। ইঁহারা আত্মোৎসর্গের মহিমায় সমগ্র ভারতভূমিকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। যেদিন দেখিব, বঙ্গবালকগণ, বঙ্গযুবকগণ হত্যামন্ত্র ভুলিয়া, অত্যাচারব্রত ত্যাগ করিয়া গান্ধীর আদর্শে নির্ভীকভাবে সহিষ্ণু ধর্মব্রত অবলম্বন করিয়াছে, সেইদিন বুঝিব, বঙ্গদেশের কল্যাণদ্বার সত্যই আমাদের নিকট উন্মুক্ত।"[৩০৪] মানবতাবাদী গান্ধীনীতির সমর্থক স্বর্ণকুমারী দৃপ্ত ঋজু কণ্ঠে তাঁর অহিংসা, সহিষ্ণুতার মতবাদ প্রচার করলেন।

তারপরে স্বর্ণকুমারীর জীবনে আবার এল বিয়োগব্যথা। তাঁর একান্ত প্রিয় মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা গেলেন কলকাতায় ১৯২৩ সালের ৯ই জানুয়ারী। 'সাহিত্য স্রোতে'র 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর' নিবন্ধে মেজদাদার মৃত্যুতে শোকনৈবেদ্য নিবেদন করতে গিয়ে স্বর্ণকুমারী মেজদাদাব সঙ্গে তাঁর গভীর ভালবাসার সম্পর্কটি বাঙ্ময় করে তুলতে চেষ্টা করেছেন: "শিশুজীবনে স্মৃতির কাণ্ডকারাখানা ভারী অদ্ভুত। বড় বড় ঘটনা মনের ত্রিসীমার পারে একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়ে— আর সামান্য কাহারো একটি কথা মনে অকস্মাৎ এমন শিকড় গাড়িয়া বসে যে তাহা আজীবন ভোলা যায় না। মেজদাদা যখন বিলাত যান তখন আমি নিতান্ত ছোট, তবু তাঁহার বিদায় যাত্রাকালের কষ্ট আমার মন হইতে এখনো নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই। ইহার দুইবৎসর পরে একদিন ভোরবেলা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যেন আমি রঙীন আকাশের নীচে উড়িয়া বেড়াইতেছি (আগের দিন একটি পরীরাণীর গল্প পড়িয়াছিলাম), উড়িতে উড়িতে মনে হইতেছে যে, বাঃ এতো বেশ সহজ ব্যাপার,— সকলে কেন এমন উড়িতে পারে না। এমন সময় মামীমা ডাকিয়া বলিলেন— "ওঠ, ওঠ, সতুবাবু এসেছেন"— জাগিয়াই তাঁহাকে দেখিতে ছুটিলাম,— সত্যইত! আমার মেজদাদা আসিয়াছেন! উঃ! সে কি আনন্দ! কি উল্লাস!

আরো দূরাতীতের একটি কথা বলি— বিলাত যাইবারও কিছু পূর্বে মেজদাদা একদিন আমাকে গাড়ী করিয়া তাঁহার সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন। জাহাজগুলোকে এমন প্রকাণ্ড দৈত্যাকার বলিয়া মনে হইয়াছিল যে সেদিনকার সেই ভয় বিস্ময়ের ছাপ— আলোকচিত্রে অস্পষ্ট ছায়াপাতের ন্যায় এখনো অস্ফুট আকারে মাঝে মাঝে আমার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে। তাহার পর বড় হইয়া তাঁহার প্রসাদে কত নব নব দেশ, কত পুণ্য তীর্থ, কত সুরম্য মন্দির, কত পাহাড়, পর্বত, নদ, নদী দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছি! কত জাতি বিজাতির সহিত আলাপ করিয়া জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করিয়াছি! বিশ্বের মহাভাবের মধ্যে প্রবেশ

করিয়া হৃদয় প্রাণের সম্প্রসারণে কৃতার্থ ধন্য হইয়াছি।"[৩০৫] একই বছরে ৬ই আগষ্ট মুসৌরীতে মারা গেলেন তাঁর কনিষ্ঠ জামাতা সরলা দেবীর স্বামী রামভুজ দত্তচৌধুরী। স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য সঙ্গিনী ও ঘনিষ্ঠ বান্ধবী অক্ষয় চৌধুরীর (১৮৫০—৯৮) পত্নী শরৎকুমারী চৌধুরাণীর মৃত্যু হয়েছে এর আগে ১৯২০ সালের ১১ই এপ্রিল, এবং ঐ বছরেই ২১এ নভেম্বর জীবনাবসান হয়েছে স্বর্ণকুমারীর ভক্ত ভ্রাতা কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন দেহত্যাগ করলেন, তাঁদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন থাকতেন শান্তিনিকেতনে, এবং সেখানেই স্বর্ণকুমারী বড়দাদাকে ভাইফোঁটা পাঠাতেন। মেজদাদার মৃত্যুর বছরেও (১৯২৩) কার্তিক মাসে বড়দাদাকে ভাইফোঁটা পাঠালেন স্বর্ণকুমারী। শান্তিনিকেতন থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ তার স্নেহমাখা উত্তর পাঠালেন। তিনি লিখলেন (১৩৩০ বঙ্গাব্দের ২৬ কার্তিক):

"স্নেহের বোনটি আমার— আমার হাতে এখনো কতকগুলি করণীয় কার্য অবশিষ্ট আছে। সেইগুলি শীঘ্র শীঘ্র চুকাইয়া ফেলিতে আমি নিতান্তই আগ্রহান্বিত। যমের দুয়ারে কাঁটা দিবার এক্ষণে তুমি বই আর আমার কেহই নাই; সুতরাং তোমার এবারকার ভাইফোঁটা ঠিক আমার সময়োপযোগী, আর সেইজন্য তাহা আমি অতিশয় যত্ন সমাদরের সহিত ললাটে বরণ করিলাম। ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করিয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্যে রাখুন ইহাই আমার আন্তরিক আশীর্বাদ। দিব্যধামস্থিত আমাদের প্রাণের ভাই সতুর (সত্যেন্দ্রনাথের) বিরচিত একটি ব্রহ্ম সঙ্গীত এক্ষণে আমার জপমালা হইয়াছে। সে গীতটি এই :— কেহ নাই আর আমার— সব তুমি। লয়েছি শরণ তব চরণে দীননাথ। যদি পাই তোমার ছায়া নাহি ডরি করাল কালে।

হায়! বিষ্ণু (বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী ১৮১৯—১৯০০) নাই— কে এটা গাইয়া আমাকে শুনাইবে।

তোমার নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষী বড়দাদা।"[৩০৬]

স্বর্ণকুমারীকে বসিয়ে মাঝে মাঝে ছবি আঁকতেন বড়দাদা।[৩০৭] দ্বিজেন্দ্রনাথের ভগ্নীদের মধ্যে তখন একমাত্র স্বর্ণকুমারী ও বর্ণকুমারীই জীবিত। মেজবোন সুকুমারীর মৃত্যু হয়েছে বহুদিন (১৮৬৪ সালে), বড় বোন সৌদামিনী ও সেজবোন শরৎকুমারীর দেহান্ত হয়েছে একই বছরে (১৯২০ সালে)। সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠা বোন বর্ণকুমারী ছিলেন ভাইবোনেদের মধ্যে দীর্ঘজীবী (১৮৫৮—১৯৪৮)। স্বর্ণকুমারীর নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন বাস করছিলেন রাঁচীর মোরাবাদী পাহাড়ের "শান্তিধামে", যেখানে জীবনের শেষ সতেরো বছর তিনি কাটিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবিত থাকাকালে প্রায়ই এই 'শান্তিধামে' গিয়ে বাস করতেন। ১৯১০—২১ সাল পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ রাঁচীতেই কাটান। তাঁরা জীবিত থাকাকালে স্বর্ণকুমারী কিছুদিন এখানে কাটান। 'সাহিত্য স্রোতে' স্বর্ণকুমারীর সে স্মৃতিকথা রয়েছে : "কি আদর যত্নে, কি আনন্দ উৎসবে দিনগুলি অতিবাহিত হইত, তাহা এখন যেন স্বপ্নের মত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা উভয়েই (সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) প্রত্যহ প্রাতে শাঁখ ঘন্টা কাঁসর ধ্বনির আহ্বানে, যে কুসুমগাছ তলায় উপাসনা করিতেন, সেই বাঁধানো বেদীতলে বসিয়া আমিও তাঁহাদের সহিত উপাসনায় যোগদান করিতাম। মনে হইত যেন সেই পুরাকালের যোগী ঋষির তপোবনে বসিয়াই ঈশ্বর-আরাধনায় রত হইয়াছি।"[৩০৮] ঐ একই বছরে (১৯২৩ সাল) স্বর্ণকুমারীকে

লেখা নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরও একটি চিঠি পাওয়া যায় যাতে জীবনের শেষভাগে আত্মীয়বন্ধুদের বিয়োগ ব্যথায় বেদনাকাতর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ হয়েছে। তিনি লিখেছেন ১৯২৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর। চিঠিটি হল : "ভাই স্বর্ণ,— তোমার আন্তরিক শুভকামনা পেয়ে খুব তৃপ্তি লাভ করলুম। মেজদাদা গেলেন. দিদি (সৌদামিনী) গেলেন, শরৎ (শরৎকুমারী) গেলেন, একে একে সবাই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, আমার পুরাতন বন্ধুবান্ধব আর একজনও নেই। এইবার আমার পালা। বোনের মধ্যে তুমি আর বর্ণ— তোমরা দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে থাক, এই আমার একান্ত বাসনা। যতই দিন যাচ্ছে, যতই সংসারে শোকতাপ পাওয়া যাচ্ছে, ততই স্নেহ ভালবাসার লোকদের আঁকড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছে করে। বোনদের স্নেহ ভালবাসার মর্যাদা এখন আরও বুঝতে পারছি। এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা কেউ দিতে পারবে না। তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে থাক, ভগবানের কাছে আমার এই প্রার্থনা। স্নেহের নতুনদাদা।"[৩০২]

স্বর্ণকুমারী ও গিরীন্দ্রমোহিনীর বহুদিনের বাসনা ছিল মজিলপুরে গিরীন্দ্রমোহিনীর মামা ও ভায়ের বাড়ী যাবেন। যৌবনে যে সাধ মেটেনি, সে সাধ মেটানোর সুযোগ এতদিনে পাওয়া গেল। ১৯২৪ সালে মজিলপুরের বালিকাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মেয়েদের পুরস্কার বিতরণের জন্য স্বর্ণকুমারীকে অনুরোধ করলেন, তিনিও সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। স্বর্ণকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী দুজনেই তখন ভগ্নস্বাস্থ্য— তবু মনের জোরে মোটরে যাত্রা করলেন ১৭ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৩১ বঙ্গাব্দ)। ১৭, ১৮ই দুদিন সেখানে থেকে তৃতীয়দিনে কলকাতায় এলেন তাঁরা। গিরীন্দ্রমোহিনীর আত্মীয়স্বজনের সমাদরে মুগ্ধ হয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী। তিনি লিখেছেন : "এই স্বল্প সময় সখি গিরীন্দ্রমোহিনীকে আমি যেরূপ প্রাণ ভরিয়া পাইয়াছিলাম পূর্বে সেরূপ সুযোগ আর কখনও ঘটে নাই। আহারে বিহারে শয়নে ভ্রমণে আমরা সাথী ছিলাম। অল্পক্ষণের নিমিত্ত-ও তিনি আমার চোখের আড়াল হইলে তৃষিত চিত্তে আমি তাঁহার পথ চাহিয়া থাকিতাম। কাছে আসিলে তখন কি পরিতৃপ্তি।" গিরীন্দ্রমোহিনীর পিতৃগৃহের বিরাট প্রাসাদ দেখে স্বর্ণকুমারী বিস্মিত বিমুগ্ধ হলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন ঐ অঞ্চলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, উক্ত গৃহে তিনি থাকতেন এবং ঐ প্রাসাদের আদর্শেই তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের প্রাসাদের পরিকল্পনা মনে আসে। প্রাসাদেরই একটি দালানে মজিলপুরের বালিকাবিদ্যালয, যে বিদ্যালয়ে বাল্যে গিরীন্দ্রমোহিনীও পড়েছেন। পুরস্কাব বিতরণ অনুষ্ঠানে সহস্র লোকের মাঝেও গিরীন্দ্রমোহিনী স্বর্ণকুমারীর পাশে উচ্চমঞ্চের উপর উপবিষ্ট হলেন। লেখিকারা প্রত্যূষে গিয়ে পৌঁছেছিলেন মজিলপুরে। তাঁদের মোটর চলেছিল উন্মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়ে— ঊষার সুবর্ণ দৃশ্যে আকাশ যখন সুরঞ্জিত। কোথাও অনেক দূর বৃক্ষের ছায়াপথ, কোথাও আঁকাবাঁকা মেঠোরাস্তা, কোথাও জলাভূমি কুঁড়েঘর, কোথাও কিছুদূরে গাছপালার ছাউনিতলে আটদশটি বসতিতে এক একটি কৃষাণ গ্রাম— প্রকৃতির এই দৃশ্য দেখতে দেখতে গিরীন্দ্রমোহিনী বলেছিলেন, "আমার অন্তিম শয্যা যেন এইরূপ মুক্ত উদার আকাশ সম্মিলন তলেই রচিত হয়। অনন্তের শোভা দেখিতে দেখিতেই যেন আমার নয়ন মুদিয়া আসে, ইহা আমার চিরজীবনের একটি সাধ।" তাঁর এ সাধ মৃত্যুকালে পূর্ণ হয়েছিল কি না স্বর্ণকুমারীর জানা নেই কারণ তাঁর মৃত্যুর সময়ে স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি। গিরীন্দ্রমোহিনীর মৃত্যুর

কিছুদিন আগে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। একটু সুস্থ হয়ে যখন সখির কাছে যাবার কথা তিনি ভাবছেন তখন সংবাদ এল তিনি আর নেই। স্বর্ণকুমারীর স্মৃতিকথায় তাঁর সখির শেষ দেখা না পাওয়ার গভীর দুঃখ ফুটে উঠেছে।[৩১০] গিরীন্দ্রমোহিনীর মৃত্যু হল মজিলপুর থেকে বেড়িয়ে আসার কয়েকমাস পরেই। মজিলপুরে তাঁরা গিয়েছিলেন ১৯২৪ সালের মে মাসে, আর গিরীন্দ্রমোহিনী দেহত্যাগ করলেন ১৬ই আগষ্ট।

পরের বছর ১৯২৫ সালে ৪ মার্চ স্বর্ণকুমারীর নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাঁচীতে পরলোক গমন করেন, এবং ১৩ই জুলাই মৃত্যু হল তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ীর। ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারী শান্তিনিকেতনে স্বর্ণকুমারীর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথেরও মৃত্যু হল। তাঁর সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী লিখেছেন : ''বড়দা ছিলেন রক্ষণনীতিশীল, মেজদা ছিলেন পরিবর্তনশীল অর্থাৎ উন্নতি পন্থী। এই বিষয় লইয়া দুইজনের মধ্যে তর্কাতর্কি চলিত। আর আমরা শ্রোতৃবর্গ সকৌতুকে তাহা শুনিয়া নিজ নিজ মত রচনা করিতাম। তবে অবশেষে সত্যের নিকট দ্বিজকে পরাস্ত মানিতে হইয়াছিল। কালচক্রের সহায়তায় ক্রমশঃ বড়দাদাকে মেজদাদা অনেকটাই আপনার দিকে টানিয়া লইয়াছিলেন।[৩১১] 'সাহিত্য স্রোত' গ্রন্থের 'শোকাশ্রু' প্রবন্ধে ভ্রাতৃগর্বে গরবিনী স্বর্ণকুমারী বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুপ্রসঙ্গে লিখেছেন : ''তাঁহারা চারিটি ভাই পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানে বিজ্ঞানে সাহিত্যে কাব্যে নানাভাবে নানাছন্দে দেবেন্দ্রপ্রাসাদ আলোকিত ও ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে তিনজন সরিয়া পড়িলেন, এখন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ গোবর্ধনধারীর ন্যায় অঙ্গুলী অগ্রে সেই প্রাসাদ সম্পদ রক্ষা করিতেছেন।'' স্বর্ণকুমারীর স্নেহধন্যা সরোজকুমারীও এই বছরেই পরলোকগমন করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ফাল্গুন মাসের (১৩৩১ বঙ্গাব্দ) ২০ তারিখে, আর ২১শে চৈত্র আশুতোষ কলেজের ছাত্রবর্গের দ্বারা ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁর এক স্মৃতিসভা আহূত হয়। কবি বিজয় চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১—১৯৪২) সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮—১৯৩২), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১—১৯৫১), ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯—১৯৩৭) প্রমুখ বক্তাদের সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীও সভায় বক্তৃতা করেন।[৩১২] মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে ১৯২০ সালে কার্তিক মাসে রাঁচীতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে স্বর্ণকুমারী নতুনদাদাকে চন্দন পাঠালে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে আশীর্বাদ করে যে ক্ষুদ্র পত্র পাঠিয়েছিলেন সেটি পাঠ করলে এই বোনটির প্রতি তাঁর আন্তরিক স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায় :—

''পাইয়া চন্দন তব হইলাম প্রীত
নন্দন না পারে দিতে এ হেন অমৃত!
প্রাণ খুলি করি বোন এই আশীর্বাদ
পূর্ণ হয় যেন তব যত-কিছু সাধ।''

তোর নতুন দাদা।[৩১৩]

স্বর্ণকুমারীর সুগভীর স্নেহ যাঁরা লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে আর একজন হলেন 'বেঙ্গলী ও হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮২৯—৬৯) প্রপৌত্র মন্মথনাথ ঘোষ

(১৮৮৪—১৯৫৮)। ১৯২৫ সালে তিনি স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।[৩১৪] তার আগে তাঁর কালীপ্রসন্ন সিংহর জীবনী (১৮১৫), রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জীবনী (১৯১৭), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনীর তিনখণ্ড (১৯১৯—২৩) ভোলানাথ চন্দ্রর জীবনী (১৯২৪) প্রকাশিত হয়েছে। তিনি পিতামহ গিরিশচন্দ্রের জীবনীও ইংরেজীতে প্রকাশ করেছেন (১৯১১)। স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ করলেন তখন তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী লিখছেন, যেটি দুবছর পরে ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। স্বর্ণকুমারীর কাছে তাঁর নতুন দাদার জীবনীর তথ্যসংগ্রহ মানসে মন্মথনাথ যান। স্বর্ণকুমারী উৎসাহিত হয়ে নতুন দাদার সম্বন্ধে তথ্য লেখককে সরবরাহ করেন এবং তাঁর 'মিলনরাত্রি' উপন্যাস একখণ্ড উপহার দেন। তাঁর কয়েকটি গান ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়ে দেওয়ার জন্য মন্মথনাথকে তিনি বলেন। মন্মথনাথ পিতা অতুলচন্দ্র ঘোষকে (জন্ম ১৮৬০) দিয়ে অনুবাদ করিয়ে দেন, গানগুলি মন্মথনাথ ঘোষের 'স্বর্ণস্মৃতি' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় (১৯৩২) সঙ্কলিত হয়েছে। অতুলচন্দ্র ঘোষের স্ত্রী ও মন্মথনাথ ঘোষের মাতা কবি সুরবালা ঘোষ (১৮৬৭—১৯৩৩) 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্রের (১৮২২—৭৩) দৌহিত্রী। স্বর্ণকুমারী আরও কতকগুলি নির্বাচিত সঙ্গীত ইংরাজীতে অনুবাদ করাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু তার আর তিনি সময় পান নি। মন্মথনাথ তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : "সাহিত্যালোচনায় এমন উৎসাহ অতি অল্পই দেখিয়াছি। জরা যেন সেই বর্ষীয়সী বাণীপুত্রীর মানসিক শক্তির এতটুকুও খর্বতা সাধন করিতে পারে নাই, নয়নের সেই প্রতিভা দীপ্তি, এত টুকু ম্লান করিতে পারে নাই।" স্বর্ণকুমারী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কতকগুলি পত্র ও চিত্র সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। পরে ১৯৩১ সালে মন্মথনাথের স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে আবার দেখা হলে, তিনি মন্মথনাথকে জানালেন : "তোমার সব বই কালী সিংহের জীবনী, নতুনদাদার জীবনী, কিশোরীচাঁদ মিত্রের জীবনী সব আনাইয়া পড়িলাম। পড়িয়া বড় ভাল লাগিল। মনে করিলাম তোমাকে লিখিয়া জানাই, তারপর ভাবিলাম কি আর লিখিব, তার চেয়ে তোমাকে মুখেই বলিয়া দি। আর একটা কথা। আমি একটা নতুন বই লিখছি তাতে বাঙ্গালা গদ্যলেখক যেমন দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, কালীসিংহ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনার নিদর্শন থাকিবে। তোমার বইগুলো থেকে অনেক সাহায্য নিচ্ছি।" এই বইটি হল 'সাহিত্যস্রোত' যার প্রথম খণ্ড বার হয় ১৯৩২ সালের ৩রা জুলাই এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি লেখিকা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে বার করার উদ্যোগ করছিলেন, কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। জীবনীকার মন্মথনাথকে প্রবীণা লেখিকা জীবনী রচনায় পরলোকগত ব্যক্তির দোষের কথা বিস্মৃত হতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারীর পুত্র জ্যোৎস্নানাথ মন্মথনাথের পরিবারে সবিশেষ পরিচিত ছিলেন বহুকাল থেকে। মন্মথনাথের বয়স যখন ছবছর (১৮৯০) তখন তাঁর তৃতীয় মাতুল কিরণচন্দ্র দে ইংলণ্ডে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তখন জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালও ইংলণ্ডে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। তাঁদের পরীক্ষার প্রস্তুতি কি রকম হচ্ছে জিজ্ঞাসা করে সুরবালা দেবী চিঠি লিখলে, প্রত্যুত্তরে তাঁর কাছে এল একটি ফটো— কিরণচন্দ্র দাবাবড়ে

খেলায় ব্যস্ত, জ্যোৎস্নানাথ বেহালা শিক্ষায় নিবিষ্ট। জ্যোৎস্নানাথের নামানুসারে কিরণচন্দ্র তাঁর পুত্রের নাম রেখেছিলেন জ্যোৎস্নাকুমার। জ্যোৎস্নানাথ 'ভারতী' সম্পাদিকার পুত্র বলে ক্রমেই মন্মথনাথ জানলেন।[৩১৫] তারপর পরিচিত হলেন স্বর্ণকুমারীর লেখার সঙ্গে, এবং তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ পেলেন সুদীর্ঘ কাল পরে ১৯২৫ সালে।

স্বর্ণকুমারীর সাধনার স্বীকৃতি ও জীবনাবসান

স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য-রস-মুগ্ধ পাঠকবর্গও স্বীকৃতি দিয়েছে তাঁর প্রতিভার। ১৯২৭ সালে শ্রেষ্ঠ লেখিকারূপে মহিলাদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিনী স্বর্ণপদক' পেয়েছেন।[৩১৬] ১৯৩০ সালে ফেব্রুয়ারীতে কলকাতায় আহূত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ঊনবিংশতম অধিবেশনে মূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে সভানেত্রী নির্বাচিত হন স্বর্ণকুমারী দেবী।[৩১৭]

ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের এক full report প্রকাশ করেন শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ। ভবানীপুর গোখেল মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় গৃহে ও প্রাঙ্গণে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১৯শে মাঘ রবিবার থেকে সরস্বতী পুজো অবকাশে তিনদিন (অর্থাৎ ১৯, ২০, ২১শে মাঘ) বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হয়েছিল। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে "অভ্যর্থনা সমিতির ২৪এ ভাদ্র তারিখের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্মিলনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হন এবং কবিবর ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১৬ই কার্তিক তারিখে পত্রদ্বারা অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে সম্মিলনের এই পদ গ্রহণে তাঁহার সম্মতি জানাইয়াছিলেন।" কিন্তু সম্মিলনের চারদিন আগে রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের কাছে একটি অভিভাষণ লিখে পাঠান। অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হতে পারবেন কি না সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ না পেয়ে অভ্যর্থনা সমিতি ১৮ই মাঘ সন্ধ্যা পর্যন্ত মূল সভার জন্য অন্য কোনও ব্যবস্থা করা সমীচীন মনে করে নি। কিন্তু দুতিন দিনের চেষ্টাতেও যখন কবির কাছ থেকে কোন সংবাদ পাওয়া গেল না তখন কর্তব্য নির্ধারণের জন্য ১৮ই মাঘ সন্ধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির একটি অধিবেশন আহূত হয় এবং এখানেই স্থির হয়, যদি অধিবেশনে পরদিন রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হতে না পারেন তবে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে এই পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হবে। সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল, "নির্বাচিত মূল সভাপতি কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ অধিবেশনের যথাসময়ে যদি উপস্থিত না হন, তাহা হইলে সাহিত্য শাখার নির্বাচিত সভানেত্রী শ্রীমতি স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়া মূল সভানেত্রী নির্বাচিত হইবেন।" পরের দিন সংবাদ পাওয়া গেল যে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফেরেন নি। এ সংবাদে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। পূর্বদিনের সিদ্ধান্ত অনুসারে স্বর্ণকুমারীকে উক্ত পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল, এবং তিনি সম্মত হলেন। এই সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সভানেত্রী কামিনী রায়, সাহিত্য শাখার নেতৃত্ব করেছিলেন। সম্মিলনের সঙ্গীত পরিচালনার ভার নেন ইন্দিরা দেবী ও সুরমা রায়। অপরাহ্ন ১।। টার সময় অধিবেশনের কাজ আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের নির্দেশে

সভার কাজ আরম্ভ হ'লে ইন্দিরা দেবী ও অমিয়া পালের নেতৃত্বে 'বন্দেমাতরম' গানটি গাওয়া হয়। প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হ'লে স্বর্ণকুমারীর এই গানটি গান হরিপদ চক্রবর্তী, হিমাংশু দত্ত প্রভৃতি।

নমামি ত্বাং
মিশ্র বেহাগ— কাশ্মীরী খেমটা
নমামি ত্বাং ভারতি, হৃদয়— কমলদলবাসিনি!
নমামি ত্বাং বাণি, রাগ— রাগিনী বিকাশিনি!
নমামি ত্বাং নন্দন নন্দিতাং সুরনরবন্দিতাং
বীণাপাণি।
তব প্রেম-পরশ রস রাগে—
পুলকিত, মোহিত চিত-নিত জাগে—
গীত অনুরাগে;
নমামি বাগ্‌বাদিনী সরস্বতি! ভক্তচিত্তে
দিব্যজ্যোতির্বিভাসিনী।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রস্তাবে ও বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সমর্থনে এবং সমবেত সভ্যমণ্ডলীর আনন্দ ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী সভানেত্রীর পদ গ্রহণ করেন। প্রস্তাব প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, তিনি বাল্যকাল থেকে স্বর্ণকুমারীর নানা রচনা ও গ্রন্থাবলী পাঠ ক'রে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে স্বর্ণকুমারীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন। তাঁকে এই পদ গ্রহণের প্রস্তাব ক'রে তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছেন। স্বর্ণকুমারী দেবী স্বীয় অভিভাষণের কিছু অংশ পড়লে তাঁর অনুরোধে বাকী অংশ পড়েন নরেন্দ্র দেব। সাহিত্য শাখার নির্বাচিত সভানেত্রী শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী সভার মূল সভানেত্রী হওয়াতে তাঁরই নির্দেশক্রমে সাহিত্য শাখার নেতৃত্ব করেন কামিনী রায়। সভার অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী বলেন, "সম্মিলনের পূর্ব নির্বাচিত সভাপতি রবীন্দ্রনাথ যখন সেদিন পর্যন্ত আসিতে পারেন নাই তখন রবীন্দ্রনাথ যে অভিভাষণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা তিনি সম্মিলনের সভানেত্রী রূপে ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিনিধি স্বরূপে সেই সাধারণ সভাতে পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন।" তারপর তিনি রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ পড়তে আরম্ভ করেন ও তাঁর অনুরোধে শেষ করেন শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে সভাপতি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল সভানেত্রী মহোদয়াকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন স্বর্ণকুমারী দেবী যে সঙ্কট সময়ে সভানেত্রীর পদ গ্রহণ ক'রে সম্মিলনের কাজ সুসম্পন্ন করেছেন, তার জন্য অভ্যর্থনা সমিতি তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন। এই উক্তি অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যদের মৌখিক কথার কথা নয়— তাঁদের অন্তরের কথা। তিনি এই বয়সে এত কষ্ট স্বীকার ক'রে এই সম্মিলনে উপস্থিত হ'য়ে বঙ্গসাহিত্যের প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁর আজীবন সাহিত্য সাধনার ফলস্বরূপ গবেষণাপূর্ণ

যে অভিভাষণ পাঠ ক'রেছেন তার জন্য তিনি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন। সুদীর্ঘ অভিভাষণে স্বর্ণকুমারী ভারতে বৈদিক যুগ, দার্শনিক যুগ, সাহিত্য যুগ, মুসলমান যুগ, চৈতন্য যুগ, ইংরেজী শিক্ষার যুগ ইত্যাদি বিভিন্ন যুগে নারীর বিদ্যাচর্চা, পাণ্ডিত্য, শিল্পকলায় নৈপুণ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। বৈদিক যুগে বিদ্যার খ্যাতি ছিল বিশ্ববারা, বাক্ লোপামুদ্রা প্রভৃতি জ্ঞানী মহিলার, দার্শনিক যুগে মৈত্রেয়ী, গার্গী, সাহিত্য যুগে বিক্রমাদিত্যের কন্যা, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি নারী বিদ্যাবতী বলে খ্যাত ছিলেন। মুসলমান যুগের বিদ্যাবতী মহিলা ছিলেন মধ্যভারতের রূপমতী, তাঞ্জোর রাজসভার মধুরবাণী, দাক্ষিণাত্যের মোহনাঙ্গিনী, অভয়া প্রভৃতি। নবাব ওমরাহদের অন্তঃপুরে কাব্য ইতিহাস চর্চা ছিল সমধিক। বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম রাজ্যপরিচালনা বিষয়ে হুমায়ুনকে পরামর্শ দিতেন। নূরজাহান বিদ্যাবুদ্ধিতে জগদ্বিখ্যাত। ঔরঙ্গজেব দুহিতা জেবুন্নেসা সুপণ্ডিত ছিলেন। এছাড়া বৈষ্ণবভক্তির গান রচনায় মাধুরী, ইন্দ্রমুখী গোপী, রসময়ী, রামমণি প্রভৃতি রমণী বিখ্যাত। স্বর্ণকুমারীর অভিভাষণটি সুচিন্তিত ও তথ্য সম্বলিত।[৩১৮]

অধিবেশনে মানকুমারী বসু 'আমার মা' নামক স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। আটটি স্তবকের কবিতাটির সপ্তম স্তবকে স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পর্কে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন—

"মূর্তিমতী সরস্বতী আমারি মা'র মেয়ে,
দেবী স্বর্ণকুমারীরে দেখ সবাই চেয়ে,
মা ভারতীর সাধা বীণে,
সুর দিয়েছেন অনেক দিনে,
শুভ্রবেশা শ্বেতপদ্ম বাণীর বীণা পেয়ে!"[৩১৯]

মোজাম্মেল হকও চোদ্দ স্তবকের 'অনন্ত দুঃখ' নামে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। তার অষ্টম স্তবকে তিনি স্বর্ণকুমারীকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন—

"আর বসেছেন ভারতী—মূরতি
শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী,
বঙ্গ-বামাকুলে যাঁহার সমান
কে আর লভেছে যশ খ্যাতি মান,
কে দে'ছে সাহিত্যে মণিরত্ন— দান
বঙ্গ বাণীর চরণ সেবি?[৩২০]

স্বর্ণকুমারী স্বীয় উপন্যাসের অনুবাদগুলি লণ্ডনে ছাপান। The Fatal Garland, An Unfinished Song প্রকাশ করেন লণ্ডনের T. Werner Laurie Ltd.। তাঁর অনূদিত উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য পাওয়া যায় নদিদিকে লেখা চিঠিতে। চিঠিগুলি বেরোয় বিশ্বভারতী পত্রিকায় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক-পৌষ সংখ্যায়। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন থেকে নদিদি স্বর্ণকুমারী দেবীকে লিখেছেন। স্বর্ণকুমারী হয়ত লণ্ডনে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশনায় প্রচারের

ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সহায়তা চেয়ে থাকবেন। তাই তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—
"তোমার বই আমি ঠিক আমেরিকায় আসবার দিনে রেলওয়ে ষ্টেশনে পেয়েছি। তুমি জান না এখানে কোন বই প্রকাশ করা কত কঠিন। অবশ্য নিজের খরচে ছাপানো শক্ত নয় কিন্তু কোনো প্রকাশক, পাঠকদের কাছ থেকে বিশেষ সমাদরের সম্ভাবনা নিশ্চিত না বুঝলে নিজের খরচে ছাপাতে চায় না। এখানকার অনেক বই গ্রন্থাকারের খরচে প্রকাশ হয়। আমি জানি এ বই প্রকাশ করবার চেষ্টা এখানে সফল হবে না। তা ছাড়া তর্জমা খুব যে ভাল হয়েছে তা নয়— অর্থাৎ ইংরেজি রচনার উচ্চ আদর্শে পৌঁছয় নি।"

স্বর্ণকুমারী দেবীর 'সাহিত্যস্রোত' ১ম খণ্ডে শ্রীযুক্ত অমিয়ভূষণ বসু অল্পই সাহায্য করেন, কিন্তু ২য় খণ্ডের জন্য স্বর্ণকুমারী দেবীর অনুরোধে তিনি বাংলা দেশের কবিওয়ালাদের বিষয়ে লেখেন ও অন্য নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু ২য় খণ্ড আর বেরোয় নি। তার আগেই স্বর্ণকুমারী পরলোকগমন করেন।[৩২১]

সুদীর্ঘকাল অবিচলিত নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার সঙ্গে স্বর্ণকুমারী সাহিত্যসাধনা করেছেন। ১৯৩২ সালের ২৮শে জুন মঙ্গলবার তিনি সানি পার্কের বাড়ীতে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন। ৩রা জুলাই-এর সকাল ১০-১৫ মিনিটে স্বর্ণকুমারীর জীবনদীপ চিরতরে নির্বাপিত হয়। স্বর্ণকুমারীর নয় ভাই ও ছয় বোনের মধ্যে তাঁর মারা যাওয়ার সময় কেবল রবীন্দ্রনাথ ও বর্ণকুমারী জীবিত ছিলেন। এবং তাছাড়া ছিল তাঁর পুত্র, কন্যা সরলা, চারটি নাতি দুটি নাতনী।[৩২২]
স্বর্ণকুমারীর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে মিষ্টার ই.এম. ল্যাঙ (E.M. Lang) লিখেছেন,—

"She is tall and stately, a veritable 'grand dame', her face is noble and expressive of high intelligence and her manner calm and perfectly dignified.[৩২৩]

মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি সক্রিয় ছিলেন। শ্রীযুক্ত অমিয়ভূষণ বসুর কাছে জানা যায়, মারা যাওয়ার বছর খানেক আগেও স্বর্ণকুমারী গানের সুর দিতেন direct করতেন, — যেমন রবীন্দ্রনাথ direction দিতেন দিনু ঠাকুরকে।

স্বর্ণকুমারীর গানের স্বরলিপি পুস্তক 'গীতিগুচ্ছ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। তিনি নিজে ছাড়া তাঁর গানের স্বরলিপি প্রস্তুত করেছেন ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী, সরলা দেবী. ইন্দিরা দেবী, প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি। সঙ্গীত রচনায়, সুরসৃষ্টিতে স্বর্ণকুমারীর বিশেষ প্রতিভা ছিল। তাঁর অধিকাংশ গানেরই শুরুতে শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিনী ও তালের নির্দেশ দানের মধ্যে সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় রয়েছে। বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী, সরস কৌতুক গীতি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের গীত রচনায়ও স্বর্ণকুমারী সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গীত প্রতিভা সম্পর্কে শ্রীপশুপতি শাসমল তাঁর 'স্বর্ণকুমারী দেবীর গান' প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী পত্রিকা. বৈশাখ---আষাঢ় ১৩৭৫) বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

স্বর্ণকুমারীর উইল সম্পর্কেও শ্রীযুক্ত বসুর কাছে জানা যায়, তাঁর ওল্ড বালিগঞ্জের উপর দুটো বাড়ী পান হিরণ্ময়ী দেবীর দুই ছেলে প্রসাদ ও আনন্দ। ওল্ড বালিগঞ্জ এবং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের মোড়ের বাড়ীটি পান সরলা দেবী। এছাড়া হিরণ্ময়ী দেবীর কন্যা কল্যাণীকে তিনি দেন দশ হাজার টাকা ও শ্রীমতী দেবযানী বসুর বিয়ের যৌতুক হিসেবে তাঁর মা উমারাণীকে দেন এক হাজার টাকা। তাঁর সানি পার্কের বাড়িটি পান পুত্র জ্যোৎস্নানাথ (১৮৭১—১৯৬২)।

স্বর্ণকুমারী দেবীর মৃত্যুর দিন ভোর থেকেই অমিয়ভূষণ বসু সানি পার্কের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। স্বর্ণকুমারীর মৃত্যুর পর সরলা দেবীব কথায় তিনি টেলিফোনে প্রত্যেক কাগজের অফিসে খবর দেন, এবং অন্যান্য যাঁদের ফোন আছে তাদেরকেও জানান। কড়েয়ায় Crematorium-এ স্বর্ণকুমারীর মরদেহ দাহ করা হয় জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালের নির্দেশে। Crematorium-এ উপস্থিত ছিলেন সঞ্জীবনীর সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র ও তাঁর কন্যা বাসন্তী দেবী। বাসন্তী দেবী একটি গান করেন ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের উপাসনার পর Gas Chamber-এ আগুন দেন জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল। জ্যোৎস্নানাথ তাঁর মায়ের সর্বদা ব্যবহৃত লেখার সরঞ্জাম, অর্থাৎ দোয়াত, কলম, পেনসিল, খাতা, প্যাড প্রভৃতি সব সাহিত্য পরিষদে উপহার দেন।

অনাড়ম্বরভাবে সানি পার্কের বাড়ীতে স্বর্ণকুমারী দেবীর শ্রাদ্ধবাসর অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিশেষ অন্তরঙ্গ ও স্বসম্পর্কীয় পুরুষদের আহ্বান কবা হয়, মেয়েদের নিমন্ত্রণ হয় নি। নিতান্ত অন্তরঙ্গ মহিলা আত্মীয়াদের সরলা দেবী বলেন চতুর্থীর দিন। সেদিন শ্রীযুক্ত অমিয়ভূষণ বসুর স্ত্রীও উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রাদ্ধবাসরে পৌরোহিত্য করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর এক পাশে বসেছিলেন শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল আর এক পাশে বসেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সরলা দেবী স্বয়ং গান গেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে যা বলেন তাতে বলেন যে, 'শ্রাদ্ধ' কথাটা এসেছে শ্রদ্ধা প্রদর্শন থেকে— অর্থাৎ মৃত্যুর পর শ্রদ্ধা প্রদর্শন।[২৪]

বহুদিন আগে 'ভারতী'তে (১৩১৭ বঙ্গাব্দের, বৈশাখ) বাণীসাধিকা স্বর্ণকুমারীর অন্তরের গূঢ় বাসনাটি ব্যক্ত হয়েছিল :—

"ওগো কমল-আসনা,— রঞ্জিনী বীণাপাণি
আমি কাহারেও আর জানি না ভারতি
তোমারেই শুধু জানি।

... ...

আমি না চাহি অন্য বিভব ঋদ্ধি
চাহি না মুক্তি, চাহি না সিদ্ধি
তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ
তোমারি অমৃত বাণী।"

'ভারতী'র বন্দনা করতে গিয়ে কবি এই বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন এবং সুদীর্ঘ জীবনের

উজ্জ্বল প্রতিভাদীপ্ত বাণীসাধনায় কবি সেই আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক করে গেছেন। বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর প্রতিভাদীপ্ত বৈদগ্ধ্যের অন্যতম বাহিকা হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী।

পাদটীকা :—

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবনস্মৃতি'তে প্রদত্ত বংশলতিকা, পৃঃ ২৯০। নতুন সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ। প্রথম সংস্করণ ১৩১৯ বঙ্গাব্দ। প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন।

২। পরিশিষ্ট অংশ, পৃঃ ৩০৩। "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরে'র আত্মজীবনী"— সম্পাদক শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, ৩য় সংস্করণ ১৯২৭ (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ)। প্রথম প্রকাশ ১৮৯৮-এ।

৩। ঐ। পৃঃ ৩০৩।

৪। ঐ। পৃঃ ৩১৩—১৮।

৫। ঐ। পৃঃ ৩২৫।

৬। ঐ। পৃঃ ৩২৬।

৭। "আমাদের কথা"— প্রফুল্লময়ী দেবী। সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, রবীন্দ্র প্রসঙ্গ গ্রন্থমালা— ২, "স্মৃতিকথা"য় সঙ্কলিত। প্রকাশ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ। রচনাটির প্রথম প্রকাশ "প্রবাসী"— বৈশাখ, ১৩৩৭।

৮। পরিশিষ্ট। পৃঃ ৩১৮—১৯। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী।

৯। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর— সাহিত্য সাধক চরিতমালা। পৃঃ ১৪, ৩য় সংস্করণ, ১৯৫৭ (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ)। (১ম সংস্করণ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।)

১০। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃঃ ৪১—৪২।

১১। ঐ। পৃঃ ৭৮—৮০।

১২। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর— সাহিত্য সাধক চরিতমালা, পৃঃ ১৫।

১৩। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃঃ ১১।

১৪। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর— শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী (১৯১৬), পৃঃ ৫৪—৫৫।

১৫। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃঃ ৪৬—৪৯, ৫৬—৫৯।

১৬। ঐ, পৃঃ ৭৮।

১৭। ঐ, পৃঃ ৭৯।

১৮। ঐ, পৃঃ ৭৯—৮০।

১৯। ঐ, পৃঃ ৮২—৮৪।

২০। পরিশিষ্ট, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃঃ ২৯৯।

২১। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর— সাহিত্য সাধক চরিতমালা, পৃঃ ১৫।

২২। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৬১, পৃঃ ৩৬। (প্রথম সংস্করণ ১৯০৯ সাল।)

২৩। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর— সাহিত্যসাধক চরিতমালা, পৃঃ ১৫—১৯।

২৪। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃঃ ১৫১।

২৫। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, পৃঃ ৩৬।

২৬। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃঃ ১৫১, ১৮১—৮৫।

২৭। আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস— শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৫)। পৃঃ ৪৪—৪৫।

২৮। 'পিতৃস্মৃতি'— সৌদামিনী দেবী। সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'স্মৃতিকথা'য় (১৩৭০ বঙ্গাব্দ) সঙ্কলিত, পৃঃ ২। রচনাটির প্রথম প্রকাশ "প্রবাসী"— ফাল্গুন, চৈত্র ১৩১৮।

২৯। 'পত্র'— স্বর্ণকুমারী দেবী, ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৯৮। 'প্রয়াগের দু-একটি দৃশ্য'— স্বর্ণকুমারী দেবী, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯। 'পাণ্ডারপুর'— স্বর্ণকুমারী দেবী, ভারতী, মাঘ, ১৩০৪।

৩০। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃঃ ১৭০।

৩১। ঐ। পৃঃ ২৯৯।

৩২। আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস— শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১—৩।

৩৩। আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস— শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ -৩

৩৪। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, পৃঃ ৩৬।

৩৫। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃঃ ২৯৮।

৩৬। সেকেলে কথা— স্বর্ণকুমারী দেবী। বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত স্বর্ণকুমারী গ্রন্থাবলী সিরিজ, ৪র্থ খণ্ড। পৃঃ ২০৫।

৩৭। আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস, পৃঃ ১৫।

৩৮। পিতৃস্মৃতি— সৌদামিনী দেবী। 'স্মৃতিকথা', পৃঃ ২।

৩৯। সেকেলে কথা— স্বর্ণকুমারী দেবী, পৃঃ ২০৫—৬। "আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তাহার সংস্কার"— স্বর্ণকুমারী দেবী। "প্রদীপ", ১৩০৬ ভাদ্র।

৪০। ঐ, পৃঃ ২০৬—৭।

৪১। ঐ, পৃঃ ২০৬।

৪২। ঐ, পৃঃ ২০৭।

৪৩। "সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর— বাংলার স্ত্রীস্বাধীনতার অন্যতম পথিকৃৎ"— শ্রীপুলিনবিহারী সেন, পরিশিষ্ট অংশ— 'পুরাতনী'— ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সম্পাদিত (১৯৫৭) পৃঃ ১৮৯। 'সেকেলে কথা'— স্বর্ণকুমারী দেবী, পৃঃ ২০৭—৮।

৪৪। পিতৃস্মৃতি— সৌদামিনী দেবী, পৃঃ ৩।

৪৫। সেকেলে কথা— স্বর্ণকুমারী দেবী, পৃঃ ২০৮। "আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তাহার সংস্কার"— স্বর্ণকুমারী দেবী। "প্রদীপ", ১৩০৬ ভাদ্র।

৪৬। ঐ, পৃঃ ২০৮।

৪৭। পিতৃস্মৃতি— সৌদামিনী দেবী। 'স্মৃতিকথা', পৃঃ ৩।

৪৮। 'আমাদের কথা'— প্রফুল্লময়ী দেবী, 'স্মৃতিকথা', পৃঃ ১০।

৪৯। স্বর্ণস্মৃতি— শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ (১৯৩২), পৃঃ ৬।

৫০। 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ'— স্বর্ণকুমারী দেবী। 'সাহিত্য স্রোত' ১ম ভাগ স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত ও সঙ্কলিত, ১৯২৯। পৃঃ ৫৩—৫৫।

৫১। পুরাতনী— ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সম্পাদিত। পৃঃ ২৭।

৫২। সেকেলে কথা, পৃঃ ২০৯—১০।

৫৩। 'সহজে গান শিক্ষা'— বালক পত্রিকা, বৈশাখ, ১২৯২। 'গান অভ্যাস'— বালক, জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র, ১২৯২।

৫৩ ক, ৫৪। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ— স্বর্ণকুমারী দেবী। সাহিত্য স্রোত, ১ম ভাগ, পৃঃ ৫৭—৫৯।

৫৫। Introduction– E.M.Lang. An Unfinished Song (1913)– by Mrs. Ghosal. Published at Cifford's in, London. By T. Werner Laurie, Ltd.

৫৬। পিতৃস্মৃতি— সৌদামিনী দেবী, পৃঃ ৫।

৫৭। সেকেলে কথা— স্বর্ণকুমারী দেবী। পৃঃ ২০৮।

৫৮। পিতৃস্মৃতি— সৌদামিনী দেবী। পৃঃ ৫।

৫৯। সেকেলে কথা— স্বর্ণকুমারী দেবী, পৃঃ ২০৯।

৬০। আমার বোম্বাই প্রবাস— শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতী, আশ্বিন, ১৩২০।

৬১। কুমারী কার্পেন্টারের জীবনচরিত— রজনীকান্ত গুপ্ত। ২য় সংস্করণ, ১৯১১। পৃঃ ৩০—৩১।

৬২। পত্র—৫। পুরাতনী— ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সম্পাদিত। পৃঃ ৫৩—৫৪।

৬৩। পত্র—৩। ঐ। পৃঃ ৪৯—৫০।

৬৪। সেকেলে কথা, পৃঃ ২০৯।

৬৫। আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস, পৃঃ ৫।

৬৬। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি— শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৩৮।

৬৭। শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী চৌধুরাণীর দৌহিত্রী ও শ্রীঅতুল বসুর সহধর্মিণী শ্রীমতী দেবযানী বসুর প্রদত্ত তথ্য।

৬৮। 'ভুক্তভোগীর পত্র'— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতী, শ্রাবণ ১৩২০।

৬৯। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃঃ ১১৯।

৭০। সেকেলে কথা, পৃঃ ২০৮।

৭১। ঐ, পৃঃ ২০৮।

৭২। ঐ, পৃঃ ২০৯।

৭৩। ঐ, পৃঃ ২০৯।

৭৪। পিতৃস্মৃতি— সৌদামিনী দেবী, পৃঃ ৪।

৭৫। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃঃ ১১৯।

৭৬। বঙ্গের মহিলা কবি— শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ২য় সংস্করণ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪১।

৭৭। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ— শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, ১৩৩৪, পৃঃ ১৩৬।

৭৮। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)— ডক্টর সুকুমার সেন। ৩য় সংস্করণ ১৩৬২, পৃঃ ৪১০।

৭৯। "সাহিত্যের সঙ্গী"— জীবনস্মৃতি— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশত-বার্ষিকী সংস্করণ ১৯৬১। ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৬২—৬৩।

৮০। আমাদের কথা— প্রফুল্লময়ী দেবী, পৃঃ ১১—১২।

৮১। ঐ, পৃঃ ১৩।

৮২। জীবনের ঝরাপাতা— সরলা দেবী চৌধুরাণী, ১৯৫৭। পৃঃ ১—২।

৮৩। জানকীনাথ ঘোষাল— হিরণ্ময়ী দেবী। ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০।

৮৪। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ২।

৮৫। জানকীনাথ ঘোষাল— হিরণ্ময়ী দেবী।

৮৬। স্বর্ণকুমারী দেবী— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৫ম সংস্করণ, ১৯৫৪। পৃঃ ৯।

৮৭। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর— অজিতকুমার চক্রবর্তী। ১৯১৬, পৃঃ ৪৭৩।

৮৮। জানকীনাথ ঘোষাল— হিরণ্ময়ী দেবী।

৮৯। স্বর্ণস্মৃতি— মন্মথনাথ ঘোষ (১৯৩২), পৃঃ ৬।

৯০। জানকীনাথ ঘোষাল— হিরণ্ময়ী দেবী।

৯১। ঐ।

৯২। পত্র— ৯০। পুরাতনী, পৃঃ ১৫০।

৯৩। জানকীনাথ ঘোষাল— হিরণ্ময়ী দেবী।

৯৪। ঐ।

৯৫। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। পৃঃ ১২০—২৪।

৯৬। জানকীনাথ ঘোষাল— হিরণ্ময়ী দেবী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর— অজিতকুমার চক্রবর্তী, পৃঃ ৬১৬—১৭।

৯৭। পত্র—১১ (পৃঃ ৬২), ১০০ (পৃঃ ১৫৯), ১৪ (পৃঃ ৬৭), ৬৭ (পৃঃ ১২৯), ৮৬ (পৃঃ ১৪৬—৪৭), ৮৫ (পৃঃ ১৪৫), ২৩ (পৃঃ ৭৯), ৩৫ (পৃঃ ৯৫)— পুরাতনী— ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী সম্পাদিত।

৯৮। পত্র—১০৪ (পৃঃ ১৬১—৬২), পুরাতনী।

৯৯। জানকীনাথ ঘোষাল— হিরণ্ময়ী দেবী।

১০০। রবীন্দ্রস্মৃতি—ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, ১৩৬৭, পৃঃ ৫৪।

১০১। ঐ। পৃঃ ৩০।

১০২। সেকেলে কথা, পৃঃ ২১০।

১০৩। ঐ। পৃঃ ২০৯।

১০৪। ঐ। পৃঃ ২১১।

১০৫। পত্র—১২ (পৃঃ ৬৪), পুরাতনী।

১০৬। পত্র—৩৩ (পৃঃ ৯৩), পুরাতনী।

১০৭। আমাদের কথা— প্রফুল্লময়ী দেবী। 'স্মৃতিকথা', পৃঃ ১৫।

১০৮। পত্র—৮৬ (পৃঃ ১৪৬), পুরাতনী।

১০৯। পত্র—৯৪ (পৃঃ ১৫৪), পুরাতনী।

১১০। পত্র—১১৯ (পৃঃ ১৭৫), পুরাতনী।

১১১। সেকেলে কথা— পৃঃ ২০৯।

১১২। পুরাতনী, পৃঃ ৩৫।

১১৩। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ১, ৫।

১১৪। ঐ। পৃঃ ৮।

১১৫। জানকীনাথ ঘোষাল— হিরণ্ময়ী দেবী।

১১৬। পুরাতন প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় পর্যায়)— বিপিনবিহারী গুপ্ত, ১৩৩০, পৃঃ ২০৫।

১১৭। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃঃ ১৫১।

১১৮। 'ভারতীর ভিটা'— শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত— ১৩৫৭, পৃঃ ৩৭৩।

১১৯। ঐ। পৃঃ ৩৭৩—৭৪।

১২০। ঐ। পৃঃ ৩৭৩।

১২১। ঐ। পৃঃ ৩৭৩।

১২২। কৈফিয়ৎ— হিরণ্ময়ী দেবী, ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩।

১২৩। ঐ।

১২৪। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। পৃঃ ১৫১।

১২৫। ঐ। পৃঃ ১৫৫—৫৬।

১২৬। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ১৬—১৭।

১২৭। ঐ। পৃঃ ১৯।

১২৮। ঐ। পৃঃ ২১—২২।

১২৯। জানকীনাথ ঘোষাল— হিরণ্ময়ী দেবী।

১৩০। পুরাতন কথা— সরোজকুমারী দেবী, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩।

১৩১। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ১১।

১৩২। কৈফিয়ৎ— হিরণ্ময়ী দেবী।

১৩৩। ঐ।

১৩৪। শরৎকুমারী দেবী চৌধুরাণীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু ও শ্রীঅতুল বসুর সহধর্মিণী শ্রীমতী দেবযানী বসুর প্রদত্ত তথ্য।

১৩৫। রবীন্দ্রস্মৃতি— ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, পৃঃ ২৮।

১৩৬। জীবনের ঝরাপাতা— পৃঃ ২৯।

১৩৭। ঐ। পৃঃ ২৯।

১৩৮। ঐ। পৃঃ ৫২।

১৩৯। রবীন্দ্রস্মৃতি— ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, পৃঃ ৩০।

১৪০। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ৯৮।

১৪১। ঐ, পৃঃ ৯৮—১০১।

১৪২। The Theosophical-Craze : It's history Madras 1894. p. 5-9.

১৪৩। – Do – p. 12-15.

১৪৪। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ২২৭। প্যারীচাঁদ মিত্র— সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৫ম সংস্করণ ১৯৫৫, পৃঃ ১৮৮—৮৯।

১৪৫। প্যারীচাঁদ মিত্র— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৫ম সংস্করণ ১৯৫৫, পৃঃ ১৮৭--৮৯।

১৪৬। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ২২৬।

১৪৭। The Theosophical Craze, p. 43.

১৪৮। ভারতকোষ (১ম খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত, পৃঃ ৪১৮।

১৪৯। ঐ, পৃঃ ১৫২।

১৫০। জানকীনাথ ঘোষাল— হিরণ্ময়ী দেবী।

১৫১। ঐ।

১৫২। ঐ।

১৫৩। পত্র—৩৯, পৃঃ ৯৯, পুরাতনী— ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সম্পাদিত।

১৫৪। শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু প্রদত্ত বিবৃতি।

১৫৫। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ৫৭—৫৮, ৭৩—৭৪।

১৫৬। বাংলার নারীজাগরণ— শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৪৫, পৃঃ ৮৭।

১৫৭। স্বর্ণকুমারী দেবী— সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৫ম সংস্করণ, ১৯৫৪, পৃঃ ২৩।

The Calcutta Municipal Gazette, 9th July, 1932.

১৫৮। ভারতী, পৌষ, ১৩২৫।

১৫৯। ভারতী, আশ্বিন, ১৩১২।

১৬০। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ৫৯।

১৬১। 'নারীশিক্ষা ও মহিলার শিল্পাশ্রম'— শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত ১৯৫০, পৃঃ ২৬৯।

১৬২। সখিসমিতি— স্বর্ণকুমারী দেবী, ভারতী, পৌষ, ১২৯৮।

১৬৩। ঐ।

১৬৪। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ৫৯।

১৬৫। স্বর্ণস্মৃতি— মন্মথনাথ ঘোষ, পৃঃ ১৩—১৪।

১৬৬। রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড)— শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৩৫৩, পৃঃ ২০২—৩।

১৬৭। রবীন্দ্রস্মৃতি— ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, পৃঃ ৩৬।

১৬৮। রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড), পৃঃ ২০২—৩।

১৬৯। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ৫৯।

১৭০। মিলনকথা— গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩।

১৭১। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ২১১।

১৭২। ঐ, পৃঃ ৬০।

১৭৩। রবীন্দ্রস্মৃতি— ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, পৃঃ ৩৫।

১৭৪। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ৫৬।

১৭৫। ঐ, পৃঃ ২১১।

১৭৬। Pramatha Nath Bose – Jogesh Chandra Begal, 1955. p. 22-25.

১৭৭। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ২১১।

১৭৮। Government of Bengal, Hooghly College Begister 1836-1936. By members of the college staff. (Supdt. Govt. Printing Bengal. Govt. Press, Alipore 1936) Part - C, P. 168.
Presidency College, Calcutta, Centenary Vol., 1955. (Govt. Printing Press, Alipore, 1956.) p. 55.

১৭৯। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ২১১।

১৮০। ঐ, পৃঃ ৫৬—৫৭।

১৮১। ঐ, পৃঃ ৬১।

১৮২। জীবনস্মৃতি— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৫৬ সংস্করণ, পৃঃ ১৩২।

১৮৩। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ৬১।

১৮৪। 'ভারতীর ভিটা'— শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী, পৃঃ ৩৭৫।

১৮৫। কৈফিয়ৎ— হিরণ্ময়ী দেবী।

১৮৬। ঐ।

১৮৭। ঐ।

১৮৮। স্বর্ণস্মৃতি— মন্মথনাথ ঘোষ, পৃঃ ৬—৭।

১৮৯। কৈফিয়ৎ— হিরণ্ময়ী দেবী।

১৯০। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ৬২।

১৯১। কৈফিয়ৎ— হিরণ্ময়ী দেবী।

১৯২। পুরাতন-প্রসঙ্গ (১ম পর্যায়)— বিপিনবিহারী গুপ্ত, ১৩২০। পৃঃ ১৭২।

১৯৩। বিহারীলাল চক্রবর্তী— সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৫২, পৃঃ ২১।

১৯৪। কৈফিয়ৎ— হিরণ্ময়ী দেবী।

১৯৫। ঐ।

১৯৬। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ৯১।

১৯৭। 'বির্জিতলাও'— ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'স্মৃতিকথা'য় সঙ্কলিত, ১৯৬৩, পৃঃ ৪২।

১৯৮। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ৯১।

১৯৯। স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন, ১১ই মাঘ, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৭। পৃঃ ৪, ৫৮, ৬৫।

২০০। বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০—১৯০০)— আশা দেবী, ১৯৬১। পৃঃ ১৪৩—৪৮।

২০১। শিবনাথ শাস্ত্রী— সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ২য় সংস্করণ ১৯৬০, পৃঃ ৩৯।

২০২। আত্মচরিত— শিবনাথ শাস্ত্রী (১৯১৮)। প্রথম সিগনেট সংস্করণ ১৯৫২, পৃঃ ১৯৬।

২০৩। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ৯১।

২০৪। ঐ, পৃঃ ৯২—৯৩।

২০৫। ঐ, পরিশিষ্ট, পৃঃ ২২৬।

২০৬। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ৯৩।

২০৭। ঐ, পৃঃ ৯৩।

২০৮। 'বালক'— জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৫৬ সংস্করণ, পৃঃ ১৩৫ (১ম সংস্করণ ১৯১২)।

২০৯। রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড)— শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। সংশোধিত সংস্করণ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ (১৯৬০), পৃঃ ৭১।

২১০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)— ডঃ সুকুমার সেন। তৃতীয় সংস্করণ ১৯৫৫, পৃঃ ৪৪৮।

২১১। মিলনকথা— গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩।

২১২। কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী— স্বর্ণকুমারী দেবী, ভারতী, আশ্বিন ১৩৩১।

২১৩। মিলনকথা— গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী। ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩।

২১৪। ঐ।

২১৫। ঐ।

২১৬। কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী— স্বর্ণকুমারী দেবী, ভারতী, আশ্বিন ১৩৩১।

২১৭। ঐ।

২১৮। ঐ।

২১৯। মিলনকথা— গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী।

২২০। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর— শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী ১৯১৬। পৃঃ ৬২০।

২২১। মিলনকথা— গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী।

২২২। ঐ — ,, — ভারতী ও বালক, পৌষ ১২৯৪।

২২৩। ঐ — ,,

২২৪। ঐ।

২২৫। ঐ।

২২৬। মিলনকথা— গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী।

২২৭। ঐ।

২২৮। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ৯৪—৯৫, পরিশিষ্ট পৃঃ ২১৩।

২২৯। রবীন্দ্রস্মৃতি— ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ১৯৬০। পৃঃ ২৮—২৯।

২৩০। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ৫৯—৬০।

২৩১। ঐ, পৃঃ ৯৫—৯৬।

২৩২। ঐ, পৃঃ ৯৬।

২৩৩। স্মৃতি— দেবেন্দ্রনাথ সেন, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।

২৩৪। পুরাতন কথা— সরোজকুমারী দেবী, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।

২৩৫। ঐ।

২৩৬। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত— শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়। 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৩।

২৩৭। পুরাতন কথা— সরোজকুমারী দেবী। 'ভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।

২৩৮। ঐ।

২৩৯। ছিন্নপত্র— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯২২। ১৯৫৫ সংস্করণ, পত্র সংখ্যা ৯, পৃঃ ২৯—৩০।

২৪০। দার্জিলিঙ পত্র— স্বর্ণকুমারী দেবী, 'ভারতী ও বালক' বৈশাখ ১২৯৫।

২৪১। ঐ।

২৪২। ঐ।

২৪৩। A Tragedy : A Blot in the Scutcheon, 1843.– The Poetical works of Robert Browning, London. Oxford University Press 1960.
জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ৩৪।

২৪৪। দার্জিলিঙ পত্র— স্বর্ণকুমারী দেবী, 'ভারতী ও বালক', বৈশাখ ১২৯৫।

২৪৫। দার্জিলিঙ পত্র— স্বর্ণকুমারী দেবী, 'ভারতী ও বালক', আষাঢ় ১২৯৫।

২৪৬। ঐ। 'ভারতী ও বালক' শ্রাবণ ১২৯৫।

২৪৭। ঐ।

২৪৮। 'কবিভ্রাতা'— শ্রীপুলিনবিহারী সেন। 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭২। পত্র সংখ্যা—১।

২৪৯। রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড)— শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ২৪১।

২৫০। 'স্মৃতি'— দেবেন্দ্রনাথ সেন, 'ভারতী' জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।

২৫১। গাজিপুর পত্র— স্বর্ণকুমারী দেবী, 'ভারতী ও বালক', জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬।

২৫২। ঐ।

২৫৩। গাজিপুর পত্র— স্বর্ণকুমারী দেবী, 'ভারতী বালক' ভাদ্র ১২৯৬।

২৫৪। স্মৃতি— দেবেন্দ্রনাথ সেন, 'ভারতী' জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।

২৫৫। ঐ।

২৫৬। ঐ।

২৫৭। ঐ।

২৫৮। পত্র— স্বর্ণকুমারী দেবী, 'ভারতী' ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক, ১২৯৮।

২৫৯। পত্র— স্বর্ণকুমারী দেবী, 'ভারতী', আষাঢ়, ১২৯৯।

২৬০। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ১০২।

২৬১। ঐ, পৃঃ ৪৪—৪৭।

২৬২। কৈফিয়ৎ— হিরণ্ময়ী দেবী, 'ভারতী', বৈশাখ ১৩২৩।

২৬৩। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ১০৭।

২৬৪। ঐ। পৃঃ ১০৭—৮।

২৬৫। Bethune School and College Centenary Volume. 1849-1949. Calcutta. Ed. by Kalidas Nag, P. 65.

বাংলার নারী জাগরণ— শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৪৫) পৃঃ ৭৭।

২৬৬। শ্রীঅমিয়ভূষণ বসুর নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

২৬৭। The autobiography of an Indian Princes – by Suniti Devi. 1921. p. 166.

২৬৮। ভারতী স্মৃতি— অনুরূপা দেবী, ভারতী, বৈশাখ ১৩৩৩।

২৬৯। রবীন্দ্রস্মৃতি— সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ১৯৫৭, পৃঃ ৮—৯।

২৭০। 'ভাবতীস্মৃতি'— অনুরূপা দেবী, 'ভারতী', বৈশাখ ১৩৩৩।

২৭১। ঐ।

২৭২। ভারতকোষ (১ম খণ্ড)— বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬৪। পৃঃ ৫৫।

২৭৩। ভারতী স্মৃতি— অনুরূপা দেবী।

২৭৪। জীবনেব ঝরাপাতা, পৃঃ ১২৪।

২৭৫। ঐ, পৃঃ ১৬০—৬২।

২৭৬। ঐ, পৃঃ ৮০।

২৭৭। ঐ, পৃঃ ১০৭, ১৮৫।

২৭৮। ঐ, পৃঃ ১৮৫—৮৭।

২৭৯। রবীন্দ্রস্মৃতি— সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৯৩—৯৯।

২৮০। ঐ, পৃঃ ১০০।

২৮১। কর্ত্তব্য কোন পথে— স্বর্ণকুমারী দেবী, 'ভারতী', পৌষ ১৩১৫।

২৮২। লর্ড কার্জন ও বর্ত্তমান অরাজকতা— স্বর্ণকুমারী দেবী, 'ভারতী', জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫।

২৮৩। Introduction – E.M.Lang. An Unfinished Song, 1913 London, p. 6.

২৮৪। শ্রীঅমিয়ভূষণ বসুর কাছে প্রাপ্ত।

২৮৫। রবিতীর্থে— অসিতকুমার হালদার, ১৯৫৮। পৃঃ ১৩।

২৮৬। ঐ, পৃঃ ১৪।

২৮৭। রবিতীর্থে— অসিতকুমার হালদার, ১৯৫৮। পৃঃ ১৪।

২৮৮। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ৬০—৬১।

২৮৯। বাংলার নারীজাগরণ— শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৪৫, পৃঃ ৯৫।

২৯০। মহারাণী সুচারু দেবীর জীবনকাহিনী— প্রভাত বসু, ১৯৬২। পৃঃ ২৪৫।

২৯১। স্বর্ণকুমারী দেবী— সাহিত্য সাধক চরিতমালা। ৫ম সংস্করণ ১৯৫৪। পৃঃ ২৩।

২৯২। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ— স্বর্ণকুমারী দেবী, সাহিত্য স্রোত, পৃঃ ৫১।

২৯৩। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃঃ ১৮৮।

২৯৪। রবীন্দ্রস্মৃতি— সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৬—৪৭।

২৯৫। পুরাতন কথা— সরোজকুমারী দেবী, 'ভারতী' জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।

২৯৬। Introduction – An Unfinished Song p. 5.

২৯৭। – Do – p. 5–6

২৯৮। শরৎকুমারী দেবীর দৌহিত্রী ও উমারাণীর কন্যা, শ্রীঅতুল বসুর সহধর্মিণী শ্রীমতী দেবযানী বসুর কাছে প্রাপ্ত।

২৯৯। রবীন্দ্রস্মৃতি, পৃঃ ৪৬—৪৭।

৩০০। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'দেশ' ১৭ আষাঢ়, ১৩৭৩ (২রা জুলাই, ১৯৬৬)।

৩০১। জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ১৯৬, ২০০—১।

৩০২। স্বর্ণস্মৃতি— মন্মথনাথ ঘোষ, ১৯৩২, পৃঃ ২২।

৩০৩। বেঙ্গলী— স্বর্ণকুমারী দেবী, 'ভারতী', আষাঢ় ১৩২২।

৩০৪। গান্ধী পত্নীর সম্বর্ধনা— স্বর্ণকুমারী দেবী, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২।

৩০৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শোকনৈবেদ্য— স্বর্ণকুমারী দেবী, সাহিত্যেস্রোত (১ম ভাগ) ১৯২৯, পৃঃ ৩৩৬—৩৭।

৩০৬। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্য সাধক চরিতমালা। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬৫, পৃঃ ২৪—২৫।

৩০৭। পুষ্পাঞ্জলি, বড়দাদা— স্বর্ণকুমারী দেবী। "ভারতী", মাঘ ১৩৩২।

৩০৮। সেকালের কথা— স্বর্ণকুমারী দেবী, ভারতী ১৩২২ চৈত্র। সাহিত্যস্রোত (১ম খণ্ড)— স্বর্ণকুমারী দেবী— পৃঃ ৩৬২।

৩০৯। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ— মন্মথনাথ ঘোষ, ১৯২৭। পৃঃ ১৭৯—৮০।

৩১০। কবি গিরীন্দ্রমোহিনী— স্বর্ণকুমারী দেবী "ভারতী", আশ্বিন ১৩৩১।

৩১১। বড়দাদা— স্বর্ণকুমারী দেবী, 'ভাবতী', মাঘ ১৩৩২।

৩১২। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ— মন্মথনাথ ঘোষ, ১৯২৭, পৃঃ ১৮৩।

৩১৩। তদেব, পৃঃ ১৮৭।

৩১৪। স্বর্ণস্মৃতি— মন্মথনাথ ঘোষ, ১৯৩২। পৃঃ ২০।

৩১৫। তদেব। পৃঃ ১৮—১৯।

৩১৬। স্বর্ণকুমারী দেবী,— সাহিত্য সাধক চরিতমালা। ৫ম সংস্করণ, ১৯৫৪। পৃঃ ২৪।

৩১৭। রবীন্দ্র-জীবনী (৩য় খণ্ড)— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ১ম সংস্করণ ১৯৫২। পৃঃ ২৭০।

৩১৮। ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন (১ম খণ্ড)। প্রকাশক শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ, ৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড। পৃঃ ১—২৬।

৩১৯। তদেব। পৃঃ ৬৩—৬৬।

৩২০। তদেব। পৃঃ ৭১—৭৫।

৩২১। শ্রীযুক্ত অমিয়ভূষণ বসুর নিকট জ্ঞাত।

৩২২। The late Sm. Swarna Kumari Devi– A short sketch of her career– by Amiya Bhusan Basu. The Calcutta Municipal Gazette. 9th July, Saturday, 1932.

৩২৩। Introduction by E.M.Lang. An Unfinished Song (1913). p. 5.

৩২৪। শ্রীযুক্ত অমিয়ভূষণ বসুর নিকট জ্ঞাত।

দ্বিতীয় ভাগ

দীপনির্ব্বাণ

বাঙলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে মহিলা ঔপন্যাসিকের পথ প্রথম সুগম করেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী। এক্ষেত্রে তিনিই হলেন পূর্বসূরী। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্ব্বাণ' (১৮৭৬) স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। মুসলমানদের হস্তে ভারতীয় হিন্দুরাজপুত বীরের পরাজয় ও ভারতভূমির অধীনতার বেদনার্ত পটভূমিতেই 'দীপনির্ব্বাণে'র কাহিনী গড়ে উঠেছে। এর ইতিহাসের দিকটা হল দিল্লী অধিপতি চৌহান বংশীয় বীর পৃথ্বিরাজ ও তাঁর সহায়কারী সুহৃদ চিতোরের রাণা রাজপুত বীর সমরসিংহের সঙ্গে তুর্কি মহম্মদ ঘোরীর থানেশ্বরে বিরাট সংগ্রাম। মহম্মদ ঘোরী শৌর্যশালী হিন্দুকে পরাস্ত করে ভারতভূমিতে আধিপত্য বিস্তার করেছে ন্যায় যুদ্ধে নয়, হিন্দুরই স্বদেশদ্রোহিতা ও রাজনীতি বিরুদ্ধ উদারতার সুযোগ নিয়ে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে লেখা উপহার পত্রেই স্বর্ণকুমারীর ভারতভূমির পরাধীনতা জনিত অন্তর্বেদনার প্রকাশ ঘটেছে :—

আর্য-অবনতি-কথা, পড়িয়ে পাইবে ব্যথা,
বহিবে নয়নে তব শোক অশ্রু ধার!
কেমনে হাসিতে বলি, সকলি গিয়েছে চলি,
ঢেকেছে ভারত-ভানু ঘন মেঘজাল—
নিভেছে সোনার দীপ, ভেঙ্গেছে কপাল!

'দীপনির্ব্বাণে'র লেখিকার উদ্দেশ্য এই "আর্য-অবনতি-কথা"-র মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবোধ উদ্দীপ্ত করা। জাতীয়তাবোধ সমকালীন সমাজে ও সাহিত্যে বিরাট আন্দোলন ও প্রেরণা এনেছিল। 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭) থেকে এই জাতীয়তাবোধের উন্মেষ, যে মেলা ঠাকুরবাড়ীর স্বদেশচর্চার একটা প্রত্যক্ষ রূপ। 'হিন্দুমেলা'য় বা জাতীয়তার আন্দোলনে তৎকালীন প্রায় প্রত্যেক মনীষী সাহিত্যিকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। ঠাকুরবাড়ীর স্বদেশচেতনার উন্মেষ বহুকাল থেকে, দ্বারকানাথের (১৭৯৪—১৮৪৬) সময় থেকেই বলা চলে। তাঁর স্বাদেশিকতাবোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলেছেন : "আমার পিতামহ এবং ছোটোকাকা মহাশয় বিলাতের সমাজে বর্ষ যাপন করিয়া ইংরাজের বেশ পরিয়া আসেন নাই, এই দৃষ্টান্ত আমাদের পরিবারের মধ্যে সজীব হইয়া আছে। ... আমাদের পিতামহ ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে বেলগাছির বাগানে নিমন্ত্রণ করিয়া সর্বদা ভোজ দিতেন, এ কথা সকলেই জানেন। কিন্তু শুনিয়াছি তিনি পিতাকে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন যে, ইংরাজকে যেন খানা দেওয়া না হয়। তাহার পর হইতে ইংরাজের সহিত সংস্রব আর আমাদের নাই; এবং পিতামহের আমল হইতে আজ পর্যন্ত সরকারের নিকট হইতে খেতাব লোলুপতার

উপসর্গ আমাদের পরিবারে দেখা দেয় নাই।"[১] দ্বারকানাথের স্বদেশচেতনাই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন তাঁর পুত্র, পৌত্র পৌত্রীরা। পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের সুগভীর স্বদেশ নিষ্ঠা ও জাতীয়তা চর্চার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে : "আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে স্বদেশের জন্য বেদনার মধ্যে আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমাদের পরিবারে বিদেশী প্রথার কতকগুলি বাহ্য অনুকরণ অনেকদিন হইতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই— কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ সাগ্নিকের পবিত্র অগ্নির মতো বহুকাল হইতে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।"[২] পরিবারের পিতা ও ভ্রাতাদের এই পরিবেশে স্বর্ণকুমারী মানুষ হয়েছেন, এবং তিনি তাঁদের বিশেষ স্নেহধন্য কন্যা ও ভগ্নী ছিলেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের প্রবল স্বদেশানুরাগ ও চর্চা যে কন্যা এবং ভগ্নীকেও প্রভাবিত করবে, তাতে আর সন্দেহ কি? বাড়ীর এই স্বদেশচর্চার পরিবেশ আর বাইরে 'হিন্দুমেলা'র প্রবল জাতীয়তাবোধের আলোড়ন স্বর্ণকুমারীর মনে স্বদেশানুরক্তির বীজটিকে রোপন করে দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

স্বাদেশিকতার উন্মেষকারী প্রথম অনুষ্ঠান 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭) স্বর্ণকুমারীর ভায়েদেরই প্রচেষ্টার ফল। 'দীপনির্ব্বাণে'র লেখিকার স্বদেশচেতনার উৎস হিসেবে হিন্দুমেলার উল্লেখ প্রসঙ্গ বহির্ভূত অবশ্যই নয়। 'ছাতুবাবু' বা আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার বাগানে হিন্দুমেলার যখন প্রথম অধিবেশন হয় (১৮৬৭ সালের ১২ই এপ্রিল)[৩] তখন স্বর্ণকুমারীর বয়স বারো। হিন্দুমেলার জাতীয়তাবোধ উপলব্ধির বয়স তখন তাঁর হয়েছে। কারণ যে মেয়ে একুশ বছরে 'দীপনির্ব্বাণে'র মত উপন্যাস লিখতে পারেন, তাঁর পক্ষে বারো বছরে স্বদেশ প্রেমানুভূতিতে প্রভাবিত হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। স্বর্ণকুমারী 'হিন্দুমেলা'র জাতীয়তাবোধের প্রভাব যে এড়াতে পারেন নি তা সহজেই অনুমেয় 'দীপনির্ব্বাণ' উপন্যাস থেকে, বিশেষ করে 'হিন্দুমেলা' যখন তাঁর ভায়েদেরই স্বদেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "দেশানুরাগ প্রচারের উদ্দেশ্যে আমাদের বাড়ী হইতে হিন্দুমেলা নামে একটি মেলার সৃষ্টি হইয়াছিল। ... বড়দাদা এবং আমার খুড়তুতো ভাই গণেন্দ্রদাদা ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন— তাঁহারা নবগোপাল মিত্রকে এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিযুক্ত করিয়া ইহার ব্যয়ভার বহন করিতেন।"[৪] পরবশ্যতার আত্মগ্লানি থেকে এই জাতীয়তাবোধের উন্মেষ, তাই হিন্দুমেলার মূল লক্ষ্য ছিল জনসাধারণকে আত্মনির্ভরতার দীক্ষা দেওয়া, এবং এই আত্মনির্ভরতার প্রেরণা দিয়ে এদেশবাসীর পরমুখী মনকে ঘরের দিকে ফেরালো হিন্দুমেলা।[৫]

১। জীবনস্মৃতি— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৬৩ মাঘ)। গ্রন্থ পরিচয় : "স্বাদেশিকতা" প্রথম পাণ্ডুলিপি। পৃঃ ১৯৯।

২। ঐ। পৃঃ ১৯০- ১৯১।

৩। হিন্দুমেলার বিবরণ— শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা', ৬৭বর্ষ, ২য় সংখ্যা। ১৩৬৭ সাল।

৪। জীবনস্মৃতি। গ্রন্থ পরিচয় : স্বাদেশিকতা, ১ম পাণ্ডুলিপি, পৃঃ ১৯১।

৫। চৈত্রমেলার উদ্দেশ্য— হিন্দুমেলার দ্বিতীয় বর্ষে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পঠিত। শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। সা: প: পত্রিকা, ৬৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করার জন্য মেলায় নানাবিধ স্বদেশী পণ্যের প্রদর্শনী হত, তাছাড়া শিক্ষিত গুণী ব্যক্তি, শিল্পী, ব্যায়ামবীরদের পুরস্কৃত করে উৎসাহও দেওয়া হত।[৬]

'হিন্দুমেলা'র মূলমন্ত্র আত্মনির্ভরতায় জাতীয়তার বিকাশ প্রথম অনুভব করেছিলেন রাজনারায়ণ বসু (১৮২৩—৯৯)। উনবিংশ শতকের বাংলাদেশের ধর্ম, সমাজ সংস্কার, শিক্ষার নানাবিধ আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের (১৮১৭—১৯০৫) সঙ্গে নিবিড় হৃদ্যতার মধ্যে দিয়ে তিনি ঠাকুরবাড়ীর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন। ঠনঠনিয়ার এক পোড়ো বাড়িতে ১৮৭৬ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "সঞ্জীবনী সভা" নামে এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছিলেন। রাজনারায়ণ বসুই এই সভার অধ্যক্ষ ছিলেন। গুপ্ত ভাষায় সভাকে বলা হ'ত "হামচুপামুহাফ"। রবীন্দ্রনাথও এই সভার একজন সভ্য ছিলেন। "জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কার্যই এই সভায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।"[৭] এই সভায় অনুসৃত স্বাদেশিকতার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসু সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :— "এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জিনিষ। দেশের সমস্ত খর্বতা, দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান করিতেন— গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না—

একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন।
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।"[৮]

'হিন্দুমেলা'র জাতীয়তাবোধ, স্বনির্ভরতার উৎস ছিল ১৮৬৬ সালে নবগোপাল মিত্রর 'ন্যাশানাল পেপারে' (প্রথম প্রকাশ ৭ই আগষ্ট ১৮৬৫) প্রকাশিত রাজনারায়ণ বসুর 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা'র কার্যাবলীর ভিত্তিতে রচিত ইংরেজী অনুষ্ঠানপত্র—

Prospectus of a Society for the promotion of National feelings among the educated natives of Bengal.

রাজনারায়ণ বসুর স্বমন্তব্যই এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় : "আমরা যখন সংকীর্ণ গৃহে অস্পষ্টবর্তিকার আলোকে জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার কার্য করিতাম তখন আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই যে, তাহা হইতে চৈত্র (হিন্দু) মেলারূপ বৃহৎ ব্যাপার সম্ভূত হইবে। মেলার ভাবটি নূতন, তাহা আমাদিগের মনে উদিত হয় নাই, কিন্তু মেলা সংস্থাপক মহাশয় তৎসংস্থাপন কার্যে আমাদিগের প্রকাশিত "Prospectus of a Society for the promotion of National Feeling among the educated Natives of Bengal". প্রস্তাব দ্বারা

৬। জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত— যোগেশচন্দ্র বাগল। (১৩৫২ বঙ্গাব্দ)। পৃঃ-১৫ ১৬।
৭। রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড— শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। সংশোধিত সংস্করণ ১৩৬৭ পৌষ। পৃঃ ৬০, স্বাদেশিকতা · সঞ্জীবনী সভা।
৮। জীবনস্মৃতি— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ মাঘ)। 'স্বাদেশিকতা', পৃঃ ৮১—৮২।

যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন ও তাহা হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মেলায় কোন কোন বিষয়ে ঐ প্রস্তাব অনুসারে অবিকল কার্য হইয়া থাকে ইহা তিনি স্বীয় ঔদার্য ও মহত্ত্বগুণে অবশ্য স্বীকার করিবেন।"[৯]

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০—১৯২৬) "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি"[১০] ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪২—১৯২৩) "মিলে সবে ভারত সন্তান"[১১] গানই ছিল হিন্দুমেলার জাতীয়তাবোধের মূলমন্ত্র। প্রকৃত স্বদেশপ্রেমের গান এসময় থেকেই রচিত হতে থাকে। হিন্দুমেলার প্রথম তিনবছর সম্পাদক ছিলেন গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১—৬৯)। তারপর ৪র্থ থেকে ৭ম অধিবেশনের (১৮৭৬) সভাপতি হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১২] হিন্দুমেলা-প্রসূত জাতীয়তাবোধ সমগ্র ভারতভূমিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। "ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়।"[১৩] "চারদিকে ভারত, ভারত— ভারতী[১৪] কাগজ বের হল। বঙ্গ বলে কথা ছিল না তখন। ভারতীয় ভাবের উৎপত্তি হল ওই তখন থেকেই, তখন থেকেই সবাই ভারত নিয়ে ভাবতে শিখলে।"[১৫] দীপনির্ব্বাণের লেখিকার ভারতভূমিতে 'আর্য-অবনতি'র বেদনা বোধের উৎসও এই স্বদেশচেতনা।

৯। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত। (১ম সংস্করণ ১৩১৫ বঙ্গাব্দ) চতুর্থ সংস্করণ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৮২।

১০। সমগ্র গানটি · "মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি।
দিবারাত্রি ঝরিছে লোচন— বারি।।
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমার হায় সহিতে না পারি।"

দ্রঃ সাহিত্য সাধক চরিতমালা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (১ম সংস্করণ ১৯৪৭) ২য় সংস্করণ ১৯৫৮, পৃঃ ১৫।

১১। "মিলে সবে ভারত সন্তান,
একতান সমপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।।
২
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত খনি রত্নের নিধান।।
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।।

সমগ্র গানটি ৭টি স্তবকে রচিত।

দ্রঃ সাহিত্য সাধক চরিতমালা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১ম সংস্করণ ১৯৪৭)। ২য় সংস্করণ ১৯৬০, পৃঃ ২০-২৩।

১২। জীবনস্মৃতি। গ্রন্থপরিচয় স্বাদেশিকতা। "দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ" — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিশ্বভারতী পত্রিকায় ১৩৫২ বৈশাখ- আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত। পৃঃ ১৯২।

১৩। জীবনস্মৃতি স্বাদেশিকতা— পৃঃ ৭৮।

১৪। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী মিলে দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকা ১ম প্রকাশ করেন ১৮৭৭ (১২৮৪ বঙ্গাব্দে) সালে।

১৫। ঘরোয়া— অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (১ম সংস্করণ ১৯৪১) ১৯৫১ সংস্করণ, পৃঃ ৭২।

স্বাদেশিকতার এই চেতনায় হিন্দুত্বের একটা সূক্ষ্ম অভিমানও যে একেবারে না ছিল, তা নয়। মনস্বী ঔপন্যাসিক, চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রভৃতি যাঁরাই পরাধীনতার আত্মগ্লানি হেতু জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়েছেন, তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু, এবং তাঁদের স্বদেশচেতনাও এই আত্মাভিমান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।[১৬] মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮—১৯৩২) তাঁর 'নবযুগের বাংলা' গ্রন্থে ঊনবিংশ শতকের জাতীয়তার উন্মেষ পর্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[১৭] 'হিন্দুমেলা'রও এই হিন্দুয়ানির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর চতুর্থ বার্ষিক (১৮৭০) মেলার সম্পাদকীয় প্রস্তাবে।[১৮] আমাদের এই স্বদেশানুরাগ এসেছিল কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা থেকেই। বহু ত্রুটিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজী শিক্ষা আমাদের সুদীর্ঘকালের মোহসুপ্তি ঘুচিয়ে নূতন যুগের কর্মে চিন্তায় যুক্তিবোধে যে দীক্ষা দিয়েছিল অর্থাৎ তামসিকতা থেকে রাজসিকতায় আমাদের উত্তরণ ঘটিয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। এই নবযুগের যুক্তি বোধেই শিক্ষিত বাঙালী বুঝেছিল পরবশ্যতা থেকে মুক্ত না হলে, আত্মনির্ভরশীল না হলে জাতির উন্নতি নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকা, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্তের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) এই চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। নব্যশিক্ষিত বাঙালীর এই দেশচেতনা ছিল একটা 'আইডিয়া', এবং স্বদেশানুরাগ ছিল তাঁদের জীবনে আচরণীয় একটি ধর্ম। এই স্বদেশচেতনা ঊনবিংশ শতকের সাহিত্যেও যথেষ্ট প্রেরণা যুগিয়ে ছিল স্বদেশচর্চার।

দেশপ্রেমের বা জাতীয়তার বিকাশের একটি উপায় ছিল ভারতেতিহাসের অতীত গৌরবময় স্মৃতিচারণা এবং এই প্রাচীন শৌর্যবীর্য কাহিনীর ইতিহাস অন্বেষণে তাই মগ্ন হয়েছিলেন এ সময়ের সাহিত্যিক ঔপন্যাসিকরা তাঁদের দেশপ্রেমের 'আইডিয়া'-কে প্রত্যক্ষ রূপ দিতে। অজ্ঞাত ভবিষ্যতের মতই না জানা অতীতের প্রতিও মানবমনের চিরন্তন কৌতূহল, দেশপ্রীতির পরাকাষ্ঠা বীরত্ব আত্মত্যাগ দেখাতে তাই ঔপন্যাসিকরা বেছে নিলেন অতীত ভাবতের গৌরবেতিহাস। স্বাভাবিক ভাবেই তাই সাহিত্যে স্বদেশ-চেতনার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল ইতিহাস অন্বেষণ। 'বঙ্গদর্শনে'র মাধ্যমে বঙ্কিম উৎসাহ দিতে লাগলেন এ কাজে দেশবাসীকে, দেশের অতীত ইতিহাস ও প্রাচীন গৌরবের কথা আলোচনা করে। ইতিপূর্বেই রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২—৯১) পুরাবৃত্ত, নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান, ইতিহাস আলোচনায় জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করেছিলেন ১৮৫১ সালে তাঁর "বিবিধার্থ সংগ্রহ অর্থাৎ পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা, শিল্পসাহিত্যাদি দ্যোতক মাসিকপত্র" প্রকাশ করে (১৭৭৩ শক, কার্তিক)। ইংরেজী শিক্ষাপ্রভাবে ও সাহিত্য পাঠে জাত বাঙালীর দেশপ্রেমের প্রবল আগ্রহে কিছুটা তৃপ্তি দিতে পেরেছিল দুটি খণ্ডে প্রকাশিত "The annals and

১৬। নিদর্শন স্বরূপ-উল্লেখ্য রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' (১৮৭৩), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা প্রভৃতি।

১৭। নবযুগের বাংলা— বিপিনচন্দ্র পাল, ১৩৬২। পৃঃ ১৪১।

১৮। হিন্দুমেলার বিবরণ— শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোঃ সঙ্কলিত। ব সা প পত্রিকা, ৬৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৭ সাল।

Antiquities of Rajsthan or the Central & Western Rajpoot States of India"– গ্রন্থ, যার লেখক হলেন Lient. Col. James Tod.। এছাড়া J.H. Caunter এর Romance of History – India গ্রন্থের দুটি খণ্ডও এই ইতিহাস-রোমান্স তৃষ্ণা মিটিয়ে ছিল। ভারতের অতীত গৌরবেতিহাসে মারাঠা রাজপুতদের বীরত্ব কাহিনীই উজ্জ্বল হয়ে আছে। সাহিত্যিকরা তাই সেই মারাঠা, রাজপুতদের বীর্যময় অতীত গৌরবগাথাকেই বেছে নিলেন বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কল্পিত আদর্শকে তৃপ্ত করতে। টডের বই এই উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছিল।

জাতীয়তা বোধোদ্দীপক ইতিহাস চেতনাকে বাংলাকাব্যের পথে প্রথম উন্মুক্ত করেছিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭—৮৭)। ভারতীয় অতীত ঐতিহ্যে গৌরবান্বিত চিত্ত রঙ্গলাল স্বদেশপ্রীতির উৎসাহে টডের রাজস্থান কাহিনী অবলম্বনে লিখেছিলেন 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮)। ১৮৫২ সালে বীটন সোসাইটির এক অধিবেশনে হরচন্দ্র দত্ত ইংরেজী কবিতার সঙ্গে তুলনা করে বাংলা কবিতার অপকৃষ্টতা দেখান, এবং এর কারণ স্বরূপ দেখান যে, বাঙালী বহুকাল পরাধীন থাকায় এদের মধ্যে যথার্থ কবি কেউ হতে পারেন নি।[১৯] এর প্রতিবাদে রঙ্গলাল 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' সভায় পাঠ করেন।[২০] স্বজাতি কর্তৃক পরাধীনতার বোধহেতু বাঙালীর কাব্যরচনার ক্ষমতা-হীনতার দুর্নামে পীড়াবোধ করে ও তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের উৎসাহে এই দুর্নাম অপনোদনে সচেষ্ট হন রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যান' লিখে। রাজপুত কাহিনী অবলম্বনে কাব্যরচনার প্রেরণা সম্পর্কে তিনি ভূমিকায় বলেন : "... ভারতবর্ষে স্বাধীনতার অন্তর্ধানকালাবধি বর্তমান সময় পর্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দিষ্ট কাল মধ্যে এ দেশের পূর্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ তাহা রাজপুতানা দেশেই ছিল। বীরত্ব ধীরত্ব ধার্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদগুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, বিদুষীত্ব এবং সাহসিকত্ব গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্যপাঠে লোকের আশুচিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুতেতিহাস অবলম্বনপূর্বক মৎকর্তৃক রচিত হইল।" নব্যশিক্ষিত বাঙালীর জাতীয়তাবোধের প্রথম কাব্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান'- এর "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" সঙ্গীত যদিও ইংলণ্ডে নির্বাসিত স্বদেশপ্রেমিক আইরিশ কবি মুর-এর কবিতাংশের অনুবাদ তথাপি গানটি স্বাধীনতাকামী পরাধীন বাঙালীরই অন্তরানুভূতি। 'রাজস্থানীয় সতীবিশেষের চরিত্র' নিয়ে রঙ্গলালের আর একটি কাব্য 'কর্ম দেবী'তেও স্বদেশানুরক্তির অভিব্যক্তি হয়েছে। পুরাতত্ত্বজ্ঞ, প্রাচীন ঐতিহ্যে শ্রদ্ধান্বিত চিত্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে কবি এ গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন কারণ তাঁর কাব্য রচনায় রাজেন্দ্রলালের বিশেষ

১৯। 'পদ্মিনী উপাখ্যান'— রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৮৫৮) ভূমিকা।

২০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস— ২য় খণ্ড— ডঃ সুকুমার সেন। (১ম সং ১৯৪৩) তৃতীয় সং ১৯৫৫। পৃঃ ১০৯।

উৎসাহ ছিল।[২১] কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন, সৎ কবিতা রচনায় উৎসাহ প্রদানার্থ কর্ম দেবী রচনা। রঙ্গলালের দেশপ্রেমের আদর্শ কর্মদেবীতে স্পষ্টতর হয়েছে।[২২] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য 'দীপনির্ব্বাণে'র কর্মদেবী আর এই কর্ম দেবী এক ব্যক্তি নন। 'দীপনির্ব্বাণে'র কর্মদেবী চিতোর রাণা সমরসিংহের পত্নী ও কিরণসিংহের মাতা। টডের ইতিহাসে যিনি কমলদেবী নামে পরিচিতা, তিনি পত্তন রাজকন্যা। 'কর্মদেবী' কাব্যের কর্মদেবী যশলক্ষ্মীর অন্তঃপাতি পুগলদেশের ভট্টিপতি মানিক্য দেবরায়ের কন্যা। পিতা তাঁর বিবাহ স্থির করেন রাজস্থানের অন্তর্গত রাঠোর রাজ অরণ্যকমলের সঙ্গে। কিন্তু কর্মদেবী পিতার অতিথি সাধু অনঙ্গ কুমারকে ভালবাসেন ও তাঁর সঙ্গে পরিণীতা হন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪—৭৩) 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের (১৮৬১) কৃষ্ণকুমারীর তেজোদৃপ্ত আত্মত্যাগ যুগের স্বদেশপ্রেমকেই উদ্দীপ্ত করেছে। টডের রাজস্থান থেকে বিষয়বস্তু গৃহীত হলেও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের সঙ্গে মূল ইতিহাসের যোগসূত্র কম। তবু মধুসূদনের স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের পরিচায়ক হিসেবে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের উল্লেখ করা যেতে পারে। মুসলমান প্রভাবে ভারতের পূর্ব গৌরবদীপ্তি ম্লান হওয়ার জন্য ভীমসিংহের খেদোক্তির মধ্যে সমকালীন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর স্বদেশানুরাগ অভিব্যক্ত।

রাজপুত ইতিহাসের কৃষ্ণকুমারীর নির্ভীক আত্মত্যাগের কাহিনী এর আগে আলোচনা করেছেন স্বর্ণকুমারীর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় ১৮৫৭ সালে (১৭৭৯ শকাব্দের পৌষ সংখ্যায়) 'কৃষ্ণকুমারী ইতিহাস' প্রবন্ধে। টডের ইতিহাসেরই অবিকল অনুসরণ এ প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধের পশ্চাতেও স্বদেশানুরাগই সক্রিয় বলে মনে হয়।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৩৮—১৯০৩) 'ভারত সঙ্গীত' কবিতাটিও এই স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী'তে (১৮৭৭) সঙ্কলিত কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫—৯৪) সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় ১৮৬৯ সালে (১২৭৭ বঙ্গাব্দের ৭ই শ্রাবণ)।[২৩] ভারতবাসীর পরনির্ভরশীল জীবনের অলসমোহের অবসান করতে কবির আত্মধিক্কার তীব্র হয়েছে এ কবিতায় :

> "ধিক্ হিন্দুকূলে : বীর ধর্মভুলে,
> আত্ম অভিমান ডুবায়ে সলিলে,
> দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু করতলে,
> সোনার ভারত করিতে ছার!"[২৪]

২১। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' · ভূমিকা।

২২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড— ডঃ সুকুমার সেন। পৃঃ ১১৫।

২৩। হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী— বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত। "কবিতাবলী" (১ম খণ্ড)। (প্রথম প্রকাশিত ১৮৭০)। ১ম সংস্করণ ১৯৫৩। ভূমিকা। পৃঃ ।০।-

২৪। ঐ। কবিতাবলী ১ম খণ্ড। পৃঃ ১১৫—২১।

পূর্বেই বলেছি, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে ইংরেজীনবীশদের দেশপ্রেম আইডিয়ার বাস্তব রূপায়ণে তথ্য সরবরাহ করে অনেক সাহায্য করেছে টড ও কণ্টরের গ্রন্থ। ঔপন্যাসিকগণ তাঁদের দেশপ্রেমের 'বীর পূজো'-কে রূপায়িত করেছেন উক্ত দুই গ্রন্থের উপকরণে রোমান্স সৃষ্টি করে। বাংলা সাহিত্যে প্রথম রোমান্স সৃষ্টি ইংরেজী আদর্শে ভারতের অতীত গৌরবেতিহাস অবলম্বনে। এ রোমান্স সৃষ্টির পথপ্রদর্শক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৫—৯৪) 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র (১৮৬২—৬৩) 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' কাহিনী দুটি। কণ্টরের গ্রন্থ অবলম্বনে পূর্ব গৌরব ইতিহাস লিখে রোমান্স রচনা প্রচেষ্টাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' (১৮৫৭) শিবাজীর বীরত্ব, আওরঙ্গজেবের কন্যা রোসেনারার ত্যাগদীপ্ত গভীর প্রেমের কাহিনীর মধ্য দিয়ে রোমান্স সৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক রোমান্স রচয়িতা বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'-র (১৮৫৫) আয়েষা ও অভিরাম স্বামীর চরিত্রে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ের' রোসেনারা ও রামদাস স্বামীর প্রভাব আছে বলে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন।[২৫]

যাই হোক, জাত্যাভিমান ও জাতীয় সংস্কৃতি নির্মাণ করতে বঙ্কিমের পক্ষেও অতীত ভারতের গৌরবকীর্তন অপরিহার্য হয়েছিল। ঐতিহাসিক রোমান্স সৃষ্টির পথে বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮—৯৪) আনলেন জাত্যাভিমান, স্বদেশানুভূতি, তার সঙ্গে মিশ্রিত হল তাঁর গল্প বলার সহজাত নৈপুণ্য। জাতীয়তা উদ্বোধনের অন্যতম একজন গুরু, বঙ্কিমের গভীর স্বদেশপ্রেমজাত উপন্যাস 'মৃণালিনী' বার হল 'হিন্দুমেলা' অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে ১৮৬৯ সালে। প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে, "বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর আগ্রহের প্রথম পরিচয় পাই তাঁর মৃণালিনী উপন্যাসে।"[২৬] বঙ্কিমের স্বদেশচর্চার বীজটি উপ্ত হল মৃণালিনীতে। এ উপন্যাসে বাংলাদেশের পরাজয়ের লজ্জাবহ গ্লানির মূলে লক্ষ্মণ সেনের ভীরু পলায়ন ও পুরোহিত তন্ত্রের ষড়যন্ত্র কল্পনা করে জাত্যাভিমানী বঙ্কিমচন্দ্র সন্তুষ্ট হতে চেয়েছেন। ইংরাজী সাহিত্যেও এই অতীতাশ্রয়ী রোমান্স সৃষ্টি করেছেন ওয়াল্টার স্কট (১৭৭১—১৮৩২) এবং তাঁরও ছিল গল্পবলার সহজাত ক্ষমতা।[২৭] বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিত হয়েছিলেন স্কটের দ্বারা এবং 'মৃণালিনী'-তে তা তিনি স্বীকার করেছেন। 'মৃণালিনী'-র প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে ছিল 'ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস' এবং আরম্ভ ছিল স্কটের The Bride of Lammermoor-এর মতো। প্রচলিত সংস্করণে বর্জিত প্রথম সংস্করণের প্রথম দুটি পরিচ্ছেদ 'রঙ্গভূমি' ও 'গজহস্তা'। 'রঙ্গভূমি' পরিচ্ছেদে মহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি কুতবউদ্দীনের বিজয়ী সেনাপতি বক্তিয়ার খিলজী মগধ জয় করে এসে কুতবউদ্দীনের সামনে বীরত্ব দেখাতে গজযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। হঠাৎ তিনি বিপদাক্রান্ত হলে হেমচন্দ্র অলক্ষ্য থেকে হস্তীকে তীরবিদ্ধ করে তাঁকে রক্ষা করেন। হেমচন্দ্রের বীরত্ব প্রদর্শনই এই বর্জিত

২৫। বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাস (২য় খণ্ড)- - ডঃ সুকুমার সেন। পৃঃ ১৮৩ --৮৪।

২৬। বাংলাব ইতিহাস সাধনা— প্রবোধচন্দ্র সেন, ১৯৫৩। পৃঃ ১৯৬।

২৭। Tales of My Landlord, Third Series (The Bride of Lammermoor and The Legend of Montrose , 1819)– Walter Scott

পরিচ্ছেদ দুটির প্রধান উদ্দেশ্য। 'রঙ্গভূমি'র পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেন হেমচন্দ্রের বীরত্ব বা বক্তিয়ার খিলজীকে রক্ষা করার প্রসঙ্গে পাঠকের ব্রাইড অফ ল্যামারমুরের কথা মনে হতে পারে। ব্রাইড অফ ল্যামারমুরে বক্তিয়ার খিলজীর মত লর্ড কিপার গভীর অরণ্যে বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন Edgar কর্তৃক। প্রথম সংস্করণের উক্ত দুটি পরিচ্ছেদে 'মৃণালিনী'র ঐতিহাসিক ভাবটি বজায় ছিল। প্রচলিত সংস্করণে পরিচ্ছেদ দুটি বর্জিত হয়ে রোমান্সের চমকপ্রদ ভাব কিছুটা লঘু হয়েছে। এ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বিন্ বক্তিয়ার খিলজী ও লক্ষ্মণ সেন দেবের যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাতে শেষে দেখা যায় তিনি 'তুরক' শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'তুরক' 'পাঠান', 'মোগল' যে এক নয়, এই ঐতিহাসিক দৃষ্টি ও নিষ্ঠা বঙ্কিমের ছিল।[২৮] সমসাময়িক স্বাজাত্যাভিমানের সঙ্গে যে 'মৃণালিনী'-র যোগ ছিল সে বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় (১৮৪৭—১৯১৯) উল্লেখ করেছেন।[২৯] 'মৃণালিনী'-র তিন বছর পরে (১৮৭২) বার হল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা যার মধ্যে বাঙালীর ইতিহাস অনুসন্ধানে আগ্রহ জাগিয়ে তিনি স্বাজাত্যাভিমান উদ্দীপ্ত করে ইংরেজীনবীশ বাঙালীকে ঘরে ফেরার পথ দেখিয়েছেন।

দেশ এবং পরিবারের এই প্রবল স্বাদেশিক চেতনার আলোড়নের মধ্যে কেটেছে স্বর্ণকুমারীর বাল্য ও কৈশোর। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'দীপনির্ব্বাণ' উপন্যাস লেখিকার অল্প বয়সের লেখা, ও সেই কারণবশতঃ উপন্যাসে কাঁচা হাতের ছাপ আছে।[৩০] দীপনির্ব্বাণ' যখন বার হয় (১৮৭৬) স্বর্ণকুমারীর বয়স তখন একুশ বছর। এটিই লেখিকার প্রথম উপন্যাস তাই নির্মাণ কৌশলের দিক থেকে খুব বেশি পরিণত নৈপুণ্য এতে অবশ্যই আশা করা যায় না, কিন্তু পিতা ও ভ্রাতাদের উৎসাহে আনুকুল্যে এবং সমসাময়িক যুগপ্রভাবে যে স্বদেশচেতনা ঐ অল্পবয়সেই তিনি অর্জন করেছিলেন, তার মূল্য বড় কম নয়। মনস্বিনী মহিলা স্বর্ণকুমারীর এই স্বদেশচর্চারই অভিব্যক্তি 'দীপনির্ব্বাণ' এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবোধের ভাবোদ্দীপনায় প্রতিনিধিত্ব করছে যে সাহিত্য সম্ভার তার মধ্যে নিঃসন্দেহে 'দীপনির্ব্বাণে'র একটি স্থায়ী আসন আছে।

জাতীয় সংস্কৃতিকে গড়ে তুলতে বাংলা নাট্যসাহিত্যে এগিয়ে এসেছিলেন স্বর্ণকুমারীর নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮—১৯২৫)। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে দায়িত্ব

২৮। উপন্যাসের কথা — শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য — মে ১৯৬১। পৃঃ ১৬১।

২৯। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'— শিবনাথ শাস্ত্রী (১৯০৪)। নিউ এস ২য় সংস্করণ, ১৯৫৭।

"কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সোমপ্রকাশ, মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি, এই সকলে এই কালের মধ্যে (অনুমিত ১৮৬০—৭০) শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিয়া দিতেছিল, তেমনি আর এক কার্য্যের আয়োজন হইয়া নব আকাঙ্ক্ষার উদয় করিয়াছিল। তাহা "ন্যাশনাল পেপার" নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত, 'জাতীয় মেলা' নামক মেলা ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের তাহার সহিত যোগ। বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তে ইহা একটি প্রধান ঘটনা, কারণ সেই যে বাঙ্গালীর মনে জাতীয় উন্নতির স্পৃহা জাগিয়াছে তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই।" পৃঃ ২৩০।

৩০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা— ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। (১ম সং ১৯৩৮)। ৩য় সং ১৯৫৬। পৃঃ ২[illegible]।

পালন করেছিলেন নাটকে সেই গুরুদায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। শাসকের অর্থনৈতিক কুৎসিত শোষণে শাসিতের মর্মবেদনার রূপটি প্রথম প্রকাশ করেছিলেন দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০—৭৩) 'নীলদর্পণে' (১৮৬০)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঙলা নাটকে স্বদেশানুরাগের অভিব্যক্তি দিলেন। তাঁর সার্বজনীন পোষাক, স্বদেশী দেশলাই তৈরী প্রচেষ্টা, মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দীর নতুন কলের তাঁত চালানোয় প্রেরণা দান, জাহাজ চালানোর প্রচেষ্টা প্রভৃতি সমস্ত কাজের মধ্যে যে প্রবল স্বদেশানুরাগ অভিব্যক্ত হয়েছিল, তার সক্রিয় রূপ তিনি সৃষ্টি করলেন নাট্যসাহিত্যে। তাঁর কথায় : "হিন্দু মেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুবাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম নাটকের ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইলেও হইতে পারে।"[৩১] এই আকাঙ্ক্ষায় তাঁর প্রথম নাটক বার হল 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪)।[৩১ক] এ নাটকে পুরুর বীরত্ব, কুল্লু পর্বতের কুমারী রাণী ঐলবিলার স্বদেশানুরাগ জাতীয়তাবোধোদ্দীপক। এর পাশেই সেকেন্দর শাহের প্রতি প্রণয়ানুরাগ বশতঃ অম্বালিকার স্বদেশস্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ, ও তক্ষশীলের ভীরু কাপুরুষোচিত আচরণে স্বদেশদ্রোহিতার ভাবটি সুন্দর পরিস্ফুট হয়েছে। স্বদেশপ্রেমিকা ঐলবিলার প্রতি পুরুর সমীহপূর্ণ আনুরক্তির অভিব্যক্তিস্বরূপ একটি নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে, যেখানে ঐলবিলার উদ্দেশ্যে পুরু বলছেন : "আমি জানি আপনার হৃদয়ে স্বাধীনতা স্পৃহা প্রজ্বলিত রয়েছে। আপনিই তো সকল রাজকুমারগণকে যবনরাজের বিরুদ্ধে একত্র করেছেন। আপনার চক্ষের সমক্ষে আমরা যে যবনরাজের সহিত যুদ্ধ করে গৌরব লাভ করব, এই আশাতেই আমাদের উৎসাহ আরও দ্বিগুণিত হয়েছে। সমরে গৌরব লাভ করে যাতে আপনার প্রেম লাভ করতে পারি, এই আমার মনের একমাত্র আকিঞ্চন।"[৩২] আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণের পটভূমিতে রাজপুতের স্বাদেশিকতা নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নাটক হল 'সরোজিনী' (১৮৭৫)। লক্ষ্মণসিংহ বিজয়সিংহ আদর্শ দেশপ্রেমিক। দেশজননীর কল্যাণে লক্ষ্মণসিংহ কন্যা সরোজিনী'-কে বলি দিতেও প্রস্তুত হন, পরে অবশ্য ভৈরবাচার্যরূপী আলাউদ্দীনের চর মহম্মদ আলির সব চক্রান্ত ধরা পড়ে গিয়ে সরোজিনী-বলি বন্ধ হওয়ায় লক্ষ্মণসিংহের পিতৃহৃদয় আশ্বস্ত হল। বিজয়সিংহের স্বদেশপ্রেমে তৎকালীন জাতীয়তাবোধের স্বরূপ পরিস্ফুট। নিদর্শন স্বরূপ বিজয়সিংহের উক্তির উল্লেখ করা যায় :

"পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভক্তির জন্য অদেয় থাকতে পারে? আমার

৩১। সাহিত্য সাধক চরিতমালা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ২২।

৩১ক। ফরাসী নাট্যকার রাসিনের (Racin), 'Alexander the Great' নাটকের অনুসরণ আছে এতে। নাটকটি ১৮৭৪ সালের ২২ আগষ্ট ও ৩রা অক্টোবর যথাক্রমে 'বেঙ্গল থিয়েটার' ও 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' জনসমাদরের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল --- সাহিত্য সাধক চরিতমালা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। (১ম সং ১৯৪৭), ২য় সং ১৯৫৫, পৃঃ ২৪।

৩২। পুরুবিক্রম নাটক— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭৪)। ২য় অঙ্ক, পৃঃ ৪৩।

জীবন বলিদান দিলেও যদি তিনি সন্তুষ্ট হন, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি।"[৩৩] 'দীপনির্ব্বাণে'-র তিন বছর পরে (১৮৭৯) প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' নাটকেও প্রতাপাদিত্য চরিত্রে এই স্বদেশচেতনা উদ্দীপ্ত হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন : "মহারাণা প্রতাপসিংহকে আমি আরাধ্য দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। তাঁহার বীরত্ব, তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাঁহার কুলনিষ্ঠা, তাঁহার দেশভক্তি আমাদের আদর্শ স্থল। চরিত্রের এই উচ্চ আদর্শ বঙ্গবাসীর সম্মুখে অর্পণ করাই এই নাটক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য।"[৩৪] একনিষ্ঠ অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমিক নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন স্বর্ণকুমারী, যে স্নেহ বর্ষিত হয়েছে শুধুই ব্যক্তিগত ঘরোয়া জীবনে নয়, ভগ্নীর সাহিত্য সঙ্গীত চর্চায় অকৃত্রিম প্রেরণা দানে তা স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের চিতোর ধ্বংস, লক্ষ্মণ সিংহের স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয়বস্তুর সঙ্গে দীপনির্ব্বাণের উপজীব্যের একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। 'সরোজিনী' 'দীপনির্ব্বাণে'র এক বছর আগেই প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে অনুমান করা যেতে পারে যে দুটি গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই। নিজে তিনি নাটকটি রচনার দায়িত্ব নিয়ে ভগ্নী স্বর্ণকুমারীকে প্রেরণা দিয়েছিলেন উপন্যাসটি রচনা করার। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী (১৮৫০—৯৮) ও রবীন্দ্রনাথের মিলিত সঙ্গীত সাহিত্য চর্চার আসরে স্বর্ণকুমারীও ছিলেন একজন যোগ্য সঙ্গী।[৩৫] ছোটবয়সে স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যগত রুচিও গড়ে দিয়েছিলেন নতুন-দাদা, "ইংরাজী হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জ্জমা" করে শুনিয়ে।[৩৬] অনুমান অসঙ্গত নয় যে, এ সময়েই স্বর্ণকুমারী স্কটের সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচিত হন, যে স্কটের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় 'দীপনির্ব্বাণে'। অবশ্য বঙ্কিমের সাহিত্য থেকেও প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন এমন কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা চলে।

স্বর্ণকুমারীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথও (১৮৬১—১৯৪১) ভারতভূমির পরাধীনতায় বেদনা বোধ করে নিতান্ত বাল্যবয়সে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' লিখেছিলেন। পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয়ে যাওয়ার আগে কিছুদিন যখন বোলপুরে ছিলেন (১৮৭২) রবীন্দ্রনাথ, সেই সময়ে

৩৩। সবোজিনী নাটক— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুব (১৮৭৫)। প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক, পৃঃ ৩৭। 'সবোজিনী' নাটকও বাসিনেব Iphigene (ইফিগেনেয়া) নাটকেব অনুসবণে লেখা। এব "জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ, দ্বিগুণ, পবাণ সঁপিবে বিধবা বালা" গানটি ববীন্দ্রনাথেব লেখা, যে গানটি লিখে ববীন্দ্রনাথ, জ্যোতিবিন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুবীব সাহিত্য সঙ্গীত চর্চার গোষ্ঠীতে প্রমোশন পেযেছিলেন।— জ্যোতিবিন্দ্রনাথেব জীবনস্মৃতি— বসন্তকুমাব চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, ১৯১৯ (১৩২৬ বঙ্গাব্দ ফাল্গুন)। পৃঃ ১৫১।

৩৪। জ্যোতিবিন্দ্রনাথ-— মন্মথনাথ ঘোষ, ১৯২৭ (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) পৃঃ ৮১। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য 'বৌঠাকুরাণীব হাট' উপন্যাসে (১৮৮২) প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে ববীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অন্য মত পোষণ করতেন। সেখানে প্রতাপাদিত্য অন্যাযকাবী, অত্যাচাবী, নিষ্ঠুব।

৩৫। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি— বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ১৫১।

৩৬। ঐ— পৃঃ ১১৯।

এটি লেখা।[৩৭] 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাব্যের রচনাকাল ১৮৭৩ ফেব্রুয়ারী-মার্চ বলে প্রবোধচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন। ১৮৯৪ অক্টোবর ২৩ তারিখে ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র থেকে জানা যায় যে, এই বীর রসাত্মক কাব্যখানি লিখিত হয়েছিল পেনসিলে, কালিতে নয়।''[৩৮] ঠাকুরবাড়ীর ছেলেমেয়েরা যেমন সমাজ সাহিত্যে জাতীয়তাবোধ উন্মেষে গভীর নিষ্ঠাব সঙ্গে তৎপর ছিলেন, তেমনি তাঁদের সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন, তাঁরাই এই পবিত্র কর্তব্যকর্মে প্রেরণা পেয়েছেন তাঁদের কাছ থেকে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-সুহৃদ স্বদেশনিষ্ঠ সাহিত্যসাধক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র (১৮৬১—১৯৩০) নাম স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার এই দুই সাহিত্যরথীর ইতিহাসপ্রেরণার একত্র সমাবেশ হয়েছিল 'ঐতিহাসিক চিত্র' পত্রিকায় (১৮৯৯), রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও প্রেরণায় যার সম্পাদকতা করেছিলেন অক্ষয় মৈত্রেয়।[৩৯] উভয় সাহিত্যরথীর স্বাজাত্যাভিমানের পরিচয় বহন করছে এই পত্রিকা।[৪০] ঠাকুরবাড়ীর আত্মীয়-বন্ধু সবাই মিলে ঊনবিংশ শতকের সাহিত্য-পত্রিকায়-সংস্কৃতিতে স্বাজাত্যাভিমানকে সক্রিয় ভাবে জাগ্রত রাখতে যে চেষ্টা করেছিলেন তা এই আলোচনা থেকে ধারণা করা যায়। স্বর্ণকুমারীও সেই ক্ষেত্রে অন্যতমা সাধিকা।

'দীপনির্ব্বাণে' লেখিকা সমসাময়িক জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেমকে অনুসরণ করেছেন নিঃসন্দেহে, তবে সে জাতীয়তাবোধের অনেকটাই রোমাণ্টিক আইডিয়া প্রসূত বা কল্পনাপ্রিয় মনের বিলাস। 'হিন্দুমেলা' ও ভ্রাতাদের স্বদেশচর্চার আত্মনির্ভরতার মন্ত্রে স্বর্ণকুমারীও উদ্বুদ্ধ

৩৭। জীবনস্মৃতিতে 'হিমালয় যাত্রা'য় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয় যাওয়ার আগে কিছুদিন বোলপুরে ছিলেন, এবং এখানে "একটি শিশু নারিকেল গাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া" কবিতা লিখতে তিনি ভালবাসতেন। এসময়েই . "তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' বলিয়া একটি বীর রসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহার উপযুক্ত বাহন সেই বাঁধানো লেট্‌স ডায়েরিটিও জ্যেষ্ঠা সহোদরা নীল খাতাটির অনুসরণ করিয়া কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা কাহারও কাছে রাখিয়া যায় নাই।"— জীবনস্মৃতি হিমালয় যাত্রা। (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ সংস্করণ) পৃঃ ৪৮। ১৮৮১ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'রুদ্রচণ্ড' কাব্যনাট্যেও মহম্মদ ঘোরীর কাছে পৃথ্বীরাজের পরাজয় ও পৃথ্বীরাজ সভাকবি চাঁদকবির প্রসঙ্গ আছে।

৩৮। "মালতী পুঁথি"--- প্রবোধচন্দ্র সেন, পৃঃ ১৩৮—৩৯, রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা ১ম খণ্ড, ১৯৬৫। সম্পাদক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য।

৩৯। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র প্রথম কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণ স্বদেশচেতনা থেকে। তাঁর আত্মকথায় জানা যায় "প্রথম আমি কবিতা লিখি; বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের প্রচলিত বিবরণ যে সর্বথা কাল্পনিক, এই ধারণায় 'বঙ্গবিজয়' নামে আমি প্রথম কাব্য লিখি। ঐ গ্রন্থ বর্তমান নাই। গৃহদাহে অপ্রকাশিত বাল্যরচনা পুড়িয়া গিয়াছে।"— সাহিত্য সাধক চরিতমালা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, (১ম সং ১৯৪৭)। ২য় সং ১৯৫৭, পৃঃ ৮।

৪০। পত্রিকাটি একবছর চলেছিল। 'পৃথ্বীরাজের' সভাকবি চাঁদ বরদাইয়ের যে বর্ণনা থেকে পৃথ্বীরাজের কাহিনী পাওয়া যায় সেই 'চাঁদকবির বীরগাথা'র অনুবাদ এই সংখ্যায় (১৮৯৯) তিনটি অধ্যায়ে বার হয়েছিল। উক্ত অনুবাদের প্রথম সংখ্যায় (১৮৯৯ জানুয়ারী) পরিশিষ্টে মন্তব্য ছিল — "কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় চাঁদ কবির বীরগাথা বাংলায় কবিতা নিবন্ধ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা যথাকালে প্রকাশিত হইবে।" কিন্তু খুব সম্ভব তা আর প্রকাশিত হয় নি। এই চাঁদ কবিই 'দীপনির্ব্বাণে' 'কবিচন্দ্র' রূপে চিহ্নিত।

টড বলেছেন, চাঁদ বরদাইয়ের গাথা ছিল ৬৯টি খণ্ডে, একশো হাজার স্তবকে ("sixty nine books, one hundred thousand stanza"– vol -1, Chapter– V. p 206-7) রচিত। পৃথ্বীরাজ পরাজয়ের কাহিনীর উৎস এই চাঁদকবির বীরগাথা।

হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে 'ভারতী'র প্রবন্ধে যার নিদর্শন মেলে।[৪১] তাহলেও এই জাতীয়তাবোধের মূলে ইংরেজের প্রতি তাঁর আন্তরিক কোন বিদ্বেষের নিদর্শন মেলে না, যে বিদ্বেষ এ সময়ের জাত্যাভিমানের উদ্বোধক প্রায় কোন ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেই ছিল না। ইংরেজ সরকারের শাসন, আইনের প্রতি বরং একটা আস্থার ভাবই ছিল তাঁর।[৪২] তবে তাঁর প্রতিবাদ ছিল ইংরেজের 'দলননীতির' ওপর, "প্রভু ও দাস সম্পর্কের পরিবর্তে রাজাপ্রজায় বন্ধুত্বের সম্পর্কটুকু" তাঁর অভিপ্রেত ছিল।[৪৩] পূর্বেই বলেছি, এ সময়ের দেশপ্রেম ছিল জীবনে আচরণীয় একটি ধর্ম, কারণ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ইংরেজীশিক্ষার সুফলগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁদের অভিপ্রেত ছিল, বাঙালীর আলস্য, ভীরুতা কাটিয়ে যথার্থ পুরুষত্ব, বলিষ্ঠতা, স্বাতন্ত্র্য, আত্মত্যাগ ও নির্ভরতায় তাকে দীক্ষা দেওয়া। স্বর্ণকুমারীর ভাবনাও সেই খাতে বয়েছিল। তাই 'দীপনির্ব্বাণে'-র স্বদেশচেতনা অনেকটাই রোমান্টিক কল্পনাপ্রিয় মনের বিলাস বলে অভিহিত করা নিতান্ত দূষণীয় নয়।

'দীপনির্ব্বাণে'র পৃথ্বীরাজ সমরসিংহের[৪৪] মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধকাহিনী টডের রাজস্থানের ইতিহাসের অবিকল অনুধাবন।[৪৫] রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় 'রাজপুত্র ইতিহাস' নামে টডের রাজপুত কাহিনীর কিয়দংশ ধারাবাহিক ভাবে বার হয় (১৭৭৩—৭৪ শকাব্দে)। এই 'রাজপুত্র ইতিহাসে'র দ্বিতীয় অধ্যায়েও (১৭৭৪ শকাব্দ, আষাঢ়) 'দীপনির্ব্বাণ' কাহিনীর ইতিহাস অংশ পাওয়া যায়। গ্রন্থের ভূমিকায় স্বর্ণকুমারী উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে বলেছেন : "মুসলমানের ভারতাধিকারের অব্যবহিত পূর্বে যে সময় হিন্দুরাজাদিগের মধ্যে একতার দৃঢ় বন্ধন ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া আসিয়াছিল এবং সর্বোচ্চ পদলাভ লালসায় পরস্পর সকলের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই সময়ের একটি ঘটনা অবলম্বিত করিয়া এই উপন্যাসের আরম্ভ— এবং গৃহবিচ্ছেদ হেতু সুযোগ বুঝিয়া যবনেরা যে সময়ে ভারতের চির প্রজ্বলিত দীপ নির্বাপিত করিল, সেই দীপনির্ব্বাণেই এই "দীপনির্ব্বাণে"র সমাপ্তি।" স্বর্ণকুমারী ইতিহাসনিষ্ঠ ছিলেন। রমেশ দত্তের (১৮৪৮—১৯০৯) উপন্যাসের ঐতিহাসিক সচেতনতার সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর চিন্তাধারার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। "দীপনির্ব্বাণে"র ভূমিকায় লেখিকার উপন্যাসের ঐতিহাসিক

৪১। 'কর্তব্য কোন পথে'— স্বর্ণকুমারী দেবী। 'ভারতী', ১৩১৫ পৌষ।

৪২। 'রাজনৈতিক প্রসঙ্গ'— স্বর্ণকুমারী দেবী। 'ভারতী', ১৩১৫ শ্রাবণ।

৪৩। ঐ।

৪৪। সমরসিংহের বীরত্ব অবলম্বনে 'দীপনির্ব্বাণে'-র সাত বছর পরে (১৮৮৪ সালে) এক গ্রন্থ লেখেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'সমরসিংহ' নামে। তাঁর ইতিহাস প্রীতি সম্বন্ধে আত্মকথায় বলেছেন, "ইতিহাসের প্রতি পিতার ন্যায় আমারও কেমন আন্তরিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে, অবসর পাইলেই ইতিহাস পড়িতাম, কেহ প্রবন্ধ লিখিবার জন্য তাড়না করিলেও তাহাই লিখিতাম। জাতীয় ধনভাণ্ডারে সাহায্যার্থে ১৮৮৪ সালে 'সমরসিংহ' নামক আমার বাল্য সংকল্পানুযায়ী প্রথম ঐতিহাসিক চিত্র মুদ্রিত হয়। তাহা আর এখন দেখিতে পাওয়া যায় না।"— সাহিত্য সাধক চরিতমালা, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পৃঃ ১২।

৪৫। The Annals and Antiquities of Rajsthan or, the Central and Western Rajpoot States of India by Lieut. Col James Tod. 1st Vol. (First published 1829). 1902 ed. chapter V.

সত্যতার প্রমাণভিত্তিক আলোচনা তাঁর এই ইতিহাস নিষ্ঠারই পবিচয় বহন করে। উপন্যাসের খুঁটিনাটি ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যতা তিনি নির্ধারণ করেছেন এলিয়ট, হ্যালহেড, কানিংহাম প্রদত্ত তথ্য, এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণাল প্রভৃতি থেকে।

'দীপনির্ব্বাণ' উপন্যাসের পৃথ্বীরাজ,[৪৬] সমরসিংহ, মহম্মদ ঘোরী, কল্যাণসিংহ ঐতিহাসিক চরিত্র। পৃথ্বীরাজের সভাকবি 'পৃথ্বীরাজ রাসো' রচয়িতা চাঁদ বরদাই উপন্যাসে কবিচন্দ্র নামে পরিচিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, পৃথ্বীরাজের সঙ্গে মহম্মদ ঘোরীর যুদ্ধ কাহিনী নিয়ে রচিত অধিকাংশ গ্রন্থেই পৃথ্বীরাজ ও কনৌজ অধিপতি জয়চন্দ্র কন্যা সংযুক্তার কাহিনী আছে। জয়চন্দ্রের সঙ্গে পৃথ্বীরাজের শত্রুতা ও সংযুক্তাকে অপহরণের আখ্যান রোমান্সের সৃষ্টি করেছে গ্রন্থগুলিতে। কিন্তু স্বর্ণকুমারী এই রোমান্সটিকে বাদ দিয়েছেন উপন্যাস থেকে, এমন কি ইতিহাসভিত্তিক পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্র প্রসঙ্গও বর্জন করেছেন তিনি। জয়চন্দ্রের স্বদেশদ্রোহিতার ভূমিকায় উপন্যাসে আছে অমাত্যপুত্র বিজয়সিংহ। পৃথ্বীরাজের ভগ্নী পৃথার সমরসিংহের পত্নীরূপে যে ঐতিহাসিক পরিচয় আছে, তাও স্বর্ণকুমারী বর্জন করেছেন, অবশ্য সে প্রসঙ্গ তিনি ভূমিকায় উল্লেখও করেছেন, যদিও কারণ নির্দেশ করেন নি।

মহম্মদ ঘোরী-কে টড 'শাবুদ্দিন' বলে অভিহিত করেছেন, এবং ইতিহাসে ঘোরী অনেকস্থানেই শাবুদ্দিন বলেই পরিচিত। 'ঘোর' রাজ্যের অধিপতি হিসেবেই তিনি 'ঘোরী' নামে পরিচিত। সমরসিংহের পত্নী পত্তনরাজকন্যা কমলদেবীও উপন্যাসে কর্ম্মদেবী নামে আখ্যাত। মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে পৃথ্বীরাজের থানেশ্বরের বিরাট ঐতিহাসিক যুদ্ধই উপন্যাসের পটভূমি। ইতিহাসের সঙ্গে মৌলিক কল্পনা শক্তিরও নিপুণ মিশ্রণ ঘটিয়েছেন স্বর্ণকুমারী। টডের রাজস্থানে উল্লেখ পাওয়া যায়, চাঁদ বরদাই সমরসিংহের বর্ণনা করেছেন— 'যোগীন্দ্র' বলে:

৪৬। পৃথ্বীবাজ কাহিনী নিয়ে বচিত আবও কয়েকটি নাটক, কাব্য, উপন্যাসেব পরিচয পাওয়া যায় :—

১) মাইকেল মধুসূদন দত্তেব চরিত লেখক যোগীন্দ্রনাথ বসুর "পৃথ্বীরাজ" যাকে কবি 'ঐতিহাসিক মহাকাব্য' বলে আখ্যা দিয়েছেন। গ্রন্থটি ১৯১৫ (১৩২২ বঙ্গাব্দে) সালে প্রকাশিত। ভূমিকায় কবি বলেছেন, 'রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ও নবীনচন্দ্রের 'পলাশীব যুদ্ধ' কাব্যের প্রদর্শিত পথ অনুসবণে তাঁব গ্রন্থ রচিত। বর্ণনীয় বিষয় হল পৃথ্বীরাজেব পবাজয়ের সঙ্গে হিন্দু স্বাধীনতাব পতন। কবি পৃথ্বীবাজেব সভাসদ চন্দ ববদাই প্রণীত 'পৃথ্বীবাজবাসো', ও টডেব গ্রন্থ অনুসবণ কবেছেন। কাব্য রচনাব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি নিজেই ভূমিকায় বলেছেন, যে, পৃথ্বীবাজ পড়ে যদি কেউ জাতীয অধঃপতনের কাবণ অনুসন্ধান ও প্রতিবিধান চেষ্টা করেন তাহলেই কাব্যকাবেব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কবিতাবস বিতবণ গৌণ উদ্দেশ্য।

২) পৃথ্বীবাজ সংযুক্তাব কাহিনী নিয়ে ১৮৮০ সালে লেখা উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রেব "পৃথ্বীরাজ বা ক্ষত্রকুল ভাগ্য শশী বাহুব গবাসে ঐতিহাসিক উপন্যাস।" গ্রন্থেব নিবেদনে লেখক বলেছেন "হৃদযেব অন্তঃস্থল হইতে যাহা প্রকাশিত হইল, তাহাই প্রণয়ন করিয়া বঙ্গসমাজে প্রকাশ করিলাম, ভাবতেব দুর্ভাগ্য গাথা গাহিলাম, ভাবতের অশ্রুব চিত্র চিত্রিত কবিলাম।" গ্রন্থে সংযুক্তা হয়েছে সুরবালা, সুরবালাব সখি মাধবিকা।

৩) মনোমোহন গোস্বামীব "পৃথ্বীরাজ (ঐতিহাসিক নাটক)", ১৯০৫ (১৩১২ বঙ্গাব্দ)। গ্র্যাণ্ড থিয়েটাবে ১৩১২ বঙ্গাব্দে ২৩ বৈশাখ শনিবার অভিনীত হয। পৃথ্বীরাজ সংযুক্তার কাহিনী, সংযুক্তাব সখি যমুনা।

৪) নিখিলনাথ বায় প্রণীত ১৯২৮ সালে প্রকাশিত 'পৃথ্বীরাজ' উপন্যাস। 'পৃথ্বীবাজ বাসো' অবলম্বনে উপন্যাসাকারে এটি লেখা। এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকে (পৃথ্বীবাজবাসো) বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিবাব জন্যই পৃথ্বীবাজের অবতারণা, সহজবোধ্য করিবাব জন্য ইহা উপন্যাসাকারে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থে 'সংযুক্তা' হয়েছে 'সংযোগিতা' ও তার সখি সুমিত্রা।

"A simple necklace of the seeds of the lotus adorned his neck; his hair was braided, and he is addressed as Jogindra or chief of ascetics."[৪৭]

চাঁদ বরদাইয়ের এ বর্ণনা সমরসিংহের উদার তেজস্বী নিষ্কাম পবিত্র চরিত্রের স্তুতি মাত্র। কিন্তু 'দীপনির্ব্বাণ' উপন্যাসে লেখিকা সমরসিংহের বিষয়ে এই সপ্রশংস বর্ণনাটিকে উপন্যাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে কাজে লাগিয়েছেন, যার মধ্যে অবশ্যই তাঁর কল্পনার বিকাশ ঘটেছে। বঙ্কিমের উপন্যাসের অদৃষ্টবাদ, জ্যোতিষচর্চার প্রভাবও এই অংশে কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। জ্যোতির্বিদ মঙ্গলাচার্যের গণনার ফল হল, চিতোরের রাণা সমরসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র কল্যাণের অকালমৃত্যু, অন্য দুই পুত্রের অযোগ্যতা হেতু সমরসিংহের সিংহাসনের যথার্থ উত্তরাধিকারীর অভাব পূর্ণ হবে কনিষ্ঠ পুত্র কিরণের দ্বারা, যদি তাকে তিন বছর সতর্কভাবে রক্ষা করা যায়। কিন্তু ভবিতব্য এড়ান গেল না, তিন বছর বয়সেই বালক পাগলিনী কর্তৃক অপহৃত হল। মনের ক্ষোভে দুঃখে সমরসিংহ রাজবেশ সিংহাসন ত্যাগ করে দীর্ঘকেশ গলায় পদ্মবীজের মালায় হলেন 'যোগীন্দ্র'। অপহৃত বালক দুর্যোগের মধ্যে দিয়েও জীবনে বেঁচে গেল এবং দূরে নির্জন পর্বতগুহাবাসী সন্ন্যাসীর কাছে আশ্রয় পেল। একই দুর্যোগে পাগলিনী বাঁচল না, কারণ উপন্যাসে তার প্রয়োজনীয়তা ঐটুকুই। পাগলিনী চরিত্র লেখিকার নিজস্ব সৃষ্ট। উপক্রমণিকায় তিনি বলেছেন, "পাগলিনীর ব্যাপার একটি প্রকৃত ঘটনার আভাস হইতে কল্পিত।" পাগলিনীর কাছে বালক কিরণকে যেতে দেওয়া হত না বলেই তার উপর বালকের অদম্য আকর্ষণের মধ্য দিয়ে শিশু মনস্তত্ত্বের সুন্দর বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা।

কিরণসিংহের পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায় কর্ণ নামে। তার চরিত্রে স্কটের The Bride of Lammermoor -এর Edgar -এর ছায়াপাত অনুভব করা যায়। 'দীপনির্ব্বাণে'র তিন বছর পরে (১৮৭৯) প্রকাশিত রমেশ দত্তের 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'র তেজসিংহ-ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যে এদেরই সমগোত্রীয়। কিরণসিংহ চিতোরের রাজ্যচ্যুত, এডগার ও তেজসিংহ যথাক্রমে Ravenswood ও সূর্যমহল দুর্গ থেকে বিচ্যুত। কিরণসিংহের ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য দায়ী পাগলিনী. এডগারকে বঞ্চিত করেছে লর্ড কিপার, তেজসিংহকে দুর্জয়সিংহ। তিনজনেই বীর, বলিষ্ঠ আদর্শবাদী যুবক। জীবনের পথ কেটে তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য তৈরী করেছে। ভবিতব্য ও অলৌকিকতায়ও এই উপন্যাসগুলিতে সাদৃশ্য আছে। ব্রাইড অফ ল্যামারমুরে Annie winnie, Ailsio ourlay প্রভৃতি ডাকিনীরা ভবিতব্য বলেছে। Lucy Ashton-এর বিবাহ অনুষ্ঠানে তাদের আলোচনার বিষয় ছিল লুসির আসন্ন মৃত্যুর কথা। 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'য় ভবিষ্যৎ বলেছে চারণী। 'দীপনির্ব্বাণে' মঙ্গলাচার্য ভবিতব্যের আভাস দিয়েছেন, তাছাড়া রাজকুমারী ঊষাবতীর স্বপ্নে ভাবী যুদ্ধের ভয়াবহ বিধ্বংসী পরিণাম দর্শনেও অলৌকিকতা রয়েছে। যুদ্ধে পরাজয়ের পূর্বে দেবীপ্রতিমার অশ্রুপাতে সমরসিংহ ভাবী বিপদের ছায়াপাত দেখেছেন।

৪৭। The Annals and Antiquities of Rajsthan or the Central & Western Rajpoot States, of India, by Lieut. Col. James Tod. 1 Vol. 1950 ed. Chapter V, p. 208.

'দীপনির্ব্বাণ' ও 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' দুটি উপন্যাসের নামকরণে তাৎপর্যমূলক সাদৃশ্য লক্ষণীয়। শেষোক্ত উপন্যাসে প্রতাপের পরাজয়ের পর রাজপুত জীবনের গৌরব সূর্য অস্তমিত হওয়ায় বেদনার ম্লান আঁধার ঘনীভূত হয়েছে, আর 'দীপনির্ব্বাণে' শৌর্যবীর্যশালী হিন্দুর পরাজয়ের পর ভারতের গৌরবদীপ নির্বাপিত হওয়ায় বেদনার করুণ ছায়া সঞ্চারিত হয়েছে। উভয় উপন্যাসেই প্রতিপাদ্য প্রাচীন গৌরবময় ভারত ইতিহাস বর্ণনা করে স্বদেশপ্রেমকে উদ্দীপ্ত করা।[৪৮]

গৃহবিবাদজনিত ভারতবাসীর আত্মদুর্বলতাও ঘোরীর ভারত জয়ের অন্যতম কারণ, ইতিহাস এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। ইতিহাস অনুসারে পৃথ্বীরাজের ক্ষমতা ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে পত্তন ও কনৌজরাজ ঘোরীকে ভারতভূমিতে আহ্বান করে এনেছিলেন। কনৌজরাজ জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজ উভয়েই অনঙ্গপালের দৌহিত্র। পূর্বেই বলেছি এই অংশেও স্বর্ণকুমারী ইতিহাস সত্য থেকে সরে এসেছেন। তাঁর উপন্যাসে স্বদেশদ্রোহিতা করেছে বিজয়সিংহ এবং তার এই বিশ্বাসঘাতকতার মূলে রয়েছে রাজকুমারী ঊষাবতীর প্রণয়লাভে ব্যর্থতা এবং সেই হেতু প্রতিশোধস্পৃহা। এদিক দিয়ে স্বর্ণকুমারী বিজয়সিংহের গৃহশত্রুতা দিয়ে উপন্যাসের কাহিনীর প্রয়োজন মিটিয়েছেন। বঙ্কিমের 'মৃণালিনী'তেও এই গৃহকলহের পরিচয় আছে। 'মৃণালিনী'-র ঐতিহাসিক পটভূমি হল বক্তিয়ার খিলজীর দ্বারা আক্রান্ত বাংলাদেশ। বক্তিয়ার খিলজী গৌড়ে প্রবেশ করেছে গৃহকলহের সুযোগ নিয়ে, যে সুযোগ করে দিয়েছে ক্ষমতালিপ্সু পশুপতি স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। 'দীপনির্ব্বাণে' বিজয়সিংহ স্বদেশদ্রোহিতা করেছে রাজ্যলোভে বটে, তবে প্রণয়ে ব্যর্থতাও তার মূলে ছিল। পশুপতি ও বিজয়সিংহ দুজনের ভূমিকা অনেকটা এক। তবে চরিত্র চিত্রণ হিসেবে পশুপতি বিজয়সিংহ অপেক্ষা অনেক সজীব ও বলিষ্ঠ। তার সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত কার্যকলাপ চরিত্রের দৃঢ়তাব্যঞ্জক যার একান্ত অভাব দেখা যায় বিজয়সিংহ চরিত্রে। বিজয়সিংহের পরিকল্পনাহীন আকস্মিক কার্যকলাপে প্রত্যয়ের অভাববশতঃ পাঠক অনেক সময় বিমূঢ় হয়ে পড়ে। বিজয়সিংহের পরিণতিতে লেখিকা 'অধর্মের পরাজয়ে'-র সনাতন বিশ্বাসের চিত্রই এঁকেছেন। মহম্মদ ঘোরী এই স্বদেশদ্রোহীকে শেষ পর্যন্ত ঘৃণা করেছে, এবং তাকে প্রতিশ্রুত রাজ্যও স্বাভাবিক ভাবেই দেয়নি। নিজের দেশের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার উপর বিশ্বাস কি?— এই নীতি নিয়েই স্বর্ণকুমারী বিজয়সিংহের পরিণতি দেখিয়েছেন। কিন্তু 'মৃণালিনী'-তে পশুপতির জ্বলন্ত অগ্নিতে ভস্মীভূত দেবীমূর্তি উদ্ধারের প্রচেষ্টায় আত্মবিসর্জন লেখকের নিপুণ কল্পনা ও সহমর্মিতার চূড়ান্ত নিদর্শন।

'মৃণালিনী'-র সঙ্গে 'দীপনির্ব্বাণে'র আরও একটি সাদৃশ্য অনুভব করা যায়, সেটি হল স্বাজাত্যবোধ। 'মৃণালিনী'-তে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গের পরাজয় গ্লানি অপনোদন করতে চেয়েছেন লক্ষ্মণসিংহের ভীরু কাপুরুষোচিত পলায়ন ও পশুপতির দেশদ্রোহিতার সুযোগে বক্তিয়ার

৪৮। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'দীপনির্ব্বাণে'র বছরেই (১৮৭৬ সালে) অতুলকৃষ্ণ মিত্রের দেশপ্রেমাত্মক রচনা 'অপেরাটিক ড্রামা' ''নির্বাপিত দীপ''। নানা ফড়নবীশ ও ঝাঁসীর রাণীকে নিয়ে লেখা, ইংরেজ বিদ্বেষ লক্ষণীয়। উভয় গ্রন্থের নাম সাদৃশ্য লক্ষণীয়। - - বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস (২য়)— সুকুমার সেন। পৃঃ ২৯৪।

খিলজীর গৌড় আক্রমণ সহজসাধ্য করে। 'দীপনির্ব্বাণে'-ও স্বদেশের পরাজয়ের কলঙ্ককে হ্রাস করার চেষ্টা দেখা যায় বিজয়সিংহের মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় ও পৃথ্বীরাজের রাজনীতি অনুচিত উদারতায়। মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে পৃথ্বীরাজের সন্ধি হয়েছে, রাজপুতেরা যুদ্ধজয়ের শেষে আনন্দে মত্ত, অসুস্থ রাজকন্যাকে নিয়ে পৃথ্বীরাজ ও কল্যাণ বিব্রত, সমরসিংহ উপাসনারত, এমন সময়ে তুর্কিরা সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে হিন্দুদের আক্রমণ করেছে ও ভারত জয় করেছে। মহম্মদ ঘোরী ইতিহাসে বীরযোদ্ধারূপে খ্যাত। কিন্তু স্বর্ণকুমারী ঘোরীর সে বীরত্বের পরিচয় দেননি। তাকে বিশ্বাসঘাতক, শঠ বীর্যহীনরূপে এঁকেছেন। এ-প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত হল: "হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যুদ্ধ-বিষয়ে অপক্ষপাত সুবিচার করিবারও কোন চেষ্টা নাই— মুসলমানেরা যেন সম্পূর্ণভাবে ভাগ্য, বিশ্বাসঘাতকতা, ও হিন্দুদের সরল বিশ্বাস প্রবণতার জন্যই যুদ্ধ জয় করিয়াছে।"[৪৯] শুধুই ভাগ্য, ষড়যন্ত্র বা বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগে যে থানেশ্বরের যুদ্ধের মত বিরাট সংগ্রামে জয়লাভ সম্ভব নয়, অবশ্যই কিছু যুদ্ধ কৌশলের প্রয়োজন, এ সত্য স্বীকার না করে ঔপন্যাসিক ইতিহাস থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়েছেন।

কিন্তু লেখিকার বর্ণনাকৌশলে সজীবতার ও নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় থানেশ্বরের যুদ্ধ চিত্রে। পৃথ্বীরাজ, সমরসিংহ, কল্যাণ ও বিজয়সিংহের অধীনে বিরাট বিচিত্র সৈন্যসমাবেশ, যুদ্ধ-সজ্জায় লেখিকা রচনা নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। রণকৌশল বর্ণনায় যুদ্ধক্ষেত্রের সংঘাতময় উত্তালতরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ স্পন্দনটি অনুভব করা যায়। ষড়যন্ত্রকারী বিজয়সিংহের অধীনস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে অপেক্ষাকৃত দূরে থাকা এবং পৃথ্বীরাজের যথার্থ বিপদে সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হওয়ার মুহূর্তটি যুদ্ধক্ষেত্রে শোচনীয় পরাজয়কে করুণতর করে তুলেছে। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্ণকুমারীর যুদ্ধ বর্ণনার নৈপুণ্য স্বীকার করেছেন।

রাজনীতি, সংগ্রামের দ্বন্দ্বময় জটিল পটে দিলীপ শৈলবালার বাল্যপ্রণয় বৈচিত্র্য ও স্নিগ্ধ মাধুর্য নিয়ে এসেছে। পর্বতের প্রাকৃতিক পরিবেশে দুটি বালকবালিকার পারস্পরিক স্নেহ অনুরাগসিঞ্চিত বাল্যক্রীড়ার মনোরম চিত্রে লেখিকা সজীব প্রাণোচ্ছল শিশু চরিত্র অঙ্কনে দক্ষতা দেখিয়েছেন। এই বাল্যক্রীড়ায় মনে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখরের' (১৮৭৫) প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয় চিত্র। তবে দিলীপ ও শৈলবালার বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ নেই, দিলীপ সমরসিংহের হৃতপুত্র কিরণ এই পরিচয় প্রকাশ হওয়ার পরেও শৈলবালার সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে। উপন্যাসের শুরু থেকেই কিরণসিংহের প্রাধান্য রয়েছে। পরে দিলীপরূপে তার ও শৈলবালার বাল্যপ্রণয়ের চিত্র দেখে মনে হয় এ প্রণয় কাহিনীটি উপন্যাসের একটি প্রধান দিক। কিন্তু পৃথ্বীরাজের রাজধানীতে গিয়ে দিলীপ ও শৈলবালাকে লেখিকা বিস্মৃত হয়েছেন এবং ঘটনা বিন্যাসে সামঞ্জস্য রাখতে পারেননি বলে ডঃ বিজিত দত্ত মন্তব্য করেছেন।[৫০] ঘটনার এই আকস্মিকতা বা শিথিলতা এসেছে, লেখিকা মূল কাহিনীর

৪৯। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। পৃঃ ২৪৭—৪৮।
৫০। বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস— ডঃ বিজিত কুমার দত্ত। ১৯৬২। পৃঃ ১৯২।

চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বে জটিলতার সৃষ্টিতে নৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি বলে। স্বর্ণকুমারী গল্পের প্রধান দিক কল্যাণ বিজয়সিংহ ও উষাবতীর প্রণয়ের জটিলতাকে কেন্দ্র করে, অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলির বিকাশ ঘটিয়ে, গল্পের সুচারু বিন্যাসের দিকে পাঠকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে রাখতে পারেন নি।

শৈলবালা প্রভাবতীর মধুর সখ্যও উপন্যাসটির মানব-জীবন-চিত্রের আর একটি আকর্ষণীয় দিক। দুবছর আগে (১৮৭৪) প্রকাশিত রমেশচন্দ্রের 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসের[৫১] সবলা অমলার বন্ধুত্ব-এর সঙ্গে তুলনীয়। রাজনীতির জটিলতা থেকে মুক্তি পেয়ে পাঠক প্রভাবতী ও শৈলবালার প্রণয়ে দুটি নারীর চপল আনন্দ উচ্ছল অভিমানে ভরা, আন্তরিকতার সুরে গাঁথা সখ্যচিত্রে যেন মর্ত্যজীবনের অনুভূতির স্পর্শ পায়। কবিচন্দ্রব পত্নী প্রভাবতী কল্পিত চবিত্র। উপন্যাসে এদুটি কল্পিত চরিত্রই সজীব, দুঃখসুখের ভাবের দোলায় জীবন্ত। কিন্তু শৈলবালা ও প্রভাবতীর পুরুষবেশে কবিচন্দ্রের সন্ধানে যাওয়ায় পাশ্চাত্ত্য নাটক ও রোমান্সের লক্ষণ সুপরিস্ফুট। শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নির্জন পর্বতগুহায় দুটি নারীর ভয়ত্রস্ত চিত্রে লেখিকা বাস্তবতাকে বজায় রেখেছেন। এরপরে বিজয়সিংহের ঘোরীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র, কিরণসিংহের আকস্মিক আগমন, প্রভাবতী শৈলবালার মিলন প্রভৃতি ঘটনাগুলির মধ্যে আকস্মিকতা ও দ্রুততা অনুভব করা যায়। কিরণসিংহের জেলের ছদ্মবেশে মহম্মদ ঘোরীর শিবির থেকে কবিচন্দ্রকে উদ্ধার করা রোমান্সোচিত ঘটনা। 'দীপনির্ব্বাণে' অতিরিক্ত ঘটনার ভিড়ে একটি ঘটনার ছাপ পাঠকের মনে পড়তে না পড়তে আর একটি ঘটনা এসে গেছে, এবং স্বাভাবিক ভাবেই সেক্ষেত্রে ঘটনাবিন্যাসে বাঁধুনিও শিথিল হয়ে পড়েছে।

ঐতিহাসিক ঘটনার পাশে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের সময়ের দেশের সমাজ, সংস্কৃতি বা মানবজীবন সম্পর্কে সম্যক ধারণা করার অবকাশ 'দীপনির্ব্বাণে'-র পাঠকের নেই। রাজপুত বীর সমরসিংহের অন্তঃপুরের যেটুকু পরিচয় আছে, তার মধ্যে তৎকালীন জীবনের ছায়াপাত হয়নি, বালক কিরণসিংহের অপহরণ সম্পর্কে সমরসিংহের পত্নী বা অন্তঃপুরিকা দাসীদের যেটুকু ভূমিকা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত পরিচয় একটুও নেই। পৃথ্বীরাজ বা মুসলমানদেরও পারিবারিক, সাংস্কৃতিক জীবনের কোন চিত্রাঙ্কণ নেই। পৃথ্বীরাজ কন্যা ও মহিষীর মাধ্যমে গার্হস্থ্যজীবনের পরিচয় দেওয়ার অবকাশ লেখিকার ছিল, কিন্তু সে সুযোগ তিনি নেন নি। মর্ত্যজীবনের সঙ্গে উপন্যাসের যোগসূত্র এর জন্য ছিন্ন হয়েছে।

পৃথ্বীরাজের কন্যা উষাবতী ও সমরসিংহের পুত্র কল্যাণের প্রণয় উপন্যাসের গল্পের দিক। এর মধ্যে বাইরে থেকে দ্বন্দ্ব আরোপিত হয়েছে বিজয়সিংহের দ্বারা, যার মূলে রয়েছে রাজকন্যার প্রতি তার রূপজ মোহ। উষাবতী কল্যাণের প্রণয়ে ঈর্ষাকাতর হয়ে বিজয়সিংহ তাদের মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছে। এই ত্রয়ীর প্রণয়ে মনোজগতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেখিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের বিকাশ করেন নি স্বর্ণকুমারী। দৈনন্দিন জীবনের জটিল পথে ঘাত-প্রতিঘাতে আহত হয়ে কল্যাণ উষাবতীর অনুরাগের গভীরতর বা সার্থক বিকাশ হয়

৫১। বঙ্গবিজেতায় সমরসিংহের বিধবা পত্নী মহাশ্বেতা ও কন্যা সরলাব জীবনদ্বন্দ্ব উপন্যাসের প্রধান বিষয়।

নি, যদিও কল্যাণের অনুভূতিতে তীব্রতা ছিল। উপন্যাসের গল্পের এই দিকটায় ঘটনাগুলিকে পরপর সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য করে সাজাতে সক্ষম হননি ঔপন্যাসিক। উষাবতীর সখি কবিচন্দ্রের ভগ্নী গোলাপ ষড়যন্ত্রের একটা মাধ্যম, যে মাধ্যম বিজয়সিংহ কল্যাণের বন্ধুত্বে চিড় ধরাতে অতি দ্রুতই সক্ষম হল। প্রণয়ে প্রত্যাখ্যান পেয়ে উষাবতীর কোন ভাববৈচিত্র্য বা অন্তর্দ্বন্দ্বের বর্হিপ্রকাশ নেই, সংজ্ঞালোপ ছাড়া। মানুষের জীবনে কোন বিপর্যয় বা শুভ ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটলেও তার পশ্চাতে থাকে জীবনের সুদীর্ঘ দিনের খুঁটিনাটি বিষয়, বিচিত্র মনস্তত্ত্ব, বিভিন্ন মানুষের কার্যকলাপ, জীবনানুভূতি এবং উপন্যাসে এসবের চিত্রায়নের মধ্যে দিয়ে পাঠক নিজের থেকেই ভাবী ঘটনার পদধ্বনি শুনতে পায়। কিন্তু 'দীপনির্ব্বাণে' কল্যাণ উষাবতীর প্রণয় আকস্মিক বিপর্যস্ত হওয়ার পূর্বে পাঠকের চিত্ত-প্রস্তুতির কোন অবকাশ নেই। হঠাৎই কল্যাণের উষাবতীর প্রণয়ে সন্দেহ জাগল গোলাপ বিজয়সিংহের ষড়যন্ত্রে এবং উষাবতীকে সে প্রত্যাখ্যান করল। এই নিদারুণ আঘাতে উষাবতীর শরীর মন ভেঙ্গে গিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলল। উপন্যাসের গল্পের এই দিকটা প্রত্যয়হীন আকস্মিক দ্রুত ঘটনাবশতঃ দৃঢ়বদ্ধ হতে পারে নি, নির্জীব হয়ে পড়েছে। উষাবতী প্রাণস্পন্দনহীন। তার রূপবর্ণনায় লেখিকা রোমান্স-নায়িকার বৈশিষ্ট্যকেই অনুসরণ করেছেন। কল্যাণও যথার্থ প্রণয়ীর সজীব চরিত্র হতে পারে নি, যার জন্য অনেকটা দায়ী তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 'এ্যাক্সনে' (action) না ফুটিয়ে সংলাপে বর্ণনা করা। গোলাপের মস্তিষ্ক বিকৃতির পরিণতির মধ্যে দিয়ে লেখিকা অন্যায়ের প্রতিফলই দেখাতে চেয়েছেন।

শৈলবালার পিতা তেজসিংহের আকস্মিক আগমন ও পলায়ন উপন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য নয়। পৃথ্বীরাজ মহিষীর স্বামীর বন্দী হওয়ার সংবাদ পেয়ে যুদ্ধে একাকী যাওয়ার চিত্রটি রোমান্স লক্ষণাক্রান্ত। কেবল এক্ষেত্রে হিন্দুনারীর তেজস্বিতার (রাণী দুর্গাবাঈ প্রভৃতির আদর্শে) কথা হয়ত লেখিকার মনে ছিল। তার মাতৃহৃদয়ের বিকাশ তেমন হয় নি।

পৃথ্বীরাজের বীরত্বের স্ফুরণের দিকেই লেখিকার ঝোঁক বেশি। বিশেষ করে যুদ্ধশেষে ঘোরীর শিবিরে নৃশংসভাবে নিহত হওয়ার মধ্যে তাঁর পৌরুষ, স্বদেশপ্রেম ও তেজদৃপ্ত আত্মত্যাগের ভাব পরিস্ফুট। পিতৃহৃদয়ের দিকটা তাঁর চরিত্রে বিশেষ স্পষ্ট হয় নি। সে তুলনায় সমরসিংহের পিতৃহৃদয় উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে, অচেনা দিলীপকে দেখে তাঁর হৃদয়ে কী এক বিস্ময়কর অনুভূতির আবির্ভাবে। কবিচন্দ্র ইতিহাস অনুযায়ী, বিশেষ মৌলিকতার দাবী রাখে না। উদার কবিপ্রাণতাই তার বৈশিষ্ট্য।

গল্পের ভাষা সাধু হলেও তা গল্পের গতিকে ব্যাহত করে নি। ভাষায় সাবলীলতা আছে। এ ভাষা সেই ভাষা যে ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে গড়ে উঠেছে। বরং গল্পের রসোপলব্ধিতে মাঝে মাঝে ব্যাঘাত ঘটেছে ঘটনার কৈফিয়তে, পাঠকের উদ্দেশ্যে সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগে প্রভৃতিতে। ঊনবিংশ শতকের ইংরেজী উপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্রের উপন্যাসও অবশ্য এ লক্ষণ থেকে বাদ যায় নি।

চরিত্র বিকাশে; মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে চরিত্রোচিত সংলাপ রচনায় উপন্যাসের মূল্য। কিন্তু

"দীপনির্ব্বাণে" সংলাপ সে গুরু দায়িত্ব পালন করে নি। অনেক সময়েই সাধুভাষার সংলাপগুলি অযথা দীর্ঘ হয়ে উপন্যাসের গতিকে মন্থর করেছে। চরিত্রগুলির নিজস্বতা লেখিকা নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। এছাড়া পূর্বেই বলেছি হৃদয়ানুভূতির উত্থান পতন, অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাব চরিত্রগুলিকে প্রায় নির্জীব জীবনউত্তাপবিহীন করে তুলেছে।

তবুও বলা যায় উনবিংশ শতকের জাতীয়তাবোধের বিকাশের যে একটি দিক হল প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাস অনুসন্ধান ও শৌর্য বীর্য কাহিনী রচনা, সেই যুগধারা অনুস্মৃতিতে সমকালীন সাহিত্যের ইতিহাসে 'দীপনির্ব্বাণে'-র একটি নিশ্চিত আসন রয়েছে। তাছাড়া ইতিহাসাশ্রিত দেশপ্রেমমূলক উপন্যাস হিসেবে 'দীবনির্ব্বাণে'-র মূল্য অবশ্য স্বীকার্য। শিল্পমূল্যে খুব উচ্চাঙ্গের না হলেও ১৮৭৬ সালে একজন বাঙালী মহিলার রচনা হিসেবে এর মূল্য কম নয়।

ছিন্নমুকুল

বাঙলা উপন্যাস-সাহিত্যে স্বর্ণকুমারীর প্রথম আবির্ভাব ঐতিহাসিক রোমান্স নিয়ে। কিন্তু সেই ধারায় একটি মাত্র উপন্যাস 'দীপনির্ব্বাণ' লিখেই তাঁর লক্ষ্য ফিরল সামাজিক উপন্যাস রচনার দিকে। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'মৃণালিনী' রচনার পর ফিরেছিলেন 'বিষবৃক্ষ'-এর দিকে। 'দীপনির্ব্বাণে'-র পরেই 'ছিন্নমুকুল' বেরল ১৮৭৯ সালে। ভারতীতে উপন্যাসটি প্রথম ধারাবাহিকভাবে বের হয় ১২৮৫ পৌষ থেকে ১২৮৬ অগ্রহায়ণ পর্যন্ত।

বাঙলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাসের পথ দেখান বঙ্কিমচন্দ্র। রমেশচন্দ্রকেও বাঙলা উপন্যাস রচনায় অনুপ্রাণিত করেছেন তিনিই। বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮—৯৪) গল্প রস-প্রবাহের সঙ্গে ইতিহাসের স্রোত ও গার্হস্থ্য রোমান্স মিশিয়ে উপন্যাসের রূপসৃষ্টি করলেন। কন্টারের 'রোমান্স অফ্ হিষ্ট্রি' থেকে উপকরণ নিয়ে ঐতিহাসিক রোমান্সের সূত্রপাত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৫—৯৪) হাতে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৬২—৬৩)-এর 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' কাহিনী দুটিতে। কিন্তু বঙ্কিমের প্রধান কৃতিত্ব বাঙলা গদ্যে রসসঞ্চার ও উপন্যাসের সার্থক শিল্পসম্মত রূপমূর্তি গঠন। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকেই কাহিনী নেওয়া হোক বা ভদ্র বাঙালী জীবন থেকেই কাহিনী সংগৃহীত হোক বঙ্কিমের সব উপন্যাসেই রোমান্স-ধর্মিতা লক্ষিত হয়। বঙ্কিমের উপন্যাস জগতের নরনারী প্রণয় প্রসঙ্গ ছাড়া দৈনন্দিন মধ্যবিত্ত জীবনের ঘরসংসারের কথা বেশি বলে না। দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)-র ঐতিহাসিক রোমান্স নিয়ে বঙ্কিমের যে সৃষ্টি কার্যের সূত্রপাত, সেই সৃষ্টি ধারাতেই বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইলের মত উপন্যাস উৎসারিত হয়ে তাকে পারিবারিক বিভিন্ন মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণক্ষম ও বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী সাহিত্যে উপন্যাসের বিরাট বিকাশ হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজী সাহিত্যের মৌল লক্ষণই ছিল 'ইন্টেলেকচুয়ালিজম' বা বুদ্ধিবাদ ও 'রিয়ালিজম' বা বাস্তববাদ। এর সঙ্গে অনুভূতি কল্পনার মিশ্রণ ইংরেজী সাহিত্যকে করেছিল বহুলতর ঐশ্বর্যশালী। ক্রমবর্ধমান যন্ত্র-বিজ্ঞানের প্রসারে, শিল্পবাণিজ্যের অভাবনীয় বিস্তারে, ইংরেজ জীবনে এ সময়ে জটিলতা বেড়েছে এবং তার প্রভাবে মননে কল্পনায় এসেছে আশানিরাশার নিত্য নূতন দ্বন্দ্ব, বুদ্ধি ও আবেগের বিচিত্র আবর্তন। এ সময়ের প্রসিদ্ধ লেখক ডিকেন্স (১৮১২—৭০) প্রবল সামাজিক চেতনা, অশ্রু সজল কৌতুক হাস্য ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্মতা সম্পন্ন সৃষ্টি প্রাচুর্যে ইংরেজী সাহিত্যে বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছেন। ডিকেন্স যেমন দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর চরিত্র গভীর সহানুভূতির সঙ্গে আগ্রহভরে এঁকেছেন থ্যাকাঁরে (১৮১১—৬৩) তেমন ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনসমস্যা

পরিমিত ভাবাবেগের সঙ্গে এঁকেছেন। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি ও শিল্পচেতনা থ্যাকারের বৈশিষ্ট্য। ব্রন্টি ভগ্নীত্রয়ের (শার্লট ১৮১৬—৫৫, এমিলি ১৮১৮—৪৮ ও অ্যান ১৮২০—৪৯) উপন্যাসে এল আত্মজিজ্ঞাসা, নারীর আপন অধিকার সম্বন্ধে অনুযোগের, তীব্র বিদ্রোহের সুর। এঁদের উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলি বেশির ভাগ সাধারণ অবস্থার শান্ত সংযত ভাবের। কিন্তু তাদের কথাবার্তায় আচার ব্যবহারে রয়েছে তীক্ষ্ণ উদ্দীপনা ও প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবোধ। প্রণয় জীবনে আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতার দাবী করেছে তারা। শার্লটের "জেন আয়ার" (১৮৪৭) ও এমিলির 'উদারিং হাইটস্' (Wuthering Heights) (১৮৪৭) এর নিদর্শন। নারীর মগ্ন চৈতন্য বা অবচেতন মন এমিলির উক্ত উপন্যাসে সক্রিয় হয়েছে।

ইংরেজী সাহিত্যে মহিলা ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব এর আগেই হয়েছে। নারীত্বের সুর নিয়ে এর অগেই এসেছেন জেন অষ্টেন (১৭৭৫—১৮১৭)। নারীর দৃষ্টিতে মানবজীবনচিত্র (Feminine outlook), চরিত্র মনস্তত্ত্ব কেমন ঠেকে তা তিনি দেখিয়েছেন। তাঁর শিল্পকীর্তির পিছনে ছিল সুদীর্ঘ সাধনা। রসচেতনা, নিরপেক্ষ শিল্পীমন, মৃদু কৌতুকচ্ছটা ও সূক্ষ্ম শান্ত দৃষ্টি জেন অষ্টেনের প্রতিভার মূলে। তাঁর 'ম্যানসফিল্ড পার্কের' (Mansfield Park) (১৮১৪) ফ্যানি প্রাইসের নারীত্বের ক্রম পরিণতি বা 'এমার' (Emma) (১৮১৬) চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় রয়েছে। বাস্তবদৃষ্টি তথা জীবননিষ্ঠার আদর্শে পরিবার কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত নারী জীবনের চিত্র জেন অষ্টেনের উপন্যাসগুলিতে একান্ত পরিচিত হয়ে উঠেছে।

ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজী সাহিত্যে বুদ্ধিতে মনস্বিতায়, বৈজ্ঞানিক চিন্তার সঙ্গে ধর্ম ও দার্শনিক ভাবনার সামঞ্জস্য সাধন প্রচেষ্টায় শক্তিশালিনী লেখিকা হলেন জর্জ এলিয়ট ছদ্মনামে মেরি অ্যান ইভান্স (১৮১৯—৮১)। কয়েকটি উপন্যাসে তিনি গ্রামীন কৃষকজীবন ও মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র অঙ্কণ এবং স্নেহশীলা নারীহৃদয়ের তথা শিশুমনের সূক্ষ্ম অকৃত্রিম বিশ্লেষণ সহানুভূতি সহকারে ও নিপুণভাবে করেছেন। 'এডাম বীডে' (১৮৫৯) হেট্টি চরিত্র, 'মিল অব দি ফ্লসে'র (১৮৬০) প্রথম দিকে গ্রামীন সমাজ ও চরিত্র অসামান্য সহানুভূতির সঙ্গে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। এ ছাড়া ভিক্টোরীয় যুগের ঔপন্যাসিক মেরিডিথের (১৮২৮—১৯০৯) অতি পল্লবিত বিশ্লেষণ, সংক্ষিপ্ত ভাষা, চমকপ্রদ সংলাপও মনস্তাত্ত্বিক আলোচনাতেই প্রবণতা বেশি। নিষ্ঠুর ভাগ্য বা নিয়তির হাতে অসহায় ক্রীড়াপুত্তলী রূপে মানবজীবনকে দেখেছেন হার্ডি (১৮৪৮—১৯২৮), তার সঙ্গে মিলেছে তাঁর গভীর দুঃখবাদ। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজীসাহিত্যে জীবনবোধ, বুদ্ধিবাদ ব্যক্তিচেতনা ও সর্বোপরি জীবনজিজ্ঞাসা জেগেছে। ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্যে পিউরিটানী মনোভাবের প্রকাশও এই সূত্রে স্মরণীয়।

কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে এসময় শিক্ষিত বাঙালী মানসের মধ্যাহ্ন কাল বলা চলে, সুদীর্ঘকালব্যাপী জীবনসংগ্রাম, শিক্ষা ও ব্যক্তি সচেতনতাসঞ্জাত সমাজবোধ বা সুগভীর জীবনজিজ্ঞাসা তখনও কথাসাহিত্যে আসেনি। নিজের দেশ, জাতি, সমাজ, শিক্ষাসম্বন্ধে বাঙালী ভাবতে শিখছে। এই সময়েই বাঙলা সাহিত্যে যথার্থ উপন্যাস নিয়ে এলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য স্কট নির্দেশিত ইতিহাসাশ্রিত গল্পরসের মধ্য দিয়ে সাহিত্যে নূতন আগ্রহ জাগানো। সেই উদ্দেশ্য সাধনে রোমান্সকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র তার মধ্য দিয়ে শিল্প আদর্শকে রূপ দিয়েছিলেন। বাঙলাসাহিত্যে উপন্যাস সৃষ্টি করতে গিয়ে বঙ্কিম ভূদেব, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির তৈরী সাধুভাষা ও গল্পের উপাদান হয়ত পেয়েছিলেন, কিন্তু তার শিল্পসম্মত মার্জিত সংযত রূপ তাঁকে গড়ে নিতে হয়েছিল। শিল্পাঞ্চল সমৃদ্ধ নাগরিক জীবন, বণিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা, ধনতন্ত্রবাদ প্রসারে অবশ্যম্ভাবী ফল ব্যক্তিচেতনা, সমাজ সচেতনতা বাস্তবধর্মিতা প্রভৃতি গদ্য বা উপন্যাস জন্মের প্রকৃত উপাদান ইংরেজের জীবনে অষ্টাদশ শতকেই এসেছে আমাদের দেশে যার আবির্ভাব তার প্রায় এক শতক পরে। কাজেই ইংরেজী উপন্যাস উদ্ভাবিত হয়ে নানা ধারায় এগিয়ে প্রধান উপাদান চরিত্র, মানবজীবন সত্য ও মনোবিশ্লেষণ সমন্বিত জীবনদর্শনে এসে পৌঁচেছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে, যে সময় বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাসের প্রায় উন্মেষ পর্ব বলা চলে।

'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯) প্রকাশিত হওয়ার সময়ে বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন রোমান্সের রঙ কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসের নায়ক নায়িকা ইতিহাসের রঙীন দূরত্ব ছেড়ে আমাদের ঘরের লোক হয়ে কাহিনীর হৃদ্যতা বাড়িয়েছে। 'ছিন্নমুকুলে'-র আগে বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর (১৮৬৫) পর কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) মৃণালিনী (১৮৬৯) ইন্দিরা (১৮৭৩) বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৩) চন্দ্রশেখর (১৮৭৫) রজনী (১৮৭৭) কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৯) বেরিয়েছে। এদের মধ্যে বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী মনস্তাত্ত্বিক— পারিবারিক উপন্যাস।

রমেশ দত্তের (১৮৪৮—১৯৩৯) বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪), মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭) মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত (১৮৭৮) ও রাজপুত জীবনসন্ধ্যা (১৮৭৯) প্রকাশিত হয়েছে এ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ 'ছিন্নমুকুল' প্রকাশিত হওয়ার মধ্যে। এর মধ্যে 'জীবনপ্রভাত' ও 'জীবনসন্ধ্যা' ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'বঙ্গবিজেতা'-ও ইতিহাসমিশ্রিত গার্হস্থ্য জীবনচিত্র। 'মাধবীকঙ্কণ' টেনিসনের 'এনক আর্ডেনে'র ভাব অবলম্বনে রচিত ইতিহাসের পটভূমিকায় নরেন্দ্র শ্রীশ ও হেমলতার 'ত্রিভুজ' প্রণয়কাহিনী। ঐতিহাসিক পরিবেশের সঙ্গে রমেশচন্দ্র কাহিনীচিত্রণে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র দৃষ্টি নিয়ে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪)। উপন্যাস কল্পনার জগৎ থেকে নেমে এল বাঙালীর নিম্নমধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের প্রাত্যহিকতায়। এ উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ না থাকলেও আছে গ্রামীণ বাঙালী পরিবারের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কৈশোর অনুরাগের স্নিগ্ধ ছবি, নিত্য নৈমিত্তিক সংসারে নারীর একদিকে সঙ্কীর্ণতা ও আরেকদিকে সরল মনের পবিত্রতা, পুরুষের সংসারজ্ঞানহীনতা 'স্বর্ণলতা'য় প্রত্যক্ষ হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের (১৮৩৪—৮৯) 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসে (প্রথম 'ভ্রমর' পত্রিকায় ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব দেখা যায়। 'চন্দ্রশেখর' এর

পরে প্রকাশিত হলেও 'কণ্ঠমালা'য় চন্দ্রশেখরের প্রভাব অনুভব করা যায়। শৈলবালা সাধারণ বাস্তবজীবন থেকে সংগৃহীত চরিত্র। শৈলবালার পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে শৈবলিনীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সঞ্জীবচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত বড় গল্প 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী'-তে ('ভ্রমর' পত্রিকায় ১২৮১—৮২ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত) রামেশ্বরের পুত্র স্নেহ ও দামিনীর অকাল গাম্ভীর্যের পরিস্ফুটন সুন্দর হয়েছে। দারিদ্র্যের দায়ে রামেশ্বরের চুরির মিথ্যা দায় গ্রহণ ও ভাগ্যবিপর্যয়ে স্ত্রীপুত্র হারানো ও জীবনের শেষ পর্যায়ে আবার সব ফিরে পাওয়ার মধ্যে দিয়ে রামেশ্বরের জীবনের ক্ষুদ্র প্রীতিস্নিগ্ধ দাম্পত্য জীবন চিত্রটি সুন্দর ও স্বাভাবিক। রোমান্সের জগতে বিচরণ না করে সঞ্জীবচন্দ্র সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকেই এ কাহিনীদ্বয়ের উপজীব্য সংগ্রহ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৪৮—১৯২২) 'শৈশব সহচরী' উপন্যাসও (বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত ১২৮২—৮৪ বঙ্গাব্দে) সাধারণ সংসার জীবনের চিত্র। কাহিনীর প্রধান উপজীব্য প্রণয়, এবং তার মধ্যে মাঝে মাঝে রোমান্টিকতার স্পর্শ আছে। প্রধান নারী চরিত্র কুমুদিনী আমাদের পরিচিত বাস্তব সংসারের নারী। ভগ্নীপতি রজনীকান্তের প্রতি তার সুপ্ত আকর্ষণ ও ভগ্নী স্বর্ণর প্রতি গভীর স্নেহ কুমুদিনী চরিত্রে সূক্ষ্মদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। স্বল্প পরিচয়ে বিনোদিনী চরিত্রও পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। শরৎ ও রজনীর প্রতি কুমুদিনীর দ্বৈত অনুভূতির মধ্য দিয়ে নারীর ভালবাসার বৈচিত্র্য সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

রাজকৃষ্ণ রায়ের (১৮৪৯—৯৪) 'হিরণ্ময়ী' উপন্যাসেরও (১৮৭৯) বক্তব্য 'ত্রিভুজ' প্রেম। একটি পুরুষকে কেন্দ্র করে দুই ভগ্নীর প্রেমানুভূতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শবাদ বা নীতিপ্রবণতায়ই গ্রন্থের পরিণতি টানা হয়েছে। ছোট বোন হিরণ্ময়ী ও প্রণয়ী ধীরেন্দ্রনাথের মিলন ঘটিয়ে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কিরণময়ী আত্মত্যাগের আদর্শের পথে সরে গেছে। ধীরেন্দ্রনাথ চরিত্র ব্যক্তিত্বহীন, কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ী দুই বোনের চরিত্রগত পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়েছে। কাহিনীকল্পনায় নূতনত্ব থাকলেও ঘটনার আকস্মিকতা ও অসম্ভাব্যতা ও দ্রুত পরিণতিতে কিছুটা অস্বাভাবিকতা অনুভব করা যায়।

'হিন্দু-পুনরুজ্জীবন' (Hindu Revivalism) নেতা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ('পঞ্চানন্দ') (১৮৪৯—১৯১১) 'কল্পতরু' (১৮৭৪) ব্রাহ্মদের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা সত্ত্বেও বইটিকে সাধুবাদ জ্ঞাপনকরা কঠিন। শিল্পের দিক থেকে দরিদ্র বলতে হয় এই বইটিকে। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার সমাপ্তি থেকে গল্পের আখ্যান টেনে লেখা দামোদর মুখোপাধ্যায়ের (১৮৫৩—১৯০৭) 'মৃণ্ময়ী' (১৮৭৪)। দামোদর 'দুর্গেশনন্দিনী'র সমাপ্তি লিখেছিলেন 'আয়েষা' বা 'নবাবনন্দিনী।' তাঁর 'বিমলা'-ও (১৮৭৭) রোমান্টিক ঘটনাবহুল। কলকাতা অঞ্চলের তৎকালীন সামাজিক দুর্নীতির বাস্তব চিত্র এঁকে চরিত্র অঙ্কনে বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী তাঁর (?—১৯০৩) 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে (১৮৭৩)। 'ছিন্নমুকুলে'র এক বছর পরে প্রকাশিত শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭—১৯১৯) 'মেজ বৌ'

উপন্যাসে (১৮৮০) বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনচিত্র, আদর্শ নারীচরিত্র অঙ্কনে তাঁর সহানুভূতিশীল উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের (১৮৬৬—১৯৩৮) উপন্যাসে পরিবারচিত্রে নারীর যে মূর্তি পরিস্ফুট হয়েছে তার সূচনা শিবনাথ শাস্ত্রী করেছেন বলা চলে।

স্বর্ণকুমারীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১—১৯৪১) 'করুণা' নামক একটি উপন্যাস 'ভারতী'তে (১৮৭৭—৭৮) বেরিয়েছিল। এটি সম্প্রতি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম অষ্টম দশকে বাঙলা উপন্যাসে নানারূপে পারিবারিক বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু চরিত্রের হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, ঘটনার সুসমঞ্জস সুস্থির গতি, নানা ঘাত প্রতিঘাতে পীড়িত দৈনন্দিন মানব জীবনের ছবি ও নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনজিজ্ঞাসা বাঙলা উপন্যাসে তখনও বিশেষ আত্মপ্রকাশ করে নি। বাঙালী সমাজে নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা তখনও সহজ হয় নি, তাই প্রণয় চিত্রগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সজীব হয়ে উঠতে না পেরে বহুলাংশে গতানুগতিক ইংরেজী উপন্যাসে বর্ণিত রোমান্টিক চিত্রের আদর্শে পরিকল্পিত হয়েছে। দ্বন্দ্ব, আত্ম বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রণয়চিত্র গুলির তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ বা সজীবতা তেমন প্রতিপাদিত হয়নি। একদিকে আদর্শ ছিল বঙ্কিমের নীতি প্রণোদিত, গার্হস্থ্য রোমান্সের, ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের, আর একদিকে তারকনাথের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা চিত্র 'স্বর্ণলতা'র। এছাড়া ছিল স্বদেশের পরাধীনতার আত্মগ্লানিজাত জাতীয়তাবোধ পরিপোষক অতীত গৌরবগাথা স্মরণমূলক রোমান্স সৃজন। এইরকম যুগপরিবেশে স্বর্ণকুমারী লিখলেন 'ছিন্নমুকুল'। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আগমন হয়েছে জাতীয়তা বোধ উদ্দীপক ঐতিহাসিক রোমান্স 'দীপনির্ব্বাণ' নিয়ে। 'ছিন্নমুকুলে' স্বর্ণকুমারীর লেখনীর মুখ ফিরল রোমান্টিক গার্হস্থ্য জীবনচিত্রণের দিকে। এ জীবনচিত্রণ 'স্বর্ণলতা'র মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহীজীবনের স্বাভাবিক জীবনচিত্র নয়, বরং বঙ্কিমের অনুসরণে রোমান্সের রঙে রঞ্জিত বাঙালী অভিজাত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনচিত্রণ।

'ছিন্নমুকুলে'র কাহিনীতে ইংরেজী সাহিত্যের প্রণয় বিষয়ে 'ত্রিভুজ বিরোধ' ঘনীভূত হয়েছে প্রথম দিকে প্রমোদ যামিনী ও নীরজার প্রেম— পরিকল্পনায়। কাহিনীর এই অংশে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' ও রমেশ্র দত্তের 'মাধবীকঙ্কণে'র সাদৃশ্য নিতান্ত অলক্ষিত নয়। তবে চন্দ্রশেখর ও মাধবীকঙ্কণের দুই নায়কের কেউই 'Villain' বা খলচরিত্র নয়, দুজনের প্রতিই পাঠকের সহানুভূতি সমভাবে উৎসারিত হতে থাকে। কিন্তু 'ছিন্নমুকুলে'র যামিনী পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারেনি, তার 'ভিলেন' সুলভ আচার আচরণের জন্য। 'ছিন্নমুকুলের দুটি প্রণয় কাহিনীই গড়ে উঠেছে রোমান্টিক পটভূমিতে— একটি নির্জন নিবিড় অরণ্যে আর একটি সুবিস্তৃত নিস্তরঙ্গ গঙ্গাবক্ষে বোটে।

উপন্যাসের প্রথমেই বোম্বাই শহরে অভিজাত পরিবারের চারুশীলার গৃহউদ্যানে দুই ভাইবোন প্রমোদ ও কনকের ক্রীড়াচ্ছলে বিবাদ ও হিরণকুমারের কনকের পক্ষ অবলম্বনে

উপন্যাসের ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। চারুশীলার বোন সুশীলার শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কে আত্মীয় হিরণকুমার। কনকের পক্ষ অবলম্বনের এই তুচ্ছ ঘটনা থেকেই শিশু প্রমোদের মনে হিরণকুমার সম্পর্কে একটা সুপ্ত আক্রোশ সমগ্র উপন্যাসের ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করেছে। এই আক্রোশেই সরল উদারপ্রাণ হিরণকুমার ও কনকের ভবিষ্যৎ মিলন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। হিরণের প্রতি প্রমোদের এই বিরূপ মনোভাবকে পরবর্তী কালে সক্রিয় করে তুলেছে যামিনীনাথের কূটকৌশল। 'ছিন্নমুকুলে'র প্রধান বিষয় হল ভ্রাতা প্রমোদের প্রতি কনকের সুগভীর অকৃত্রিম অনুরাগ ও তার স্নেহবঞ্চিত দুঃখময় জীবনের ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী। 'কনক মুকুলে'র সংসার আবর্তে 'ছিন্ন' হওয়ার করুণ চিত্রই ছিন্নমুকুলের প্রতিপাদ্য। তাই উপহার পত্রে স্বর্ণকুমারী তাঁর মানস-কন্যা কনকের করুণ জীবনের জন্য তাঁর জ্যোতিদাদার সহানুভূতি প্রার্থনা করেছেন। উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে কনকের প্রথম আবির্ভাব নয়নের দৃষ্টিতে কী এক অজ্ঞাত বেদনাভার ও নিজের সঙ্কুচিত উপস্থিতি নিয়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এলাহাবাদে গঙ্গার তীরে সুবিস্তৃত অরণ্য রাশির মধ্যে বনবালা নীরজার সঙ্গে প্রমোদ ও যামিনীর সাক্ষাৎ ও পরিচয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সুদূর নির্জন বনভূমিতে কাপালিক প্রতিপালিতা কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনা 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের রোমান্টিক সৌন্দর্য পরিবেশনের উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করেছে। নারীজীবনে বিষয় বৈরাগ্যের প্রতীক মানবী কপালকুণ্ডলা, যেন প্রকৃতির সৌন্দর্যেরই সাকার বিগ্রহ। কিন্তু 'ছিন্নমুকুলে' ঊনবিংশ শতাব্দীর নীরজায় প্রকৃতি সৌন্দর্যের সে রোমান্টিক ঔদাস্য, বৈরাগ্য নেই। নিবিড় অরণ্যভূমি ছেড়ে লোকালয়ে মানবসমাজে সে অনায়াসেই মানিয়ে নিতে পেরেছে, অন্তরের সহজাত বৈরাগ্য বা ঔদাস্য তার সে পথে বাধাসৃষ্টি করে নি। 'ছিন্নমুকুলে'র এই নিবিড় অরণ্যের পাশে, এলাহাবাদের অভিজাত শহর, কলকাতার ভবানীপুরের নাগরিক পরিবেশ উপন্যাসের প্রকৃতি-সৌন্দর্যের রোমান্সকে ঘনীভূত হতে দেয় নি, বরঞ্চ বিষয়বস্তুকে যুগোপযোগী হওয়ার পথে কিছুটা বাধা দিয়েছে।

পথহারা নবকুমারকে পথ দেখিয়ে দিয়েছিল কপালকুণ্ডলা. আর ছিন্নমুকুলেও পথহারা প্রমোদ যামিনীকে পথ দেখিয়েছে নীরজা। বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলাকে প্রথম উপস্থিত করেছেন :

"সেই গম্ভীরনাদিবারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি! কেশভার-অবেণী সংবদ্ধ, সংসর্পিত রাশিকৃত, আগুল্ফলম্বিত কেশভার— তদগ্রে দেহরত্ন; ... বিশাল লোচনে কটাক্ষ, অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর অথচ জ্যোতির্ময়, সে কটাক্ষ এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণ লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল।"

আর নীরজার উপস্থিতি—

"জ্যোৎস্না মূর্তিমতী হইয়া কি বনানীর অস্ফুট অপূর্ণ সৌন্দর্য সহসা পরিস্ফুট সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন? ... বালিকার পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী, অঙ্গে আকণ্ঠলগ্ন ক্ষুদ্র অঙ্গরক্ষা, পরিধানে জটিল গ্রন্থিযুক্ত কুঞ্চনাবহুল গৈরিক বসন। ... বালিকা যথার্থই বনবালা, সে মুখে যুবতী—

স্বভাবসুলভ লজ্জা নাই। সে মুখে বিলাসময় ভাবভঙ্গী কিছুমাত্র নাই, তাহা বালিকার উপযুক্ত ঈষৎ সরল হাস্যে মাত্র প্রফুল্ল।"

কপালকুণ্ডলার সঙ্গে সাক্ষাতের পরদিন নবকুমার অতি প্রত্যুষে সমুদ্রতীরাভিমুখে গেছেন— ও প্রতীক্ষা করতে লাগলেন কপালকুণ্ডলার :

"কাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন? পূর্বদৃষ্টা মায়াবিনী পুনর্বার সে স্থলে আসিবেন— এমত আশা নবকুমারের হৃদয়ে কতদূর প্রবল হইয়াছিল, বলিতে পারি না— কিন্তু সে স্থান তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না।"

'ছিন্নমুকুলে'র প্রমোদও পরদিন আবার অরণ্যে গেছে, তারও মনোভাব :—

"প্রমোদ হতাশচিত্তে শূন্যমনে কাননের চতুর্দিকে অবলোকন করিলেন। সেদিনের মত কোন দেবী-প্রতিমা কি তাঁহার নেত্রগোচর হইবে না?" নীরজার পিতাও সন্ন্যাসী, কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কাপালিক চরিত্রের ভয়াবহ, বিস্ময়কর কাঠিন্য তাঁর চরিত্রে নেই। নীরজার পিতা গৃহী সন্ন্যাসী, একসময়ে তিনি সংসারী হয়েছিলেন, ভাগ্যবিপর্যয়ে সংসার সুখ বঞ্চিত হয়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন। ভাগ্যবিপর্যয়কে বিস্মৃত হওয়ার জন্য তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণ, সন্ন্যাসবেশের অন্তরালে তাঁর অন্তরের প্রেমবঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভ, কন্যাস্নেহ-ফল্গু ধারায় প্রবাহিত।

নীরজা ও কপালকুণ্ডলার সাদৃশ্য আবাল্য লীলাভূমি ও বেশভূষা সম্পর্কিত অংশটুকুই, তার বেশি নয়। প্রকৃতিতে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন নারী। একজন যথার্থই বনবালা, সমাজে লোকালয়ে সে মানাতে পারে না, হৃদয়মধ্যে তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করেও নবকুমারকে কোথাও দেখতে পায় না। আর একজন সামাজিক নারী, অদৃষ্ট চালিত হয়ে বনে বাস করেছে মাত্র, বনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় নি।

নীরজা কনকের কাছে অন্তরানুভূতিকে ব্যক্ত করে ফেলে— "বনের এলো হরিণ হওয়ার চেয়ে পোষা হরিণ হওয়াই ভাল।" প্রমোদ সম্পর্কে তার অনুভূতি :—

"প্রমোদকে কেহ ভালবাসে শুনিতেও নীরজার ভাল লাগে। যদি কেহ নীরজার প্রিয়পাত্র হইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে প্রমোদের প্রশংসা করাই তাহার অভীষ্টসিদ্ধির একটি সহজ ও অকাট্য উপায়।"

বনবালা নীরজার সাংসারিক নীরজায় পরিণতিটি এইরূপ :—

"মনের মত লোক পাইয়া এখন আর সে কাকাতুয়ার সহিত কথা কহে না, ফুল লইয়া খেলে না, এখন তাহার খেলা, আমোদ, গল্প, সকলি মানুষের সহিত, এখন লীলাময়ী যমুনার উপর কূলস্থ বটবৃক্ষ পতনের মত নীরজার তরল স্বভাবে গৃহস্থের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে, এখন বনের পক্ষী পিঁজরায় আবদ্ধ হইয়া লোকরঞ্জন কথা কহিতে শিখিয়াছে;"

প্রমোদ যখন নীরজার আবাল্য লীলাভূমি অরণ্য দেখাতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করে সে খুশি হয়, আবার না দেখতে পেয়ে কোন ক্ষোভও তার মনে জাগে না।

নীরজার মনস্তত্ত্ব ঔপন্যাসিকের নারীদৃষ্টিতে বিশ্লেষিত হয়েছে। কনককে নীরজা আপন

করে নিয়েছে, কিন্তু দাদার প্রতি কনকের নিঃস্বার্থ ভালবাসায় নীরজার বিশেষ কোন সহানুভূতি নেই, বরং কনকের প্রণয়পাত্র হিরণকুমার প্রমোদের বিরাগভাজন বলে কনকের প্রতি তার সুপ্ত ক্রোধ। কনকের জীবনের সুখশান্তি চিরতরে বিনষ্ট করতেও তার নারীহৃদয়ে একটুও দাগ পড়ে নি। ব্যক্তিত্বহীন সাধারণ নারীচরিত্র নীরজা। সুগভীর ভ্রাতৃপ্রীতি, ও আত্মোৎসর্গের মধ্যে কনক চরিত্রের রোমান্সে নূতনত্ব রয়েছে। প্রমোদের একান্ত স্বার্থপরতায় কনকজীবনের করুণ বিষাদান্তক পরিণতি পাঠকহৃদয়কে আকর্ষণ করে। সংসারে সর্বত্র স্নেহবঞ্চিত কনক হিরণকুমারের ভালবাসা জীবনে আঁকড়ে ধরেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের ভালবাসা মিলনে পরিণতি লাভ করেনি। কনক হিরণকুমারের নির্দ্বন্দ্ব প্রণয়ে বাইরের আঘাত এসেছে প্রমোদের হিরণকুমারের প্রতি বিতৃষ্ণার মধ্য দিয়ে। কনক স্বর্ণকুমারীর রোমান্টিক মানসদুহিতা। জীবনভোর সে দুঃখ বঞ্চনা সয়ে গেছে, কোন প্রতিবাদ আসেনি তার কণ্ঠে। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি হিন্দু নারীর প্রতীক সে।

প্রমোদ যামিনী ও নীরজার প্রেমের ত্রিভুজ বিরোধে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না। যামিনীর নারীরূপ-তৃষ্ণাই এই প্রেমের দ্বন্দ্ব বা জটিলতার সৃষ্টি করেছে, অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন প্রকাশ নেই। বিলাসী তরলচিত্ত রূপোন্মাদ যুবকরূপে যামিনীনাথ পাঠকসমীপে আবির্ভূত হয়েছে। তার চিন্তাধারা ও আচার ব্যবহারে কোন সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। ধীরে ধীরে নীরজাকে হরণ, প্রমোদকে বিপদে ফেলার প্রয়াস ও হত্যা প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সে ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে বহুল সুলভ 'ভিলেন' চরিত্রে পরিণত হয়েছে। কনককে দেখা মাত্র তার রূপে মুগ্ধ হয়ে নীরজা ও প্রমোদের বিবাহ ব্যাপারে সে উৎসুক হয়েছে। প্রমোদ নীরজার মিলন পথে প্রথমে বাধা হয়েছে অমোঘ নিয়তির মত যামিনীর অসীমরূপতৃষ্ণা।

চমকপ্রদ ঘটনা ও আকস্মিক যোগাযোগ 'ছিন্নমুকুলে' প্রচুর আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজে সন্ন্যাসিনী নীরজা ও তার হরণবৃত্তান্ত, প্রমোদ-কে যামিনীর হত্যাপ্রচেষ্টা, সুশীলার বহুকালের হারানো স্বামীর হঠাৎ নীরজার পিতা রূপে আবির্ভাব, উন্মাদিনী কনকের বনে বনে বেড়ানো প্রভৃতি চমকপ্রদ ও আকস্মিক বা অতি নাটকীয় ঘটনার প্রচুর নিদর্শন আছে।

প্রমোদ অস্থিরমতি, আত্মসর্বস্ব যুবক, যুক্তির চেয়েও ভাবাবেগের উপরই তার প্রবণতা বেশি। প্রমোদ বা হিরণকুমার কোন চরিত্রই ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক নয়। হিরণকুমারও আদর্শের ভাবাবেগসম্পন্ন রোমান্টিক পুরুষ চরিত্র। দৈনন্দিন জীবন সঞ্জাত উত্তাপ সজীবতা এ চরিত্রগুলিতে যথার্থ প্রাণস্পন্দন আনতে পারে নি। গঙ্গার ঘাটে কনকের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের স্থানে হিরণকুমারের প্রাণত্যাগের প্রচেষ্টার মধ্যে রোমান্টিক ভাবানুভূতিরই চূড়ান্ত পরিণতি। সামাজিক মানুষের দৈনন্দিন পারিবারিক জীবন বা সেই জীবনপ্রবাহে মানুষের যে বিচিত্র ভাবের দোলা তার পরিস্ফুটন নেই 'ছিন্নমুকুলে'। উপন্যাস জীবনচিত্র,— যুগের সমাজচেতনা ও জীবনানুভূতিকে ধরে রাখে উপন্যাস। কিন্তু 'ছিন্নমুকুলে' মানবজীবনের নানাবিধ ঘাত প্রতিঘাত সমুত্থিত জীবন-জিজ্ঞাসার কোন অভিব্যক্তি নেই।

'ছিন্নমুকুলে'র বিভিন্ন পরিচ্ছেদের নামকরণের মধ্যে দিয়ে বক্তব্যের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

'দীপনির্ব্বাণ' অপেক্ষা স্বর্ণকুমারীর পরিণত প্রতিভার নিদর্শন 'ছিন্নমুকুল'। পূর্বের উপন্যাসটি অপেক্ষা এ উপন্যাসে গল্পের গতি স্বচ্ছন্দ হয়েছে, কৈফিয়ৎ আপ্তবাক্য গতিকে বাধা দেয় নি। সংলাপেও অপেক্ষাকৃত নৈপুণ্যের পরিচয় আছে, 'দীপনির্ব্বাণে'র সুদীর্ঘ আড়ষ্ট সংলাপ এখানে নেই। ষোড়শ পরিচ্ছেদে যামিনীনাথের বিবাহ প্রস্তাব কাকাতুয়াকে আদর করার ছলে এড়িয়ে যাওয়া ও তার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তরগুলি নীরজার মনোভাব প্রকাশের পক্ষে সহায়ক। উপন্যাসের ভাষা সাধু হলেও স্বচ্ছন্দ ও গতিশীল। সংলাপে চলিত ভাষা প্রয়োগ চরিত্রগুলির স্বাভাবিকতা বজায় রাখার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ বা ঘটনাসন্নিবেশে বিশেষ সূক্ষ্ম নৈপুণ্যের পরিচয় না থাকলেও সমগ্র ভাবে 'ছিন্নমুকুল' সুখ পাঠ্য, করুণ রসোদ্রেককারী উপন্যাস, স্বর্ণকুমারীর অপেক্ষাকৃত পরিণত প্রতিভার পরিচায়ক।

মালতী

এরপরেই ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হল স্বর্ণকুমারীর ক্ষুদ্রাকার উপন্যাস 'মালতী'। (ভারতী'তে প্রথম প্রকাশিত ১২৮৬ বঙ্গাব্দের মাঘ-ফাল্গুন।) 'মালতী'-রও মূল উপজীব্য ভ্রাতাভগ্নীর গভীর অনুরাগ। নামচরিত্র 'মালতী'র গভীর ভ্রাতৃপ্রেম অনেকটা কনকের মত আত্ম-বিলোপকারী ও এই প্রণয়ই তার জীবনে ট্র্যাজেডির মূল কারণ। তবে কনকের ভাই প্রমোদের মত মালতীর ভাই রমেশ আত্মসর্বস্ব লঘুচিত্তের যুবক নয়। রমেশ ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্যশিক্ষিত বিলেত ফেরত বাঙালী যুবকের প্রতিনিধি। মালতী তার মায়ের সুখী কন্যা, কিন্তু রমেশ তাকে সহোদরাতুল্যই স্নেহ করে। রমেশের স্ত্রী শোভনা তার নিজেরই মনোনীত। স্নেহে প্রেমে স্নিগ্ধ ভ্রাতাভগ্নী ও ভ্রাতৃবধূর সুন্দর শান্ত জীবনে প্রথম তরঙ্গবিক্ষেপ হল মালতীর প্রতি রমেশের ভালবাসায় শোভনার সন্দেহ সংশয়ে। শোভনার এই সন্দেহ ক্রমে গাঢ় হয়ে উপন্যাসে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। শোভনার অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় দিয়েছেন স্বর্ণকুমারী। তিনি নারী-দৃষ্টিতে শোভনার ঈর্ষা সংশয় জড়ানো অন্তর্দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। রমেশের সান্নিধ্যে যুক্তি ফিরে পেয়ে শোভনার হৃদয় কখনো শান্ত হচ্ছে, আবার মালতীকে দেখে রমেশের অকৃত্রিম স্নিগ্ধমধুর খুশির হাসিতে চিরন্তন ইমোশনাল নারী যুক্তি হারিয়ে অশান্ত হয়ে উঠেছে। এই দ্বন্দ্বে শোভনা চরিত্রে বাস্তব নারীর সজীব উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছে।

রোমান্স ছেড়ে মানবমনের অপার রহস্যে স্বর্ণকুমারী আকৃষ্ট হয়েছেন। তার নিদর্শন রয়েছে ঔপন্যাসিকের মন্তব্যে :—

"নিউটন গ্যালিলিও অনেক ভাবিয়া বাহ্যিক জগতের নিয়ম বাহির করিয়াছেন, কিন্তু মনের নিউটন কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। আর কবেই বা জন্মাইবেন কে জানে!"

মানবমনের এই অপার রহস্য অভিব্যক্ত হয়েছে শোভনার অনুভূতি ও আচার আচরণের মধ্য দিয়ে। রমেশ মালতীর ভাইবোনের অকৃত্রিম নিবিড় ভালবাসায় সন্দিহান হয়ে এবং রমেশের প্রতি আস্থাহীন হয়ে শোভনা নারীর সেই চিরন্তন আত্মহত্যার পথই বেছে নিয়েছে। জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা থেকে তাকে উদ্ধার করেছে রমেশ কিন্তু এই ঘটনার পর থেকেই শোভনার সব অবিশ্বাস সন্দেহ মুছে গেছে। আর এই ঘটনার পর থেকেই শুরু হয়েছে সরলা মালতীর অন্তর্দ্বন্দ্ব। স্নেহব্যাকুলা ভগ্নী ভায়ের জীবনে চিরতরে শান্তি এনে দিল নিজে আত্মহত্যা করে। একদিকে ভগ্নীর অকৃত্রিম নিবিড় ভালবাসা আর একদিকে স্ত্রীর সন্দেহে রমেশের মানসিক দ্বন্দ্বও স্বর্ণকুমারীর লেখনীতে সুপরিস্ফুট হয়েছে।

মাত্র চারটি পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত উপন্যাসটিতে চমকপ্রদ ঘটনা বা তার আকস্মিকতা

বেশি নেই। অবান্তর প্রসঙ্গ একেবারেই নেই। সংসারের ঘূর্ণাবর্তে পীড়িত তিনটি মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ আছে। তার মধ্যে দিয়েই স্বচ্ছ ভাষায় কাহিনী সহজ গতিতে এগিয়ে গেছে। সংহত কাহিনী, নিপুণ চরিত্র অঙ্কণ, ও মনস্তত্ত্বের নূতন দিক নিয়ে 'মালতী' একটি সার্থক ক্ষুদ্র উপন্যাস। শোভনার দ্বন্দ্ব উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে নূতনত্ব নিয়ে এসেছে। 'মালতী'-র চরিত্রগুলির আর সেই রোমান্সের রঙের দূরত্ব নেই, আমাদের পরিচিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের মানুষ তারা।

মিবাররাজ

সামাজিক মানুষের জীবনকাহিনী থেকে ইতিহাসাশ্রিত কাহিনীর দিকে স্বর্ণকুমারী আবার ঝুঁকেছেন 'মিবাররাজ' উপন্যাসে (১৮৮৭) যেমন বঙ্কিমচন্দ্র ঝুঁকেছিলেন 'রাজসিংহ' রচনায় ও রমেশচন্দ্র দত্ত 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যায়'। রাজপুত ও ভীলদের জাতিগত বিরোধের মূল উৎস কাহিনী এ উপন্যাসের প্রতিপাদ্য। ভীলেদের রাজভক্তি ও বিশ্বাসের সুন্দর পরিচয় আছে এতে। বিষয়বস্তুতে স্বর্ণকুমারী হুবহু টডের রাজস্থান কাহিনীর অনুসরণ করেছেন। রাজপুত সূর্য বংশের আদিপুরুষ গুহার জন্ম পর্বতগুহায়। রাণী পুষ্পবতী পিত্রালয় চন্দ্রাবতীতে পূজো দিতে গিয়ে স্বামী সৌরাষ্ট্র অধিপতি শিলাদিত্যের যুদ্ধকালে তাতারদের হস্তে নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে এক পর্বতগুহার মধ্যে পুত্রের জন্ম দিয়েই পরলোক গমন করেন। পুরোহিত বধূ কমলাবতীর কাছে গুহা পুত্রস্নেহে পালিত হয়। ভীলেরা ছিল গুহার একমাত্র সহচর। তাদের সঙ্গেই খেলায় আনন্দে গুহার দিন কাটত। খেলার মধ্যে তারা গুহাকে তাদের রাজা বলে বরণ করল। ভীলসর্দার মন্দালিক পরম স্নেহভরে তার এই 'রাজপদে'-র স্বীকৃতি দিল। মন্দালিকের পুত্র গুহার প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে গুহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করল, বৃদ্ধ মন্দালিক তাদের নিরস্ত করতে গিয়ে গুহার তীরে প্রাণ হারাল। সেই কলঙ্ক আজীবন বহন করে গুহা ইদরে রাজত্ব করেন ও এর পুত্র বাপ্পাই মিবার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

এ উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বস্তু প্রণয় নয়। এর প্রধান বিষয় গুহার বীরত্ব, তার প্রতি ভীলদের অপরিসীম রাজভক্তি ও বিশ্বাস, বৃদ্ধ মন্দালিকের হত্যার অপরাধে অপরাধী গুহার আত্মগ্লানি। ভ্রাতাভগ্নীর মধুর প্রীতির চিত্র এতেও আছে।

'মিবাররাজ' উপন্যাস ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল 'কলঙ্ক' নামে (১২৯৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ-পৌষ)। 'কলঙ্ক' নামকরণের মাধ্যমে লেখিকা বীর উদারহৃদয় রাজপুতজাতির আদিপুরুষ গুহার ঘটনাচক্রে মন্দালিক-হত্যার অনিচ্ছাকৃত অপরাধকেই ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ নাম পাঠকের পছন্দ না হওয়ায় গ্রন্থাকারে প্রকাশনার সময় নাম রাখলেন 'মিবাররাজ', ভীলেদের কাছ থেকে মিবাররাজের রাজ্য লাভের কাহিনী। গুহার এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধই রাজপুত ও ভীলদের সুদীর্ঘকালব্যাপী জাতিগত বিরোধের মূল কারণ।

উপন্যাস হিসেবে 'মিবাররাজে' স্বর্ণকুমারীর ঔপন্যাসিক প্রতিভার পরিচয় আছে। গল্পবলার ক্ষমতা স্বচ্ছন্দ ও আকর্ষণীয় হয়েছে। কৈফিয়ৎ, আপ্তবাক্য, ঘটনাবাহুল্য না থাকায় গল্পের গতি কোথাও ব্যাহত হয় নি। মন্দালিক পুত্রের মনস্তত্ত্ব পরিস্ফুটনে ঔপন্যাসিকের কৃতিত্বের ছাপ আছে। এ উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র ভীলপুত্র। পিতার স্নেহ ও দলের বিশ্বাস দুইই ছিল

ভীলপুত্রের। এমন সময়ে ভীলেদের মধ্যে এল তার সমবয়স্ক গুহা। গুহার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভীলপুত্র নিজেই তাকে অস্ত্রচালনায় সুপটু করে তুলল, এবং তার বীরত্ব, মাহাত্ম্যের প্রচার করতে লাগল দলের মধ্যে। গুহা দলের ভালবাসা ও বিশ্বাস অর্জন করে নিল। কিন্তু যখন ভীলপুত্রের পিতা মন্দালিকের স্নেহ পক্ষপাতিত্বও গুহার দিকেই অধিক পরিমাণে ধাবিত হতে লাগল, তখনই ভীলপুত্রের গুহার প্রতি ভালবাসায় এল দ্বিধা, দ্বন্দ্ব। পিতৃস্নেহের ভাগ সে কোন কিছুর বিনিময়েই দিতে প্রস্তুত নয়। ভীলপুত্র বরাহ ও গুহা হরিণ শিকার করে আনাতে মন্দালিকের স্নেহপ্রবণ হৃদয় যখন গুহার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ভীলপুত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বে ঘৃতাহুতি পড়ল। এরপর গুহাকেই ভীলেরা রাজা করল। পিতৃস্নেহ, ক্ষমতা সব হারাবার আশঙ্কায় ভীলপুত্র কাতর ও ক্ষুব্ধ হল। ঔপন্যাসিক ভীলপুত্রের এই পিতৃস্নেহ বুভুক্ষু হৃদয়ের উদ্ঘাটন সুন্দর করে করেছেন। পিতার স্নেহে ভীলপুত্রের কখনও তৃপ্তি কখনও সংশয়ের দ্বন্দ্বটি সুপরিস্ফুট হয়েছে। স্নেহে ক্ষমায় উদার পুরুষ মন্দালিক। পুত্র ও পুত্রতুল্য গুহার দ্বন্দ্বের নিরসন প্রচেষ্টায় তার আত্মবিসর্জন পাঠকহৃদয়কে স্পর্শ করে।

পাঠশালায় অধ্যয়নকালে দুঃসাহসিক বেপরোয়া চঞ্চল শিশু গুহার চিত্রাঙ্কনে স্বর্ণকুমারী প্রতিভার নূতন দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে। শিশু মনস্তত্ত্ব অঙ্কনে স্বর্ণকুমারীর দক্ষতার নিদর্শন গুহা। দিদি সত্যবতীকে নিবিড়ভাবে ভালবাসে গুহা। শিশু বয়সে দুষ্টুমি করলেই মা কলাবতী দিদিকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দেওয়ার ভয় দেখালেই গুহার সব চাঞ্চল্য দুষ্টুমি স্তব্ধ হয়ে যেত। পিতৃতুল্য মন্দালিকের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভালবাসা গুহার চরিত্রের আর একটি দিক। উপন্যাসের পরিণতিতে স্বর্ণকুমারী নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। আহত মন্দালিকের শুশ্রূষা করতে গিয়ে গুহা প্রথমে দেখতে পেল ভীলপুত্রের তীর। ভীলপুত্র পিতৃহত্যার সেই আত্মগ্লানিতে আত্মবিসর্জন দিল। তারপরে গুহার দৃষ্টিপথে পড়ল তার নিজের তীর, উপলব্ধি করল পরম শুভাকাঙ্ক্ষী স্নেহশীল মন্দালিককে হত্যার আত্মগ্লানি। শুধু ভ্রাতৃস্নেহের স্বল্প পরিচয়েও সত্যবতীর স্নেহশীলা নারীহৃদয়টি সজীব ও সুন্দর ফুটে উঠেছে। সংক্ষিপ্তির মধ্যে 'মিবাররাজ' উপন্যাসে স্বর্ণকুমারীর নৈপুণ্যের পরিচয় আছে।

বিদ্রোহ

রাজপুত ভীলদের জাতিগত বিরোধ কাহিনী নিয়ে স্বর্ণকুমারী আর একটি উপন্যাস লেখেন 'বিদ্রোহ' (১৮৯০)। বিদ্রোহ উপন্যাসে স্বর্ণকুমারীর পরিপূর্ণ ঔপন্যাসিক প্রতিভার পরিচয় রয়েছে। কাহিনীর স্বচ্ছন্দ ধারা, চরিত্র ও মনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, ঘটনার পারম্পর্য ও ধীর সুস্থির গতি, চরিত্র বিকাশে সহায়ক সংলাপ সব মিলিয়ে 'বিদ্রোহ' উপন্যাসের রচয়িত্রী স্বর্ণকুমারী পুরুষ ঔপন্যাসিকের সমমর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। এ উপন্যাসের কোথাও নারী লেখনীর পরিচয় নেই। 'বিদ্রোহে'র ঘটনা 'মিবাররাজে'র দুশো বছর পরের। ভীলেদের রাজ্য রাজপুতদের অধীনে এখন। রাজা গ্রহাদিত্য কেবল ইতিহাসের চরিত্র। ইতিহাসের পটভূমিকায় সাধারণ মানব জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'বিদ্রোহে'। রাজা রাণী জটিল মানসিক দ্বন্দ্বে ইতিহাসের দূরত্ব ঘুচিয়ে আমাদের মনের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। এই দ্বন্দ্বেই তারা রোমান্টিক নায়ক নায়িকা না হয়ে সজীব মানুষ হয়ে উঠেছে।

'বিদ্রোহ' উপন্যাসের প্রারম্ভের পটভূমি, ভীলেরা রাজপুত বশ্যতা স্বীকার করেছে, তাদের দাসত্ব করেছে, কিন্তু বিদ্রোহের চাপা অসন্তোষ রয়েছে তাদের মধ্যে। ভীলদের জীবনযাত্রার বাস্তব স্বাভাবিক ছবি ফুটে উঠেছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে তাদের আবাসস্থল, বেশভূষা, জীবনযাত্রার একটা সম্যক পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। ভাষাও তাদের জাতিগত স্বাভাবিকতা বজায় রাখার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ঘাটের উপর মন্দির দালানে সপারিষদ রাজসভার চিত্রটি মনোরম। স্তাবক পরিবেষ্টিত রাজার বাস্তব চিত্র হিসেবে এর মূল্য আছে। গণপতি ঠাকুর, বিদূষক, শ্রীমন্ত সিংহ প্রভৃতি প্রত্যেক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে এই সভার হাস্যালাপে।

ভীল জুমিয়ার বীর্যে আকৃষ্ট হয়ে নাগাদিত্য তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। এই বন্ধুত্বের চিত্রে স্নিগ্ধ প্রলেপ এনে দিয়েছে জুমিয়ার বালিকা কন্যা সুহার। কিন্তু বংশগত বৈর নির্যাতন-প্রবণতা নিয়ে এসে আবির্ভূত হয়েছে জুমিয়ার পিতা জঙ্গু। প্রীতি সদ্ভাবের স্নিগ্ধ পরিবেশে সৃষ্টি হয়েছে জটিলতা, অশান্তি। ভীলেদের সুপ্ত অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছে।

রাজ পারিষদদের মধ্যে রাজার আড়ালে জুমিয়ার প্রতি রাজার আকর্ষণের নানারূপ বিরূপ আলোচনা ও মন্তব্যও তাদের প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করেছে।

রাজার ভীলকন্যা সুহারের প্রতি আকর্ষণ ও সেই আকর্ষণ থেকে পরিবার ও রাজ্যে অশান্তি বিদ্রোহের সৃষ্টি উপন্যাসের উপজীব্য। এই ট্র্যাজেডিব মূল রয়েছে রাজার উদ্ধত অস্থির প্রকৃতিতে। ভীলকন্যার প্রতি প্রথমে রাজার ছিল সহজ আকর্ষণ। কিন্তু জনগণের সন্দেহ ও মিথ্যা অপবাদই এই সহজ প্রীতিকে সমাজ বিগর্হিত প্রণয়ের পথে নিয়ে গেছে।

রাজপুরোহিত হরিতাচার্য ও রাণী সেমন্তী রাজাকে বারবার সাবধান করেই এই প্রণয় গাঢ় হবার পথে সহায়ক হয়েছেন। রাজার এই মনোবিশ্লেষণ ঔপন্যাসিকের লেখনীতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

'বিদ্রোহ' উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী চরিত্র অঙ্কনে সর্বাপেক্ষা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন রাণী সেমন্তীর মধ্যে। একদিকে রাজার প্রতি গভীর প্রণয়জাত বিশ্বাস ও আর একদিকে লোকাপবাদে সংশয়— মানসিকতার এই দুয়ের দ্বন্দ্বে রাণীর ট্র্যাজেডি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। এই দ্বন্দ্বই ক্রমশঃ স্বামীস্ত্রীর মনোমালিন্যের কারণ হয়ে জীবন-ট্র্যাজেডিকে অগ্রসর করে দিয়েছে। সারল্য, স্বামী ভক্তি, ক্ষমা, ঔদার্য ইত্যাদি বিভিন্ন মনোবৃত্তির সমন্বয়ে রাণী বাস্তব নারী হয়ে উঠেছে। এই চরিত্রের মাধুর্য বৃদ্ধি করেছে রাণীর গভীর সন্তান স্নেহ। স্বামীপ্রেমে অংশভাগিনী সুহারকে দেখেও বাণী ঈর্ষিত হন নি, গভীর করুণ স্নেহে তিনি বিগলিত হয়েছেন। গৌরীপুজোর দিন প্রণয়প্রতিদ্বন্দ্বিনী সুহারকে নিয়ে এসে গৌরী সাজিয়ে রূপের শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়ে, এবং পরে সুহারকে নিজ অলঙ্কার বেশভূষায় সজ্জিত করে রাজার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যে রাণী হিন্দুনারীর পতিপ্রেমের গভীর পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। রাণী চরিত্রে ব্যক্তিত্বের বিকাশ নেই, সনাতন হিন্দুনারীর আত্মবিলোপকারী পতিপ্রেমের নিদর্শন আছে। প্রেমে স্নেহে ত্যাগে রাণী চরিত্র ও তার দ্বন্দ্ব পাঠককে আকৃষ্ট করে।

সুহার চরিত্র ব্যক্তিত্ব বর্জিত নিছক .রামান্টিক চরিত্র। অসার্থক প্রেমের পরিণতি সে খুঁজে নিয়েছে বিদ্রোহ অবসানে রাজা রাণীর মৃত্যুর পর তাঁদের সন্তানকে রক্ষার দায়িত্বের মধ্যে। তার স্নেহব্যাকুল নারী হৃদয় তৃপ্ত হয়েছে তার মধ্যে। সুহারের প্রণয়পাত্র ভীলযুবক ক্ষেতিয়াও বাকী জীবনে সুহারের সেবা করার ব্রতই গ্রহণ করেছে কোন প্রতিদান পাওয়ার আশা না রেখে। উপন্যাসের পরিণতিতে ভীলেরা বিদ্রোহ করে জয়ী হয়েছে, রাজা রাণীর মৃত্যু ঘটেছে। ইদর থেকে সমস্ত ক্ষত্রিয়রা পালিয়ে গেছে। সুহারেব কাছে পালিত রাজার শিশুপুত্রই 'বাপ্পা' নামে খ্যাত।

পুরোহিত হরিতাচার্যের মধ্যে ব্যক্তিত্বের কিঞ্চিৎ বিকাশ আছে। গণৎকারের চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে ভীলেদের কুসংস্কার প্রবণতার পরিচয় পরিস্ফুট। দাসী রুক্মা টাইপ চরিত্র, রাণীর জীবন বিপর্যয়ে যার ভূমিকা বেশ কিছুটা আছে।

দশম পরিচ্ছেদের বনশোভার সৌন্দর্য বর্ণনাটি হৃদয়গ্রাহী। অযত্নবর্ধিত বিভিন্ন বনবৃক্ষ ও পুষ্পে লেখিকার সূক্ষ্ম সৌন্দর্যরসিক চিত্ত বিমুগ্ধ হয়েছে। এই বনরূপ বর্ণনায় লেখিকার সৌন্দর্যবোধ ও সূক্ষ্মদৃষ্টি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী'র অন্তর্গত হিমালয় ভ্রমণকালে অরণ্য সৌন্দর্য দর্শনের কথা মনে করিয়ে দেয়। উপন্যাসের সঙ্গীতগুলি মনোভাব পরিস্ফুটনে সহায়ক। ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদে রাণী যখন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে বিপর্যস্ত, যখন বেদনায় তাঁর হৃদয় স্তব্ধ, সে সময় সংগীতের মধ্য দিয়ে তাঁর বেদনার প্রকাশ ও রাজার চিত্ত আলোড়ন স্বাভাবিক সুন্দর। এককথায় 'বিদ্রোহ' উপন্যাসই স্বর্ণকুমারীর সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ রচনা।

হুগলীর ইমামবাড়ী

'হুগলীর ইমামবাড়ী' ভারতী'তে প্রথম বার হয় (১২৯১ পৌষ থেকে ১২৯৩ বৈশাখ), এবং গ্রন্থাকারে বার হয় ১৮৮৮ সালে (১২৯৪ বঙ্গাব্দে)। ইতিমধ্যে স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য প্রতিভা বিচিত্র দিকে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'দীপনির্ব্বাণ' 'ছিন্নমুকুল' 'মালতী' 'মিবাররাজ' তাঁর চারটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সহজাত রোমান্টিক কবিপ্রতিভাও স্বরূপ খুঁজে পেয়েছে 'বসন্ত উৎসব' গীতিনাট্যে (১৮৭৯) ও 'গাথাকাব্যে' (১৮৮০)। এছাড়া প্রবন্ধরচয়িত্রী হিসেবেও সাহিত্যজগতে স্বর্ণকুমারী খ্যাতি পেয়েছেন 'পৃথিবী' গ্রন্থের (১৮৮২) সৌর ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক বৈজ্ঞানিক আলোচনায়। উপন্যাস ও কাব্যের রোমান্টিকতা এবং প্রবন্ধের তথ্যভিত্তিক যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনায় স্বর্ণকুমারী স্পষ্ট স্বকীয়তার যখন প্রমাণ দিয়েছেন, এইসময়ে 'হুগলীর ইমামবাড়ী' গ্রন্থাকারে বার হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষদিকের উপন্যাসগুলি আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭) সবই তখন প্রকাশিত হয়েছে। ঐতিহাসিক ও সামাজিক রোমান্স ছেড়ে গীতার নিষ্কাম কর্ম ভিত্তিক দেশ প্রেম, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বঙ্কিম-উপন্যাসের উপজীব্য হয়েছে। রমেশচন্দ্রও ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে সরে এসে 'সমাজ' (১৮৯৪) ও 'সংসারে'র (১৮৮৬) গার্হস্থ্য কাহিনী লিখেছেন।

এছাড়া উপন্যাসজগতে আবির্ভূত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সুহৃদ ও তাঁর প্রশংসাধন্য লেখক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০—১৯০৮)। তাঁর 'শক্তি কানন' (১৮৮৭) পলাশির যুদ্ধের কিছু আগের পল্লীবাংলার সুখ-দুঃখমিশ্রিত ঘরোয়া জীবনের ছবি।

স্বর্ণকুমারীর অনুজ রবীন্দ্রনাথেরও ঔপন্যাসিক হিসেবে আগমন হয়েছে 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮২) ও রাজর্ষি উপন্যাসে (১৮৮৭)। 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র চরিত্রগুলি ইতিহাসের হলেও প্রতাপাদিত্য ও বসন্তরায়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শাশ্বত মানবের ক্রুরতা নিষ্ঠুরতা ও মানবপ্রেমিকতার ভাবে ভোলা উদাসীনতা দুটি দিকই দেখিয়েছেন। 'রাজর্ষি'তে সনাতন ধর্মের প্রথাসর্বস্বতার ওপরে মানবতার জয়গানের ঘোষণা। হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্বে উপন্যাসের ঘটনা পরিচালিত হয়েছে। স্বার্থান্ধ নিষ্ঠুরতাকে ছাপিয়ে উঠেছে সার্বজনীন মানবপ্রেম। উপন্যাসে বাইরের ঘটনার প্রভাব থেকেও হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথই আনলেন।

প্রতাপাদিত্যকে কেন্দ্র করে প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র দ্বিতীয় খণ্ড বার হয়েছে ১৮৮৪ সালে (১ম খণ্ড ১৮৬৯)। একদিকে ইতিহাস অনুসরণ, গার্হস্থ্য চিত্রণ আর একদিকে রবীন্দ্রনাথের মানবহৃদয়ানুভূতির বিশ্লেষণ— এসময়ের উপন্যাসে দেখা যায়।

'হুগলীর ইমামবাড়ী'কে স্বর্ণকুমারী ঐতিহাসিক উপন্যাস বললেও ইতিহাসের রোমান্স

বা ঘটনাপ্রভাব এতে নেই। মহম্মদ মসীনের জীবনকাহিনী এ উপন্যাসে বিষয়বস্তু। তাঁর চরিত্রের সাহায্যে ভারতীয় ধর্মের ব্যাখ্যা ও প্রচার করেছেন লেখিকা। ইতিহাসের সংঘাতময় পটভূমি বা রোমান্সের বর্ণচ্ছটা ছেড়ে এখানে আদর্শবাদী স্বর্ণকুমারীর আত্মপ্রকাশ। সর্বধর্ম-সমন্বয়ের দিকেও লেখিকার প্রবণতা অনুভব করা যায়। উপন্যাসে জীবনচিত্রণের মাধ্যমে ধর্মপ্রভাব বা তার বিকাশ না দেখিয়ে দীর্ঘ সংলাপে ধর্মব্যাখ্যা করেছেন ঔপন্যাসিক।

উপসংহারে স্বর্ণকুমারী বলেছেন মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্রর ইংরেজী বক্তৃতার সারাংশ অবলম্বনে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহম্মদ মহসীনের যে বাঙ্গলা জীবনচরিত লিখেছিলেন (মহম্মদ মহসীনের জীবনচরিত শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত ১৮৮০) তার থেকে তিনি তথ্য নিয়েছেন। গ্রন্থ প্রদত্ত তথ্য অবিকল অনুসরণ না করে মাঝে মাঝে তিনি কিম্বদন্তীর আশ্রয়ও নিয়েছেন, এবং সে প্রসঙ্গ লেখিকা উল্লেখও করেছেন। প্রমথনাথের গ্রন্থে পাওয়া যায় আগা মতাহারের কন্যা মন্নুজান খানম্। মতাহার মৃত্যুর সময় কন্যাকে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করে যান, তখন তাঁর পত্নী অসন্তুষ্ট হয়ে হুগলী নিবাসী কাজি ফয়জুল্লাকে বিবাহ করেন। মহম্মদ মহসীন এঁদের সন্তান। মন্নুজানের থেকে তিনি আটবছরের ছোট। আর একটি কাহিনীর প্রচলন আছে যে, মহম্মদ মহসীন মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার সেখানে মৃত্যু হলে, মাতা হুগলীতে এসে আগা মতাহারকে বিবাহ করেন এবং তাঁদেরই কন্যা মন্নুজান খানম্। 'হুগলীর ইমামবাড়ী'তে এই দ্বিতীয় কাহিনীর অনুসরণ আছে।

মন্নুজান সম্পর্কেও উক্ত জীবনীগ্রন্থ থেকে জানতে পাবা যায়, মতাহার মৃত্যুর সময় নির্দেশ দিয়ে যান তাঁর ভাগ্নে সালাউদ্দীন খাঁর সঙ্গে মন্নুজানের বিবাহ দিতে। সেই অনুসারে তাঁর মৃত্যুর পর পারস্য-দেশ থেকে সালাউদ্দীন এসে মন্নুজানকে বিবাহ করেন। তাঁদের দাম্পত্য জীবন সুখে কাটে। উপন্যাসে এক্ষেত্রে লেখিকা কিম্বদন্তী অনুসরণ করেছেন। মতাহার অনেক অনুসন্ধানের পর আদরিণী কন্যার বিবাহ দেন পারস্যরাজ সালাউদ্দীনের সঙ্গে, যিনি বিলাসপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। সুরাপান ইত্যাদি উচ্ছৃঙ্খলতায় তিনি সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করলে মতাহার কন্যাকে দুর্দশা থেকে বাঁচাবার জন্য কিছু সম্পত্তি লুকিয়ে রাখেন এবং মৃত্যুকালে দানপত্ররূপে তাবিজে করে তা কন্যাকে দিয়ে যান। পিতার মৃত্যুর পর মন্নুজান বিষয়বিরাগী হয়ে তা ভ্রাতাকে দান করেন। মসীন তা ধর্মকার্যে নিয়োজিত করে ভগ্নীর সঙ্গে বিষয়বন্ধন মুক্ত ফকির জীবন অবলম্বন করেন। তাবিজে দানপত্র দেওয়ার উল্লেখ মহসীন জীবনীতেও আছে।

প্রমথনাথের মহসীন জীবনী ও কিম্বদন্তীর মিশ্রণে হুগলীর ইমামবাড়ীর গল্প লিখেছেন স্বর্ণকুমারী। মন্নুজান খানম্ উপন্যাসে হয়েছে মুন্না। সংক্ষেপে কাহিনীটি হল মুন্নার স্বামী সালাউদ্দীন বিলাসপ্রিয় মদ্যপ। উচ্ছৃঙ্খলতায় সে সব সম্পত্তি খোয়াতে বসেছে। মুন্না অগাধ প্রীতি নিয়ে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। সালাউদ্দীন শেষ পর্যন্ত নবাব সেরজঙ্গের কন্যাকে বিবাহ করার জন্য মুন্নাকে ছেড়ে চলে যায়। মতাহার ও মসীন দুজনেই মুন্নার

বেদনার সমব্যথী কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সালাউদ্দীন যাবার আগেই মতাহার কন্যার দুঃখ আর সহ্য করতে না পেরে তীর্থের পথে বেরিয়ে পড়েন। সালাউদ্দীন যাওয়ার কিছুদিন পরে মসীনও গেল পিতৃসন্ধানে। মুন্নার নিঃসহায় দুঃখের জীবনে দেখাশোনা করে মসীনের সুহৃদ গায়ক ভোলানাথ। নবাব খাঁজাহান খাঁ মুন্নার কাছে পূর্বে বার বার প্রণয় জ্ঞাপনে ব্যর্থ হয়ে এসময়ে তাকে অপহরণের চেষ্টা করে। মসীনের ধর্মগুরু সন্ন্যাসী অলৌকিক ক্রিয়া বলে মুন্নাকে রক্ষা করল। মুন্না পথে পথে ঘোরে, ভিক্ষা করতে চেষ্টা করেও পারে না। অবশেষে মুন্না অনুসন্ধান পেয়ে আশান্বিত চিত্তে চলল নবাব সেরজঙ্গের বাড়ী, কারণ তার কন্যাকে বিবাহ করে তার বাড়ীতেই অধিষ্ঠান করছিল সালাউদ্দীন। কিন্তু সেখানে সে আশ্রয়ের বিনিময়ে স্বামীর কাছে পেল অসীম লাঞ্ছনার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান। ইতিমধ্যে তীর্থের পথে মতাহারের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর প্রদত্ত তাবিজ নিয়ে মসীন ফিরে এসেছে। পিতৃ প্রদত্ত সম্পত্তি জনহিতকর কাজে দান করে ভাইবোন মানবসেবার মহৎ কাজে আত্মোৎসর্গ করলেন।

উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী একটি বিশেষ অনুভূতি নিয়ে এসেছিলেন— ভাইবোনের নির্মল নিবিড় ভালোবাসার। 'ছিন্নমুকুল', 'মালতী'তেও আমরা এই স্নিগ্ধ ভালোবাসার চিত্র পেয়েছি। তবে এ চিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হল, বোনেদের জীবন সাধারণতঃ করুণ দুঃখী, ভায়ের কল্যাণকামনায় তাদের আত্মসত্তা বিলুপ্ত। 'ছিন্নমুকুল'-এর কনক, 'মালতী'র মালতী এই ধারাই বহন করেছে। 'হুগলীর ইমামবাড়ী'তে মসীন মুন্নার চিত্র লেখিকার এই বিশেষ অনুভূতির অনুসরণ। কেবল এ উপন্যাসে ব্যতিক্রম বোনের সুখের জন্য ভাই ব্যাকুল, তার সুখ দুঃখেই সমর্পিত প্রাণ। বলাবাহুল্য মুন্নাচরিত্রে লেখিকার সেই পূর্বচিত্রিত রোমান্টিক বিষাদ পরিস্ফুট। অবিরাম দুঃখানুভূতির মধ্যে দিয়ে মুন্নাকে নির্মোহ নিরাসক্ত জীবনবোধে উত্তরণ করানো হয়েছে। বাইশ বছর বয়সের তুলনায় মুন্না তাই অনেক বেশি অনুভূতিপ্রবণ, জীবনসাধিকা। জীবনের ঐহিক সুখ ঐশ্বর্য তার অন্তরের গভীরে কোন ছায়াপাত করতে পারে না।

উপন্যাসে মসীন মুন্নার চেয়ে চার বছরের বড়। বোনের সুখ দুঃখেই তার সুখদুঃখ। জীবনের সমস্যার কোন প্রতিকার না খুঁজে সে ধর্মের ব্যাখ্যায় সান্ত্বনা খোঁজে। মসীন মুন্নার নিষ্ক্রিয় সমব্যথী। মসীন চরিত্র ইতিহাস অনুসারে ন্যায়পরায়ণ, দয়ার্দ্র, আর্তের সেবায় সদাই উন্মুখ। মসীন চরিত্রে তাই কোন মৌলিকতা নেই।

হুগলীর ইমামবাড়ীতে স্বর্ণকুমারী মুসলমান সমাজ ও জীবনচিত্র অঙ্কন করতে মনস্থ করে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। মসীন মুন্না মুসলমান সমাজের। কিন্তু উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণে বা পারিবারিক চিত্রাঙ্কণে মুসলমান সমাজ সংস্কৃতি বা জীবনের বৈশিষ্ট্য ফোটেনি। মুন্নার মধ্যে হিন্দু নারীর আদর্শ পাতিব্রত্য, স্নেহকোমল ভাবটিই পরিস্ফুট। মুসলমান সমাজে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ও লোকাচাররূপে প্রচলিত। মুন্নার পক্ষে দ্বিতীয় বিবাহ অকল্পনীয়। শত লাঞ্ছনাতেও সে স্বামীগত প্রাণা, মদ্যপ উচ্ছৃঙ্খল নিষ্ঠুর সালাউদ্দীনের দিনান্তে একবার দর্শন পেয়েও সে তৃপ্ত। কাউকে সে অভিযুক্ত করে না নিজের জীবনের দুঃখের জন্য, সবই

অদৃষ্টের বিধান বলেই সে মেনে নেয়। সালাউদ্দীন মুন্নাকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার পরে তার জগৎ আঁধার হয়ে গেল। স্বামী পরিত্যক্তা সর্বহারা মুন্নার করুণ বেদনা পাঠকহৃদয়কে স্পর্শ করে। সপত্নীর গৃহে স্বামীর কাছে দাসীরূপেও একটু স্থান পাওয়ার আগ্রহ মুন্নার একনিষ্ঠ পতিপ্রেমের চূড়ান্ত নিদর্শন। এই গভীর দুঃখের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে জীবনসাধনায় উত্তীর্ণ হয়েছে, ভারতীয় ধর্মের লক্ষ্য নিরাসক্ত মোহমুক্তিতে উত্তরণ করেছে মুন্না।

সমকালীন মুসলমান সমাজচিত্রের আভাস কয়েকটি ঘটনায় কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে নবাববাড়ীতে প্রহরীদের কাছে চুড়ীওয়ালার অমানুষিক নিগ্রহ, প্রথম পরিচ্ছেদে বেগম সাহেরবানুর পাল্কীর সামনে অক্ষম বৃদ্ধার লাঞ্ছনা ও চতুর্দশ পরিচ্ছেদে প্রহরীদের হস্তে ভোলানাথের লাঞ্ছনার মধ্যে মুসলমান রাজত্বে নবাবের কর্মচারীদের অত্যাচারে সাধারণ নির্দোষ মানুষের নিগ্রহের প্রত্যক্ষ রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে 'খাসমজলিস' নামক সালাউদ্দীনের মজলিস চিত্রে মুসলমান নবাবদের স্তাবক বেষ্টিত ভোগবিলাসের চিত্রটি মনোরম ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

খেয়ালী খাঁজাহান খাঁর উল্লেখ মহসীন জীবনীতেও আছে। খাঁজাহান খাঁর অধ্যায়ের সঙ্গে উপন্যাসের কোন যোগসূত্র নেই বলে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত। মনে হয়, মুন্নার নিরাসক্ত নিষ্কলুষ সারল্যের অভিব্যক্তিকে স্ফুটতর করবার জন্য এ চরিত্রের উপস্থাপনা। তাছাড়া খাঁজাহান খাঁ ও মসীন সমসাময়িক প্রসিদ্ধ দুটি মানুষ। একজন বিলাসী খামখেয়ালী স্বেচ্ছাচারপ্রিয়, আর একজন ধীর স্থির উদার মহান বিষয়বিরাগী আর্তের বন্ধু। এ দুটি বিসদৃশ মানবসত্তা স্ফুটনেও হয়ত লেখিকার লক্ষ্য ছিল। তাছাড়া খাঁজাহান খাঁর প্রবৃত্তি ও বিবেকের দ্বন্দ্বটিও একটি আকর্ষণীয় দিক। চরিত্রটির প্রতি লেখিকার সহমর্মিতা ছিল বোঝা যায়। আগেই বলেছি 'হুগলীর ইমামবাড়ী' আদর্শবাদী ধর্মসাধিকা স্বর্ণকুমারীর সৃজিত। তাঁর বক্তব্য হল এই পার্থিব জীবনের স্বল্পস্থায়ী ভোগ বিলাস সুখ-সম্পদ বা দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে মানুষ জীবনের বৃহত্তর যে লক্ষ্যের জন্য প্রস্তুত হয় সে লক্ষ্য হল নিরাসক্ত নির্মোহ জীবনসাধনা। সেই সিদ্ধিতে পৌঁছানোর জন্যই মানুষের মর্ত্যের এই ক্ষণিক সুখ-দুঃখ ভোগ। তবে মানুষ এই ভোগকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে গীতার নির্দিষ্ট নিষ্কাম কর্মের দ্বারা। খাঁজাহান খাঁ স্বর্ণকুমারীর এই ধর্মপ্রচারের একটি মাধ্যমও বটে, প্রবৃত্তি পরায়ণতার পথে তার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন লেখিকা, তবে তার স্বীয় সত্তায় এর পরিণতি দেখাতে পারেন নি, তার জন্য আনতে হয়েছে সন্ন্যাসীর অলৌকিক উপস্থিতিকে।

উপন্যাসের অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয় চরিত্র ভোলানাথ। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে প্রহরীদের সঙ্গে সংলাপে তার স্বকীয়তা ফুটেছে। মহসীন জীবনীতে মহসীনের সুহৃদ গায়ক ভোলানাথের উল্লেখ আছে। ডঃ বিজিত দত্ত ভোলানাথে রবীন্দ্রনাথের বৌ-ঠাকুরাণীর হাটের বসন্তরায়ের প্রভাব দেখেছেন। ভোলানাথে বসন্তরায়ের মানবপ্রেমের উদার মহানতার আদর্শ থাকলেও বসন্তরায়ের আত্মনিমগ্ন বিশালহৃদয়ের মানবদরদী বলিষ্ঠ পুরুষত্ব ভোলানাথে নেই। তবে

ভোলানাথ চরিত্র অঙ্কণে লেখিকা স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। মানুষের হাতে মানুষের নিগ্রহ দেখে তার ব্যথিত বেদনার্ত নিরুপায় হৃদয় সান্ত্বনা খোঁজে রামপ্রসাদী গানে। রামপ্রসাদী গানের দুটি দিক রয়েছে— একদিকে তন্ত্রের দেবীকে জননীরূপে বন্দনায় চিরন্তন মানবের হৃদয়ার্তি আর একদিকে এর মূল্য অষ্টাদশ শতকের সমাজজীবনের স্পষ্ট পরিচয় হিসেবে। রামপ্রসাদ (আনুমানিক ১৭২০— মৃত্যু ১৭৮১) তাঁর সমকালীন অত্যাচার অনাচারগ্রস্ত সমাজ জীবনকে সুস্থ দরদী দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন, ব্যথিত হয়েছেন, নিরুপায় হৃদয় প্রতিকারে অসমর্থ হয়ে জগজ্জননীর পায়ে মনোবেদনাকে উজাড় করেছে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। এই দিক দিয়ে তাঁর গানের সর্বকাল ও সর্বজন হৃদ্যতা। নবাববাড়ীতে লাঞ্ছিত হয়ে, মসীন চলে যাওয়ার পরে ব্যথিত হৃদয় ভোলানাথ, মুন্নার বেদনায় কাতর হয়ে মায়ের নামগানে সান্ত্বনা খুঁজেছে, আবার সুদীর্ঘ দুঃখাবসানের পর মসীন মুন্না মিলিত হলে আনন্দেও মায়ের নামগানের মধ্যে তাঁকেই স্মরণ করেছে। এর মধ্যে ভোলানাথের অসহায় হৃদয়বেদনার করুণ দিকটি মূর্ত হয়েছে। বসন্ত রায়ও মানবের লাঞ্ছনা দেখে সঙ্গীতেরই আশ্রয় নিতেন। নবম পরিচ্ছেদে মুন্নাকে ছেড়ে সালাউদ্দীনের চলে যাওয়ার সংবাদে ব্যথিত ভোলানাথের অকৃত্রিম মর্মব্যথা লেখিকা সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়েছেন গানের আসরে তার ব্যর্থ হাসির প্রচেষ্টা ক্রন্দনে পর্যবসিত হওয়ার দৃশ্যে।

উপন্যাসে শিল্প বা রসোপলব্ধিকে ছাপিয়ে উঠেছে ধর্ম আলোচনা। মসীন উপন্যাসের শুরু থেকেই বুদ্ধ অশোকের আদর্শে মানবের দুঃখ যথার্থ দূর করতে উন্মুখ হয়ে ধর্ম অনুসন্ধান করেছে। ভারতীয় ধর্মের কর্মফল, জন্মান্তরবাদ, পাপপুণ্য বোধ প্রভৃতি নিয়ে সন্ন্যাসীর সংলাপে লেখিকা দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। যার ফলে গল্পের দিকটা একেবারে অনাদৃত হয়ে পড়েছে। গল্পে অনাবশ্যক ঘটনার ভিড় না থাকলেও এই দীর্ঘ ধর্মব্যাখ্যাই গতিকে মন্থর করেছে। ঊনবিংশ শতকে হুগলী শহরে যে কোন মুহূর্তে সন্ন্যাসীর অত্যাশ্চর্য আবির্ভাব ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ উপন্যাসটিকে বাস্তবের ভিত্তিভূমি থেকে সরিয়ে দিয়েছে। উপন্যাসের গল্পকে মানবজীবনের সহজ গতি থেকে ধর্মের নীতিব্যাখ্যার দিকে টেনে নিয়ে গেছে সন্ন্যাসী। যার ফলে গল্প রস প্রবাহ রুদ্ধ হয়েছে। স্থানে স্থানে পাঠককে সম্বোধন করে মানবজীবন ও কর্ম সম্পর্কে অবহিত করার প্রচেষ্টাও পাঠকের নিজস্ব উপলব্ধিতে বাধা সৃষ্টি করেছে।

ধর্মপ্রচার বা ব্যাখ্যা দীর্ঘ হলেও 'পৃথিবী'র স্বর্ণকুমারীর বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠা এই আলোচনায় অনুভব করা যায়। মানবজীবন, কর্তব্যকর্ম, ফলভোগ, প্রবৃত্তি ও ধর্মের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সম্পর্কে পাঠককে একটা সম্যক ধারণা করার অবকাশ লেখিকা দিয়েছেন বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী ধর্মালোচনায়।

ফুলের মালা

স্বর্ণকুমারীর শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'ফুলের মালা' বার হয় ১৮৯৫ সালে। বাংলাদেশে তুর্কি আক্রমণের পরবর্তীকাল এ কাহিনীর পটভূমি। গিয়াসুদ্দিনের, পিতা সেকন্দর শাহ্ ও গণেশদেবের সঙ্গে বিরোধ এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। ইতিহাসের কোন্ গ্রন্থকে স্বর্ণকুমারী অনুসরণ করেছিলেন নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না, তবে অনুমান করা যায় Stewart এর History of Bengal (১৮১৩) গ্রন্থ থেকে লেখিকা ইতিহাসের তথ্য পেয়েছিলেন।

Stewart এর ইতিহাসে সেকেন্দর শাহের পরিচয় পাই সুবিচারক ও প্রজাহিতৈষী সুলতান রূপে। তাঁর দুই স্ত্রীর মধ্যে প্রথমাপত্নীর ছিল সতেরোটি সন্তান এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর একমাত্র পুত্র গিয়াসুদ্দিন। প্রথমা স্ত্রী সেকেন্দর শাহকে গিয়াসুদ্দিনের বিপক্ষে কুমন্ত্রণা দিতে চেষ্টা করতেন। সৎ-মায়ের চক্রান্ত বুঝে গিয়াসুদ্দিন একদিন শিকারের নামে সোনারগাঁওয়ে চলে যান ও পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। পাণ্ডুয়া পর্যন্ত তিনি এগিয়ে যান। গোয়ালপাড়ায় পিতাপুত্রের সৈন্য মুখোমুখি হয়। যুদ্ধে সেকেন্দর সাহের মৃত্যু হল, গিয়াসুদ্দিন পাণ্ডুয়ায় সুলতান হন।[১]

উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সেকেন্দর শাহের পূর্বপুরুষের তথা বাংলাদেশের যে ইতিহাস লেখিকা দিয়েছেন তা তথ্যভিত্তিক। ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের শাসনকর্তা বহরম খাঁকে হত্যা করে অধিকর্তা হলেন ফকরুদ্দীন মবারক শাহ্। আর পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা কদর খাঁ নিহত হলেন আলিউদ্দিন আলি শাহর হস্তে। তাঁর পরে এক পদস্থ কর্মচারী[২] সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ আলি শাহকে হত্যা করে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহন করলেন ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের সোনার গাঁ জয় করে গৌড়-বঙ্গকে তিনি যুক্ত করলেন।[৩] দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ তুঘলক বাংলায় এলেন, পাণ্ডুয়া আক্রমণ করলেন। দিনাজপুরের ধানজর পরগণায় একদলা দুর্গে সামসুদ্দীন আশ্রয় নিলেন। একদলা অধিকারে ব্যর্থ হয়ে সম্রাট দেশে ফিরলেন। বাংলার সুলতানের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হল ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে।[৪] সামসুদ্দীনের পর তাঁর সিংহাসন অধিকার করেন পুত্র সেকেন্দর শাহ্। সেকেন্দর শাহ ও তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দিনের পারিবারিক কলহ ও গণেশ দেবের সঙ্গে সংগ্রাম 'ফুলের মালা'র উপজীব্য।

১। The history of Bengal from the first Mohammedan invasion until the virtual conquest of that country. By the English A.D. 1757 by Charles Stewart Esq. M.A.S. (1st Edition 1813, 25 May) Calcutta 1903 Bangabasi Press. Section IV P. 99-102.

২। 'সিয়ার উল-মুতাখ্খিরীন' (১৭৮৮) ইনি ধাত্রীপুত্র বলে পরিচিত। (History of Bengal. Vol. II, ed, by J.N. Sarkar. 1948. P. 96. Ch. IV.) লেখিকাও সেই মতই গ্রহণ করেছেন।

৩। History of Bengal. Vol. II, ed, by Jadunath Sarkar 1948. Ch IV P. 106-109.

৪। – Do –

উপন্যাসের শিল্প বা বক্তব্যের দিক থেকে 'ফুলের মালা' স্বর্ণকুমারীর অনেক পরিণততর উপন্যাস। নিছক ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স সৃষ্টি এ উপন্যাসের রচয়িত্রীর লক্ষ্য নয়, জীবনধর্মের চিত্রণও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। দিনাজপুরের রাজা গণেশ দেব ও শক্তি লেখিকার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। গণেশদেব ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য লেখিকা সম্পূর্ণ ইতিহাস ভিত্তি করে পরিস্ফুট করেন নি। ইতিহাসে গণেশদেব 'কংস' নামে পরিচিত, ষ্টুয়ার্ট 'কণিস' নামে তাঁকে আখ্যাত করেছেন।[৫] ইতিহাসে গণেশের সম্পর্কে মতদ্বৈধ আছে। কোথাও অত্যাচারী, কোথাও শান্তিপ্রিয় রাজারূপে তিনি পরিচিত।[৬] মুসলমান ধর্ম বিলুপ্ত করার জন্য তিনি মুসলমানদের উপ' বহু অত্যাচার করেছেন। কিন্তু স্বর্ণকুমারী গণেশ দেবকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবাদর্শে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর চিত্রিত গণেশদেব মানবপ্রেমিক, ধর্ম সম্পর্কে উদার। উপন্যাসে গণেশদেব আদর্শ উদার আত্মসংযমী চরিত্র। তাঁর মধ্যে দিয়ে লেখিকা প্রবৃত্তি নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন। বয়সের অভিজ্ঞতা ও মানসিক পরিণতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণকুমারী জীবনে ধর্মনীতির দিকে আগ্রহান্বিত হয়েছেন। 'হুগলীর ইমামবাড়ী' উপন্যাসে এই ধর্মবোধ স্থান নিয়েছে নীতি আলোচনায় উপদেশে। তাই সেক্ষেত্রে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের জীবনচিত্রণ পরিস্ফুট হতে পারে নি, মানব মানবীর জীবনস্পন্দন সেক্ষেত্রে অননুভূত। মানুষের জীবনাদর্শের দিকটা নীরস ধর্মালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। পরবর্তী 'বিদ্রোহ' উপন্যাসে এই অসম্পূর্ণতার দিকটি স্বর্ণকুমারী প্রবল ভাবেই কাটিয়ে উঠেছেন, উপদেশমূলক নীতিবাদের আশ্রয় না নিয়ে জীবনচিত্রের মধ্যে দিয়ে এ গ্রন্থে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন তিনি। রাজা নাগাদিত্যের মাধ্যমে জীবনে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব ও তার ফলাফল দেখিয়েছেন তিনি। নাগাদিত্যের জীবনে অকালমৃত্যুর মধ্যে দিয়ে করুণ মর্মান্তিক পরিণতি, প্রবৃত্তির কাছে তার অধীনতার প্রায়শ্চিত্ত। সেদিক দিয়ে গণেশদেব নিবৃত্তি সাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন, তাই অসাধারণ সৌন্দর্য সম্পন্ন তেজদৃপ্তা শক্তির আকর্বণকে তিনি শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে পেরেছেন। 'বিদ্রোহে'র নাগাদিত্যের উপর যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষের' নগেন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তেমনি গণেশ চরিত্র অঙ্কনের সময় স্বর্ণকুমারীর মনে 'সীতারাম' উপন্যাসের সীতারাম চরিত্রের আদর্শ ছিল বলে মনে হয়। সীতারামের মনে স্ত্রীর রূপমোহ ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়েছে এবং তাঁর রাজত্ব ও মনুষ্যত্ব বিলোপ করেছে। 'সীতারামে'র চরিত্রে এই দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু রাজা গণেশ এই দ্বন্দ্বে জয়ী হয়ে আদর্শ পুরুষ রূপে প্রতিভাত হয়েছেন। প্রজাপালক আদর্শ পবিত্র রাজারূপে গণেশ চরিত্র অঙ্কনই লেখিকার উদ্দেশ্য ছিল। তবে সমগ্র উপন্যাসে গণেশের ব্যক্তিত্ব বা দৃঢ়তার সমান পরিচয় পরিস্ফুট হয় নি।

শক্তি গণেশের বাল্যসখী। ছ বছরের অদর্শনে শক্তিকে বিস্মৃত হয়ে গণেশদেব নিরুপমাকে বিয়ে করলেন। তারপর অকস্মাৎ শক্তির দেখা পেলেন। তার দৃপ্র তেজোময়ীরূপের বুদ্ধিদীপ্ততায় তিনি আকৃষ্ট হলেন এব‍ং পুনরায় বিবাহেও মনস্থির করলেন। বাধা দিলেন গণেশদেবের মা,

---

৫। History of Beng. Ed. by, J.N.Sarkar, ch. V, p. 121, History of Bengal Charles Stewart Section– IV, p. 108

৬। History of Bengal : J.N.Sarkar ch. V. p. 122-125.

শক্তির পিতৃস্বসার কলঙ্কের অজুহাত দেখিয়ে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে গণেশ দেবের এই দুর্বলচিত্তের পরিচয় স্পষ্ট। এই দুর্বলতার উপর মিলেছে তাঁর ভাব প্রবণতা। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গণেশদেব সম্পর্কে যথার্থই সিদ্ধান্ত করেছেন, রাজা গণেশ রোমান্স লক্ষণাকান্ত রোমান্টিক নায়ক, কিন্তু তবু বাস্তব চরিত্র। গণেশদেবের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুটনেও লেখিকা প্রয়াসী হয়েছেন। শক্তি গণেশের কাছে প্রেমে প্রত্যাখাত হয়ে, ও বিশ্বাসে আঘাত পেয়ে স্বধর্ম পত্যিাগ করেছে প্রতিশোধ নেবার জন্য। গিয়াসুদ্দিনকে বিয়ে করেছে বঙ্গেশ্বরী হয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্তির জন্য। শক্তির এই ভাগ্যবিপর্যয়ে, ধর্মপরিবর্তনে গণেশদেব অনুতপ্ত, যার মূলে রয়েছে তাঁর নিজের অপরাধবোধ। সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তিনি করতে চান আশ্রয়প্রার্থী ও তাঁর জীবন রক্ষাকর্তা গিয়াসুদ্দিন ভ্রাতুষ্পুত্র সাহেবুদ্দিনকে রক্ষা করে। এক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিত্বের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়, মাতৃ আজ্ঞাও তিনি লঙ্ঘন করতে উদ্যত হয়েছেন সাহেবুদ্দিনের জন্য।

ঘটনা বিন্যাস, চরিত্র বিশ্লেষণ সবদিক থেকেই স্বর্ণকুমারীর এ উপন্যাস পূর্বাপেক্ষা অধিকতর পরিণত। ঘটনার আকস্মিক বা অতি দ্রুত ভিড় এখানে দেখা যায় না।

গিয়াসুদ্দিন ইতিহাসে বীরচরিত্র রূপে অঙ্কিত।[৭] কিন্তু উপন্যাসে এ চরিত্রের বীরত্বের দিকটা তত পরিস্ফুট হয়নি। দশম পরিচ্ছেদে কালীমন্দিবে প্রতিমার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে শক্তির কাছে প্রণয় নিবেদন গিয়াসুদ্দিন চরিত্রের বীরত্ব বা পৌরুষের দিকটা ম্লান করে দিয়েছে। শক্তির প্রেমে মুগ্ধ প্রেমিক রূপেই গিয়াসুদ্দিন উপন্যাসে অধিক ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছে। তার উপর শক্তির ব্যক্তিত্বের প্রভাবের দিকে লেখিকা বিশেষ ঝোঁক দিয়েছেন।

উপন্যাসের ঘটনার সমসাময়িক দেশ কালের পরিচয় 'ফুলের মালা'র লেখিকা দিয়েছেন, যার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের বাস্তব মূল্য স্বীকৃতি পেয়েছে। একবিংশ ও চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে সাধারণ মানুষের কথোপকথনের মধ্যে দেশের পরিস্থিতি ও জনমানসের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকান্তর স্বপ্নদর্শনের মধ্যে ভাবী যুদ্ধের পরিণতির আভাষ আছে। কিন্তু 'দীপনির্ব্বাণে'র রাজকন্যা উষার স্বপ্নদর্শনের রোমান্টিকতা এখানে নেই। পরামাণিক তার স্বপ্নের কথা বলছে শ্যামসর্দার, মুন্সী প্রভৃতি বন্ধুদের কাছে। তার স্বপ্নে দেখা আকাশ লাল হয়ে রক্ত উছলে মাটি ভেসে যাওয়া এবং ভগবতী মূর্তির আবির্ভাব ও সান্ত্বনা দান ইঙ্গিতবহ। স্বপ্নের ইঙ্গিত বুঝতে না পেরে নবীন অধিকারীর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করেছে পরামাণিক। গণেশদেবের অনুচর সৈন্যদের মনে সন্ন্যাসিনী সম্পর্কে প্রবল আস্থা। সেই বিশ্বাসই ব্যক্ত হয়েছে এদের সন্ন্যাসিনীর ভগবতীরূপে আবির্ভাব কল্পনায়। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, সংস্কার এখানে কিছুটা অনুভব করা যায়। এছাড়া যুদ্ধ ও দেশে তার ভয়াবহ ফলাফল সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অনুভূতির চিত্রটিও মনোরম ও বাস্তব।

দীর্ঘ কৈফিয়ৎ বা সান্ত্বনা বাক্য প্রভৃতির প্রভাব কাটিয়ে উঠলেও স্বর্ণকুমারী এ উপন্যাসে স্বপ্নদর্শন বা অলৌকিকতা থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেন নি। কিন্তু তবু শ্রীকান্ত পরামাণিকের স্বপ্নদর্শন উপন্যাসের বাস্তবতাকে ব্যাহত করেনি। সন্ন্যাসিনীর অলৌকিক কীর্তিকলাপে বরঞ্চ

৭। History of Bengal : Charles Stewart. p. 102-104.

সেই বাস্তবতা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সন্ন্যাসিনী অতি মানব রাজ্য থেকে আমদানী বলে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন। এই অতিমানবিকতার পরিচয় সন্ন্যাসিনীর সংলাপে কার্যকলাপে সর্বত্রই রয়েছে। বাস্তব মানবীর জীবনস্পন্দন তাঁর মধ্যে অনুভব করা যায় না। একবিংশ পরিচ্ছেদে সন্ন্যাসিনী কর্তৃক "মিলনদীঘি" সৃজন এই অলৌকিকতার চূড়ান্ত নিদর্শন। 'হুগলীর ইমামবাড়ী' উপন্যাসের সন্ন্যাসীর সমগোত্রীয় ইনি।

'ফুলের মালা' উপন্যাসে লেখিকা স্বকীয়তা দেখিয়েছেন ইতিহাস বহির্ভূত চরিত্র, শক্তির চরিত্রাঙ্কনে। তেজদৃপ্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্না শক্তি প্রথমাবধিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথম পরিচ্ছেদেই বালিকা শক্তির এই চরিত্র বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। যুবরাজ গণেশদেব বাল্যসখী শক্তিকে খেলায় রাণীপদে বরণ করেছে এবং নিরুপমা হয়েছে দাসী। অদৃষ্টের পরিহাসে জীবনে নিরুপমাই হয়েছে গণেশদেবের রাণী, শক্তি কোন স্থানই সেখানে পায়নি। শক্তি চরিত্র বাস্তব। ধীরে ধীরে তার চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বিশেষ করে নারীর স্বাধীন সত্তার চেতনা স্বর্ণকুমারী শক্তির মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। অদৃষ্টের পরিহাসকে সে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয় নি। প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ করেছে শক্তি নিজের ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য। বাল্যবয়সেই তার হাত দেখে জ্যোতির্বিদ বলেছিলেন সে রাজ্যেশ্বরী হবে। সেই বিশ্বাসেই শক্তি দৃঢ় হয়েছিল। গণেশদেবের কাছে তাই প্রত্যাখাত হয়ে গিয়াসুদ্দিনকেই সে বরণ করে নিয়েছে পতিত্বে, ক্ষমতাভিলাযের জন্য। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রেমে প্রত্যাখাতা শক্তির গণেশদেবের প্রতি একদিকে প্রতিহিংসা পরায়ণতা আর একদিকে ব্যর্থ প্রেমিকা দুর্বল নারীহৃদয়ের করুণ হাহাকার সুন্দর অভিব্যক্ত হয়েছে। দুটি অনুভূতিই লেখিকা নিপুণভাবে ফুটিয়েছেন। শক্তির সৌন্দর্যবর্ণনাতেও লেখিকা বাস্তবের অনুগামী হয়েছেন। রোমান্টিকতার থেকেও আত্মমর্যাদাবোধে দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুটনেই লেখিকা লক্ষ্য দিয়েছেন— "শক্তি গৌরী— কিন্তু সাধারণ বঙ্গ বালার ন্যায় চম্পক বা কোমল পাণ্ডুবরণী নহে— তাহার বর্ণ ইরাণীর ন্যায় তেজোরাশিতে প্রফুল্ল, প্রদীপ্ত, সুবর্ণাভ। কেবল বর্ণ নহে, তাহার সুঠাম সুদীর্ঘ নাসার, বক্ররেখাযুক্ত নিমীলিত প্রান্ত ওষ্ঠাধরে, মধ্যবিভক্ত ক্ষুদ্র চিবুকে, কৃষ্ণভ্রূধনু নিম্নস্থ ঘনপত্রশালী নীলনয়নের দৃষ্টিতে আত্মগরিমাময় গর্বিত দীপ্ত সৌন্দর্য প্রকটিত।" (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)। রাজকুমার গণেশদেবের প্রতি ভালবাসা ও বড় হবার আকাঙ্ক্ষা এই দুই অনুভূতিতে স্বর্ণকুমারী শক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। দশম পরিচ্ছেদে শক্তির এই অন্তর্দ্বন্দ্ব চমৎকার পরিস্ফুট হয়েছে। ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় গণেশ দেবের উপর প্রতিশোধ গ্রহণার্থে সে আত্মনিপীড়নের সঙ্কল্প করেছে গিয়াসুদ্দিনকে বিয়ে করে। তার ফলে বঙ্গেশ্বরী হয়ে শক্তি উচ্চ ক্ষমতার অধিকারিণী হবে। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে এই দুই অনুভূতির প্রকাশ রয়েছে। ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে, রাণী নিরুপমাকে দেখে শক্তির অন্তরে ঈর্ষার উদয়ে ও রাজা গণেশ দেবের কাছে যবনী হওয়ার আত্মগ্লানি ব্যক্ত করে করুণ ভিক্ষাপ্রার্থনার মধ্য দিয়েও মানবী শক্তির ভাবস্পন্দনই অনুভব করা যায়। শক্তির প্রেমিকা ও মাতৃসত্তার দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠেছে সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে। শক্তির বিভিন্ন ভাবানুভূতি ও অন্তর্দ্বন্দ্বের নিপুণ বর্ণনা তার চরিত্রের সজীবতা বজায় রেখেছে। ত্রিংশ পরিচ্ছেদে বঙ্গেশ্বরী ও ঐশ্বর্যশালিনী শক্তির দীনহীন বন্দী ও প্রণয়ী গণেশদেবকে দেখে ভাবান্তর ও নিজ জীবনের

ঝুঁকি নিয়ে তাকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা তার আত্মবিসর্জী ত্যাগ ও মহান প্রেমের পরিচায়ক, যে প্রেমানুভূতি অর্জন করতে তাকে আজীবন আত্মসংগ্রাম করতে হয়েছে, বহু বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। মানুষের মনুষ্যত্বের সাধনার দিকটাই হয়ত স্বর্ণকুমারী এখানে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। পার্থিব জগতের বাসনা লোভের অতীত হয়ে, নির্মোহ হয়ে জীবনে সিদ্ধি লাভ করতে শক্তিকে নিজ জীবনের সমস্ত আনন্দ সুখকে বিসর্জন দিয়ে মূল্য দিতে হয়েছে।

'ফুলের মালা' নামকরণটিও গভীর অর্থবহ। এখানে রমেশ চন্দ্রের 'মাধবীকঙ্কণ' গ্রন্থের ছায়া পড়েছে। বাল্যসখা গণেশদেব খেলার সাথী শক্তিকে খেলার ছলে যে ফুলের মালা দিয়ে রাণীপদে বরণ করেছিল বাস্তব জীবনে সে মালা শুকিয়ে অনাদৃত অবহেলিত হয়ে ব্যর্থ হল। সে ফুলগুলি শুকিয়ে শক্তির পদদলিত হয়ে শেষ পরিণতি লাভ করল। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শক্তি শেষ পর্যন্ত জীবনসাধনায় সিদ্ধি লাভ করে বাসনা প্রতিহিংসার অতীত হয়ে গণেশদেবকে রাজ্যরক্ষার্থে মুক্ত করে নিজে প্রাণদান করল। তার মাতৃহীনা রোরুদ্যমানা বালিকা কন্যা গুলবাহারকে গণেশদেবের বালক পুত্র যাদব সান্ত্বনা দিতে গিয়ে ফুলের মালা পরিয়ে পত্নীত্বে বরণ করল। উত্তর জীবনে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে গণেশদেবের পুত্র 'জালালুদ্দিন' নাম নিয়ে গুলবাহারের জন্য মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে পিতৃ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করল। গণেশদেবের কাছে প্রাপ্ত শক্তির অবহেলিত ব্যর্থ ফুলের মালা সত্য হল গুলবাহার ও জালালুদ্দীনের জীবনে। যদিও যাদবের এই ধর্মপরিবর্তনের কারণ ঐতিহাসিক তথ্য ভিত্তিক নয়। ইতিহাসে আছে রাজা সিংহাসনে আরোহণ করে মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচারী হয়ে উঠেন এবং নিজ রাজ্য থেকে মুসলমানদের নির্মূল করতে দৃঢ় সংকল্প করে তাদের উপর নৃশংস অত্যাচার শুরু করেন। নূর কুতব-উল-আলম এতে শঙ্কিত হয়ে সুলতান ইব্রাহিমকে লেখেন বাংলাদেশ আক্রমণ করার জন্য। ইব্রাহিম বাংলাদেশে আসেন এবং ফিরোজপুরে শিবির স্থাপন করেন। এতে রাজা গণেশ ভীত হয়ে কুতব উল আলমের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন এবং তাঁকে অনুরোধ করেন ইব্রাহিমকে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বলার জন্য। কুতব উল আলম গণেশ দেবের অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হলেন এক সর্তে যে গণেশদেব মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করবেন। গণেশদেব তাতে সম্মত হলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাতে বাধা দিলেন। অবশেষে গণেশদেব বারো বছরের পুত্র যদুকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করান এবং তার নাম হয় জালালুদ্দীন। বালক জালালুদ্দীনকেই গণেশদেব সিংহাসন ছেড়ে দিলেন। কুতব-উল-আলমের কাছে এ সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে সুলতান ইব্রাহিম জৌনপুরে ফিরে যান ও সেই বছরেই মারা যান। তখন গণেশদেব পুত্রকে অপসারিত করে নিজে পুনরায় সিংহাসনারোহণ করেন ও পুত্রকে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনেন। গণেশদেবের মৃত্যুর পর জালালুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন, ও মুসলমান ধর্মের ব্যাপক প্রচার করেন।[৮] কিন্তু স্বর্ণকুমারী বর্ণিত যদুর জালালুদ্দীন হয়ে মুসলমান হওয়ার কাহিনী একটু পৃথক। তবে ইতিহাসে না থাকলেও লোকের সাধারণ বিশ্বাসে ও সংস্কারে এই ধারণাই প্রবল ছিল। তার ফলে উপন্যাসে রোমান্সের আমদানী সহজ হয়েছে। স্বর্ণকুমারী গণেশদেবকে অত্যাচারীরূপে দেখাতে চাননি।

৮। History of Bengal · J.N.Sarkar, Ch. V, p. 124-25.

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম সম্পর্কে উদার সংযমী আদর্শবাদী গণেশ চরিত্র অঙ্কনের। তাছাড়া গুলবাহারের মা শক্তি গণেশদেবের মুক্তির পথ সুগম করে আত্ম-বিসর্জনের পথ বেছে নিয়েছে। শক্তির কন্যা গুলবাহারের জন্য তাই গণেশদেবের পুত্র মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে পিতৃকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। এটা হল মানবিকতার দিক। হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির প্রতিও লেখিকার লক্ষ্য ছিল বলে মনে হয়। এ সম্প্রীতি প্রচারের পরিচয় আমরা পূর্বে 'হুগলীর ইমামবাড়ী' উপন্যাসেও পেয়েছি।

গিয়াসুদ্দিন অনুচর কুতব চরিত্র প্রথাগত শঠ চরিত্র (ভিলেন)। গিয়াসুদ্দিনকে কুকর্মে সেই অনুপ্রাণিত করে, আর জনসাধারণের কাছে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণের ছল করে। প্রথম দিকে গিয়াসুদ্দিনের উপর তার অশেষ প্রভাব ছিল। শক্তি বেগম হয়ে এসে স্বীয় ঔদার্য ক্ষমতা ব্যক্তিত্ব প্রভাবে গিয়াসুদ্দিনকে অনুগত করে ফেলে। ফলে শক্তির উপর কুতবের প্রচণ্ড আক্রোশ জাগে। কিন্তু সে ধীর মস্তিষ্ক কুটনীতিবিদ। দীপনির্ব্বাণের বিজয়সিংহ, ছিন্নমুকুলের যামিনী, অপেক্ষা কুতব চরিত্র আরও গভীর ও পরিণত। তার যে কোন কার্যের পূর্বে কারণ আছে ও ধীরস্থির পরিকল্পনা আছে। স্বীয় বুদ্ধিবলেই শক্তিকে গিয়াসুদ্দিনের কাছে দ্বিচারিণী প্রমাণার্থে সে গণেশদেবের সঙ্গে শক্তির সাক্ষাতের সুযোগ করে দেয়। কিন্ত শেষ পর্যন্ত অন্যায়ের প্রতিফল পেল কুতব গিয়াসুদ্দিনের হস্তে নিহত হয়ে।

সেকেন্দর শাহের চরিত্র রাজনীতিক হিসেবে পরিস্ফুট নয়। ইতিহাসে শাসক ও বীররূপে সেকেন্দর শাহের পরিচয় আছে। গণেশদেবকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজসভায় আনিয়ে বন্দী করায় লেখিকা মুসলমানের বিশ্বাসঘাতকতার ধারাই বজায় রাখতে চেয়েছেন বলে মনে হয় (বিংশ পরিচ্ছেদ)। এই পরিচ্ছেদেই রাজনীতিক বোধহীন খেয়ালী সিকন্দর শাহের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়েছে। অস্থিরমতিত্ব ও রাজনীতিজ্ঞানহীনতার জন্য শুভার্থীদের হারিয়ে একাকী যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে প্রাণ হারাতে হল।

নবীন অধিকারীর চরিত্র উপন্যাসে লঘু হাস্যরস সৃজনে সহায়কারী। সে যাত্রায় সখী সাজে, টপ্পা গায়। রণক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা রন্ধনের জন্য। যুদ্ধ বিদ্যায় নবীনের কোন নৈপুণ্য নেই। সরল নির্বোধ আত্মভোলা নবীনের চরিত্র উপন্যাসে স্নিগ্ধ হাস্যচ্ছটা বিকিরণ করেছে (একবিংশ পরিচ্ছেদ)। তার সঙ্গীতগুলি হৃদয়ের গভীর ভাবানুভূতি উদ্রেককারী। এ গানগুলিতে গীতি কবিতার রেশ রয়েছে এবং এগুলি গীতিকবি স্বর্ণকুমারীর রচনা নৈপুণ্যের পরিচায়ক। গভীর ভাববহ গানের সঙ্গে হালকা ছন্দে লঘু হাসির গান রচনাতেও স্বর্ণকুমারী দক্ষতার পবিচয় দিয়েছেন দ্বাদশ পরিচ্ছেদে। শক্তির গীত নিজের লেখা গান শুনে মুগ্ধ হওয়ার মধ্যে লেখিকা নবীন অধিকারীর মনোবিশ্লেষণের সুযোগ নিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গীতিকবি স্বর্ণকুমারীর ব্যক্তি অনুভূতির স্পর্শ এখানে থাকা অসম্ভব নয়।

উপন্যাসে কৈফিয়ৎ যেগুলি আছে সেগুলি সুপ্রযুক্ত। উপন্যাসের গতিকে অনাবশ্যক ব্যাহত করেনি বা গল্পরসেও ব্যাঘাত করে নি। পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে এই কৈফিয়ৎ গণেশদেবের হৃদয়ানুভূতি বিশ্লেষণের সহায়ক।

নিরুপমা চরিত্র শক্তির ব্যক্তিত্বের পাশে নিষ্প্রভ। স্বার্থ, ঈর্ষা, সন্দেহ, ধর্ম সম্পর্কে সঙ্কীর্ণতা নিয়ে সাধারণ রমণী নিরুপমা। এ চরিত্র তেমন পরিস্ফুট হতে পারে নি।

'ফুলের মালা'য় লেখিকার গল্প বলার দক্ষতার পরিচয় রয়েছে, ভাষা, সংক্ষিপ্ত-ইঙ্গিতাবহ সংলাপ, ঘটনার সাবলীল গতি যার সহায়ক। বিষাদান্ত গল্পটির করুণ অনুভূতি শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে লেখিকা সক্ষম হয়েছেন।

স্নেহলতা

বাঙলা উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পর থেকে আধুনিকতা হিসেবে যে গভীরতর বাস্তবতা দেখা গিয়েছে তার সূচনা রবীন্দ্রনাথে। কল্পনা তথ্য মিশিয়ে অদ্ভুত প্রতিভাবলে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাসের রোমান্স জগত সৃষ্টি করতেন। যুগমানসের চাহিদাকে হৃদয়ঙ্গম করেই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের ভিত্তিকে রোমান্স ইতিহাসের অসাধারণত্ব থেকে সরিয়ে এনে বাস্তবজীবনের দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর 'চোখের বালি'তে (১৯০৩)। এখনকার উপন্যাসের রস জমেছে প্রাত্যহিক জীবনে নরনারীর হৃদয়বৃত্তির আলোড়নে সংঘাতে। ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত থেকেও নরনারীর মনে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ভাবের খেলা ও পরিণতি যে জীবনে অনেক বেশি জটিলতা নিয়ে আসে তাই হচ্ছে এখনকার উপন্যাসের প্রধান বক্তব্য। এই বাস্তবতার সুরই আধুনিক উপন্যাসে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

স্বর্ণকুমারীর 'স্নেহলতা' উপন্যাস সেদিক থেকে আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত। সাধারণ বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবন নিয়ে বাঙলা উপন্যাস সাহিত্যে প্রথম আবির্ভাব তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৪৩—৯০) 'স্বর্ণলতা'য় (১৮৭৪)। বাঙালী সংসারের একান্নবর্তী পরিবারের সুখ সৌভাগ্যের চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন এ উপন্যাসে, এবং ধীরে ধীরে তুচ্ছ কারণে সঞ্জাত পারিবারিক অশান্তি কিভাবে পরিবারটিকে ধ্বংস করেছে তার স্বাভাবিক চিত্রটিকে আঁকতে চেয়েছেন তারকনাথ। কিন্তু 'স্নেহলতা'য় আমরা দেখলাম সেকালের সমাজজীবনে ব্যক্তিহৃদয়ের সমস্যা, বেদনা। এদিক দিয়ে 'স্নেহলতা' আধুনিক বাস্তবধর্মী উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। উপন্যাসটির প্রথম খণ্ড বেরোয় ১৮৯০ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি বেরোয় ১৮৯৩ সালে। ১২৯৬ এর বৈশাখ থেকে ১২৯৮ এর জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত 'ভারতী'তে উপন্যাসটি বেরোয় 'পালিতা' নামে। 'পালিতা' নামে অনাত্মীয় গৃহে নায়িকার জীবনের বিড়ম্বনা দুর্দশার প্রতি ইঙ্গিতটা যেন বেশি ছিল, 'স্নেহলতা' নামে চরিত্রটির ব্যক্তিত্বের প্রতি গুরুত্ব রয়েছে বেশি। কিন্তু উপন্যাসটি পড়লে দেখা যায়, লেখিকা নায়িকা চরিত্রের ব্যক্তিত্বস্ফুরণ বা অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুটনে বেশি নজর দেননি, বরং তার জীবনের ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতেই স্বর্ণকুমারীর আগ্রহ বেশি। 'স্নেহলতা' উপন্যাসের প্রধান রস বাস্তব রস। এর বাস্তবরসের সঞ্চার হয়েছে নরনারীর জটিল অন্তর্রহস্য উদ্‌ঘাটনে বা মনোবিশ্লেষণে নয়, সংসারের নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতায়, ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে নিষ্পেষিত বেদনার্ত একটি বালিকার জীবনের করুণ কাহিনীতে। বাল্যে মা বাবাকে হারিয়ে অতি ক্ষীণ আত্মীয়তার সূত্রে স্নেহলতা জগৎবাবুর সংসারে আশ্রয় পেয়েছিল। উপন্যাসের শুরুতেই এ সংসারে তার স্থানটি জগৎবাবুর স্ত্রীর আচার ব্যবহারে কথায় বার্তায় সম্যক আভাসিত। জগৎবাবুর কন্যা টগরের অন্যায় জোর জুলুমে ও তার মার ভর্ৎসনা তিরস্কারে স্নেহলতার এ পরিবারে অবাঞ্ছিত অবস্থিতি অনুভব করা যায়। জগৎবাবুর মা মৃতা কন্যার বাপ-মা মরা এই

ভাগনীটির প্রতি বিশেষ স্নেহশীলা ছিলেন তার নম্র সৌজন্যপূর্ণ স্বভাবমাধুর্যের জন্য। এমন কি অদূর ভবিষ্যতে তিনি বুদ্ধিমতী রুচিমার্জিত স্নেহলতাকে পৌত্র চারুর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে ঘরের বধূ করার বাসনাও পোষণ করতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সংসারের সর্বময় কর্ত্রী হলেন জগৎবাবুর স্ত্রী। উপন্যাসের শুরুতে স্বর্ণকুমারী জগৎবাবুর স্ত্রীর দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রম্ভালাপ ও তাসের আসরে যে মধ্যবিত্ত সংসারটির চিত্র তুলে ধরেছেন তা পাঠককে উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে কৌতূহলী করে তোলে এবং জগৎবাবুর স্ত্রীর কর্তৃত্বাধীন সংসার চিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে উঠে। ঘটকী ও অন্যান্য সম্পর্কীয়া মহিলাদের সঙ্গে কথায় গল্পে স্নেহলতা সম্পর্কে মনোভাব জ্ঞাপনে, স্বার্থ সঙ্কীর্ণ মেয়েলিপণায় তীক্ষ্ণ নারীবুদ্ধির সদ্ব্যবহারে এই নারীচরিত্রটি উপন্যাসের বাস্তব রস বিস্তারে সহায়তা করেছে। স্নেহলতার যেন তেন প্রকারেণ একটি বিয়ে দিয়ে জগৎবাবুর তাকে ভবিষ্যতে পুত্রবধূ করার বাসনার সমূলে উচ্ছেদ করাই তার লক্ষ্য। বাস্তব নারীবুদ্ধিবলে উপরে কর্তব্যপরায়ণতার আচ্ছাদনটি রেখে সে নারী মহলে উদার হিসেবে পরিচিত। নারী চরিত্রটি অঙ্কনে স্বর্ণকুমারীর নারীহাতের স্পর্শ লক্ষণীয় বিশিষ্টতা পেয়েছে। সাংসারিক বা বৈষয়িক সকল ব্যাপারে মেয়েলি কান্নায়, রুক্ষ মেজাজে সে জগৎবাবুর উপর স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। অশান্তির ভয়ে জগৎবাবুর ভীরু ব্যক্তিত্ব স্ত্রীর মত নির্দ্বিধায় মেনে নেয়। স্নেহলতা নিয়তির বিধানে জীবন আবর্তে ভাসতে ভাসতে এক সংসার থেকে আর এক সংসারে গিয়ে পড়ল বধূ রূপে। তার স্বামী মোহন তখনও পড়ুয়া, অগত্যা বেশির ভাগ সময়ে তাকে গৃহের বাইরেই থাকতে হত। শ্বশুরবাড়িতে স্নেহলতার দিন কাটতে লাগল মাতৃহীন মোহনের কঠোর রুক্ষভাষিণী হৃদয়হীন জ্যাঠাইমার তাঁবেদারীতে। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে মোহন যখনই গৃহে আসত, স্নেহলতার করুণ অসহায় নারীজীবনের জন্য সমবেদনা অনুভব করত। মাঝে মধ্যে স্নেহলতার হয়ে জ্যাঠাইমার কাছে নানান আবেদন নিবেদনে মোহনের পুরুষহৃদয়ের সবল ঔদার্যের দিকটি ব্যঞ্জিত হয়েছে।

বিভিন্ন নারীচরিত্রে স্বর্ণকুমারী তীক্ষ্ণ নারীর দৃষ্টিতে সেকালের সমাজের হৃদয়হীনতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। জগৎবাবুর স্ত্রী, মোহনের জ্যাঠাইমা এই ধরণের নারীসমাজের প্রতিনিধি। নারী হয়েও নারীজাতির প্রতি তাঁদের কোন মমতা নেই বরং তারা স্বজাতিদ্বেষী। জগৎবাবুর স্ত্রী সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সর্বস্ব অশিক্ষিতা গ্রাম্য নারী, কিন্তু নারীর সুচতুর ছলাকলায় নিপুণা। মোহন কিশোরীর জ্যাঠাইমা বালবিধবা, জীবনে সমস্ত ভোগ সম্পদ থেকে বঞ্চিতা। এই বঞ্চনা তাঁর চরিত্রে একটা রুক্ষ হৃদয় হীনতায় প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। নিজেদের জীবনের বঞ্চনা ক্ষোভকে অন্যের প্রতি ঔদার্যের মহানুভবতায় চালিত করার মত চারিত্রিক বলের অধিকারী এঁরা নন। জীবনে দুর্বিপাকে এই ধরনের কঠিন হৃদয়া নারীদের কাছে আশ্রিত হয়ে স্নেহলতার অনভিজ্ঞ সরল অবোধ কিশোরী হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সংসারের এই রুক্ষ ধূসরতায় তারজন্য যেটুকু সজল স্নিগ্ধ, মমতা ছিল তা যুবক স্বামীর অকৃত্রিম প্রণয়ানুভূতিতে, জীবনের মার গভীর স্নেহে, জীবনের সস্নেহ সহানুভূতিতে। জীবনের বিধবা মা এ বাড়ীর বধূ হলেও প্রখরা জায়ের কাছে সুঙ্কুচিত, ম্লান। স্বামীর আকস্মিক অকালমৃত্যুতে সহায়হীন স্নেহলতার দুঃখদুর্দৈব পূর্ণ জীবনকে লেখিকা ঘটনা সংঘাত সঙ্কুল করে তুলেছেন। শ্বশুরবাড়ীতে উচ্ছৃঙ্খল

প্রকৃতির দেবর ও জ্যাঠাইমার নির্দয় আশ্রয় থেকে জীবনের অনিবার্য গতিতে স্নেহলতা আবার ফিরে এল জগৎবাবুর সংসারে। এখানেই উপন্যাসেব প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের শুরুতে দেখা যায় চপলমতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান যুবক চারু স্নেহলতার প্রতি মোহাসক্ত। জীবনের সঙ্গে টগরের বিবাহ হয়েছে। চঞ্চল চারুর অসামাজিক আসক্তির প্রতিবিধান করেছে তার মা ও বোন স্নেহলতাকে চারুর চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে। স্নেহলতা কখনও টগরের শ্বশুরবাড়ি কখনোও নিজের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে যেচে আশ্রয় নিয়েছে। এই জীবনের ঘাটে ঘাটে ঘুরতে ঘুরতে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে নিরাশ্রয় অসহায় স্নেহলতা জীবন সমস্যার সমাধান করেছে আত্মহত্যাব পথ বেছে নিয়ে।

উপন্যাসটির ঘটনাবিশ্লেষণের দিক দিয়ে বহির্ঘটনার যতখানি বিশ্লেষণ হয়েছে, সমস্যাগুলিকে যতখানি আলো ার বিষয় করে তোলা হয়েছে, সেই তুলনায় বর্হিঘটনার পটভূমিতে নরনারীর হৃদয়ানুভূতির আলোড়ন স্বতঃস্ফুর্ত হয় নি। চরিত্র সৃষ্টিতে ও জীবনসমস্যার আলোচনায় উপন্যাসটিতে গভীরতার একান্ত অভাব। ঘটনাপ্রবাহে পাত্রপাত্রীর হৃদয়ের উত্থানপতন ধ্বনি শোনা যায় নি। অদৃষ্টের দুর্বিপাকে জটিল জীবন আবর্তে ক্ষতবিক্ষত নিপীড়িত নারীহৃদয়ের বেদনারঙীন অনুভূতিতে স্নেহলতা চরিত্রটি সজীব হলে উপন্যাসটি বক্তব্যে, কাহিনীগ্রন্থনে আরও উৎকর্ষ লাভ করত। সমাজ সংসারের নিষ্ঠুরতায় আলোড়িত স্নেহলতার ব্যক্তিত্বের বা নিভৃত হৃদয়ের অনুভূতি স্পন্দন শোনা যায় নি। নায়িকার হৃদয়রহস্য উন্মোচনে স্বর্ণকুমারী নিপুণ হতে পারেন নি। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ ও ঘটনা তার দুঃখদীর্ণ জীবনের পঞ্জিকা হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সামাজিক উপন্যাসে হিন্দুসমাজের সঙ্কীর্ণতা কুসংস্কার প্রবণতার বিরুদ্ধে যথেষ্ট শ্লেষ ইঙ্গিত রয়েছে, কিন্তু তাঁর আসল বক্তব্য ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও আমাদের সামাজিক রীতিনীতির নিষ্ঠুরতা যে পারিবারিক সুখশান্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে তার করুণ দিকটার চিত্রণ রয়েছে। কিন্তু 'স্নেহলতা' উপন্যাসে সমাজের নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা. স্নেহলতার ব্যক্তিজীবনের সমস্যা আলোচনায় বা ঘাতপ্রতিঘাত সৃজনে বা গভীর বেদনানুভূতির পরিণতিতে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠে নি। সংসার জীবনের তুচ্ছতায়, হৃদয় হীনতায় স্নেহলতা যে আঘাত পেয়েছে সে আঘাত স্নেহলতার বালিকা চিত্তে অনায়াসেই একটি গভীর অনুভূতির জগৎ গড়ে তুলতে পারত যা তাকে পরিণত জীবনে অভিজ্ঞ দৃপ্ত নারীর ব্যক্তিত্ব পূর্ণতা এনে দিত। কিন্তু স্নেহলতার স্পর্শকাতর মনের যেটুকু পরিচয় আমরা পেয়েছি তা ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়। তার নিজস্ব ভাবাভিব্যক্তিতে অনুভূতিতে সে বেদনা স্বতঃস্ফুর্ত হয়ে উঠে নি। সংসারের আঘাতে স্নেহলতার বেদনার্ত হৃদয়কে লেখিকা স্বপ্নের অলৌকিক রাজ্যে মুক্তি দিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে তাই কিশোরী বালিকা দুঃখময় জীবনের অনুভূতিতে পরিণত যুবতী হয়ে উঠে নি। তার বেদনার্ত চিত্ত সমস্যা সঙ্কুল মর্তসংসার ছেড়ে মাঝে মাঝেই আকাশকুসুমের গন্ধ সুরভিত হয়ে পরীরাজ্যের কল্পলোকের বাতাসে হিল্লোলিত হয়েছে। সমস্যা-সঙ্কুল জীবনের বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে নিজ জীবনের আদর্শ নিষ্ঠার অনুভূতিতে নারী হৃদয়ের আবেগ উত্তাপে চরিত্রটি সজীব প্রাণবন্ত হয়ে উঠার যথেষ্ট অবকাশ

ছিল। নারী জীবনের সমস্যাকে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন জীবন, কিশোরী নবীন প্রভৃতি অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবকদের তর্ক আলোচনায়, যাদেব অনেকেরই কথা অনুযায়ী কাজ করার নিষ্ঠা বা আদর্শ নেই। বাল্যবিবাহ বিধবাবিবাহ প্রভৃতির সম্পর্কে নানাবিধ মন্তব্যে আলোচনায় এরা উপন্যাসটিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে জীবন সমস্যা চিত্রণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। কিশোরীকে পরে দেখা যায় উচ্ছৃঙ্খল, আদর্শহীন পানাসক্ত পুরুষরূপে। অসহায় স্নেহলতার উপর অন্যায় জুলুম করতে তার বিবেকে বাধে নি। চারুও স্নেহলতার রূপজ মোহে বাধা পেয়ে পানাসক্ত হয়ে কিশোরীর সাহচর্যে বিপথগামী হয়েছে। প্রথমদিকে এই যুবকগুলির তর্কের ঝড়, ইংরেজী উচ্চারণের যথার্থ রীতি নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা উপন্যাসের গতিকে অযথা ভারমন্থর করেছে এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছে। সমাজ সংস্কারের প্রতি লেখিকার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট কিন্তু উপন্যাসের চরিত্রগুলির জীবনচিত্রে তা প্রতিবিম্বিত হয়ে সরস উপভোগ্য হয়ে পাঠকহৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে নি।

জগৎবাবু মামুলী চরিত্র। চরিত্রটিতে লেখিকার বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় রয়েছে। স্ত্রীর প্রখর মেজাজ ও সঙ্কীর্ণতার কাছে তাঁর সরল দৃঢ়তা বিহীন প্রকৃতি স্বভাবতই প্রতি পদে হার স্বীকার না করে পারে না। যৌবন থেকেই জীবনের ঘটনা পরম্পরায় জগৎবাবুর ব্যক্তিত্বহীনতা ও মনোবলের অভাব উপন্যাসে পরিস্ফুট হয়েছে। যৌবনে পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করে তাঁর ব্রাহ্ম হওয়ার বাসনা হয়েছিল কিন্তু পিতার মতের বিরোধিতা করে বাসনাকে সফল করার মনোবল তিনি সংগ্রহ করতে না পারায় সে বাসনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছিল। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পব সংসারের অনিবার্য নিয়মে তিনি শোকাহত হয়েছেন, আবার মৃতা স্ত্রীর দুঃসম্পর্কীয়া আত্মীয়া এক বিধবা মহিলার মায়ের চিকিৎসা করতে গিয়ে মহিলায় আসক্ত হয়ে বিধবাবিবাহে উৎসাহী হয়ে পড়েন। কিন্তু পিতা যখন তাঁর পুনর্বিবাহের জন্য পাত্রী স্থির করলেন তখন সে উৎসাহ বিসর্জন দিয়ে জগৎবাবু দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন। জীবনের কোন পদক্ষেপেই তাঁর দৃপ্ত পুরুষত্বের বিদ্রোহ বা বিক্ষোভ নেই। শান্ত অবনমিত চিত্তে তিনি সবায়ের সঙ্গেই আপোষ করে চলেছেন। জগৎবাবুর চরিত্রে মহানুভবতা, পুরুষের ঔদার্য সরলতা আছে, শুধু যে ব্যক্তিত্ববলে সব গুণের সুসমঞ্জস্য হয়ে চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতে পারত, সেই ব্যক্তিত্বেরই প্রচণ্ড অভাব রয়েছে তাঁর মধ্যে। তাঁর সরলতা, ঔদার্যের ছোটখাট চিত্রগুলি চিত্তাকর্ষক। দরিদ্র সুখীকে স্ত্রীর অমতে অর্থ সাহায্য করে স্ত্রীর তীক্ষ্ণ নারীবুদ্ধির কাছে ধরা পড়ে তিরস্কার ভোগ করার দৃশ্য, বা বন্ধুর বাড়ীর নিমন্ত্রণে গিয়ে তার পীড়াপীড়িতে সিনেমা দেখে এসে অসতর্ক মুহূর্তে গৃহিনীর কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার দৃশ্যে প্রখরা স্ত্রীর কাছে ভীত সহিষ্ণু স্বামীর ঘরোয়া জীবনের ছোটখাট চিত্রগুলি হৃদয়গ্রাহী। শান্ত নম্র সেবাপরায়ণা স্নেহলতা রুচিমার্জিত স্বভাব মাধুর্যে তাঁর হৃদয়ের নিভৃতে গোপনে একটি স্নেহের আশ্রয় করে নিয়ে ছিল। কিন্তু সে অনুভূতির ভিত্তিতে প্রকাশ্য সংসারে স্নেহলতাকে সস্নেহ আশ্রয়ের নিশ্চিন্ততা দেওয়ার জোর তাঁর ছিল না। স্নেহলতার প্রতি স্ত্রীর নিষ্ঠুর ব্যবহারে বেদনার্ত হয়ে তাঁর ভীরু পুরুযত্ব গঙ্গার ঘাটের নির্জনতায় শান্তি খুঁজেছে।

পিতার এই চিত্তদৌর্বল্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চপলতার সঙ্গে সঞ্চারিত হয়েছে পুত্র চারুতে। চারুর জীবনে কোন আদর্শ, তীব্র অনুভূতি বা নিষ্ঠা নেই। বাল্যের খেলার সঙ্গিনী স্নেহলতার

প্রতি তার যে আসক্তি এসেছে পরে তা মোহজাত। হৃদয়ের গভীর অনুভূতিতে তার মূল প্রোথিত নয়। তাই সে বিধবা বিবাহ সমস্যা নিয়ে মেতে উঠেছে। আবার যখন তার মা ও বোন এই অসামাজিক আসক্তির প্রতিবিধানে স্নেহলতাকে অন্য আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে তখন সে অন্যত্র বিবাহ করতেও দ্বিধা করে নি। স্নেহলতার শ্বশুর বাড়ীতে বার বার চারুর প্রেমপত্র পাঠানোয় এবং শেষ পর্যন্ত কিশোরীর সঙ্গে মিলে স্নেহলতার প্রতি শত্রুতা সাধনে ব্যর্থতার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রয়াসে চারু চরিত্রের লঘু চপল দিকটি উদভাসিত। আবাল্য সঙ্গিনী স্নেহলতার প্রতি নিবিড় মমতা সহানুভূতিতে এ প্রেমের জন্ম হলে তার অভিব্যক্তি হত আরও গভীর তাৎপর্য-মন্ডিত।

কিন্তু চারুর একটি বিশেষ গুণের দিক প্রকাশ পেয়েছে তার ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনা নৈপুণ্যে। কবিতা রচনায় সে বন্ধু মহলে যথেষ্ট সমাদর অর্জন করেছে। ষোড়শবর্ষীয় বালকের কবিতারচনার প্রেরণায় ও খ্যাতিলাভে আত্মগর্ববোধে স্বর্ণকুমারী কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের ছবি এঁকেছেন বলে অনেক সুধী ব্যক্তির অভিমত। কিশোরী, নবীন প্রভৃতি যুবকেরা স্বাদেশিকতাবোধ প্রসারের জন্য 'গুপ্ত সভা' নামে একটি সভা করে— এবং সে সভার অন্যতম সভ্য চারু। সে সভার সে Poet Laureato বা রাজকবি, সকলে একসঙ্গে তার রচিত গান গাইলে সে নিজেকে শেকস্পিয়ারের সমকক্ষ মনে করত। এই গুপ্ত-সভায় রবীন্দ্রনাথের সঞ্জীবনী সভার সঙ্গে যোগাযোগের ছায়াপাত হয়েছে বলে উক্ত সমালোচকদের অভিমত। গীতবিতানের গ্রন্থ পরিচয়ে এই গুপ্ত সভা ও চারু প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে। "... 'সঞ্জীবনী সভা'র সহিত রবীন্দ্রনাথের যোগ, সেই মণ্ডলীতে কবি হিসাবে তাঁহার সমাদর, তাঁহার তখনকার বয়স এবং কৈশোরোচিত উৎসাহ, এমন কি 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত (স্বাদেশিকতা অধ্যায় : শেষ অংশ) বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবু আর তরুণ সকল সভ্য মিলিয়া সমবেত গান গাওয়ার দৃশ্য— স্নেহশীলা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী গল্পচ্ছলে প্রায় সব কথাই বলিয়াছেন ও সবটারই একটি বাস্তব ছবি আঁকিয়াছেন দেখা যায়।" (গীতবিতান, গ্রন্থ পরিচয়, পৃঃ ৯৮১)। গুপ্ত সভার বর্ণনায় 'স্নেহলতা' উপন্যাসে চারুর রচিত—

"একসূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন,
জীবন মরণে রব শপথে বন্ধন।

....

যে গানটি রয়েছে, গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা সে সম্পর্কেও মন্তব্য রয়েছে। "রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচয়' (১ম সংস্করণ : পৌষ ১৩৪৯) পুস্তকে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন 'গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, ইহা আমরা কবির নিজের মুখেই শুনিয়াছি'। শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সাক্ষ্যও অনুরূপ (রবীন্দ্রনাথের একটি গান : দেশ : ২৬ চৈত্র ১৩৫০/২৫৭ পৃঃ)"। রবীন্দ্রজীবনী প্রণেতা শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থেও চারু ও গুপ্তসভার প্রসঙ্গে এই আলোচনার সমর্থন রয়েছে (রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড, ১৩৬৭ পৌষ সংস্করণ, পৃঃ ৪৯—৫০)। সঞ্জীবনী সভায় (১৮৭৬) যাতায়াতের সময় রবীন্দ্রনাথও পনেরো বছরের বালক।

স্বল্প অংশে হলেও মোহনের চরিত্র পৌরুষ ও ঔদার্যের দৃঢ় সমন্বয়ে ফুটেছে ভাল। কিশোরী স্নেহলতাকে জ্যাঠাইমার নির্দয়তার অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে পুরুষত্বের ঝুঁকি নিয়ে যথেষ্ট জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জ্যাঠার কাছে মাসোহারার উপর নির্ভরশীল পড়ুয়া জীবনের ও তার মায়ের সংসারচিত্রে লেখিকা সেকালের একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে যারা বঞ্চিত হত তাদেরই দুর্ভাগ্যকে চিত্রিত করেছেন। কিশোরীর স্ত্রী কমলা পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতায় অত্যাচারিত অসহায় নারীত্বের যে একটা বেদনাকরুণ অনুভূতি রেখে গেছে তা পাঠকচিত্তকে স্পর্শ করে।

উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসে সমাজ চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। জগৎবাবুর গৃহে মেয়েদের তাসখেলার আসরে বিভিন্ন আলাপচারিতায় সেকালের নারী জগতের সুচারু চিত্র অঙ্কনে স্বর্ণকুমারীর নারীহস্তের পরিচয় রয়েছে। নিজের স্বার্থে ঘা লাগায় কন্যাকে শাসন করায় আবার পরক্ষণেই তাকে অন্যায় প্রশ্রয় দেওয়ায় জগৎবাবুর স্ত্রীর অশিক্ষিত রুচিহীন মনের চিত্রাঙ্কণে ঔপন্যাসিকের নারী মন বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছে। স্নেহলতাকে নিজের কাছে নিয়ে যাওয়ার আবেদন নিয়ে তার শ্বশুরবাড়ীতে জগৎবাবুর বার বার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মধ্যে সেকালের সমাজে শ্বশুরগৃহে বালিকা কন্যার অসহায় অবস্থাটি প্রকট হয়ে উঠেছে।

গল্পের পরিণতিতে চারুর প্রচেষ্টায় স্নেহলতার চরিত্রে জগৎবাবুর সংশয় সৃষ্টি ও সেই মুহূর্তে স্নেহলতার বিষপানে আকস্মিক আত্মহত্যা অনেকটা অতিনাটকীয়। স্নেহলতার জীবনের এই করুণ পরিণতি আমাদের মনকে সেরকম বেদনাকাতর করতে পারে নি, কারণ স্নেহলতার আগাগোড়া জীবনে চরিত্রের ধীর গভীর পরিণতিতে এই ট্র্যাজেডির করুণরস ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয় নি। স্নেহলতার জীবনের সমস্যাকে জটিলতর করবার জন্য ঔপন্যাসিকের এটি একটি চেষ্টাকৃত উপায় অবলম্বন মাত্র। জীবনে আত্মহত্যার চূড়ান্ত পথ বেছে নেওয়ার আগে জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত ক্ষতবিক্ষত অন্তর্দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ স্নেহলতার নারীচিত্তের দ্বন্দ্ব আবেগ যথেষ্ট তীব্র হয়ে উঠে নি। লেখিকার নারীহস্তের স্পর্শ স্নেহলতার জীবনের ট্র্যাজেডিকে সকরুণ মর্মস্পর্শী করে তুলতে সক্ষম হয় নি, নইলে স্নেহলতার মর্মান্তিক সমস্যা বিজড়িত অন্তর্বেদনা নিদারুণ তীব্রতা লাভ করতে পারত।

ডঃ সুকুমার সেন স্বর্ণকুমারীর উপন্যাস-সাহিত্যে স্নেহলতাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। তাঁর অভিমত "বাঙ্গালী সমাজে আধুনিকতার সমস্যা লইয়া এই প্রথম উপন্যাস লেখা হইল।" উপন্যাসের "চরিত্রচিত্রণ ও মনোবিশ্লেষণ বেশ স্বাভাবিক" বলেই তিনি মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যরূপ, তাঁর মতে "সমাজ ও ধর্মসংস্কারমূলক তর্কবিতর্কের মধ্যে" উপন্যাসটি নিজ প্রধান উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছে। তাঁর অভিমত "উপন্যাসে ঘটনা পারম্পর্যের সহিত কোন চরিত্র পরিণতির সংযোগ হয় নাই— উপন্যাসের প্রকৃত রস কোথাও জমাট বাঁধে নাই।"

উপন্যাসটির প্রতিপাদ্য সমাজসমস্যা নরনারীর চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে প্রকাশ না পেলেও বক্তব্যের স্বকীয়তায় ও নূতনত্বে স্বর্ণকুমারী যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আধুনিক সমস্যাপীড়িত সাধারণ নরনারীর জীবন নিয়ে উপন্যাস রচনায় যে তিনি পথ দেখিয়েছেন তার মধ্যে কোন সংশয় নেই।

কাহাকে

'স্নেহলতা'র সমাজ সমস্যা চিত্রণের পর নরনারীর অপার মনোরহস্য নিয়ে উপন্যাস রচনায়ও পথ দেখিয়েছেন স্বর্ণকুমারী তাঁর 'কাহাকে' উপন্যাসে (১৮৯৮)। গ্রন্থের নামকরণেই অন্তর জগতের অপার রহস্যের সমস্যার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট, এবং বলাবাহুল্য সে সমস্যা মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত রুচিমার্জিত এক নারীর। উপন্যাসটিতে স্বর্ণকুমারীর নারীচিত্তের সূক্ষ্ম মনন শক্তি ও সুকুমার অনুভূতির সুন্দর পরিচয় রয়েছে। উপন্যাসের গল্পের পরিকল্পনায় লেখিকার চিন্তাশক্তির স্বাতন্ত্র্য, মৌলিকতা ও সূক্ষ্মদর্শিতা আখ্যায়িকার অন্তর্নিহিত রসটিকে জমাট করে তুলেছে। উপন্যাসটি স্বর্ণকুমারী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান বলে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত।

স্বর্ণকুমারীর নারীদৃষ্টি গল্পের সুশিক্ষিতা যুবতী নায়িকার কোমল অপ্রগলভ চিত্তের সুকুমার অনুরাগের দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছে তার স্বগতোক্তিতে। নায়িকার জীবনের ধীর স্থির আত্মানুভূতি বিশ্লেষণে নারী স্বভাবের দুর্বলতা, সঙ্কোচ, কুণ্ঠা, আবেগ সব বৈশিষ্ট্যগুলি স্বচ্ছন্দ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। সাল তারিখ দিয়ে নায়িকার নিজের বয়স মনে নেই, দিদির বিবাহ দিয়ে সে একটা মোটামুটি বয়স অনুমান করে নিয়েছে। বাল্যে মাতৃহারা বালিকার ভালবাসার সমস্ত জগৎ জুড়ে ছিল পিতা। পিতার ভালবাসায় দিদির ভাগটুকুও দিতে তার ক্ষুদ্র চিত্ত সায় দিত না। তার অতীত জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার স্মৃতিতে এ অনুভূতির চিত্তাকর্ষক অভিব্যক্তি রয়েছে। তারপর তার পড়াশুনো শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এল নূতন ভালোবাসার স্বাদ— সহপাঠী বালক ছোটুর বন্ধুত্বে। বালিকার ছোট্ট হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালবাসার দুটি ধারা তার ছোটখাট অনুভূতি, অভিমান দ্বিধাদ্বন্দ্বের ইঙ্গিতে পরিবেশিত হয়েছে। পিতার আদরিণী অভিমানিনী কন্যা নায়িকা মৃণালিনীর পিতার প্রতি সুগভীর ভালবাসা শ্রদ্ধায় স্বর্ণকুমারীর নিজেরই বাল্য ছবি দেখা যায়। মৃণালিনীর মতই স্বর্ণকুমারী অতি প্রত্যূষে বাগান থেকে ফুল তুলে পিতাকে ভক্তির প্রথম উপহার দিতেন নিত্য, এবং পিতার স্নেহে বিগলিত হতেন। কোনদিন ফুল না পেলে, বা পিতার স্বাচ্ছন্দ্যের বস্তুটি তাঁর হাতে তুলে দিতে না পারলে জ্যাঠাইমা, দিদির প্রতি বালিকা মৃণালিনীর অভিমান হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু পিতার প্রতি এই অকৃত্রিম গভীর ভালোবাসায় ভাঁটা পড়েছে বাল্যবন্ধু ছোটুর জন্যে। কোন কোন দিন প্রত্যূষে তোলা অতি প্রিয় ফুল ছোটুও বালিকা বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেয়েছে। পাঠশালায় ছোটুর সঙ্গে বালিকার সরল বন্ধুত্বের চিত্র গ্রাম্য বালক বালিকার হৃদ্যতার চিত্র হিসেবে পাঠকের চিত্তে স্থায়ী রেখায় অঙ্কিত হয়। পিতার আদরিণী কন্যা বন্ধু ছোটুর কাছেও অভিমানের যে প্রশ্রয় পেয়েছে তার মধ্যে বালক চরিত্রে ভাবী পুরুষত্বের ব্যঞ্জনাই স্পষ্ট।

ধীরে ধীরে বালিকা শিক্ষায় মার্জিত বুদ্ধিতে পরিণত যুবতী হয়ে উঠেছে। দিদি ও ব্যারিস্টার

ভগ্নীপতির গৃহে নায়িকার জীবনে নূতন করে যৌবন প্রেমের সূচনা হয়েছে নবীন ব্যারিস্টার রমানাথের আগমনে। নায়িকার বাল্যস্মৃতিজড়িত একটি গান গেয়ে রমানাথ মৃণালিনীর হৃদয়ে গভীর অনুরাগের সঞ্চার করেছে। বাল্যের ছোটু যৌবনের তারুণ্যে উদ্দীপ্ত নায়িকার অপরিচিত ডাক্তার রূপে আবির্ভূত হয়েছে। মৃণালিনীর অসাক্ষাতে প্রসঙ্গক্রমে ডাক্তার রমানাথকে তার বিলাত প্রবাসের বিদেশিনী প্রণয়িনীর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে অলক্ষ্যে থেকে তা নায়িকার কর্ণগোচর হয়। প্রেমাস্পদের বিশ্বাসভঙ্গে তার নারীচিত্তের অন্তর্দ্বন্দ্ব, ব্যাকুলতার চিত্র সরস সুন্দর। বাস্তব সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে— প্রেমাস্পদের বিশ্বাসভঙ্গে সংশয় ভীত ভাবানুভূতিতে আলোড়িত নারীহৃদয়ের মর্মস্পর্শী উদ্‌ঘাটন করেছেন লেখিকা। জীবনের হাসিকান্না ভালমন্দ নিয়ম বিশৃঙ্খলা সব নিয়ে সত্যানুগ দৃষ্টিতে এখানে নারীচিত্তের ভাবনা অনুভূতির পরিবেশন হয়েছে।

উপন্যাসটির পরিণতিতেও জীবনরসিক স্বর্ণকুমারীকে দেখা যায়। রমানাথের বিশ্বাসভঙ্গের অপরিসীম বেদনার মুহূর্তে ডাক্তারের সততা ঔদার্যে উজ্জ্বল পৌরুষের আকর্ষণের ক্ষীণ অনুভূতিতে নায়িকার মনের যখন আর এক তীর গড়ে উঠছে— তখন সেই সমস্যাসঙ্কুল মুহূর্তে তার জীবনসমস্যার সমাধানের ভার শক্ত হাতে তুলে নিয়েছেন স্নেহময় পিতা। ঘটনাবিন্যাসে কাহিনীর আখ্যান কৌশলে এক্ষেত্রে লেখিকা কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন। পিতা তার যে বাল্যবন্ধু ছোটুকে জামাতা হিসেবে মনোনয়ন করেছেন, ঘটনা পরিস্থিতিতে দেখা গেছে সেই নায়িকার বাঞ্ছিত ডাক্তার। মানবজীবন সতত পরিবর্তনশীল— নদীর গতির সঙ্গেই তার একমাত্র তুলনা চলে। নদীর যেমন এক তীর ভাঙ্গে আর এক তীর গড়ে, মানুষের মনোজীবনেও তেমন বিচিত্র ক্রিয়া চলে। 'কাহাকে'-র নায়িকার স্বগতোক্তিতে চিত্ত বিশ্লেষণে এই অপার জীবন সত্যটিকে স্বর্ণকুমারী প্রাণময় আবেগতপ্ত রূপ দিয়েছেন। 'কাহাকে' নায়িকার অন্তর রহস্যেরই বহির্প্রশ্ন। নারীর প্রণয়জীবনের এই সমস্যার চিত্র সূক্ষ্ম ও মনোজ্ঞ হয়েছে বর্ণনার গুণে।

এ উপন্যাসে পুরুষ চরিত্র অঙ্কনেও লেখিকার যত্ন লক্ষণীয়। রমানাথ ও ডাক্তার দুটি বিভিন্নমুখী চরিত্রের বৈপরীত্য বর্ণনা কৌশলে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রমানাথ ইংরেজী শিক্ষাভিমানী, লঘু হৃদয়ের পুরুষ। সংযত মার্জিত বুদ্ধিদীপ্তিতে, ধীরতায় সহমর্মিতায় ডাক্তার চরিত্র তার সম্পূর্ণ বিপরীত। রমানাথের প্রতি নায়িকার প্রেমে যখন দ্বিধা সংশয় এসেছে সেই বেদনাতুর মুহূর্তে নায়িকার প্রতি ডাক্তারের সংবেদনশীল মার্জিত ব্যবহারে পুরুষ চিত্তের একটি দিক সুন্দর পরিস্ফুট হয়েছে। নায়িকার ভগ্নীপতি ও ডাক্তারের ইংরেজী সাহিত্য আলোচনার সুদীর্ঘ অংশটি উপন্যাসের বক্তব্যে অনাবশ্যক ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। জর্জ এলিয়টের রচনাদক্ষতার প্রশংসার জন্যই যেন অংশটি লেখিকার চেষ্টাকৃত আরোপ।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' (১৮৭৩) 'রজনী', (১৮৭৭) উপন্যাসে নায়িকার স্বগতোক্তি থাকলেও সে চরিত্রগুলির সঙ্গে 'কাহাকে'র নায়িকা চরিত্রের মূলগত পার্থক্য রয়েছে। ইন্দিরার ডাকাত কর্তৃক অপহৃত হয়ে হারানো স্বামীকে খুঁজতে বেরনোয় এবং তাঁকে পুনরায় হস্তগত করার জন্য নানা ছলাকলার প্রয়োগে প্রগলভতায় যে রোমান্সের অবতারণা হয়েছে বা অন্ধ

ফুলওয়ালী রজনীর ভালোবাসায় যে রোমান্সের আবেশ রয়েছে 'কাহাকে'র নায়িকা সে ধরণের রোমান্সের নায়িকা নয়। সে সংসারের মধ্যবিত্ত ঘরের রক্তমাংসের নারী। মধ্যবিত্ত সংসারজীবনে শিক্ষিত মার্জিত নারীর প্রণয় অনুভূতির দ্বন্দ্বক্লিষ্ট চিত্ত বিশ্লেষণে স্বর্ণকুমারী 'কাহাকে'র নায়িকাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছেন। কাহিনীর বিন্যাসে, গল্পরস সঞ্চারে, প্রাত্যহিক জীবনে নারীর প্রণয় অনুভূতি, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে সবদিক দিয়ে 'কাহাকে' একটি সার্থক উপন্যাস।

বিচিত্রা-স্বপ্নবাণী-মিলনরাত্রি

মাঝামাঝি বয়সে স্বর্ণকুমারী লিখেছেন 'বিচিত্রা (১৯২০) 'স্বপ্নবাণী' (১৮২১) 'মিলনরাত্রি' (১৯২৫)। এগুলি একটি উপন্যাসেরই তিনটি ভাগ। উপন্যাসটির কিছু কিছু অংশ বেরিয়েছিল 'ভারতী'তে ১৩২৫ এর শ্রাবণ থেকে ১৩২৬ এর কার্তিক পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যায়। 'স্নেহলতা', 'কাহাকে' উপন্যাসে নরনারীর জীবনসমস্যা, মনস্তত্ত্বের সুচারু বিশ্লেষণ থেকে এই উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী আবার ফিরে গেছেন রোমান্সের নিভৃত কল্পজগতে। তবে এ রোমান্স তাঁর উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম দিকের সৃষ্ট ঐতিহাসিক রোমান্স নয়। উপন্যাসের মূল চরিত্র প্রাত্যহিক জীবন থেকে নেওয়া নয়। এর কাহিনীর বিস্তার রাজারাজড়ার, তাদের নায়েব দেওয়ান প্রভৃতিদের নিয়ে হয়েছে। পাত্রপাত্রীর স্বদেশচর্চার ভিত্তি ভূমিটি অবশ্য বাস্তবের মাটিতে প্রোথিত। রোমান্সের বিস্তার হয়েছে পাত্রপাত্রীর রাজৈশ্বর্য আড়ম্বরপূর্ণ জীবনে স্বদেশচর্চার বিলাসিতায়। দেশের মাটি বা জনগণের সঙ্গে সুগভীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় থেকে তাদের এ স্বদেশহিতৈষণার প্রেরণা আসেনি।

হিন্দুমেলা থেকে (প্রথম অধিবেশন ১৮৬৭) ঠাকুরবাড়ীর পৃষ্ঠপোষকতায় ও সচেষ্ট উদ্দীপনায় বাংলা দেশে যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়, সেই স্বাজাত্যবোধই এ উপন্যাসের প্রতিপাদ্য। উপন্যাসের আর্টের দিক দিয়ে স্বর্ণকুমারী পূর্বে 'কাহাকে'তে যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, এতে তার যথেষ্ট অভাব। পাশাপাশি ধনীর আড়ম্বর ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবনে ও স্বদেশচর্চা আন্দোলনের ছায়ায় উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিত্ব জীবনী শক্তিহীন এবং নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। এ উপন্যাসে দেশচর্চার ভাববিলাসে নরনারীর জীবনসমস্যা চাপা পড়ে গেছে। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের সাংসারিক ও রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে ব্যক্তি অনুভূতির একটা নিগূঢ় যোগসূত্র স্থাপন করতে ঔপন্যাসিক সক্ষম হননি। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে সতেজ স্বদেশচেতনা না থাকলে স্বদেশচর্চা শুধুমাত্র শূন্যগর্ভ ভাবাবেগে স্ফীত হয়ে পড়ে। জাতীয়তা ভাবোদ্দীপক রাজনৈতিক জীবনে প্রাণশক্তির যে মূল প্রোথিত থাকে তাকে ফুটিয়ে তুলতে না পারলে উপন্যাসের নরনারীর স্বদেশচর্চা ব্যক্তি হৃদয়ের আবেগে উদ্দীপ্ত প্রাণস্পন্দনের সাড়া জাগাতে পারে না। এ উপন্যাসের নর-নারীর স্বদেশচর্চা ব্যক্তিজীবনের সমস্যা সংঘাতের সেই তীব্র ভাবাবেগে বা প্রাণস্পন্দনে সজীবতা পায় নি।

এ উপন্যাসের নায়িকা প্রসাদপুরের রাজা অতুলেশ্বরের আদরিণী কন্যা জ্যোতির্ময়ীর চরিত্র রোমান্সের নায়িকার মত আদর্শের উঁচু সুরে বাঁধা। জ্যোতির্ময়ী ও শরৎকুমারের প্রণয় এই স্বদেশচর্চার রোমান্টিক আবেষ্টনে গাঢ়তা হারিয়েছে, তাদের চরিত্রে দেশহিতৈষণার দায়িত্ব নিয়ে এ ভালবাসা যেন নিতান্ত গৌণ হয়ে পড়েছে। স্বদেশসেবার আন্তরিকতা ও প্রণয় আবেগের তীব্রতায় রাজকন্যার মর্তজগতের দৈনন্দিন বাস্তবজীবনের নারী-হৃদয়ের উন্মোচন হয় নি।

হিন্দুমেলায় প্রচারিত স্বাদেশিকতার প্রধান কথা ছিল আত্মনির্ভরতা অর্জন। স্বর্ণকুমারী বাল্যবয়স থেকেই বাড়ীতে ভাইদের মধ্যে স্বাদেশিকতার প্রবল উদ্দীপনা দেখেছেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর স্বদেশপ্রেমী অন্তঃকরণ এতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। পরিণত বয়সে তাঁর নানান কাজে সাহিত্যচর্চায় এই স্বদেশচেতনার সম্যক পরিচয় পরিস্ফুট। তাঁর 'সখিসমিতি' বাংলা দেশের মেয়েদের আত্মনির্ভরতায় উদ্বুদ্ধ করার একটি সক্রিয় প্রচেষ্টা। 'ভারতী'র বিভিন্ন প্রবন্ধে কবিতায়ও স্বর্ণকুমারীর আত্ম স্বাতন্ত্র্য অর্জনকামী স্বদেশচেতনার স্ফুরণ হয়েছে। স্বর্ণকুমারী স্বাভাবিক বুদ্ধি ও মেধা বলেই ইংরেজ শাসকের প্রতি বা বিদেশী মাত্রই বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করেন নি। স্বামী ও মেজদাদার প্রেরণায়, সহযোগিতায় দেশের অভিজাত ইংরেজ মহলে ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর প্রচুর মেলামেশা ছিল। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তিতে তিনি ইংরেজের অধ্যবসায়, পৌরুষ, স্বজাতিবোধ প্রভৃতি সৎগুণগুলির গুণগ্রাহী না হয়ে পারেন নি। সহজ মেধা ও যুক্তিবলে তিনি বুঝেছেন যে স্বদেশচর্চার প্রধান কথা হওযা উচিত পরনিরপেক্ষ আত্মস্বাতন্ত্র্য। আলস্য, পরনির্ভরতাই আমাদের চরিত্রের প্রধান ত্রুটি। স্বর্ণকুমারীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারতবাসী যদি স্বকীয়তা অর্জন করে সর্ববিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হয় বিদেশী শাসন তখন আপনা থেকেই শিথিল হয়ে পড়বে। স্বদেশ সেবায় উন্মত্ত বিক্ষোভে, বোমা বিস্ফোরণে, ইংরেজকে পীড়ন বা ধ্বংস করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ তিনি দেখেন নি। স্বদেশচর্চার প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারীর কনিষ্ঠা কন্যা সরলা দেবীর কথাও উল্লেখ্য, কারণ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জ্যোতির্ময়ীর স্বদেশচর্চায় সরলা দেবীর স্বদেশচর্চার ছায়াপাত লক্ষ্য করা নিতান্ত অমূলক হবে না। কন্যার স্বদেশচর্চাকে স্নেহময়ী জননী স্বীয় উপন্যাসের চরিত্রে তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিশ শতকের স্বদেশচর্চায় 'বীরাষ্টমী' উদ্‌যাপন করে তরুণদের শক্তি ও উৎসাহ যোগানো, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনা ও প্রচার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যর স্ফুরণ প্রভৃতি বিভিন্ন ধারায় অসাধারণ তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব-শালিনী সরলাদেবীর স্বদেশপ্রেম উৎসারিত হয়েছে।

দুই কন্যার বিবাহোত্তর অকাল মৃত্যুতে বেদনাহত হয়ে রাজা অতুলেশ্বর তৃতীয়া ও কনিষ্ঠা কন্যা জ্যোতির্ময়ীকে অনূঢ়া রেখে তার মন ও চরিত্রের সম্যক বিকাশের যথাসাধ্য আনুকূল্য ও সহযোগিতা করেছেন। জ্যোতির্ময়ীর জীবনের প্রধান আদর্শ স্বদেশ সেবা। তার এই দেশহিতৈষণার বিকাশ হয়েছে দেশের তরুণদের ব্যায়ামচর্চা সভাসমিতি গঠনের মধ্য দিয়ে শক্তি ও উদ্দীপনা সঞ্চারে। দেশসেবার যথার্থ পথ অন্বেষণ করতে গিয়ে জ্যোতির্ময়ী গুরুর খোঁজ করেছে। বিক্ষোভকারী উন্মত্ত আন্দোলনের সমর্থক বিপ্লবীদলের নায়কের দর্শন পেয়ে তাকে গুরুর আসনে বসাতে জ্যোতির্ময়ীর শান্ত ধীর চিত্তে দ্বিধা এসেছে। এই দ্বিধা দ্বন্দ্বের সংশয় নিরসনের জন্য সে শরৎকুমারের উপদেশপ্রার্থী হয়েছে। শরৎকুমারের শান্ত সহিষ্ণু ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে জ্যোতির্ময়ীর জীবনে নূতন চেতনা এসেছে। শরৎকুমার নিজে খুব সক্রিয় নয়, কিন্তু অপরের উপর তার প্রভাব যথেষ্ট। একটা অমানবিক আদর্শবাদ তার চরিত্রেব স্বাভাবিক বিকাশের পথে অন্তরায় হয়েছে। অতুলেশ্বরের ষ্টেটের ম্যানেজার ও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় মামা শ্যামাচরণের গৃহে সে প্রতিপালিত। মামা পুত্রস্নেহেই তাকে পালন করে এসেছেন। বলিষ্ঠ বিদ্বান বুদ্ধিমান চিকিৎসক হিসেবে শরৎকুমারের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট। কিন্তু সবসময় আত্মত্যাগের একটা মহান

অতিমানবিক আদর্শ তার চরিত্রে এই ব্যক্তিত্বকে সজীব হয়ে উঠতে দেয় নি। এই অতি-মানবিকতার স্পর্শ রয়েছে তার বিলেত যাওয়ার জাহাজ কেবিন ভাড়ার মাতুল প্রদত্ত টাকা হাসির ভাইকে রেস খেলতে ধার দিয়ে আসায়। এর মধ্যে রয়েছে তার মহান উদ্দেশ্য শচীনকে কুপথ থেকে ফেরানো। হাসি মায়ের মতের অনুবর্তী হয়ে শরৎকুমারের প্রণয়কে প্রত্যাখ্যান করেছে, কারণ শরৎকুমার বিদ্যায় বুদ্ধিতে পুরুষত্বে দৃপ্ত হলেও অর্থের কৌলীন্যে বিজনকুমারকেই জামাতার উপযুক্ত মনে করেছেন হাসির মা। সনাতন আদর্শে মায়ের মতানুসরণে হাসির অন্তর্বেদনার সম্যক প্রকাশ নেই। দয়িতনির্বাচনের এ হেন কঠিন সিদ্ধান্তের পিছনে যথেষ্ট উপযুক্ত বিশ্বাসযোগ্য কারণের অভাব অনুভূত হয়। তারপরে শরৎকুমারের জীবনের মোড় ঘুরে গেছে। মামার সঙ্গে ঘটনাচক্রে প্রসাদপুর রাজ্যে গিয়ে সে রাজকুমারীর অনুসৃত দেশসেবায় সক্রিয় অংশ নিয়েছে। ব্যায়ামচর্চা খেলাধূলা সব কিছুতেই তার উৎসাহ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে করতে জ্যোতির্ময়ীর শান্ত মধুর ব্যক্তিত্বে সে মুগ্ধ হয়েছে। সহজ স্বচ্ছন্দ ব্যবহার, ঔদার্য, পুরুষসুলভ উদাসীনতা, বলিষ্ঠ উৎসাহে সে জ্যোতির্ময়ীর হৃদয়ে একটা প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু দেশসেবার মহান আদর্শ উভয়ের প্রণয়ানুভূতির উপর কতকটা নৈর্ব্যক্তিকতার আবরণ এনে দিয়েছে। এদের চরিত্রে প্রণয়ের সুখদুঃখের অনুভূতিতে বেদনা আনন্দে তরঙ্গায়িত ব্যক্তিজীবনের আবেগ আকুলতা স্পন্দিত হয় নি। চরিত্রগুলি যতখানি মহান আদর্শ, সংযমের প্রচারক হয়েছে ততখানি ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের সুযোগ পায় নি। পরস্পরের প্রতি আকর্ষণে উভয়ের হৃদয়াবেগ অপেক্ষা আদর্শবোধ অধিকতর প্রভাবশীল। প্রেমের উষ্ণ উত্তাপের পরিবর্তে এদের চরিত্রে মহান দেশপ্রেম আদর্শের একটা শিশির সিক্ত শীতল অনুভূতি উপলব্ধি করা যায়। এ উপন্যাসে প্রেমের বিশ্লেষণ বা চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা জটিলতা পরিস্ফুটনের চেয়েও ঔপন্যাসিকের মনে স্বদেশ সেবার আদর্শ ছিল প্রবল। পরিচিত সংসারের ভালোয় মন্দয় নর-নারীর প্রাণের আবেগ মহান আদর্শবাদী চরিত্রগুলিতে সঞ্চারিত নয়।

ঘরোয়' জীবনের মেয়ে কন্যাসমা হাসির প্রতি অতুলেশ্বরের প্রণয় আকর্ষণে অবাস্তবতার দিকটি স্পষ্ট। অতুলেশ্বরের প্রণয় অনুভূতিতে মর্ত্যজগতের সংসার জীবনের মৃতদার পুরুষের প্রৌঢ় বয়সের নিঃসঙ্গতার বেদনায় নারীর প্রেমস্পর্শ পাওয়ার আকূতি দীপ্ত হয়ে উঠেনি। বয়সের তুলনায় চেহারায় তাঁর তারুণ্যের দীপ্তি, তিনি রসিক, নারীমনোহারী। তিনি সঙ্গীত চর্চা করেন, আদরিণী কন্যার স্বদেশচর্চায় আনুকূল্য করেন, হাসিকে নিয়ে প্রাসাদের হ্রদে নৌকা বিহার করেন। এ চরিত্র কল্পজগতের রোমান্টিক নায়ক। মর্ত্যজীবনের সঙ্গে তাঁর যোগ নিতান্ত আলগা ধরণের। কন্যা ও পিতার সম্পর্কটিও বাস্তবসংসারের প্রাত্যহিক জীবনের পিতাপুত্রীর অনুভূতির স্পর্শে আন্তরিক নয়, রোমান্সের কৃত্রিমতার আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত। উপন্যাসে আমাদেরই সমশ্রেণীর মানুষের আশানিরাশা আনন্দ বিষাদে উদ্বেল জীবনকাহিনী দেখতে চাই। কিন্তু এ উপন্যাসে নরনারীর জীবনযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল বা পরাভব ম্লান অস্তিত্ব নেই।

সাধারণ ঘরের মেয়ে হাসিও অসমবয়স্ক রাজার রোমান্টিক প্রেমের অধিকারিণী হয়ে বাস্তবজগতের ঊর্ধ্বে চলে গেছে। টেনিসনের — Idylls of the King (1859) কাব্যপাঠ করে রাণী গুইনেভারের প্রেমে নিজের প্রণয়ের প্রতিফলন দেখে তার চরিত্রে রোমান্টিক ভাবাবেশই

গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। শরৎকুমারের সঙ্গে তার পূর্ব প্রণয়ের স্মৃতিচারণে মাঝে মাঝে জ্যোতির্ময়ী সম্পর্কে সূক্ষ্ম ঈর্ষাবোধে তার বাস্তব নারী মনের দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে।

জ্যোতির্ময়ীর সঙ্গে হাসির সখ্যে লেখিকার গাঢ় অনুভূতির পরিচয় রয়েছে। এ অংশে লেখিকার ব্যক্তিজীবনের সই পাতানো বন্ধুত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভালবাসার প্রগাঢ়তায়, মান অভিমানের নারী-মনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে অংশটি হৃদয়স্পর্শী।

সুজন রায় ও বিজন রায় উপন্যাসে বিরুদ্ধ শক্তির সৃষ্টি করেছে। জ্যোতির্ময়ী ও শরৎকুমারের প্রণয়ের প্রতিবন্ধক হয়েছে বিজন রায়। বিজন রায় নিজে জ্যোতির্ময়ীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে যতটা না সক্রিয় প্রতিকূলতা করেছে তার থেকেও বেশি বাধা সৃষ্টি করেছে সুজন রায় প্রসাদপুরের ঐশ্বর্যলোভে। প্রসাদপুরের রাজবংশের পূর্ব-পুরুষদের সঙ্গে দূর আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে সুজন রায়ের। জ্যোতির্ময়ীকে পুত্রবধু করে ক্ষমতালোভী সুজন রায় প্রসাদপুরের রাজত্ব মুঠোয় ভরতে চায়। সুজন রায়ের চক্রান্তে রাজদ্রোহী হিসেবে পিতা বন্দী হওয়ার আশঙ্কায় জ্যোতির্ময়ী প্রেমাস্পদ শরৎকুমারকে প্রত্যাখ্যান করে বিজন রায়ের স্ত্রী হবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার মধ্যে প্রেমিকানারীর মনোবেদনা যথেষ্ট দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংশয়ের সঙ্গে মূর্ত নয়। এ সংঘাত অনেকটাই প্রয়োজনমূলক সৃষ্টি ও বহির্ঘটনা আরোপিত, জ্যোতির্ময়ীর প্রেমে দ্বিধাদ্বন্দ্ব এনে হৃদয় সমস্যার সম্যক উদ্‌ঘাটনে কাহিনী আবর্তের জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে নি। প্রেমাস্পদের ভালবাসা বিস্মৃত হয়ে, স্বকীয় আত্মানুভূতির বিসর্জন দিয়ে, জ্যোতির্ময়ী যে পিতার সুনাম মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে জীবনের সেই পরম-মুহূর্তের অন্তর্বেদনা চরিত্রটিতে স্বতোচ্ছ্বসিত হয়ে চরিত্রটিকে রোমান্টিকতার অসম্ভাব্যতা থেকে মুক্ত করে বাস্তবের সজীব প্রাণবেগচঞ্চল বিশিষ্টতা দিতে পারত। জীবনপদক্ষেপে স্বতঃউত্থিত সমস্যায় উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর জীবন বিজড়িত নয় বলেই ঘটনাবিন্যাস মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বাস্তব রসের সম্যক স্ফুরণ হয় নি।

উপন্যাসটির পরিণতি মেলোড্রামাটিক। বিজনকুমার শরৎকুমারের প্রতি আকস্মিক ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে গুলিবিদ্ধ করতে গিয়ে ভুলক্রমে জ্যোতির্ময়ীকেই হত্যা করে বসেছে। প্রেমের ক্ষেত্রে এ ঈর্ষা বিজনকুমারের চরিত্রে প্রেমানুভূতির সঙ্গে মিশে প্রথম থেকেই তাকে বস্তু-জগতের পুরুষ চরিত্রের হৃদয়াবেগে জীবন্ত করে তোলেনি। প্রথম দিকে তার চরিত্র গৌণ, নিষ্ক্রিয় রয়েছে। কৃতকর্মের জন্য তখনই অনুশোচনায় বিদ্ধ হয়ে জ্যোতির্ময়ী ও শরৎকুমারের মিলন ঘটানোর প্রচেষ্টায় বিজন কুমারের চরিত্রে তথা উপন্যাসে নাটকীয় আবেগের সঞ্চার হয়েছে। এ বিষাদান্তক পরিণতির সূচনা আগাগোড়া উপন্যাসের কাঠামোয় ঘনিয়ে উঠে নি।

হাসির মা জীবন্ত চরিত্র। জামাতা নির্বাচনের ব্যাপারে আত্মভোলা স্বামীকে বারবার তিরস্কার করার মধ্যে সংসারের সাধাবণ মাতৃহৃদয়ের প্রকাশ হয়েছে।

ইংরেজ চরিত্রগুলিতে বিশেষ করে ম্যাজিস্ট্রেট দম্পতি চরিত্রে ইংরেজের মহত্ত্ব সম্পর্কে লেখিকার স্বকীয় অনুভূতি স্পষ্ট হয়েছে। সহজ ভাষায় গল্পবলার আর্টটি মনোরম। স্বর্ণকুমারীর নাটক উপন্যাসে গানের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এখানেও পাত্রপাত্রীর গভীর হৃদয়ানুভূতি অনেক সময়ই গানে ব্যঞ্জিত হয়েছে।

ছোটগল্প

ছোটগল্প ও উপন্যাসের পার্থক্যটা শুধু আকারগত নয়, প্রকৃতিগত ত বটেই। ছোটগল্পের আয়তনও যেমন ক্ষুদ্র তেমনি তার আর্টও স্বতন্ত্র। ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা ভরা জীবনের এমন একটি খণ্ডাংশ এতে বেছে নিতে হয় যেটি ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরেই পূর্ণতা লাভ করে। কাহিনীটিকে ঘিরে জমাট বেঁধে উঠে একটি নিটোল ভাবরস। কাহিনী শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও পাঠকচিত্তে এর রেশ থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি' মনে হবে শেষ হয়ে হইল না শেষ!" উপন্যাসের ধীর মন্থর গতিতে আরম্ভ হওয়ার বা পাত্র-পাত্রীর দীর্ঘ পরিচয় বিশ্লেষণের এতে স্থান নেই। ছোটগল্পের সংহত পরিধিতে বাহুল্যবর্জিত সীমার মধ্যে কোন ঘটনা বা ঘটনার অংশ, চরিত্র বা চরিত্রের বিশেষ অংশকে ফোটাতে হবে। মানবজীবনের জটিলতা অসামান্য, তার চরিত্রের বৈচিত্র্যও অপরিসীম। ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যের এই জটিলরস ছোটগল্পের প্রাণ। একটি মুহূর্তে একটি জীবনের একাংশ এতে বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠে। গীতিকবির মত ছোটগল্পের লেখকও জগৎ ও জীবনকে নিজের মনের মধ্যে প্রতিফলিত করে নিজের ধারণাটিকে (Impression) রূপায়িত করেন। নিজের উপলব্ধ ধারণা ও চেতনার পরিমণ্ডলে কাহিনী বা চরিত্রকে তিনি স্থাপন করেন। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রকৃত স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছ অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিতে আমাদের এই বাহ্যতঃ তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর জীবনের গভীরের ভাবঘন রসপ্রবাহটিকে, মানব চরিত্রের সূক্ষ্ম পরিবর্তন, জীবনের রহস্যময় সূত্রগুলিকে শাশ্বত রসরূপ দিয়েছেন। তাঁর ছোটগল্পে দোষগুণ সুখ-দুঃখ বিজড়িত তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর মানবজীবনের ভাষ্যই রসমণ্ডিত হয়ে অসাধারণত্ব অর্জন করেছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে মানুষ, প্রকৃতি ও রহস্যলোকের অতিপ্রাকৃত চেতনার প্রাধান্য।

স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্পগুলিও স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি। আমাদের এই আপাততুচ্ছ অতি সাধারণ জীবনের গভীরে যে একটি ভাবঘন গোপন প্রবাহ আছে তাকে কেন্দ্র করেই তাঁর গল্পগুলি রচিত হয়েছে। বিষয়বস্তু, চরিত্রচিত্রণ, ঘটনাবিন্যাস, বর্ণনাভঙ্গী সবদিক থেকেই তাঁর গল্পগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ। সংসারের, সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার দোলায় আবর্তিত মানব জীবনের বা চরিত্রের ছোটখাট বৈচিত্র্যে বা অতি সামান্য হৃদয়ানুভূতির আলোড়নে স্বর্ণকুমারী গল্পলেখার রস বা প্রেরণা পেয়েছেন। গল্পগুলি তাই কখনও মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের আড়ালে গভীর গোপন বেদনার হতাশ্বাসে করুণ, কখনও জীবনের প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল কখনও দুঃসাহসিক মানুষের কার্যকলাপে ভয়ানক। স্বর্ণকুমারীর গল্পগুলিতে মানুষের প্রতি তাঁর অপার ভালবাসা এবং সুগভীর জীবনরসোপলব্ধির আলোকে নিতান্ত নগণ্য মানুষও অসামান্য দীপ্তি লাভ করেছে। সেখানেই স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যশিল্পের সার্থকতা। এই অজ্ঞাত অখ্যাত মানুষগুলির ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনা

স্নেহ ভালবাসা উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে সমগ্র মানবসমাজের একটা বৃহৎ অব্যক্ত বেদনার মত সহৃদয় পাঠকের মন স্পর্শ করতে থাকে। স্বর্ণকুমারীর গল্পগুলির বিশিষ্টতা চরিত্রগুলির হৃদয়রহস্য উন্মোচনে। জীবনরসিক শিল্পীর প্রসন্নদৃষ্টিতে মানুষের বিচিত্র চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও জীবনের খণ্ডাংশের চিত্রগুলি স্নিগ্ধ মাধুর্যামণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

নিজের স্বার্থচিন্তায় উদাসীন অতিসাধারণ ব্যক্তির চরিত্রেও অসাধারণ দৃঢ় চিত্ততার এবং মহত্ত্বের স্ফুরণ হতে পারে— এমন এক নগণ্য ব্যক্তির কাহিনী নিয়ে 'ট্যালিসম্যান' গল্পটি রচিত। মনিব টডের প্রতি ভৃত্য রণবীরের সরল অকৃত্রিম গভীর ভালবাসার অনুভূতি গল্পটিতে আগাগোড়া গীতিকবিতার মত অনুরণিত হয়েছে। রণবীরের চরিত্রটির পরিকল্পনায় স্বর্ণকুমারীর যথেষ্ট মৌলিকতা রয়েছে। সংসার জীবনে মানুষের স্নেহপ্রীতির সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ রক্ত-সম্পর্কের অপেক্ষা না করে কতখানি নিবিড় হতে পারে তার নিখুঁত পরিচয় গল্পটিতে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কর্ণেল টডের অনুগত ভৃত্য আর্দালী রণবীর। তাদের সম্পর্কটা শুধু বেতনভুক্ ভৃত্য মনিবের নয়। বেতনের বিনিময়ে যতটুকু সেবা বা কর্তব্যপরায়ণতা পাওয়া উচিত টড রণবীরের কাছে পেতেন তার অনেক বেশি, মানবজীবনের বৈষয়িক হিসেব-নিকেশে যার পরিমাপ সব সময় করা যায় না। জাতি-ধর্ম-অর্থের সম্পর্কর থেকে এক্ষেত্রে বড় হয়ে উঠেছিল দুটি হৃদয়ের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা। রণবীর গাড়ীতে না থাকলে টড সেদিন কাউকে না কাউকে মোটর চাপা দেন, ধূমপান করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত গাউনে আগুন লাগালে মেমসাহেবের সাহায্যে রণবীর ঠিক উপস্থিত থাকে আদেশের অপেক্ষা না রেখে, আবার টডের পুত্র টিম বাবা হ্রদে নৌকা চড়তে গিয়ে উল্টে পড়লে প্রাণভয় তুচ্ছ করে রণবীরই তাকে রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে।— "এইরূপে জলে স্থলে কর্ণেল সাহেবের শ্রীমধুসূদন ছিলেন আর্দালী রণবীর। তাই প্রভু আদর করিয়া এই উপকারী 'পেয়ারের' চাকরের নাম দিয়াছিলেন ট্যালিসম্যান।" সমস্ত পরিবারটিকে নিয়ে টড সাহেবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল সবল গ্রাম্য রণবীর। এই ট্যালিসম্যানের হৃদয় রহস্যের অপরূপ উন্মোচন হয়েছে গল্পটিতে। তিন বছরের ফার্লো নিয়ে টড দেশে গেলে রণবীর ফিরে গেল তার দেশের বাড়ী বার্মণিয়াতে। সেখানে ছিল তার সাধ্বী স্ত্রী শিশুপুত্র নিয়ে স্বচ্ছল সংসার। কিন্তু শান্তিতে ঘরসংসার করা তার আর হল না। অকস্মাৎ একদিন কাগজে সে দেখল টড সাহেব একবিংশ পাঞ্জাবী রেজিমেন্টের নায়কত্ব নিয়ে ফ্রান্সে যুদ্ধে যাচ্ছেন। টডের 'ট্যালিসম্যান' সে, কি করে শান্তিতে এ সময়ে ঘরে বসে সে থাকতে পারে! হৃদয়ের কোন গোপন অনুভূতির টানে তার পতিপ্রাণা স্ত্রী, সরল শিশু পুত্র কিষণদাস পরিবৃত মায়ার সংসার মিথ্যা হয়ে গেল— সে গিয়ে রেজিমেন্টে নাম লেখাল। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে নিজের প্রাণ দিয়ে টডকে রক্ষা করে সে প্রভুভক্তির দুর্লভ নিদর্শন রেখে গেল। গল্পটিতে ট্যালিসম্যানের এই অন্তর্রহস্যের সুন্দর উদ্‌ঘাটন হয়েছে। দুটি নিঃসম্পর্কীয় হৃদয়ের নিবিড় বন্ধনের গোপন সূত্রটি আবিষ্কার করে স্বর্ণকুমারী গল্পটিকে অনবদ্য রসরূপ দিয়েছেন। মানুষের বাঁধাধরা হিসেবী জীবনে এই ক্ষণিক স্নেহ প্রেমের যে ভাবানুভূতি সাহিত্যে তা শিল্পীর অপরিসীম সহৃদয়তায় সার্থক রসরূপ লাভ করেছে। গল্পবলার সহজ ভঙ্গীটি স্বর্ণকুমারীর একান্ত নিজস্ব।

স্বর্ণকুমারীর গল্পগুলি আগাগোড়া স্বচ্ছন্দ গল্পরসে সমুজ্জ্বল। গল্পাংশের বাহুল্যবর্জিত

'অমরগুচ্ছ' (ভারতী, ১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ—শ্রাবণ) আত্মকাহিনীটি গীতিকবিতার মতই নিটোল ভাব রসঘন। অসামান্য বাস্তবতার সঙ্গে এক নারীর হৃদয়ানুভূতির বিশ্লেষণ করেছেন লেখিকা। নায়িকার স্বগতোক্তিতে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের নিপুণসুন্দর উদ্ঘাটন হয়েছে গল্পটিতে। হিন্দুনারীর বৈধব্য সংস্কারে ও সজ্ঞানে না-দেখা স্বামীর কল্পিত ভাবাদর্শের প্রতি ভক্তিতে নায়িকার মন অভিভূত হয়ে ছিল। কিন্তু সেই সংস্কার ও ভক্তির আদর্শে চিড় ধরল দাদার বন্ধুর আকস্মিক আবির্ভাবের বাস্তবতায়। মিথ্যা সংস্কারে ও কল্পনার আদর্শে যে নারীত্ব অবহেলিত বঞ্চিত হয়ে ছিল, সেই অপমানিত নারীত্ব জেগে উঠল সংসারের কঠিন বাস্তবতায়। নায়িকার স্বামীর কল্পনার মূর্তি অস্পষ্ট হয়ে গেছে দাদার বন্ধুর সাহচর্যের আনন্দে। প্রকৃত প্রেমের আবির্ভাবে নারী চিত্তের এই মনোদ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া গল্পটিতে অপূর্ব নৈপুণ্যে ও গভীর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। একদিকে সমাজজীবনে নারীর অভ্যস্ত সংস্কার যার মধ্যে বাস্তবের কোন ভিত্তি নেই, আর একদিকে বস্তু সংসারের নারীহৃদয়ের চাহিদা— এই দুয়ের টানাপোড়েনে নায়িকার অন্তর্রহস্যের উন্মোচন চিত্তাকর্ষক। বাল্যবিধবা নায়িকার স্বামীসংস্কার—

"স্বামীকে আমাব মনে পড়ে না। যাঁহার অভাবে আমার সমস্ত জীবন শূন্য, তিনি কে তাহা আমি ঠিক জানি না। তবুও তাঁহার স্মৃতিতে, তাঁহার ধ্যানে হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখিতে চাই। ইহাই আমাদের আজন্ম শিক্ষা, চিরন্তন সংস্কার। তাহা ভাল কি মন্দ, ন্যায় কি অন্যায়, পুণ্য কি পাপ, সে তর্ক পর্যন্ত আমার মনে উদয় হয় না,— দূরাতীত সুখ স্বপ্নের ন্যায় কখনও কখনও বিবাহের কথা মনে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে একটি ছায়াময় মূর্তি মানসপটে বিভাসিত হয়। তাহা জীবন্ত আকারে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য দারুণ আকুলতা জন্মে, কিন্তু মনের আবেগ মনে রুদ্ধ করিয়া অশ্রুমলিন নয়নের সমক্ষে তখন একখানি ফটোগ্রাফ আনিয়া ধরি। ফটোগ্রাফ খানি আমার স্বামীদেবের বহুদিনের তোলা, তাই রেখা বিলীন, অস্পষ্ট, লুপ্তসাদৃশ্য এই ছবি তাঁহার একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন, সুতরাং ইহার মত মূল্যবান বস্তু আমার আর কিছুই নাই।" একদিকে সজ্ঞানে না-দেখা স্বামীর স্মৃতিপূজা, অপরদিকে প্রত্যক্ষ বাস্তব,— "সকলেই বলিত, আমাদের অতিথি বেশ সুপুরুষ। আমি মনে করিতাম, তাঁহার মত সুন্দর পুরুষ সংসারে দ্বিতীয় নাই। যখন ইংরাজদিগের সহিত তাঁহাকে দেখিতাম, তখন আমার নয়নে নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় তিনি শোভা পাইতেন। কিন্তু পূর্ণদৃষ্টিতে ভাল করিয়া তাঁহাকে দেখিতে আমার কখনও সাহস হইত না। নয়নে নয়ন সংলগ্ন হইলেই দৃষ্টি আপনা হইতেই অবনত হইয়া পড়িত। এই চকিত দর্শনেই কি মহাপুলক শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া উঠিত জানি না, পূর্ণদর্শনে— পূর্ণবাক্যালাপে অধিকতর সুখ সম্ভব কি না!"

বর্তমানের প্রত্যক্ষ জীবন্ত বাস্তবের কাছে বিধবার সংস্কার আদর্শ ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু গল্পটির পরিণতি জীবনরসের বাস্তবতায় সার্থক শিল্পরূপ পায় নি। স্বর্ণকুমারীর নীতিপ্রবণতা তাঁর শিল্পীসত্তাকে অতিক্রম করে গেছে। বিধবার সংস্কারের আদর্শই নায়িকার জীবনে তাই বড় হয়ে উঠেছে। দাদার বন্ধুর আকস্মিক সস্ত্রীক দর্শন পেয়ে নায়িকার মোহ ছুটে গেছে, স্বামীর বিস্মৃত স্মৃতি ফিরে পেয়ে বিবেকের দংশনে দগ্ধ হয়েছে নায়িকা। স্বপ্নে তার স্বামী দেখা দিয়ে বাস্তবের মোহমুক্তি ঘটিয়েছে। পরিসমাপ্তির অলৌকিকতা গল্পটির শিল্পোৎকর্ষ, বাস্তবরসকে

ক্ষুণ্ণ করেছে। গল্পের এই অলৌকিক পরিণতিতে বঙ্কিমের প্রভাব সুস্পষ্ট। এইধরণের নীতিপ্রবণ পরিণতিতে গল্পের জীবনরসও ব্যাহত হয়েছে।

'জীবন অভিনয়' গল্পটি (ভারতী ১৩১২ আশ্বিন) নারীর প্রেমানুভূতির আর একটি দিক উদ্ঘাটিত করেছে। জীবনের একটি খণ্ডাংশ অবলম্বণে রচিত গল্পটিতে মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য রয়েছে। সহজলভ্য পুরুষের প্রেমে নারীমনের প্রতিক্রিয়া চমৎকার অভিব্যক্ত হয়েছে গল্পটিতে। জনার্দন সদাসর্বদা স্নেহে প্রেমে মলিনাকে ঘিরে রাখতে চায়— কিন্তু মলিনা তাতে তার প্রতি আরও বিরূপ হয়ে উঠে—

"মলিনার কিন্তু জনার্দনকে ভাল লাগে না। জনার্দন সদাসর্বদা তাহার ভালবাসা দিয়া মলিনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে চায়— ইহাতে তাহার অতিশয় বিরক্তি বোধ হয়।"

মলিনার মনে আরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে জনার্দনের নামটি—

"যাহা হউক জনার্দ্দনের এরূপ শত অপরাধও মলিনা মার্জনা করিতে পারিত, যদি হতভাগ্য যুবক জনার্দ্দন না হইয়া ললিতমোহন বা এইরূপ কোন শ্রুতিমধুর নাম ধারণ করিত। যখন মলিনা ভাবে, লোকে তাহাকে মিসেস জনার্দ্দন বলিবে— তখনি এমন বেতর বেসুরা সুরে কথাটা খট্ করিয়া তাহার প্রাণে লাগে যে, পিয়ানোর সমস্ত সুরগুলা একসঙ্গে বেসুরা বাজিলেও তাহার কানে তাহা তত কঠোর বাজিত না। তাহাদের বাগানের মালীর নাম জনার্দ্দন, ভদ্রলোকের এ নাম তাহার অসহ্য।"

সংসারে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ও সময়বিশেষে যে মানুষের মনে কত বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, তারই সরস সুন্দর নিদর্শন গল্পটি। নরনারীর প্রেমানুভূতির বিকাশের জন্য প্রয়োজন পরিবেশের আনুকূল্য, হৃদয়ের সহমর্মিতা। বস্তু সংসারে প্রেমের উপলব্ধিতে নরনারীর মনের কত বৈচিত্র্যই সক্রিয় থাকে। এই ধরণের বৈচিত্র্যেরই একটি উদাহরণ মলিনা। নরনারীর পারস্পরিক একাত্মতায় অনুকূল পরিবেশে যে প্রেমভাব জাগে, তার একটিরও অন্যথা হলে, অনেক গভীর ভালবাসাও ধুলায় লুণ্ঠিত হয়, বিদ্রূপের বিষয় হয়। মলিনার কাছে জনার্দ্দনের ভালবাসা, সব গুণ মিথ্যা হয়ে গেছে তার নামটির জন্য। এই নামের জন্য মলিনা জনার্দ্দনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে নি। মলিনার কাছে জনার্দ্দন বিদ্রূপ অবহেলার পাত্র হয়ে উঠেছে। নারী মনস্তত্ত্বের সুন্দর উদঘাটন হয়েছে গল্পটিতে। যে পুরুষের ভালবাসা সহজেই পাওয়া যায়, তার প্রতি নারীর মন বিরূপ হয়ে উঠে। নারীর প্রেমানুভূতিতে রুচি অনেকটা প্রতিক্রিয়াশীল থাকে। 'জীবন অভিনয়' গল্পটিতে লেখিকা নারীমনের এই বিশিষ্টতাটুকুকে সুকৌশলে রূপায়িত করেছেন।

'পেনে প্রীতি' গল্পটিতে (ভারতী ১৩০৬ শ্রাবণ) স্বর্ণকুমারীর ভ্রমণ রসিকতাই প্রধান হয়ে উঠেছে। এক কিশোরী বালিকার অপরিণত মন যে কেমন করে প্রেমের মৃদুস্নিগ্ধ বর্ণচ্ছটায় বিকশিত হয়ে চিরতিমিরে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তাই এ গল্পটিতে অনাড়ম্বরভাবে বিবৃত হয়েছে। পথঘাটের অতি সাধারণ বস্তুও লেখিকার অনুভূতিপ্রবণ মনের প্রতিফলনে সুস্নিগ্ধ সৌন্দর্যসিক্ত হয়ে উঠেছে। বোম্বাই শহরে স্বর্ণকুমারীর জীবনের অনেকগুলি দিনই কেটেছে দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। 'ভারতী'র পাতায় পাতায় স্বর্ণকুমারীর সেই ভ্রমণস্মৃতি মুদ্রিত আছে। বোম্বাই

শহরের আলিবাগ ভ্রমণের স্মৃতিও এর মধ্যে একটি। 'পেনে প্রীতি' গল্পে আলিবাগ জেলার 'পেন' নামক স্থানের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় স্বর্ণকুমারীর সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ আছে। গল্পের বক্তা নায়ক 'পেনে' থাকাকালে এক মহারাষ্ট্রীয় ফুলওয়ালীর কৈশোর প্রেমের যে করুণ মধুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তারই প্রতিবিম্বন রয়েছে গল্পটিতে। এক অজ্ঞাত অখ্যাত নিতান্ত সাধারণ ফুলওয়ালীর কৈশোর জীবনের সুকুমার প্রেমানুভূতির আবেগটিকে গল্পের সহজ ভাষায় স্বর্ণকুমারী যে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তার মধ্যে তাঁর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় রয়েছে। সাত বছরের বালিকা ফুলওয়ালীকে তার মায়ের অনুরোধে ইংরেজ ভগ্নীপতি যে বিয়ে করার কথা দিয়েছিল সেই স্মৃতি নিয়ে বালিকার জীবনের দশটি বছর কেটে গেছে। সতেরো বছরের যুবতী ফুলওয়ালী সেই প্রান্তসাহেবের প্রত্যাবর্তনের আশায় অপেক্ষা করে আছে। গল্পের বক্তা নায়কের কাছ থেকে প্রান্ত সাহেবের একটি ছবি নিয়ে প্রতীক্ষারত সতেরো বছরের যুবতী নারীহৃদয় সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করেছে। সরস ভ্রমণ কাহিনীর মাঝে ক্ষুদ্র প্রেমের স্মৃতিটুকু গল্পটিতে একটা সুস্নিগ্ধ মাধুর্য্য এনে দিয়েছে। "সাহিত্য" পত্রিকার ১৩০৬ সালের ভাদ্র সংখ্যার সমালোচনা কলমে গল্পটি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে, — "'পেনে প্রীতি' একটি মনোরম ভ্রমণবৃত্তান্ত। ফুলওয়ালী মহারাষ্ট্র কন্যার প্রেমকাহিনী একটি ক্ষুদ্র গল্পের মত চিত্তাকর্ষক।" চিত্তের অকপট সারল্য, কৈশোর প্রেমের অকৃত্রিম গভীরতা নিয়ে ফুলওয়ালীর চরিত্রটি হৃদয়গ্রাহী।

'বিজয়ার আশীর্বাদ' গল্পটি রোমান্টিক। আমাদের সমাজের সেকালের সংস্কারগুলির মধ্যে একটি ছিল গঙ্গাবক্ষে শিশুপুত্রকে ভাসিয়ে দেওয়া। (রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' কবিতায় তার পরিচয় রয়েছে।) সেইরকম একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই গল্পটি বিন্যস্ত। ক্ষেমঙ্করী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে প্রথম পুত্রটিকে মানত স্বরূপ গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়ে দিয়ে শোকবিহ্বল হয়ে পড়ল। দ্বিতীয়া কন্যা সন্তানটিরও মৃত্যু হলে স্বামী স্ত্রী সংসারে নিরাসক্ত হয়ে সন্ন্যাসী হল। ভৈরবী ক্ষেমঙ্করী জীবনের প্রায় শেষপ্রান্তে এসে ঘটনাচক্রে দেখা পেল শিশুকালে ভাসিয়ে দেওয়া পুত্রের। সেই পুত্র সাগর তখন উচ্চশিক্ষিত যুবক। গল্পের পরিণতিতে মাতা-পুত্রের মিলন দৃশ্যটি মর্মস্পর্শী। নিখিলচাঁদ ও করুণাময়ীর ভূমিকা বিশিষ্টতাবর্জিত। এঁরা শিশু সাগরকে পেয়ে পুত্রহীনতার বেদনা ভুলেছিলেন। সাগরের বাগ্‌দত্তা বধূ 'বারুণী' রোমান্টিক নায়িকা। গল্পটিতে ঘটনার জটিলতার দিকেই লেখিকার দৃষ্টি নিবিষ্ট রয়েছে। ভৈরবী চরিত্রটি নূতন ধরণের।

'স্বপ্ন না কি' গল্পটি অ্যাড্‌ভেন্‌চারধর্মী। নায়কের নিজের মুখেই তার অ্যাড্‌ভেন্‌চারের কাহিনীটি ব্যক্ত হয়েছে। দিদির বাড়ী শিমুলতলায় বেড়াতে গিয়েছিল নায়ক রমাপ্রসাদ বসু। সেখানে হলদিঝোরা দেখতে গিয়ে এক গুহামধ্যে নায়ক সন্ধান পেল রহস্যের। অন্ধকার গুহামধ্যে অসীম সাহসভরে প্রবেশ করে সে দেখল একটি পুরুষ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাকে বন্ধনমুক্ত করে বেরিয়ে আসার সময় পথে সে পেল ডুলীমধ্যে এক অচেতন নারীকে। সে নারীকে গৃহে নিয়ে গিয়ে সুস্থ করে জানা গেল রহস্যের সূত্র। মনোরমার পিতা মৃত্যুর সময় পঞ্চাশ হাজার টাকা ও একটি বাড়ী রেখে গিয়েছিল কন্যার বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ। বিষয়সম্পত্তির অধিকারী মনোরমার ভাই বিলেতে গিয়েছিল পড়াশোনা করতে। মনোরমার

পিতার বন্ধু ঘনশ্যাম ঘোষ এই সুযোগে টাকা ও বাড়ীর লোভে মনোরমাকে অপহরণ করে নিয়ে গেল। পথিমধ্যে তাকে উদ্ধার করল রমাপ্রসাদ। নাটকীয় পরিস্থিতিতে রমাপ্রসাদকে খুনের দায়ে হাজতে নিয়ে যাওয়া হল সেইদিন যেদিন মনোরমার সঙ্গে তার বিবাহের সব আয়োজন প্রস্তুত। বিচারের রায়ের দিন গুহামধ্যে যে ব্যক্তির খুনের দায়ে রমাপ্রসাদকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল সে সশরীরে কোর্টে সাক্ষ্য দিল ঘনশ্যাম ঘোষের সব চক্রান্তের। মনোরমার সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছিল বলে ঘনশ্যাম ঘোষ তাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল গুহায়। এইভাবেই গল্পের মধুর পরিসমাপ্তি ঘটল। রহস্যকাহিনী বর্ণনায় স্বর্ণকুমারীর দক্ষতার নিদর্শন এই গল্পে আছে।

বাংলা দেশের মেয়েদের শ্বশুরবাড়ীতে আদর মর্যাদা নির্ভর করে বাপের বাড়ীর আর্থিক অবস্থার উপর। বিয়ের পণ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন পার্বণে প্রেরিত তত্ত্ব ইত্যাদি উপলক্ষে মেয়ের বাপের বাড়ী যত দিতে পারবে শ্বশুরবাড়ীতে মেয়ের আসন তত পাকাপোক্ত হবে। নইলে মেয়েদের আজীবন নিন্দা বা খোঁটা শুনতে হয়। এই সামাজিক পটভূমিকায় মেয়েদের অসহায় বেদনার করুণ ছবি রয়েছে 'পূজার তত্ত্ব' গল্পে। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের "দেনাপাওনা" গল্পও এই ধরণের সামাজিক পটভূমিকায় বিবাহের পণ নিয়ে বরপক্ষের, বিশেষ করে বরের মায়ের নিষ্ঠুরতার কাহিনী। পূজোয় মা বাবার মেয়ের শ্বশুরবাড়ী তত্ত্ব পাঠানোর ব্যবস্থাপনায় গল্পের সূচনা। মায়ের আশঙ্কা তত্ত্বের জিনিষ পাছে মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর লোকের মনের মত না হয়, মেয়েকে নিন্দে শুনতে হয়। মাতাল স্বামীর অগোচরে মা তাই কষ্টে সঞ্চিত অর্থে জামায়ের রেশমী চাদর আনালেন। কিন্তু তবুও মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর মনঃপুত হল না। পূজোয় জামাই এল না, মেয়ে একাই এল। মা মেয়ের মিলনদৃশ্যটি করুণ মর্মস্পর্শী। গল্পটিতে আমাদের সংস্কারাচ্ছন্ন হৃদয়হীন সমাজের পটভূমিতে মা ও মেয়ের অসহায়তার গভীর অন্তর্বেদনা মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। মায়ের প্রতি সমবেদনায় সুশীলার ভূমিকাটুকু বড় মধুর। তত্ত্ব দেখে তার শ্বশুরবাড়ীর সকলে নানা মন্তব্য প্রকাশ করল— "সে সকল কথা যে কন্যা সুশীলার শ্রবণ সুখকর হইল না তাহা বলা বাহুল্য। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে মাকে স্মরণ করিল, তাহার দুঃখিনী মা, তাহার জন্য তাঁহাকে কত কষ্টই সহ্য করিতে হয়। মাতার কষ্টের স্মৃতির মধ্যে তাহার নিজের কষ্ট চাপা পড়িয়া গেল।" বাঙালী ভদ্রঘরের অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ বাতাবরণের নিরানন্দ রূপটি গল্পটিতে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যুগে তাঁর কবিতার ব্যর্থ অনুকরণ প্রচেষ্টার যে প্রবল জোয়ার বাংলা কাব্য সাহিত্যে দেখা গিয়েছিল, অক্ষম দুর্বল কবিদের সেই অসার অনুকরণ প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর— 'কান্তিবাবুর খোসনাম' গল্পটিতে। পর প্রশংসালব্ধ আত্মম্ভরিতা ও কাণ্ডজ্ঞান শূন্যতা গল্পটির নায়কের ট্র্যাজেডি।

'মিউটিনি' গল্পটি "ছোটখাট মিউটিনি" নামে ভারতীতে বের হয় ১৩০৭ সালের আষাঢ় সংখ্যায়। এক ইংরেজ মহিলার বাঙলা ভাষা জ্ঞানের অভাবে এদেশে যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে সরস কৌতুককর কাহিনী 'মিউটিনি' লেখা। শহরে থাকাকালে একরাত্রে তাঁর স্বামী 'ট্যুরে' (tour) গেলে ইংরেজ মহিলাটি একাকী দাসদাসী ও বাংলোর সিপাহীদের তত্ত্বাবধানে রইলেন। অর্ধরাত্রে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল অস্ত্রের ঝনঝনিতে। ভীত ত্রস্ত

ইংরেজ মহিলাটি তাঁর আয়াকে জিজ্ঞাসা করে শুধু জানলেন 'পুলিস, সিপাহী, লড়াই।' কারণ আয়ার বাংলা কথা তিনি বোঝেন না। ভয়চকিত হয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। পরের দিন জানা গেল স্থানীয় পুলিশ সাহেব তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও আর এক সিপাহী বাহিনী পাঠালে বাংলোর সিপাহীরা অপমান বোধ করে— তাই পারস্পরিক সংঘর্ষ বাধে। তাছাড়া আরও একটি কারণ হল দুপক্ষেরই দুজন সিপাহীর আয়ার প্রতি অনুরাগ ছিল। সে ঘটনা এ বিরোধে আরও ইন্ধন যুগিয়ে ছিল। এই সংঘর্ষকেই মেমসাহেব 'মিউটিনি' বা বিদ্রোহ, লড়াই মনে করে ভীতত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। গল্পটিতে উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা কিছু লক্ষ্য করা যায় না। গল্পটি প্রসঙ্গে 'সাহিত্য' পত্রিকায় (মাসিক সাহিত্য সমালোচনা, ১৩০৭ শ্রাবণ, ১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) মন্তব্য করা হয়েছিল—

"... মেমসাহেরের ভয়, বড় সাহেবের সাহস, মিসিবাবার 'দেয়ালা' বা কালো সাহেবের চার পিয়ালায় প্রবল তরঙ্গ, সবই ছোটগল্পের বিষয়ীভূত হইতে পারে। কিন্তু আখ্যানবস্তু যতই সামান্য হউক, তাহা ফুটাইয়া তুলিবার ক্ষমতা না থাকিলে গল্পরচনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ঘোরালো রসালো গল্পের গঠন বরং ক্ষুদ্র ক্ষমতার আয়ও হইতে পারে— কিন্তু চিত্তবৃত্তির বিশ্লেষণ যে সব গল্পের উদ্দিষ্ট, তাহাদের সাফল্য বিশেষ ক্ষমতাসাপেক্ষ। মেমসাহেবের অকারণ ভয় তুচ্ছ বিষয় হউক, লিখিতে পারিলে ইহাও ছোটগল্পে পরিণত হইতে পারিত, কিন্তু দেবী স্বর্ণকুমারী এ ক্ষেত্রে সে ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।"

স্বর্ণকুমারীর গল্পগুলিতে বিষয়গত বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। বাংলাদেশে ইংরেজ রাজত্বে স্বাধীনতার আন্দোলনের নামে যে হিংসাত্মক বিপ্লব প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল, 'নবডাকাতের ডায়েরি' গল্পে তারই তত্ত্ববিশ্লেষণ ও মূল্যনির্ধারণের চেষ্টা করেছেন স্বর্ণকুমারী। গল্পটির মূল কথাই হল দেশের কাজ যত মহৎই হোক না কেন তাতে যদি মানুষের আত্মপ্রসারণ ব্যাহত হয়, দৃষ্টি শক্তি সঙ্কীর্ণ হয়, আত্মমর্যাদা বিনষ্ট হয় তবে তা ব্যক্তি জীবনের পক্ষে নিতান্ত অমঙ্গল-জনক হয়ে উঠে। স্বর্ণকুমারীর দূরবিহারী অন্তর্ভেদী রসদৃষ্টিতে এই হিংসাত্মক প্রচেষ্টার মারাত্মক গলদ যে কোনখানে তা ধরা পড়েছে। ইমোশনের উন্মাদনায় উন্মত্ত না হয়ে এবং শত্রুর উপর বিদ্বেষ না রেখে দেশের কাজ করাতেই যথার্থ মনুষ্যত্ব, বীরত্ব। স্বর্ণকুমারীর ঈপ্সিত স্বাধীনতা অর্জনের পথ হল আত্মস্বাতন্ত্র্য বা আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন রবীন্দ্রনাথও এই কথাই বলেছেন। স্থির বুদ্ধিতে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে হিংসাত্মক বিপ্লবকে সমর্থন করেন নি। দেশবাসী স্বয়ংক্রিয় আত্মনির্ভরশীল হলে ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে চলে যাবে বলে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনার মত্ততা তখন বাঙালীর স্থিরতর দৃষ্টি ও ধ্রুবতর কল্যাণ-বুদ্ধিকে যে কতটা আচ্ছন্ন করে ছিল, নবকুমারের চরিত্রে স্বর্ণকুমারী তারই নিপুণ চিত্র এঁকেছেন। নবকুমারের পিতা মৃত্যুর সময় হেয়ার কলেজের ইংরেজীর প্রোফেসর কেমিক্যাল সাহেবের হাতে ১৫ বছরের পুত্রকে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন। কেমিক্যাল সাহেব সে প্রতিশ্রুতি কখনোই বিস্মৃত হন নি। কিন্তু পিতার মৃত্যুতে স্বাধীন নবকুমারের কেমিক্যাল সাহেবের শাসনে বন্দীদশায় জীবন কাটাতে মন উঠল না। অপরিণত বালক নবকুমারের স্বদেশী আন্দোলনে স্বর্ণকুমারী তখনকার স্বদেশী আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্য হুজুগপ্রিয়তাকে সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। নবকুমারের

কথায় ''আবাল্য আমি 'স্বদেশী'।— দুধে-দাঁত বোধ হয় তখনও আমার সব ভাঙ্গে নাই, যখন আমি সদলবলে দোকানীদের বিলাতী কাপড় পুড়াইয়া আসিয়াছি। এ বার স্কুল ছাড়িয়া রীতিমতভাবে বিপ্লবপন্থী হইয়া পড়িলাম।'' কেমিক্যাল সাহেব চেয়েছিলেন নবকুমার পড়াশুনো করে মানুষ হোক্— কিন্তু তাঁর অপরাধ তিনি 'বিদেশী'। অগত্যা বন্ধুদের প্ররোচনায় নবকুমার সদাসর্বদা তাঁকে এড়িয়ে চলে। দীর্ঘদিন নবকুমার স্বদেশী আন্দোলনের হিংসাত্মক বিপ্লব, হত্যা, নৃশংস লুণ্ঠন ইত্যাদিতে মেতে থেকে অবশেষে বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছে। বৃহত্তর মহত্তর জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য মনে প্রাণে উপলব্ধি করে আবার মানুষ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। কঠোর বাস্তবতায় অন্তর্দাহনে দগ্ধ হওয়ার পর নবকুমারকে কেমিক্যাল সাহেবের মহানুভবতা, উদার মনুষ্যত্ব বিচলিত করে তুলল। তার দৃষ্টির মোহান্ধতা ঘুচল। শেষে নবকুমার বুঝল— ''যদি ভারতে এইরূপ দশ বিশটাও কেমিক্যাল সাহেব থাকিতেন, তাহা হইলে ইংরাজ রাজ্য আজ প্রেমরাজ্য হইয়া উঠিত।'' মনস্বিনী স্বর্ণকুমারী ইংরেজদের মধ্যে বিদগ্ধ গুণী ব্যক্তিদের স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করেন নি, সেইখানেই তাঁর মনুষ্যত্ব, তাঁর মানবপ্রেমিকতা। দেশকাল জাতি ধর্মের সঙ্কীর্ণ সীমায় তিনি মানুষকে বিচার করে তার মনুষ্যত্বের অবমাননা করেন নি। স্বর্ণকুমারীর দেশানুরাগও এই কারণে সঙ্কীর্ণতামুক্ত উদার, গভীর ভাববহ, রসদৃষ্টিতে উজ্জ্বল। স্বর্ণকুমারীর শিক্ষিত উদার জীবনদৃষ্টির পরিচয় নিবদ্ধ রয়েছে কেমিক্যাল সাহেবের চরিত্রটিতে। হত্যা, লুণ্ঠনের দায়ে অভিযুক্ত নবকুমারকে কেমিক্যাল সাহেব নিজে গিয়ে মুক্ত করে এনেছেন। জীবনের যথার্থ মনুষ্যত্ব, সার্থকতা নবকুমার উপলব্ধি করেছে নিজের জীবন দিয়ে— সে এখন সংশয়মুক্ত— তারই কথায়—

''খুন ডাকাতী যে স্বাধীনতার পথ নয়, ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু তবুও—! তবুও আমার চিত্ত প্রশান্ত হয় নাই। অধীনতাবন্ধন ছেদন করিবার আকুলতাও এখনও নিবে নাই। যদি সময় আসে, যদি কোন পথপ্রদর্শক কাম্যফললাভের উজ্জ্বলতর উৎকৃষ্টতর পথ দেখাইয়া দেন— তবে আমি যে সর্বাগ্রে জীবন-মরণ-পণে পুনরায় তাঁহার নিশানতলে গিয়া দাঁড়াইব, তাহাতে সন্দেহ নাই।''

অসংখ্য তরুণের এই উদ্দাম প্রাণশক্তি অনেক সময়ই যথার্থ নেতৃত্বের অভাবে যে দেশসেবার নামে হজুগেই বিনষ্ট হয়, সে সম্পর্কে স্বর্ণকুমারীর সহৃদয় অনুভূতি এখানে স্বতঃপ্রকাশিত। মোহান্ধতা বশত অল্পবয়সী তরুণরা দেশসেবার নামে যে বিপ্লব, হত্যা, লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয় অনেক সময়ই সে সকল কাজে তাদের প্রাণ সায় দেয় না। তবু অনিচ্ছা থাকলেও হুজুগে তারা সে সব কাজ করে। নবকুমারের অন্তর্দ্বন্দ্বে এই হুজুগ প্রিয়তার প্রতি স্বর্ণকুমারীর তীব্র কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে।

স্বর্ণকুমারীর বারোটি সরস গল্পের সঙ্কলন 'নবকাহিনী'। লেখিকা বইটি তাঁর স্বামীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। এর তিনটি গল্পে ইতিহাসের সূত্র রয়েছে। স্বর্ণকুমারীর ইতিহাস-নিষ্ঠার পিছনে ছিল সুগভীর দেশানুরাগ ও জীবনজিজ্ঞাসা। বঙ্কিম পরিমণ্ডলের প্রায় অধিকাংশ সাহিত্যিকরা বঙ্কিমের ইতিহাসকেন্দ্রিক রোমান্স রচনায় যে অল্পবিস্তর ঝুঁকেছিলেন একথা নিঃসংশয়ে বলা

যায়, যাঁদের অন্যতম প্রধান ছিলেন স্বর্ণকুমারী। স্বর্ণকুমারীর ইতিহাস আসক্তির পিছনে আর একদিকে সক্রিয় ছিল ঠাকুরবাড়ীর 'হিন্দুমেলা'র স্বদেশী হাওয়া ও নতুনদাদার প্রেরণা। স্বর্ণকুমারী জীবনরসিক শিল্পী। ইতিহাসের পাতায় মনুষ্যজীবনের বিবর্তনের কাহিনী তাই তাঁর মনকে আকর্ষণ করেছে। স্বদেশ প্রেমিক স্বর্ণকুমারী দেশের প্রাচীন গৌরব ঐতিহ্যের সন্ধানে খুঁজে ফিরেছেন ইতিহাস। এই দেশানুরাগেই তিনি দেশবাসীর সামনে রাজপুতজাতির প্রাচীন বীরত্ব গৌরব, সুমহান আত্মত্যাগ, স্বজাতি-বাৎসল্যের আদর্শ তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাস, গল্পগুলির মাধ্যমে। ইতিহাসকে যতদূর সম্ভব অবিকৃত রেখে মানুষের মহৎ আত্মত্যাগী, দেশবাৎসল্যের কাহিনীকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পগুলিতে গল্পরস অব্যাহত রেখে। এদিক দিয়ে গল্পগুলি সার্থক শিল্প রসমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

'নবকাহিনী'র প্রথম গল্প 'কুমার ভীমসিংহ', (১২৯৩ বৈশাখ, ভারতী)। দুটি পরিচ্ছেদের বড় গল্প এটি। রাজপুতজাতির আত্মত্যাগের মহান আদর্শ গল্পটিতে প্রতিফলিত হয়েছে, অবলম্বন পারিবারিক কাহিনী। রাণা রাজসিংহের হৃদয়ে অকস্মাৎ অকপট পবিত্র পুত্রস্নেহের আবির্ভাবে গল্পটি পরিপূর্ণ জীবনরস-মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। রাণা রাজসিংহ ও তাঁর পুত্রদ্বয় জয়সিংহ ভীমসিংহের উল্লেখ টডের গ্রন্থে— (Chapter XIV, p. 150, Annals and Antiquities of Rajsthan of the Central and Western Rajput States of India) রয়েছে। তারপরের কাহিনীটি স্বর্ণকুমারীর নিজস্ব। পুত্র স্নেহান্ধতাবশতঃ রাজসিংহ কনিষ্ঠপুত্র জয়সিংহকে সিংহাসনে বসাবার মনস্থ করেছেন। কুমার ভীমসিংহের মাতা রাণী কমলকুমারী এসে রাণাকে যথার্থ পিতৃ কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিলেন। দুদণ্ডের হলেও কমলকুমারীর পুত্র ভীমসিংহই বড়, পিতৃসিংহাসন তারই ন্যায্য প্রাপ্য। পুত্র স্নেহান্ধতাবশতঃ পক্ষপাত দেখিয়ে কনিষ্ঠ জয়সিংহকে সিংহাসন দিয়ে রাণা বিরাট অকর্ত্তব্য অন্যায় করতে চলেছেন। রাণীর তিরস্কারে রাজসিংহের সত্য উপলব্ধি ঘটল, নিজের ভুল, অন্যায় তিনি বুঝলেন। কিন্তু জয়সিংহকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ। এই শেষ মুহূর্তে তাকে বঞ্চিত করলে সে বিদ্রোহী হতে পারে। নিরুপায় পিতা ভীমসিংহকে ডেকে তার হাতে তুলে দিলেন শাণিত তরবারি— সে জয়সিংহকে বধ করে সিংহাসন অধিকার করে নিক। পিতৃস্নেহে আজন্মবঞ্চিত ভীমসিংহের বুভুক্ষু হৃদয় পিতৃস্নেহেব স্পর্শে কৃতার্থ হয়ে, সিংহাসনের সকল দাবী স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে রাজ্য ছেড়ে চলে গেল। রাজসিংহের পিতৃহৃদয়ের দ্বন্দ্ব চমৎকার। পিতৃস্নেহে আবাল্য বঞ্চিত বুভুক্ষু হৃদয় যুবক ভীমসিংহের অকস্মাৎ পিতৃস্নেহস্পর্শে বিমুগ্ধ হৃদয়াবেগের স্ফুরণও চিত্তাকর্ষক।

'ক্ষত্রিয় রমণী' গল্পটির (ভারতী, ১২৯৩ জ্যৈষ্ঠ) প্রতিপাদ্য রাজপুত রমণীর তেজস্বিতা, বাহুবল, দৃঢ়চিত্ততা। তিনটি পরিচ্ছেদের গল্পটিতে রোমান্সের নূতনত্বের চমক আছে। এক গ্রাম্য ক্ষত্রিয় রমণীর তেজস্বিতা, বাহুবল আকৃষ্ট করেছে রাজপুত বীর অরিসিংহকে। বাহুবলে গ্রাম্য রমণীর কাছে বার বার পরাজিত অপমানিত যুবক অরিসিংহের হৃদয়ে অনুরাগের স্ফুরণে স্বর্ণকুমারীর বিশিষ্ট বর্ণনাভঙ্গীটি লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে বর্ণনাভঙ্গী ও মনোধর্ম বিশ্লেষণে স্বর্ণকুমারীর দক্ষতা অবশ্য স্বীকার্য। গল্পটির আকস্মিক সূচনা পাঠকচিত্তে রমেশচন্দ্র দত্তের 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'অহেরিয়া'র কথা মনে পড়ায়। "ঐ বরাহ", "ছুটাও ছুটাও", "আরো

ছুটাও", "ঐ দিকে চল", "এই দিকে এস"।— মৃগয়াকারীদের শতকণ্ঠের এইরূপ চীৎকার ধ্বনি আরাবল্লিস্থ অন্ধয়া- নামক বনের দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিল, অশ্বারোহীগণের দ্রুতপদনিক্ষেপে অন্ধয়ার পার্বত্যভূমি বিদারিত হইয়া উঠিল, বরাহ প্রাণভয়ে ঊর্ধশ্বাসে, পর্বতের এধার হইতে ওধারে — বনের এদিক হইতে ওদিকে ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে বন ছাড়াইয়া ঢালুপথ দিয়া এক সুবিস্তীর্ণ ভুট্টাক্ষেত্রের মধ্যে আসিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।" বিষয়বস্তু ইতিহাসের থেকে গৃহীত হলেও স্বর্ণকুমারীর গল্পবলার ক্ষমতার পরিচয় গল্পটিতে সুস্পষ্ট। অরিসিংহের এই তেজস্বিনী স্ত্রীই বীর হাম্বীরের জননী, যে হাম্বীর বারো বছরেই বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ইতিহাসের কিম্বদন্তী হল— "According to tradition Hammir's father Arisimha married a low born Rajput woman, who was blessed with extraordinary physical strength and the issue was the hero, Hammir." (p. 326, Chapter XIII, History and Culture of the Indian People, Vol. VI, The Delhi Sultanate. May, 1960, Bharatiya Vidya Bhavan) টড এই মহিলাকে Ursi বলে উল্লেখ করেছেন (Chapter VI. p, 60)। শক্তিময়ী গ্রাম্য ক্ষত্রিয় নারীর ইতিহাস কাহিনীর এই সূত্রটিকে নিয়ে স্বর্ণকুমারী অনবদ্য গল্পরচনা করেছেন। ক্ষত্রিয়রমণীর পিতার চরিত্রে ক্ষত্রিয়ের তেজ, আত্মসম্ভ্রম বোধ উদ্ভাসিত।

'ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব, তরবারি'তে (ভারতী ১২৯৭ জ্যৈষ্ঠ) গল্পের নিপুণ কৌশলে রাজপুত জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলাই স্বর্ণকুমারীর উদ্দেশ্য। গল্পটি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ইতিহাসে রাজপুতেরা বীরত্বের জন্য খ্যাত। অশ্ব ও তরবারি তাদের প্রধান সহায়। স্ত্রীজাতিকে তারা সম্মান করে। রাজপুতের এই বীর্য, আত্মসম্ভ্রমবোধের চমৎকার স্ফুরণ হয়েছে দেবীসিংহের চরিত্রটিতে। সম্রাট সিকন্দর লোদীর (রাজ্যকাল ১৪৮৯—১৫১৭) অমাত্য আসফ খাঁ বুন্দিরাজ দেবীসিংহের মনোহর অশ্ব পাথারকে দেখে এসে সম্রাটের কাছে তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করলে সিকন্দরশাহ ঈর্ষিত হলেন। তিনি পাথারকে অধিকার করার ফন্দী আঁটলেন। দেবীসিংহকে তিনি সুকৌশলে বন্দী করলেন। কিন্তু চতুর দেবীসিংহও বুদ্ধিবলে ঘোড়া নিয়ে পলায়ন করলেন, সম্রাট সিকন্দর শাহকে বুঝিয়ে দিলেন রাজপুতেরা যে কোন অবস্থাতে স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারিকে কখনও পরিত্যাগ করে না। রাজপুতজাতির এই চারিত্রিক ঐতিহ্য গৌরবকেই প্রতিপাদ্য করে স্বর্ণকুমারী গল্পের জাল বুনেছেন।

ছটি পরিচ্ছেদের 'সন্ন্যাসিনী' গল্পে প্রেমের এক অপূর্ব মহনীয় রূপ প্রতিফলিত হয়েছে. প্রেম যখন সর্বোচ্চ স্তরে উঠে কামনাশূন্য হয়, তখন প্রেমাস্পদের জন্য আত্মবিসর্জনও করা যায়। প্রকৃত অর্থাৎ স্বার্থহীন ভালবাসা বন্ধনের সৃষ্টি করে না, তা সংসারের ও সমাজের মিথ্যা জাল থেকে মুক্ত করে মানুষকে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়ে দেয়। কুমারসিংহ ও নলিনী বাল্যবয়সের খেলার সাথী। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হল। মিবার সেনাপতি অজয়সিংহ মহবুব খাঁর গতিরোধে যাত্রা করলে কুমারসিংহ তাঁর সৈন্যদলভুক্ত হলেন। এ সংবাদে নলিনী বিরহ বেদনায় কাতর হয়ে পড়ল। একদিন কুমারের সঙ্গে রাজধানী থেকে আগত সুসজ্জিত সেনাবাহিনী দেখতে গিয়ে নলিনী কুমারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

এক অশ্বারোহীর অশ্বপদতলে পড়ে আহত হল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে সেই অপরিচিত যুবককে দেখে সে মুগ্ধ হয় ও তার প্রেমপাশে আবদ্ধ হয়। যুদ্ধে যাওয়ার সময়ে হৃদয়হীনা নারী নলিনী বাল্যসখা কুমারের কাছে অনুরোধ জানাল তার প্রণয়ী অজয়সিংহকে রক্ষা করার। যুদ্ধে অসামান্য কৃতিত্বে কুমার জয়ী হলেন, অজয়সিংহকে শত্রুকবল থেকে রক্ষা করলেন নিজে আহত হলেন। শঠ অজয়সিংহ রাজধানীতে ফিরে প্রচার করলেন তাঁর কৃতিত্বে যুদ্ধ জয়ের বার্তা। নলিনীকেও সে বিস্মৃত হল। একদিকে অজয়সিংহের শঠতা অপরদিকে কুমারসিংহের মহানুভবতা, আত্মত্যাগের আদর্শ— দুটি পরস্পর বিপরীতধর্মী মনোভাবের বিশ্লেষণে স্বর্ণকুমারী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নলিনী যখন কুমারসিংহের অকৃত্রিম প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করেছে, তখন যুদ্ধে আহত কুমারসিংহ ইহজগত ছেড়ে চলে গেছে। নলিনী সন্ন্যাসিনী হয়ে কুমারের প্রতি অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। বরবেশী অজয়সিংহের প্রত্যাশায় যখন রয়েছে নলিনী, তখনই মৃত কুমারসিংহকে বহন করে শিবিকাটির আগমন গল্পের পরিসমাপ্তিকে করুণ করে তুলেছে। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে কুমারসিংহ সত্য, আত্মত্যাগের মহান আদর্শ রেখে গেল। অজয়সিংহের শঠ চরিত্রটি বাস্তব।

একটি অনাথ অসহায় বালকের জীবনে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস নিয়ে 'প্রতিশোধ' গল্পটি লেখা। নিদারুণ কষ্টে, অনশনে কালীপ্রসাদের পিতার অকাল মৃত্যু ঘটে। পিতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করে বালক সেই রাত্রে শ্মশানেই পিতৃহন্তার প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ নিল। পিতৃহীন অনাথ কালীপ্রসাদ মন্দিরপতি দেবীপ্রসন্নর গৃহে পুত্রবৎ স্থান পেল সেই রাত্রে। তার সহৃদয়তায় পাড়াপ্রতিবেশী, পরিচিত অপরিচিত সকলেই প্রসন্ন। কিন্তু সুখের দিনেও সে তার শপথ বিস্মৃত হয় নি। সে মন্দিরে গিয়ে রোজ কালী বন্দনা করে এবং প্রতিশোধ ভিক্ষা চায়। বালক পুত্র অসুস্থ হলে দেবীপ্রসন্ন দেবীকালীর অনুগ্রহভাজন কালীপ্রসাদকে তাঁর পুত্রের জন্য দেবীকে প্রসন্ন করার অনুরোধ করলে, কালীপ্রসাদ হোম, যজ্ঞ করল,—

"অগ্নি ব্যোমভেদী শব্দে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ বিস্তার করিয়া শতমূর্তিতে ঊর্ধগামী হইল, বালক সেই অগ্নিময় মূর্তিরাশির দিকে চাহিয়া ভুলিয়া গেল যে হোম করিতেছে কেন? উদ্দীপ্ত হৃদয়ে সেই শতমূর্তি লক্ষ্য করিয়া কালীপ্রসাদ বলিয়া উঠিল, প্রতিশোধ প্রতিশোধ! শত মূর্তি যেন একত্রে তথাস্তু বলিয়া মুহূর্তে অন্তর্হিত হইল।"

বালক মারা গেল।

"পিতা শোকন্মত্ত, মাতার আর্তনাদে চতুর্দ্দিক বিদারিত, কালীপ্রসাদের হৃদয় অনুতাপ-যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত, সে ভাবিতেছে পূর্ণহৃদয়ে সে দেবীর নিকট বালকের জন্য প্রার্থনা করিতে পারে নাই সেইজন্যই এইরূপ ঘটিল।"

ভায়ের মৃত্যুতে কেঁদে কেঁদে বালিকা মেঘমালাও শয্যাশায়ী হল। শেষ সন্তানটি যখন মৃত্যুমুখে তখন দেবীপ্রসন্ন দেবীর স্বপ্নাদেশ পেলেন, মন্দিরের প্রকৃত অধিকারী স্বামী স্ত্রী ও শিশুপুত্রটিকে বঞ্চনা করার পাপেই তার এই প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাসে দেখা গেল মন্দিরের সেই প্রকৃত অধিকারীর শিশু পুত্রটি কালীপ্রসাদ ছাড়া আর কেউ নয়। কালীপ্রসাদ যখন বিদীর্ণ হৃদয়ে নিজ জীবনের বিনিময়ে তার প্রতিশোধ প্রার্থনা বিফল করার

মিনতি জানাচ্ছে দেবীর কাছে তখন মেঘমালাও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। এইভাবেই কালীপ্রসাদের প্রতিশোধের স্পৃহা দেবী পূর্ণ করলেন। এই প্রতিশোধ স্পৃহার চরম মূল্য দিল কালীপ্রসাদ দেবীর হাতের শাণিত কৃপাণ নিজ বক্ষে আমূল বসিয়ে দিয়ে। নিষ্পাপ বালকের অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসে যেভাবে সত্য হয়ে উঠেছে গল্পটির বিন্যাসে তার সুচারু রূপ দিয়েছেন স্বর্ণকুমারী। গল্পটির ট্র্যাজিক পরিণতি করুণ, মর্মবিদারী। কালীপ্রসাদের মনোজগতে পরস্পর বিপরীত ভাবের বিশ্লেষণ নিপুণ, তার ব্যথাহত হৃদয়ের যন্ত্রণা সুব্যক্ত।

চরিত্রহীন লম্পট স্বামীর হাতে পড়ে এক স্বল্পবাক্ অসহায় নিরীহ বালিকা অবস্থা গতিকে নানান বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল এই নিতান্ত সাধারণ কাহিনী 'যমুনা'' গল্পের বিষয় হয়ে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। মাতৃহীন বালিকা যমুনা স্বামীর সঙ্গে তাঁর গৃহে গিয়ে দেখল স্বামী পূর্বেই বিবাহিত, এবং পরিচয় গোপন করে তিনি তাকে বিবাহ করেছেন। স্বামীগৃহে সে রক্ষিতা ছাড়া কিছুই নয়। নারীজীবনের এই প্রবঞ্চনার কাহিনী যমুনার স্বগতোক্তিতে করুণ মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। অসহনীয় অত্যাচারে অপমানে যমুনা স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছে— আশ্রয় পেয়েছে এক সহৃদয়া নারীর কাছে যার উক্তিতে গল্পটি বিবৃত। কিন্তু সে আশ্রয় তার রইল না। স্বামী এসে আবার নিয়ে গেল তাকে। শেষে গল্পের লেখিকা নায়িকা একদিন গ্রাম প্রান্তে তার দেখা পেল সন্ন্যাসিনী রূপে। কিছুদিন পরে সেখানে দেখা গেল তার মৃতদেহ। জীবনের নিদারুণ আঘাত প্রত্যাঘাতে পর্যুদস্ত অসহায় নারীর মর্মবেদনা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে গল্পটিতে। অসহায় অবমানিত নারীত্বের বেদনার রূপায়ণে স্বর্ণকুমারীর নারীহস্তের সহৃদয় সহানুভূতির স্পর্শ লক্ষণীয়।

অন্য নারীতে আসক্ত স্বামীর অনাদরে অবমানিত নারীর মর্মবেদনা করুণভাবে ফুটে উঠেছে 'কেন' গল্পটিতে (ভারতী ১২৯৮ আষাঢ়)। নায়িকার স্বগতোক্তিতে লেখা গল্পটি চিত্তাকর্ষক। নারীর জীবনে সব থেকে বড় দুঃখ স্বামীর প্রেমের বঞ্চনা। গল্পের সূচনাতেই নায়িকার স্বগতোক্তিতে স্বর্ণকুমারী তার নিখুঁত ইঙ্গিত দিয়েছেন— ''সংসারে স্বামীর ভালবাসা যাহার নাই, তাহার আবার কিসে সুখ? কোলে সোনার পুত্তলি বৎস, কৌশল্যার মত শাশুড়ির কন্যার অধিক স্নেহ যত্ন,— তবুও মনের আগুন নেবে না।'' নায়িকার স্বামীপ্রেমের বঞ্চনার এই করুণ সুরটিই গল্পে ধ্বনিত। গল্পটিতে অলৌকিক দৈবমহিমা বাস্তব জীবনরসের উপর জয়ী হয়েছে। নায়িকা স্বামীর মন ফিরে পেয়েছে কালীর কৃপায়। দেবী মানবীর বেশে এসে স্বামী বঞ্চিতা নারীকে কৃপা করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত নায়িকার কাছে স্বামীর পরিবর্তনের রহস্যটুকু অজানা থেকে গেছে। স্বামীর প্রতি আসক্ত নারীর পরিবর্তনটুকু নারী চরিত্রের রহস্যময়তায় যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক।

শুধু নারী নয়, পুরুষের হৃদয়োদঘাটনেও স্বর্ণকুমারী যে দক্ষ ছিলেন তার নিদর্শন 'আমার জীবন' গল্পটি (ভারতী ১২৯৮ ভাদ্র)। এ গল্পে পুরুষ হৃদয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রয়েছে। স্বর্ণকুমারী যে সংসারের বিচিত্র মনুষ্য চরিত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন গল্পগুলি তার উজ্জ্বল নিদর্শন। সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় পুরুষ চিত্তের সুচারু বিশ্লেষণ লক্ষণীয়—

"তোমরা শুনিলেই আর একরকম ভাবিয়া বসিবে, কিন্তু আমি বেশ জানি সে সব কিছু নয়। দুএকবার আমারও সন্দেহ হইয়াছে বটে; কিন্তু তখনই বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি তাহা ভুল। একবার ভালবাসিলে নাকি আর একবার ভালবাসা যায়! তবে যে মৃণালিনী দেবীকে দেখিতে আমার ভাল লাগে— তাঁহার সহিত গল্প করিতে আনন্দ বোধ হয়, ইহার সহজ কারণ তাঁহাকে আমি ভালবাসি কিন্তু নিতান্ত সাদাসিধে বন্ধুতার ভালবাসা মাত্র, অন্য কিছু নহে, হইতেই পারে না,— একবার ভালবাসিলে নাকি আর একবার ভালবাসা যায়!"

গল্পের এই অনাড়ম্বর স্বচ্ছ ভাষা ও চিত্ত বিশ্লেষণের স্টাইল স্বর্ণকুমারীর নিজস্ব। সরস ভাষা নৈপুণ্যে স্ত্রীপুরুষের সহজ বন্ধুত্ব পুরুষের মনোভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে—

"তুমি যে সুন্দরি হাসিয়া বলিতেছ— "হ্যাঁ হ্যাঁ দরকার মত সকল পুরুষেরই এইরূপ মতিভ্রম ঘটে! মুড়ি খাইতে কোন কালেই তোমাদের ত্রুটি নাই, কেবল সুবিধা বুঝিয়া— তাহা মুড়ি কি চাল ভাজা এইটা বুঝিতেই ভুলিয়া যাও।"

এ কথায় আমি নাচার! কিন্তু তুমি মহাশয়া যাই বল, আমার বিশ্বাস আমি মুড়ি ও চালভাজার প্রভেদ বিলক্ষণ বুঝি,— আর বুঝিয়াই বলিতেছি, ইহা প্রেম নহে, বন্ধুতা মাত্র। সুকোমল সুদৃঢ়, বহুপুণ্যজ, পরমুপাদেয় বন্ধুতা— তবে স্ত্রী পুরুষেই এরূপ বন্ধুতা সম্ভবে; পুরুষে পুরুষে ঠিক এইরূপ বন্ধুতা হয় না! অশ্রুজলের প্রত্যাশায় অশ্রুজল বিসর্জন মমতার আকাঙ্ক্ষায় হৃদয়ের দুঃখময়দ্বার এমন কি জীবনের ঘৃণিত অংশও অসঙ্কোচে উদ্‌ঘাটন— ইহা পুরুষের মধ্যে হাস্যকর, স্ত্রীপুরুষের বন্ধুতাতেই স্বাভাবিক।"

বর্ণনাভঙ্গী ও হৃদয়ানুভূতির পরিস্ফুটণে স্বর্ণকুমারীর রীতিমত নৈপুণ্যের পরিচয় রয়েছে গল্পটিতে। গল্পবলার অনবদ্য ভঙ্গীটি কৌতূহলোদ্দীপক। যেখানে হৃদয়ের সহমর্মিতা সেখানেই অকৃত্রিম বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। তাই ডাক্তার নায়ক ও রোগিনীর মধ্যে এ ধরণের সহৃদয় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। ডাক্তার তার পূর্ব প্রণয়ের কাহিনী অকপটে বন্ধুর কাছে খুলে বলেছে। নারী বন্ধুর হৃদয়োত্তাপের স্পর্শে তার বহুদিনের রুদ্ধ হৃদয় উন্মুক্ত হয়ে গেছে আবেগে, সহমর্মিতায়। শেষ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে জানা গেছে এই মৃণালিনীই ডাক্তারের পূর্ব প্রণয়িনী। গল্পের ঘটনাবিন্যাসের কৌশলটি নিপুণ।

সাংসারিক জ্ঞানের অশুচিতাবর্জিত সরল শান্ত লজ্জাশীলা এক তরুণী সঙ্কীর্ণচিত্ত অনুদার শ্বশুরগৃহের স্নেহবঞ্চিত পরিবেশে মনোবেদনায় পীড়িত হয়ে অকালে ঝরে পড়ল— এই কাহিনী নিয়েই "লজ্জাবতী" গল্প (ভারতী ১২৯৪ আষাঢ়) লেখা। গল্পটিতে লজ্জাবতীর চরিত্র চিত্রণেলেখিকার নারী মানসের ছাপ লক্ষণীয়। লজ্জাবতীর প্রকৃতি তার শ্বশুরবাড়ীর কাছে একেবারে অবোধ্য ও অগম্য ছিল, তাই এই সরল বালিকার পদে পদে দোষ দেখত তারা। লজ্জাবতীর শ্বশুরবাড়ীর অনাদর অত্যাচারে নিপীড়িত শুষ্ক মরুভূমিতুল্য জীবনে একটুখানি স্নেহ আন্তরিকতার সজীব স্পর্শ নিয়ে এল শ্বশুরকন্যা ফুলকুমারী। ফুলকুমারী কদিনের জন্য পিতৃগৃহে এসে সুগম্ভীর সহানুভূতিতে অসহায় ভ্রাতৃবধুটিকে আপন করে নিল। এদের হৃদয়বিনিময়ের চিত্র বাস্তবনারীচিত্তের উত্তাপে জীবন্ত। গল্পের পরিণতিতে স্বভাবকুণ্ঠ সঙ্কোচশীলা

লজ্জাবতীর অকালমৃত্যুতে করুণরস ঘনীভূত হয়েছে। নিতান্ত সাধারণ এমন অনেক অজ্ঞাত অখ্যাত বাঙালীবধূই স্নেহহীন পরিবেশে নিপীড়িত হয়ে অভিমানে অকালে ঝরে যায়। গল্পটির মধ্যে সেইরকম নিতান্ত সাদাসিধে একটি বাঙালীঘরের হৃদয়হীনতার চিত্রই পরিস্ফুট হয়েছে। বাঙালী অন্তঃপুর চিত্রে স্বর্ণকুমারীর চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এক বুদ্ধিমতী সরলহৃদয়া কিশোরী বালিকার আশাভঙ্গের করুণ কাহিনী হচ্ছে 'নূতন বালা' গল্পটির বিষয়। এ গল্পটি 'গহনা' নামে ভারতীতে বের হয় ১২৯৮ সালের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায়। বাঙালী সংসারে বিবাহ ব্যাপারে আধুনিক শিক্ষিত পুত্রর সঙ্গে মাতাপিতার মতের যে প্রায়ই গরমিল হয়, এবং তার ফলভোগ করে বধূরূপে মাতাপিতার মনোনীত বালিকারা, এই গল্পে ভাবিনীর ভূমিকায় তা প্রকটিত হয়েছে। বিহারীবাবুর স্ত্রী কন্যা হেমপ্রভার মৃত্যুতে শোকে মোহ্যমান হয়ে প্রতিবেশি কন্যা ভাবিনীকে কন্যাসম গ্রহণ করলেন। তাঁর পুত্র নলিন তখন বিলেতে। পুত্র বিলেত থাকাকালে তার মতের অপেক্ষা না করে তিনি ভাবিনীকে ভাবী পুত্রবধূরূপেও মনোনীত করে রাখলেন। সরলা নিষ্পাপ অপরিণত বুদ্ধি বালিকা সেই কল্পনার রঙে দয়িতের আশায় দিন কাটাতে লাগল। ভাবী স্বামী ও দাম্পত্যজীবনের কল্পনায় কুমারী নারীর লজ্জারুণ হৃদয়ের ভাবাভিব্যক্তি চমৎকার। কিন্তু নলিন গৃহে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে গল্পের ট্র্যাজেডি ঘনীভূত হল। নলিন ভাবিনীকে বিবাহ করতে সম্মত হল না, কারণ সে বিলাতেই বিবাহ করেছে। এ ঘটনার বিষময় ফল ভোগ করতে হল নিষ্পাপ কুমারী ভাবিনীকে। অবমানিতা উপেক্ষিতা সরলহৃদয়া ভাবিনীর মনোবেদনা পাঠকচিত্তকে স্পর্শ করে। ভাবিনীর প্রতি বিহারী বাবুর স্ত্রীর অকৃত্রিম স্নেহবাৎসল্য গল্পটিকে আগাগোড়া স্নিগ্ধকারুণ্যে অভিষিক্ত করেছে। তাঁর অজ্ঞাতেই পুত্র প্রবাসে বিবাহ করেছে। পুত্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি যখন ভাবী বধুর জন্য নির্মিত বালাজোড়াটি ভাবিনীর হাতে পরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছেন নলিনকে. তখন গল্পের পাত্রপাত্রীর জীবনের করুণ ট্র্যাজেডি পাঠকের মন অভিভূত করে তোলে। মধ্যবিত্ত সংসারের অতি সাধারণ একটি ঘটনা স্বর্ণকুমারীর রচনানৈপুণ্যে এই করুণ গল্পটিতে অসামান্যতা অর্জন করেছে। অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাসে কত সুকুমার কিশোরী হৃদয়ই যে প্রতিনিয়ত এমন লাঞ্ছিত উপেক্ষিত হচ্ছে তারই একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশমাত্র লেখিকা গল্পটিতে তুলে ধরেছেন।

'চাবি চুরি' গল্পটি বন্ধুত্বের ছলে একটি পুরুষের প্রতি অপর এক পুরুষের নির্দয় প্রবঞ্চনার বাস্তব কাহিনী। সংসারে স্বার্থান্ধ কুটিল ব্যক্তিদের কাছে ভালোমানুষ সরল বিশ্বস্ত হৃদয় মানুষেরা যে কিভাবে প্রতারিত হয় তারই সহৃদয় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে গল্পটিতে। গল্পটি 'বিবাহ' নামে ভারতীতে প্রকাশিত হয় ১৩১৮ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের দুটি সংখ্যায়। সুকুমারের বিশ্বস্তহৃদয় বন্ধু অপর এক সুকুমার বা 'সুখদা'। বাল্যে সুকুমারের মাতুল প্রদত্ত একটি অতি প্রিয় জাপানী বাক্সর চাবি চুরি করে সুখদা বন্ধুর সরল হৃদয়ে যে কঠিন আঘাত দিয়েছিল তারই জের চলেছে যৌবনে। যৌবনে সুখদা বন্ধুত্বের আরও প্রতিদান দিল চক্রান্ত করে স্বদেশী আন্দোলনের মিথ্যা দায়ে সুকুমারকে জেলে পাঠিয়ে। সুকুমার যখন জেলে গেল, তার আর এক সপ্তাহ পরে তার

বিবাহের সব আয়োজন প্রস্তুত। জেল থেকে ফিরে সুকুমার যখন ভাবী শ্বশুরগৃহে উপস্থিত হল তখন দেখা গেল ঘটনাচক্রে তার ভাবীবধূর সঙ্গে বন্ধু সুখদার বিবাহ নিষ্পন্ন হয়ে গেছে। সংসার জ্ঞানহীন সরল বিশ্বাসী সুকুমার জীবনের কঠিন মূল্য দিয়ে সংসারে বিশ্বাসঘাতকতার যে অভিজ্ঞতা লাভ করল তারই করুণ চিত্র স্বর্ণকুমারী গল্পটিতে এঁকেছেন। নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের এমন কত বিচিত্র ঘটনার অভিজ্ঞতায় মনুষ্য জীবন প্রতিনিয়ত আবর্তিত হয়। সংসারজীবনের প্রতি পদক্ষেপে এই আঘাত প্রত্যাঘাতে মানুষ কখনও জয়ী হ'য়ে হাসে, কখনও পরাজয়ের নিরাশার বেদনায় ভেঙ্গে পড়ে। জীবনদ্রষ্টা শিল্পী শিল্পে সাহিত্যে তার দুএকটি চিত্র তুলে ধরেন। স্বর্ণকুমারীরও তাই সাহিত্যসম্ভারের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে ঘরোয়া সাদাসিধে মানুষের নিতান্ত সাধারণ জীবনের ছোটখাট কামনা-বাসনা আশানিরাশা সুখ দুঃখের দুএকটি স্পন্দন। এখানেই স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য শিল্প মানবজীবনের সঙ্গে দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অসামান্য শিল্পোৎকর্ষ অর্জন করেছে। তাঁর রসবোধ ও সংযম গল্পগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

স্বর্ণকুমারীর 'রক্তপিপাসু' গল্পটি 'প্রতিশোধ' নামে ১২৯৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ভারতীতে বের হয়। গল্পটি যার আত্মকথা সেই যুবকের একদিকে প্রতিশোধ স্পৃহার আগুনে জর্জরিত ও আর একদিকে প্রবল ভ্রাতৃস্নেহে বিভাবিত মনোবৃত্তির প্রতিফলন নিখুঁত। ছোটভাই সুবোধের প্রতি কান্তির অপার স্নেহ। ভাইটিকে মানুষ করে তোলাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু তার এই মহৎ উদ্দেশ্যে বাদ সাধল কালীনাথ। কালীনাথের সঙ্গে বৃথা সময় কাটিয়ে সুবোধ যখন এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় ফেল করল তখন সে আর ধৈর্য ধরতে পারল না। ভায়ের মনেও প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা জাগানোর জন্য কান্তি সুবোধের কাছে কালীনাথের পূর্ব ইতিহাস ব্যক্ত করল। কালীনাথের পিতা তাদেরই পিতার বিষয়সম্পত্তি আত্মসাৎ করে ধনী হয়েছে। কাজেই কালীনাথের প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারণ করা তাদের অকর্তব্য, অন্যায়, বরং তার প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়চিত্ত হওয়া উচিত। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, ভেবে কান্তি পরম তৃপ্তি লাভ করল যখন দেখল ভাই গোপনে 'প্রকৃত প্রতিশোধ' পড়ছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে গোপনে সুবোধের প্রতিশোধ নেওয়ার মহড়াও সে জানতে পারল। তারপর সুবোধ নিরুদ্দেশ হ'লে ভীতত্রস্ত কান্তি দেশের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হল— বুঝি বা প্রতিশোধ নিয়ে সুবোধ কালীনাথকে নৃশংসভাবে হত্যাই করে বসে, এই আশঙ্কায় বিজন গভীর অরণ্যে ভায়ের কণ্ঠের 'প্রকৃত প্রতিশোধ' শুনে ভয়ার্ত কান্তি যখন সুবোধের সম্মুখে উপস্থিত হল, তখনই গল্পের কৌতুকাবহ পরিসমাপ্তি ঘটল। দেখা গেল সুবোধ ও কালীনাথ দেশের বাড়ীতে 'প্রকৃত প্রতিশোধ' নামে যে নাটকটি অভিনীত হবে, বিজন অরণ্যে তারই মহড়া দিচ্ছে। সুবোধ বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারণ করেই পিতৃশত্রুর পুত্রর প্রতিশোধ নিয়েছে। মানবিকতার জয় ঘোষিত হয়েছে। গল্পটিতে স্বর্ণকুমারীর সাসপেন্স সৃষ্টি করার অসামান্য কুশলতার পরিচয় রয়েছে। গল্পগুলি স্বর্ণকুমারীর বিশিষ্ট রসদৃষ্টি, সূক্ষ্মবোধ ও বিশ্লেষণী শক্তির কুশলতায় নিপুণতর শিল্পসৌন্দর্য লাভ করেছে। এই আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক হবে না যে, বাংলা ছোট গল্পের লেখিকা হিসাবে স্বর্ণকুমারীর স্থান বেশ উঁচুর দিকে।

Short Stories নামে স্বর্ণকুমারীর গল্পগুলির একটি ইংরেজী অনুবাদ সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। এতে সঙ্কলিত গল্পগুলি হচ্ছে, The sorrows of a life --- (আমার জীবন), The lost key (চাবি চুরি), Immortelles from a daring hand (অমরগুচ্ছ), The new Bangles (নূতনবালা), Lajjavati or the sensitive plant (লজ্জাবতী), The Reason Why? A strange tale (কেন), The gift of Goddess Kali (প্রতিশোধ), The Sannyasini (সন্ন্যাসিনী), The Rajput prince and his steed (ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী অশ্ব তরবারি), The oath of Kumar Bhimsin (কুমার ভীমসিংহ), The genius of the place (পেনে প্রীতি), Only a Chapter (জীবন অভিনয়), Talisman (ট্যালিসম্যান), Mutiny (মিউটিনি)।

রাজকন্যা নাটক

বাংলা নাট্যসাহিত্যে নূতন যুগের সূচনা হল ১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে বাংলা নাট্যসাহিত্যে যে যুগের সূত্রপাত সে যুগের রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের (১৮৪৪—১৯১২) একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল। গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার প্রেরণা আসে অভিনয় দক্ষতা থেকে। তাঁর নাট্যরচনা তাই মূলতঃ রঙ্গালয়ের প্রয়োজনে, খেয়ালখুশির বশে নয়। বাঙলা রঙ্গমঞ্চ ও নাটককে তুচ্ছতার অগৌরব থেকে রক্ষা করে সম্মানজনক পরিণতি দিয়েছেন গিরিশচন্দ্র। পৌরাণিক নাট্যের নাট্যকার রূপেই তিনি বাঙলা দেশে অভূতপূর্ব গৌরব লাভ করেছিলেন। ভক্তিরসবহুল পৌরাণিক নাটকের দ্বারা তিনি জনচিত্তে প্রচলিত হিন্দুধর্মের আদর্শকে সুকৌশলে প্রচার করেছিলেন। তাঁর সামাজিক নাটকগুলির বিশিষ্টতা রয়েছে কলকাতার হিন্দু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের ঘটনা চিত্রণে। গিরিশচন্দ্র যেমন নাটকে নূতনত্ব এনেছিলেন অমৃতলাল বসু (১৮৫৩—১৯২৯) তেমনি প্রহসনে বৈচিত্র্য এনেছিলেন। তাঁর যশের প্রতিষ্ঠা প্রধানত প্রহসন-নক্শার উপরই। সামাজিক অনাচার ও ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রধানত অমৃতলালের বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে। সমসাময়িক কালের আর একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩—১৯১৩)। তিনি প্রধানত দেশপ্রেমোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটকের নাট্যকার রূপে খ্যাত। শেক্সপীয়র সুলভ অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে, কবিত্বময় গদ্য সংলাপ রচনায় ও নাটকীয়তা সঞ্চারে তাঁর নাটকগুলি সবই মঞ্চ সফল। ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৮৬৩—১৯২৭) সামাজিক নাট্যরচনায় দক্ষতা দেখাতে পারেননি। দেশপ্রীতিমূলক ঐতিহাসিক নাটক 'প্রতাপাদিত্য', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'আলমগীর', 'চাঁদবিবি' রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। অন্যদিকে 'আলিবাবা' ও 'কিন্নরী'র মতো নৃত্যগীত মুখর নাট্যরচনা তাঁকে যশ ও অর্থ উভয়ই এনে দিয়েছিল।

বাংলা নাটকের মোড় ঘুরেছে রবীন্দ্রনাথে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে ঘটনা-বাহুল্য বা আবেগ সঙ্কুলতা প্রধান নয়। তাঁর নাটকের বিশিষ্টতা ঘটনার সংঘাতে নয়, আদর্শের ও ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে।

নাটক, অভিনয়ের এই আবহাওয়াতেই বাঙলা নাট্যসাহিত্যজগতে— স্বর্ণকুমারীর পদার্পণ। স্বর্ণকুমারীর প্রথম নাটক 'রাজকন্যা' প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে। রবীন্দ্রনাথের তখন সাঙ্কেতিক নাটক রচনার পালা চলেছে। তাঁর সাঙ্কেতিক নাটক 'রাজা' (১৯১০), 'অচলায়তন' (১৯১১), 'ডাকঘর' (১৯১২) আত্মপ্রকাশ করেছে। নাটকগুলিতে আস্তিক্যবুদ্ধি, প্রেম, সৌন্দর্য ও মানবাত্মার জয়ের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। স্বর্ণকুমারী নাটকে অনুজ রবীন্দ্রনাথের এ ধরণের সাঙ্কেতিকতার প্রভাব একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। আবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলির (পুরুবিক্রম ১৮৭৪, সরোজিনী ১৮৭৫, অশ্রুমতী ১৮৭৯) মূল প্রেরণা ছিল দেশপ্রেম। এই দেশপ্রেম

তখনকার কলকাতার জাতীয় আন্দোলন হিন্দুমেলাকে (১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত) আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠেছিল। 'স্বর্ণকুমারী'র 'দীপনির্ব্বাণ' উপন্যাস রচনার পটভূমিকাতেও ছিল এই দেশপ্রেম। তাঁর নাটক দুটি রাজকন্যা (১৯১৩) নিবেদিতা (১৯১৭) রচনার মূল প্রেরণাও সমকালীন দেশপ্রেম। তবে তা ইতিহাসকে আশ্রয় করে নি। 'রাজকন্যা'য় তা অনেকটা রূপকথা ধর্মী, 'নিবেদিতা'য় ঘরোয়া সমাজচিত্রে তা উদ্ভাসিত। 'রাজকন্যায়' রাজকন্যা কল্যাণী রাজ্যে অপ্রেম অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। শেষপর্যন্ত তার আত্মোৎসর্গের মধ্যে দিয়ে তার পিতা রাজার দৃষ্টির অন্ধতা ঘুচেছে। সত্যকে তিনি উপলব্ধি করেছেন আত্মজাকে বিসর্জন দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকের ছায়া এ নাটকে পড়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' (১৮৭৫) নাটকের সঙ্গেও 'রাজকন্যা'র বিষয়বস্তুর একটা ক্ষীণ সাদৃশ্য দেখা যায়। 'সরোজিনী'তে ভৈরবাচার্য লক্ষ্মণসিংহকে অমাবস্যার নিশীথে দেবীমূর্তি দেখিয়ে দৈববাণী শোনায় যে, রাজকন্যাকে বলিরূপে না পেলে দেবী তৃপ্ত হবেন না। লক্ষ্মণসিংহ দ্বিধায় পড়লেন, একদিকে রাজকর্তব্য, দেশপ্রেম অপরদিকে কন্যাস্নেহ। রাজকর্তব্য ও পিতৃহৃদয়ের দ্বন্দ্বে রাজার চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'রাজকন্যা'য় কল্যাণী দেশে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে সাহায্য পেয়েছেন ভ্রাতৃসম সৈনিক ধ্রুবকুমারের। পরে ধ্রুবকুমারের মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে রাজকন্যা তার আসল পরিচয় পেলেন। ধ্রুবকুমার আর কেউই নয়, বাল্যে রাণীর ষড়যন্ত্রে নিহত না হয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিল যে রাজপুত্র, ধ্রুবকুমার তিনিই। তিনি রাজকন্যার সহোদর ভ্রাতা। এ হেন মধুর সম্পর্ককে কলুষিত ক'রে রাজার চোখে তুলে ধরেছেন রাণী হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য। রাজা রাজকন্যার আসল স্বরূপ জানতে পারলে রাণীর চক্রান্ত ব্যর্থ হতে পারে ও তাছাড়া ছিল সপত্নী কন্যা বিদ্বেষ। রাণী তাই সুকৌশলে রাজার মনে ভুল ধারণা জন্মিয়েছেন যে রাজকন্যা দেশদ্রোহী ও ধ্রুবকুমারের প্রণয়িনী। ধ্রুবকুমারের পরিচয় রাজার কাছে তখনও অজ্ঞাত। তিনি রাগে ঘৃণায় রাজকন্যার বলির নির্দেশ দিলেন। রাজকন্যার আত্মবিসর্জনের পর রাজা সব জেনেছেন। নিরুপায় পুরুষ সন্ন্যাস নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছে নিজের ভুলের। রাজার চরিত্রে রাজোচিত দার্ঢ্য, মহিমা, পুরুষত্ব সুস্পষ্ট হয় নি। সর্বোপরি রাজার চিত্তে রাজকর্তব্য ও কন্যাস্নেহের দ্বন্দ্বও প্রকট নয়। 'সরোজিনী'র ট্র্যাজিক পরিণতি অবশ্য অন্যভাবে ঘটেছে। ভৈরবাচার্য সরোজিনীকে বধ করতে প্রস্তুত হলে লক্ষ্মণসিংহের অন্যতম প্রধান সর্দার বিজয়সিংহ এসে খড়্গ কেড়ে নিলে প্রাণভয়ে ভৈরবাচার্য গণনায় ভুল স্বীকার করে বললেন যে দৈববাণীর উদ্দিষ্ট নারী রাজকুমারীই নন, রাজ্যের অধিবাসিনী যে কোনও সুন্দরী নারী। অদৃষ্টের পরিহাসে অজ্ঞাতে যে মুসলমান যুবতীকে তিনি হত্যা করলেন, পরে জানা গেল সে তাঁরই কন্যা, রোষেনারা।

স্বর্ণকুমারীর নাটকের সংখ্যা বেশী নয়, মাত্র দুটি নাটক তিনি লিখেছিলেন, 'রাজকন্যা' ও 'নিবেদিতা'। 'রাজকন্যা'-কে তিনি নাট্যোপান্যাস বলে চিহ্নিত করেছেন। এই চিহ্নীকরণের মধ্যে দিয়ে স্বর্ণকুমারী গ্রন্থটির রচনাভঙ্গীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। উপন্যাসের বর্ণনাধর্মই এর বৈশিষ্ট্য। পাত্রপাত্রীর সংলাপ, অভিনয়, চরিত্রবিকাশে এতে নাট্যরস জমেনি। নাটকীয় ঘটনা

বা আচরণের (action) মধ্যে দিয়ে চরিত্রগুলি পরিস্ফুট হয়নি। 'রাজকন্যা', 'নিবেদিতা' তাই নাটক নয়, নাট্যচিত্র। কাহিনীর সংহতির অভাব। ঘটনার আকস্মিকতা বিশেষ করে এক্ষেত্রে চোখে পড়ে।

'রাজকন্যা'য় অনেকগুলি ভালো গান রয়েছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নাচগানের মহড়ায় মেয়েদের গানটি যুবতীদের চপলচঞ্চল আনন্দের ভাবদ্যোতক। গানটি অনুপ্রাসে গীতিমাধুর্যে ছন্দোময় হয়ে উঠেছে।

" রজনী রজত মধুরা
গাও গো রঙ্গে বাজাও সঙ্গে,
রুণুঝুনু নাচি আমরা।
বাজাও সেতারা বীণ, ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিন্,
ধীরে থমকি দ্রুত চমকি
তারে তারে তারে মীরে ঝঙ্কারে অধীরা—
রুণু ঝুনু নাচি আমরা
বাজাও শারঙ্গ নীরতরঙ্গ তালে তালে তালে
মঞ্জুল বোলে মন্দিরা।"

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজকন্যার গানটিতে ঈশ্বরের কল্যাণময় অস্তিত্বে স্বর্ণকুমারীর গভীর বিশ্বাস দ্যোতিত। প্রকৃতির সৌন্দর্য মাধুর্য ঈশ্বরেরই সৃষ্টি, মানুষও তাঁরই সৃষ্টি। তবে কেন মানুষের এই অজ্ঞানতা, এত দুঃখক্লেশ—

"মধুর আকাশ মধুর রবি
মধুরূপময়ী ধরণী ছবি,
মধুর মিলনে আলোকিত সবি,
দশদিকে প্রেম পুলক বয়।
— — — —
এত সুখ ভরা এই নিকেতন
দ্যুলোক ভূলোক সুখে অচেতন
কেন পিতা তবে এ সন্তানগণ
দীন দুঃখী শুধু তোমার ঘরে!
— — — —
দিলে যদি জ্ঞান কেন তবে মোহ,
কেন ঈর্ষা দ্বেষ, দিলে যদি স্নেহ
এ আনন্দ রাজ্যে কেন প্রভু দেহ,—
এত অমঙ্গল বেদনা ক্লেশ!"

চতুর্থ দৃশ্যে মহারাণীকে সাজাতে সাজাতে সখিদের গানটিতে ছন্দের ধ্বনির চাতুর্যে সজ্জার ছন্দ ব্যঞ্জিত হয়েছে—

"কুঙ্কুম চন্দনে, অলক্ত রঞ্জনে,
সুগন্ধ উথলিত, চারু বসনে!
তারকা-বিমোহন মুকুট সুশোভন
দিগন্ত ঝলমল মণিরতনে! ইত্যাদি

'রাজকন্যা'র নাট্যরূপ হল 'দিব্যকমল' (১৯৩০)। রচনাভঙ্গী ও ভাবে দুটিতে কোন পার্থক্য নেই। 'রাজকন্যা' লেখিকা উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর দৌহিত্র, দৌহিত্রী (হিরণ্ময়ীর পুত্র কন্যা) প্রসাদকুমার ও কল্যাণীকে। উপহার পত্রে তিনি লিখেছিলেন,—

"এসো এসো ওগো প্রসাদকুমার
এসো কল্যাণি, রূপসী বালা,
শোনাব একটি করুণ কাহিনী—
ছুটে এসো কাছে রাখিয়ে খেলা।
তারো নাম ছিল কল্যাণী দেবী—
রাজার মেয়ে সে, — গরবী নয়,
রূপ তোর মত অতটা না হোক
গুণে কিন্তু সেরা বলিতে হয়।"

'দিব্যকমল' রচনা করেছিলেন স্বর্ণকুমারী শেষ বয়সে। 'দিব্যকমল' প্রকাশিত হওয়ার দুবছর পরেই তিনি পরলোকগমন করেন। শেষ বয়সে মায়ের কথাই লেখিকার মনে পড়েছে। তাই মাকে তিনি স্মরণ করেছেন 'দিব্যকমলে'র উপহার পত্রে—

"ফুটেছিল এ কমল—
মানস কনক-সরে
যতনে এনেছি তুলে
তোরে মা স্মরণ ক'রে!
যদিও নিকটে নেই
স্মৃতিপূর্ণ তোমাতেই,
একবার নেমে এস
দেখা দাও ক্ষণ তরে!"

'দিব্যকমলে'র প্রস্তাবনা অংশটি পরবর্তীকালের সংযোজন। এতে রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য সজ্জায় রাজপ্রাসাদের নাট্যশালার খুঁটিনাটি বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া আছে বাগ্‌দেবী ভারতীর একটি বন্দনা শ্লোক, যার মধ্যে সরস্বতীর বরপুত্রী স্বর্ণকুমারীর ভক্তি বিনম্র ভাবটি সমুদ্ভাসিত। তেলেগু ভাষায় 'রাজকন্যা'র অনুবাদ হয় Kalyani নামে ১৯২৭ সালে। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয় এর ইংরেজী অনুবাদটি Princess Kalyani নামে। এটির প্রকাশনার দায়িত্ব ছিল মাদ্রাজের Ganesh & Co.-র।

স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য সাধনার উৎস ছিল স্বদেশ প্রেম। উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, গানে

কবিতার বিভিন্ন দিকে তাঁর দেশাত্মবোধ উচ্ছ্বসিত হয়েছে। 'রাজকন্যা' নাটকটিরও প্রতিপাদ্য দেশাত্মবোধ, মানবপ্রেম। 'মিলন রাত্রি', 'বিচিত্রা' উপন্যাসের নায়িকার মত 'রাজকন্যা'র কল্যাণীও স্বদেশকল্যাণে আত্মউৎসর্গীকৃত। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের মতই নাটকেও দেশপ্রেম প্রাত্যহিক জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে মর্ত্যনারীর হৃদয়োত্তাপের স্পর্শ পায় নি। ঘটনার প্রতিকূলতায় ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে এ দেশপ্রেম ধূলিমাটির জীবন্ত মানবীয় নয়! তা রোমান্টিক দেশপ্রেমিকা নায়িকার ধূলিমাটির স্পর্শশূন্য আদর্শবাদেই থেকে গেছে।

'রাজকন্যা' নামকরণে যে রূপকথার ছায়া রয়েছে, চরিত্রগুলিও সে স্পর্শ বর্জিত নয়। রাজা, রাজকন্যা কল্যাণী, হাসি, লতা, পাতা, ফুল, রেণু, আলো, ছায়া প্রভৃতি কল্যাণীর সখীরা, রাজকন্যার বিমাতা রাণী, তার মন্ত্রণাদাত্রী সহচরী মাতঙ্গিনী, কল্যাণীর প্রতি বিমাতার বিদ্বেষ ইত্যাদি সবকিছুতে রূপকথার বৈশিষ্ট্য বর্তমান। সপত্নীপুত্র ধ্রুবকুমারকে বাল্যবয়সে বিমাতার হত্যা করানোর চেষ্টা, যুবক ধ্রুবকুমারের আকস্মিক আর্বিভাব, সৈনিকের পদগ্রহণ, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ ইত্যাদি কাহিনীর আগাগোড়ায় রূপকথাধর্মিতা খুবই স্পষ্ট।

রাজকন্যার আয়তনও সংক্ষিপ্ত। এতে দুটি অঙ্ক আছে। প্রথম অঙ্কে আছে পাঁচটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে আছে আটটি দৃশ্য। এই সংক্ষিপ্ত আয়তনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকীয় সম্পূর্ণতা এতে আশা করা যায় না। নাটকটি তাই নাটকীয় সম্পূর্ণতা পায়ও নি।

নিবেদিতা নাটক

স্বর্ণকুমারীর অপর নাটক 'নিবেদিতা'। একাঙ্কিকাটি সাতটি দৃশ্যে রচিত। বস্তুসংসারের গার্হস্থ্য পরিবেশে নারীর আত্মোৎসর্গের মহিমা দেখানোই লেখিকার উদ্দেশ্য। নাটকটি পুরুষ চরিত্র বর্জিত। মহিলাদের দ্বারা অভিনয় করাবার উদ্দেশ্যেই 'নিবেদিতা' বোধকরি রচিত হয়। নাটকটির চরিত্র অঙ্কণে, সংলাপ রচনায় লেখিকার নারী হস্তের স্পর্শ পাওয়া যায়। চরিত্রগুলি প্রাত্যহিক সংসারজীবন থেকে নেওয়া। তখনকার কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস বিজড়িত হৃদয়হীন সমাজ নারীচরিত্রগুলির সংলাপে উদ্ঘাটিত হয়েছে। মেয়েরাই সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মেয়েদের প্রতি কতখানি হৃদয়হীন হতে পারে তার মর্মস্পর্শী চিত্র এতে এঁকেছেন স্বর্ণকুমারী। স্বর্ণকুমারী 'নিবেদিতা' উৎসর্গ করেছেন কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবীকে।

'নিবেদিতা'র কাহিনী হল, আত্মীয়-পরিজন সখিদের মধ্যে হাসিখুশীতে দিন কাটে সুমঙ্গলার। তার স্বামী প্রবাসে। সংসারে তার একমাত্র আপনজন মা। সুমঙ্গলা আপন পর নির্বিশেষে প্রত্যেককে ভালবাসে। তার হৃদয়ে কোন সঙ্কীর্ণতার মালিন্য নেই। সুমঙ্গলার জীবনে প্রথম আঘাত এল তার স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে। তখনকার কালে বৈধব্যের সংস্কার আচরণ বজায় রাখতে গিয়ে বয়স্কা নারীরা বালিকাদের প্রতি যে কতটা কঠিন হৃদয়হীন হতে পারত তার বাস্তবচিত্র আছে নাটকটিতে। সুমঙ্গলার মা রোগগ্রস্ত, শয্যা ছেড়ে উঠতে পারে না। এই সুযোগে বৈধব্যের অজুহাতে সুমঙ্গলার প্রতি নিষ্করুণ ব্যবহার করতে লাগল তাদেরই আশ্রিতা সুমঙ্গলার মামীমা। সংসারের বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন নারীজগতে সুমঙ্গলা ব্যতিক্রম। নিজের ভালো বা স্বার্থ সে বোঝে না। মামীমা তার এই উদারতার সুযোগ নিল। নিজের মেয়ের বিয়ের দায় দেখিয়ে সুমঙ্গলার যথাসর্বস্ব সে আত্মসাৎ করল। সেই আঘাতে সুমঙ্গলার মার মৃত্যু হল। মায়েরও মৃত্যু হ'লে সংসারের সুমঙ্গলার জন্য রইল শুধু মামীমার ভর্ৎসনা লাঞ্ছনা মিথ্যা তিরস্কার। সুমঙ্গলার ট্র্যাজেডিকে বাস্তব পরিবেশে করুণভাবে ফুটিয়ে তোলার অবকাশ ছিল। তার নারী জীবনের ব্যর্থ অসহায়তা, নিঃস্বার্থ, নিপীড়িত প্রাণের সকরুণ বেদনা সংসারের দৈনন্দিন জীবনের সংঘাতে হৃদয়স্পর্শী হতে পারত। কিন্তু সে নাটকীয় পরিণতিকে সম্পূর্ণ পরিহার ক'রে স্বর্ণকুমারী নাটকের শেষে সীতার পাতাল প্রবেশের মতো ধরণীদেবীর অলৌকিক আবির্ভাব ও দৈববাণীর অবতারণা ক'রে রসাভাস ঘটিয়েছেন। এক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সুমঙ্গলার নারীত্বের সহিষ্ণুতার, আত্মোৎসর্গের আদর্শ ফুটিয়ে তোলা। নাটকটির নাটকীয় মূল্য বা শিল্পোৎকর্ষ এখানে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে। নতুবা বাঙলা সাহিত্যের সামাজিক নাটকের ইতিহাসে এটি উল্লেখযোগ্য মর্যাদা পেতে পারত।

কনেবদল

স্বর্ণকুমারীর প্রহসন দুটি 'কনেবদল' (১৯০৬) ও 'পাকচক্র' (১৯১১) স্বতন্ত্র সাহিত্য মর্যাদায় খুব উজ্জ্বল না হলেও একেবারে বিশিষ্টতাবর্জিত নয়। বাংলা প্রহসন রচনায় একটা ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন মধুসূদন দীনবন্ধু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। মধুসূদন, দীনবন্ধুর "একেই কি বলে সভ্যতা" (১৮৬০), "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" (১৮৬০), "নবীন তপস্বিনী" (১৮৬৩), "বিয়ে পাগলা বুড়ো" (১৮৬৬), "সধবার একাদশী" (১৮৬৬) ইত্যাদি বেশির ভাগ প্রহসনে নব্যপন্থী হিন্দুসমাজের ইংরেজী শিক্ষাভিমান, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ভণ্ডামি, মিশনারীদের ধর্মপ্রচার, সমাজজীবনে বিধবার বিড়ম্বনা, সতী নারীর দুর্দশা, কৌলীন্য প্রথার ভয়াবহতা ইত্যাদি নানাবিধ সামাজিক চারিত্রিক উৎকটতাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। সূক্ষ্ম উঁচুদরের কৌতুকসৃষ্টি অপেক্ষা মানবিকতার দিক নিয়ে মধুসূদন প্রহসনের একটা রূপ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। মধুসূদন যে দেশী সামগ্রী নিয়ে প্রহসন রচনার পথ দেখিয়েছেন দীনবন্ধুর প্রহসনগুলিতেও সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কারবার। বিরল আয়োজনে স্বল্প কথায় কৌতুকরস জমিয়ে তুলেছিলেন পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রহসন রচয়িতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২), 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬) ও 'অলীকবাবু' (১৯০০) প্রভৃতি প্রহসনে। 'কিঞ্চিৎ জলযোগে' কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি কটাক্ষ থাকলেও ব্যক্তিগত বিদ্রূপ বিদ্বেষের জ্বালা নেই। ঘটনা বৈচিত্র্যেই হাস্যরস জমানোর দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পর বাঙ্গলা প্রহসনে স্বকীয়তা আনলেন অমৃতলাল বসু (১৮৫৩—১৯২৯)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রহসনে যে বিশুদ্ধ সরস কৌতুক ধারাটিকে প্রবাহিত করেছিলেন অমৃতলালের রচনায় তা খানিকটা পুষ্টি লাভ করল। অমৃতলালের 'বিবাহ বিভ্রাট' (১২৯১ বঙ্গাব্দ) 'বাবু' (১৩০০) প্রভৃতি প্রহসন জাতীয় নাটকে বাঙালী চরিত্রের অনেক দুর্বলতা ও সামাজিক উৎকটতাকে নিয়ে অনাবিল হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। আক্রমণমূলক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, সংলাপ, নাটকীয় ঘটনা সংস্থাপনের নিপুণ কৌশলে তাঁর কৌতুক উপভোগ্য হয়েছে। সমাজ সংস্কার ও রাজনৈতিক আন্দোলনে কিছুটা প্রাচীনপন্থী অমৃতলাল নব্যবাংলার প্রগতিশীল আন্দোলনের বাড়াবাড়িতে রঙ্গরসের সন্ধান পেয়েছেন। একাকার (১৩০১), কালাপানি (১২৯৯) অবতার (১৩০৮) ইত্যাদি এই ধরনের প্রহসন। সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য অপর নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালও (১৮৬৩—১৯১৩) বাঙ্গলা সাহিত্যে অবতীর্ণ হন রঙ্গ ব্যঙ্গ ও প্রহসনধর্মী নাটক নিয়ে। নব্যপন্থী হিন্দুসমাজের উপর তাঁর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে 'কল্কি অবতার' (১৩০২)-এ। তাঁর 'ত্র্যহস্পর্শ' (১৩০৭) 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩০৮) 'বিরহ' (১৩০৪) ইত্যাদি প্রহসনেও কখনও কপটাচারের প্রতি ধিক্কার কখনও স্ত্রীশিক্ষা বা স্বাধীনতার প্রতি কটাক্ষ ইত্যাদি রঙ্গ ব্যঙ্গে কৌতুকরস উচ্ছ্বসিত। দ্বিজেন্দ্রলালেরও সামাজিক অসঙ্গতি বা চারিত্রিক উৎকটতা নিয়ে কৌতুকরস জমানোর প্রবণতা

লক্ষ্য করা যায়। তাঁর হাস্যরসাত্মক নাটকগুলির কৌতুকরস সৃষ্টিতে হাসির গানগুলি কিছুটা সহায়তা করেছে।

হাস্যরসাত্মক নাটকে ব্যক্তি বা সমাজকে নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গের পরিবর্তে তীক্ষ্ণ হাস্যকৌতুকের প্রাধান্য আনলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি প্রহসনে ঘটনা বা চারিত্রিক অসঙ্গতির থেকেও সংলাপের কৌতুকজনক পরিস্থিতিকে অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছেন। শেষরক্ষা বা গোড়ায় গলদ (১৮৯২), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭) ইত্যাদি হাস্যরসে সমুজ্জ্বল নাটকগুলিতে তাঁর বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বিস্ময়কর।

স্বর্ণকুমারীর প্রহসন দুটিতেও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বিদ্বেষ জ্বালা নেই। সামাজিক অসঙ্গতিগুলিকেও তিনি তীব্র আঘাত করেন নি। সূক্ষ্ম রসবোধ, ঘটনা বিন্যাসের সুকৌশল, চরিত্রগুলির হাস্যকর অসঙ্গতির মধ্যে স্বর্ণকুমারী বাঙ্গালী পারিবারিক জীবনের প্রচ্ছন্ন স্নিগ্ধ কৌতুকরসধারার উৎসমূলটিকে আবিষ্কার করেছেন। তাঁর সমসাময়িক নাট্যকার অমৃতলাল বসু বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে এইখানেই তাঁর পার্থক্য। সমাজসংস্কারকের ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেন নি। প্রহসনে তিনি আদর্শ নিয়েছিলেন অগ্রজ ও অনুজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের। তাঁর দুটি প্রহসনেই ঘটনা সাজানোর কৌশল প্রাধান্য লাভ করেছে। মার্জিত রুচির প্রসন্ন হাস্যধারায় তাঁর একটা স্বকীয়তা রয়েছে। সংলাপের মধ্যেও তাঁর বাকচাতুর্য ও বুদ্ধির দীপ্তি হাস্যরস জমিয়ে তুলেছে।

'কনেবদল' প্রহসনে শ্রীধর ও শশীর পূর্বনির্বাচিত পাত্রীসম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ললিতার কৌশলে যে কেমন করে মিলনান্তক পরিণতিতে রূপান্তরিত হল তা সুকৌশলে দেখানো হয়েছে। 'কনেবদলে'র কাহিনীটি হল এই — শশিনাথ পাকড়াশী বিলেত যাওয়ার আগে চন্দ্রাকে পছন্দ করে বিয়ের কথা দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিদেশে শিক্ষিতা স্বাধীন মেয়েদের দেখে তার আর শিক্ষিতা মেয়েতে রুচি নেই। সে চায় অল্পশিক্ষিতা কমবয়সী ঘরোয়া মেয়ে। তাই তার বন্ধু শ্রীধর যখন 'দুগ্ধপোষ্যা' মেয়ে ছেড়ে 'প্রেমালাপ' 'কোর্টসিপ' করার মত লেখাপড়া জানা বড় মেয়ে বিয়ে করতে চায় তখন সে আক্ষেপ করে—

"হায় হায়! এমন মেয়েকে তুমি ছাড়ছ? ভগবান তোমাকে এমন সৌভাগ্য দিচ্ছেন, আর তা তুমি বুঝছ না? দেখ ভাই, চাউনিতে মজা, কবিতাতে প্রেমালাপ, এসব ছেলে বয়সেই সাজে, কিন্তু ওতে পেট ভরে না, ভায়া! বিলাত গিয়ে ওসব ঢের করা গেছে। এখন আমি চাই একটি ছোট্ট মেয়ে উঠতে বললে সে উঠবে, আর বসতে বললে সে বসবে, যে আমার জন্য স্বহস্তে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রাঁধবে, আমাকে আগে খাইয়ে পাতে খাবে, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে ঘুমুবে"—

অপরদিকে শ্রীধর গড়গড়ির বৌদি ললিতা বহুদিন থেকে মাসীমাকে কথা দিয়ে রেখেছে তাঁর চোদ্দ বছরের মেয়ে মালতীর সঙ্গে দেওরের বিয়ে দেবে বলে। কিন্তু চোদ্দ বছরের 'দুগ্ধপোষ্যা' বালিকাকে বিয়ে করতে শ্রীধর রাজী নয়, কারণ তার বাসনা,—

"আমি চাই কোর্টসিপ— প্রেমালাপ, কবিতায় কবিতায় ভাব প্রকাশ, আমি চোখে চোখে চেয়ে বলব—

দেখি দেখি আবার দেখি,
দেখিবার সাধ মেটে না ত,

যত দেখি ও মুখখানি দেখিবার
সাধ বাড়ে তত!"

তাই শ্রীধর বৌদিকে মনোভাব জ্ঞাপন করে—

"এক কথায় আমি চাই, গানে গানে, প্রাণে প্রাণে মদির মিলন। ১৪/১৫ বছরের মেয়েতে এ রকম প্রেম হতেই পারে না। তুমি যদি আমার মনের মত লেখাপড়া জানা একটি বড় মেয়ে দিতে পার তবেই বিয়ের কথা বলতে এস।"

দুই বন্ধুর মনোভাবে জানা গেল, দুজনের জন্য নির্বাচিত পাত্রীদ্বয়কে বদল করে নিলে দুজনের মনঃপূত হয়। দু-বন্ধুতে পরামর্শ করে দুজনে ছদ্ম পরিচয়ে নির্বাচিত পাত্রীদের দেখতে গেল। শ্রীধর গেল শশিনাথের পরিচয়ে শিক্ষিতা বয়স্কা চন্দ্রাকে দেখতে, শশিনাথ শ্রীধরের পরিচয়ে বালিকা মালতীকে দেখতে গেল। ললিতার কৌশলে দুজনেই আসল পাত্রীর বদলে তেইশ বছরের অপরিণতবুদ্ধি ক্ষেপীকে দেখে ও তার আধো আধো কথা শুনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পূর্বনির্বাচিত কনেদের বিবাহ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। যথারীতি নির্বিঘ্নে উভয়েব বিবাহে নাটকের মিলনান্তক পরিসমাপ্তি ঘটল। নাটকটির দুটি অঙ্কের কাহিনীটি আগাগোড়া কৌতুকরসপূর্ণ ও সুরুচিসঙ্গত।

কৌতুকগান রচনায় স্বর্ণকুমারী যে পারদর্শিনী ছিলেন, 'কনেবদল' প্রহসনের হাসির গানগুলিতে তার নিদর্শন রয়েছে। সবগানগুলিই ভোলাদাদার। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের "কে গো রমণী কালবরণী", চতুর্থ দৃশ্যের "কে তোরা জামাই নিবি", দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে, "ব্রাদার হে তোমার", "তোম তোম তানা না না" শেষ দৃশ্যের "বাজা রে বাঁশরী বাজা" প্রভৃতি গানগুলি স্বর্ণকুমারীর কৌতুক গান রচনায় উজ্জ্বল নৈপুণ্যের পরিচায়ক।

বিবাহে পণপ্রথা বাঙালী সমাজের একটি বিষময় দিক। স্বর্ণকুমারীর কৌতুকগানে এই সমাজচিত্র উদ্‌ঘাটিত—

"কে তোরা জামাই নিবি, ওগো কনের মা-রা,
এনেছি নূতন বর, গুণে সেরা, ওগো গুণে সেরা।
এ নয় সাধারণ ছেলে
পাশের ভার সে বইতে নারাজ, তাই ফেল্ বি.এ. এল্ এ!
গুণের বল কি সীমা, এর নাই জমি জমা,
এ যে স্বনামধন্য, পুরুষগণ্য বিলেত ফেরা।
ওগো কনের মা'রা,
কে তোদের মেয়ে এমন কপাল জোড়া!
লাগবে না টাকাকড়ি, সোনাভরি ওজন করা,
শুধু উনিশ কি বিশ যৌতুকটি দিস্ কাগজ ভরা
ওগো কাগজ ভরা।
অমনি পরবে টোপর আপনি সে বর দেবে ধরা।"

বঙ্গীয় যুব সমাজের উগ্র পাশ্চাত্ত্য মোহও গানের কৌতুকে ধরা পড়েছে। মেয়েদের নব্য বেশ-ভূষা শিক্ষা সংস্কৃতিও স্বর্ণকুমারীর হাসির গানের খোরাক যুগিয়েছে—

"পায়ের আলতা গালে ঠোঁটে,
মল নীরব জুতার চোটে,
করে বাজে পিয়ানোতে ঠুং ঠাং ঠা!
কলিকালের এমনি মেয়ে
হার মেনে যায় বি-এ, এম-এ,
বিয়ের তক্কা কেবল ফক্কা বলিহারি যা!"

দ্বিতীয় অঙ্কে চতুর্থ দৃশ্যে চন্দ্রার "আমারো আঁখি কেন ভাসে গো জলে" গানটি গীতিধর্মী রোমান্টিক। বিরহিণী নায়িকার বেদনার ভাবটি গানের সুরে ভাষায় বিমূর্ত হয়েছে। প্রহসনের সরস চলিত ভাষার সংলাপগুলি আকর্ষণীয়, চরিত্র বিকাশের সহায়ক।

'কনেবদল' স্বর্ণকুমারী উপহার দিয়েছেন পুত্র জ্যোৎস্নানাথকে। উপহার পত্রে পুত্রের কর্মজীবন পথে জননীর আশীর্বাণী উচ্চারিত হয়েছে—

"বৎস!

কর কাজ চিরোৎসাহে, অশ্রান্ত অটল;
ধন্য কর, ধন্য হও, সাধ সুমঙ্গল।
হাসি খুশী এ কৌতুক,
ক্ষণিকের খেলাটুকু,
বিশ্রাম আরাম শুধু— শুধু নব বল।"

পাকচক্র

‘কনেবদলে’র থেকে সার্থকতর নাট্যপ্রতিভার নিদর্শন রয়েছে স্বর্ণকুমারীর ‘পাকচক্র’ (১৯১১) প্রহসনে। এখানেও ঘটনা সংস্থাপনের সুকৌশলেই হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। স্বদেশ-হিতৈষণার আবরণে ভণ্ডামি, মধ্যবিত্ত সংসারের ঘরোয়া জীবনে নারীর সঙ্কীর্ণ মেয়েলিপণা, সাংসারিক খুঁটিনাটি বিষয়ে ঘোরালো স্ত্রীবুদ্ধির কাছে বাঙালী পুরুষের অধীনতা ইত্যাদি পারিবারিক তুচ্ছ বিষয় ‘পাকচক্রে’র কৌতুকরসেব উপাদান। সাতটি দৃশ্যের একাঙ্কিকাটি স্বর্ণকুমারী শিল্পী অসিতকুমার হালদারকে ‘বিবাহযৌতুক’ হিসেবে উৎসর্গ করেছিলেন।

‘পাকচক্রে’ও ঘটনাসাজানোর বৈচিত্র্যেই হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। বিনোদের পিতা উন্নতিবিধায়িনী নামক সমাজকল্যাণ সভার প্রেসিডেন্ট। সভার সদস্য হিসেবে তিনি কাগজে কলমে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে ছেলেমেয়ের বিয়েতে টাকা নেবেন না বা দেবেন না। কিন্তু বাঙালী ঘরের দুর্বল পুরুষের যা হয়— কথায় এক কাজে আর এক, তাঁর ক্ষেত্রেও তাই হল। কথায় কাজে সামঞ্জস্য রাখতে তিনিও পারলেন না। তাঁর মেয়ে দুটি অকালেই মারা গিয়েছিল। সুতরাং টাকা বা পণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সেক্ষেত্রে তাঁকে আর ভাঙ্গতে হল না। কিন্তু ছেলের বিয়েতে ঘটনাচক্রে তাঁর আর সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সম্ভব হল না। হরিবাবুর কাছে বিশেষ প্রয়োজনে একসময় তাঁর পাঁচ হাজার টাকা ধার হয়েছিল। হরিবাবুর মেয়েকে পুত্রবধূ করলে তাঁর এই পাঁচহাজার টাকা আর শোধ দিতে হয় না, বরং আরও পাঁচ হাজার টাকা তাঁর ঘরে আসে। এমন লোভনীয় শর্তে রাজী না হওয়ার মত বে-হিসেবী নির্বোধ তিনি নন। স্বামীর টাকা ধার নেওয়ার কথা স্ত্রী জানেন না, তিনি চান নগদ দশ হাজার টাকা হাতে নাতে পেতে। স্বামী স্ত্রীতে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। গৃহকলহের সমাধান করল প্রখর বুদ্ধিমান চন্দ্রকান্ত। চন্দ্রকান্ত বিনোদের পিতার বিশেষ স্নেহ ও বিশ্বাসভাজন। তার পরামর্শে বিনোদ গিন্নীর বিশেষ স্নেহভাজন শশিমুখীর সঙ্গে প্রেমের ছলনা করতে লাগল। শশিমুখী গিন্নীর "বোনের সইয়ের পাতান মেয়ে". তাছাড়া শশিমুখী সংসারে গিন্নীর ডানহাত। পুত্রের এ হেন মতিভ্রমে বিনোদের পিতা রুষ্টতার ভাণ দেখালেন গিন্নীর উপর, কারণ শশিমুখী না থাকলে পুত্রের এ হেন মতিভ্রম ঘটত না। গিন্নী কর্তার ক্রোধকে সত্য জ্ঞান করে ভীত হলেও মনে মনে খুশি হলেন শশিমুখীকে পুত্রবধূ করার আশায়। শেষপর্যন্ত সমস্যার সমাধান ঘটেছে, চন্দ্রকান্ত শশিমুখী, বিনোদ হরিবাবুর মেয়ের বিয়ের মধুর মিলনান্তক পরিসমাপ্তিতে।

বুদ্ধিদীপ্ত তারুণ্যের পরিচয় রয়েছে চন্দ্রকান্ত চরিত্রে। তার বুদ্ধিতেই নাটকের পাত্রপাত্রীরা পরিচালিত হয়েছে। বিনোদের পিতা পুরুষত্ব বর্জিত। তখনকার কালের দুর্বল ব্যক্তিত্ব বাঙালী পুরুষের প্রতিনিধি তিনি। চরিত্রটিতে তখনকার বাঙালীদের মধ্যে যে দেশহিতৈষণা সমাজ

সংস্কারের উচ্ছ্বাস জেগেছিল, তার প্রতি স্নিগ্ধ কটাক্ষ রয়েছে স্বর্ণকুমারীর। সংসারের নারীর অধীনতাপাশকে এরা কাটিয়ে উঠতে পারেন না। নিজ মতে চলার সামান্য বুদ্ধি বা পুরুষত্বটুকু থেকেও এঁরা বঞ্চিত। সাধারণ বাঙালী পরিবারের তুচ্ছ এই চারিত্রিক বিশিষ্টতাটুকু নিয়ে স্বর্ণকুমারী কৌতুকরস জমিয়েছেন। গিন্নীর কাছে কাজ আদায়ের জন্য তাঁর স্তাবকতাটুকু সরস চিত্তাকর্ষক—

—"গিন্নী আমার সোনামনি গিন্নী আমার ধন
গিন্নী নইলে কে বুঝবে এ হৃদয় বেদন।"

আরও— "তুমি আমার তালুক মুলুক তুমি টাকার তোড়া
তুমি চেলি বারাণসী তুমি শালের জোড়া।"

প্রহসনের ঘটকী চরিত্রটি সজীব। তার সংলাপে স্বর্ণকুমারীর হাস্যরস জমিয়ে তোলার অসামান্য প্রচেষ্টাটুকু অভিনব। সম্বল শুধু ঘটকীর বিদ্যা বা ভাষাজ্ঞান। উদাহরণস্বরূপ—

"হা হা ছড়া! একটু অশ্লীব দোষ ঘটলো যে! শ্লোক— বুঝলেন, ছড়া নয়। আর পণ্ডিত কথাটাও ভুল— পণ্ডিতের স্ত্রীলিঙ্গ পণ্ডিতানী, যেমন মাতুলানী।"

"তা বলছি। জানেন, মেয়ে আছে চার রকম; — বিদ্বসী, রূপসী, ধনাবতী ও গুণাবতী। সচরাচর সকলে ব'লে থাকে বটে, ধনবতী গুণবতী, কিন্তু সেটা ভুল, ধন শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ধনা, আর গুণ শব্দে গুণা— অতএব ধনাবতী ও গুণাবতী,"

ঘটকীর "কে তোরা জামাই নিবি" এবং "আমি কি যেমন তেমন ঘটকী" গান দুটি চরিত্রোপযোগী হাস্যরসোদ্রেককারী। বাঙালী সমাজে বিবাহ রীতিতে ঘটকপ্রথা বহুদিনের সংস্কার। সেই সামাজিক প্রথা নিয়ে কৌতুক স্বর্ণকুমারীর হাসির গানে উচ্ছ্বসিত হয়েছে—

"বেশী কথা কি কব আর
ভবে করি যাত্রী পার,
আমি কাণ্ডারী
ছেলে, মেয়ে মা বাপেরা
পার হ'তে চাও যারা যারা
আঁচল ধরে দাঁড়াও তারা,
আমি নহি ত সামান্যি।"

গৃহিনীর ভূমিকাটিতে স্বর্ণকুমারীর গার্হস্থ্যজীবনের বাস্তব নারীচরিত্র অঙ্কনে দক্ষতার পরিচয় সুস্পষ্ট। সুখ, দুঃখ, লোভ, দ্বেষ, ঈর্ষা সব কিছু নিয়ে বাঙালী ঘরোয়া মেয়েদের জীবন কাটে। হাস্যরসিক যিনি তিনি সেই প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি তুচ্ছতা সঙ্কীর্ণতা থেকে হাসির খোরাকটুকু সংগ্রহ করে নেন। সেইখানেই হাস্যরসিকের জীবন রস রসিকতা। প্রতিদিনকার এই তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা নিয়েই মানুষের জীবন। এই জীবনকেই শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মে ফুটিয়ে তোলেন মনের মাধুরী মিশিয়ে। স্বর্ণকুমারী ছিলেন জীবনরসিক শিল্পী। মানুষের জীবনকে তিনি দেখেছেন

গভীর ভালবাসা সহানুভূতি সহমর্মিতা দিয়ে। সেই সহমর্মিতাতেই জীবনদ্রষ্টা শিল্পী সমাজমানুষের জীবনের খুঁটিনাটি বিসদৃশতাকে, অসঙ্গতিকে দেখেছেন কৌতুক দৃষ্টি দিয়ে।

শশিমুখী চরিত্রও স্বর্ণকুমারীর নারীচরিত্র অভিজ্ঞতার আর একটি পরিচয়। সাংসারিক বুদ্ধি তার গৃহিণীর থেকে অনেক বেশি। বুদ্ধির চাতুর্যে সে সংসারের সবাইকে খুশি রেখে চলে— প্রহসনে তার এই চরিত্রবৈশিষ্ট্যটুকু ফুটেছে ভাল। সূক্ষ্ম বর্ণনা কৌশলে নাট্যকার শশিমুখীর নারীত্বের বিকাশ দেখিয়েছেন। প্রথম দৃশ্যে যুবক বিনোদ পিসির কাছে বিবাহের স্বাভাবিক বাসনা গোপনে ব্যক্ত করেছে। শশিমুখী এসে উপস্থিত হ'লে বিনোদ প্রস্থান করেছে। শশিমুখী জানতে চাইল, "দাদাবাবু কি বলছিলেন"— নারীর সহজাত কৌতূহলেরই অভিব্যক্তি। বরদা ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ বাসনা ব্যক্ত করল :

"দাদাবাবু আর কি বলবে— এই হরিবাবু ভদ্রলোক, মেয়ে নিয়ে সাধাসাধি করছে, অমন সুন্দর মেয়ে, ছেলেরও অত মন, তা বৌদিদির যে কেন মন উঠছে না, এইটেই আশ্চর্য্য!

মেয়ে কেমন, তাওত দেখতে হবে! অমন সুন্দর শতকে একটা মেলা দায়!"

নারীর স্বভাবের সহজাত বৈশিষ্ট্য অন্য নারীর রূপের প্রশংসা সইতে পারে না। এই সাধারণ মনস্তত্ত্বটুকু শশিমুখীর অভিব্যক্তিতে সহজভাবে ফুটে উঠেছে—

শশি— "(পান ধুইবার জলপাত্রের দিকে চাহিয়া ভ্রূভঙ্গি সহকারে) দাদাবাবুর যে কি নজর! সুন্দর অমন ঢের ঢের আছে।"

'পাকচক্রে' কৌতুককর সঙ্গীতরচনায় স্বর্ণকুমারীর পারদর্শিতার পরিচয় সুস্পষ্ট। হাসির গানগুলি কৌতুকরসকে জমিয়ে তুলেছে। নিদর্শন স্বরূপ ৫ম দৃশ্যে কর্তার গানটি। গিন্নীর অভিমানের আর হদিশ তিনি পাচ্ছেন না। তখন পত্নীর উদ্দেশ্য তাঁর গান—

"কোথা তুমি প্রাণেশ্বরি!
ঘোর— বিরহ— তুফান— গরজে কামান—
অভয় কর দান— কর্ণে ধরি!
দোষ ক'রে থাকি রোষ ভুলে যাও,
গজেন্দ্র চরণে স্থান তবু দাও—
দীন অভাজনে বারেক ফিরে চাও,
অন্তিমে কাতরে স্মরি।
এস— ভ্রূকুটি লোচনে— প্রাণ চমকিয়া
এস— প্রখর বচনে কান মুখরিয়া
এস— নিম— অধরে ভীম হাসিয়া
দেখি দুনয়ন ভরি।"

ঘটনা সাজানোর কৌশলে, পরিবেশ সৃষ্টিতে, চরিত্রচিত্রণে, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপে নাটকীয়তা 'পাকচক্রে'র কৌতুকরস 'কনেবদল' অপেক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত।

বসন্তোৎসব

সমসাময়িক গীতাভিনয় বা গীতিনাট্য সাহিত্যে স্বর্ণকুমারীর 'বসন্ত উৎসব' (১৮৭৯) গীতিনাটকটির বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী থেকে প্রকাশিত এটিই প্রথম গীতিনাটক। ইউরোপীয় অপেরার আদর্শ অনুসরণে বাংলার গীতিনাট্য উনিশ শতকের শেষদিকে নুতনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইউরোপীয় ও ভারতীয় দুই ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যাপক প্রচেষ্টার ফল এই গীতিনাট্যগুলি। বাংলা সাহিত্যের এই ধারাটি গীতাভিনয়, অপেরা, নাট্যবাসক ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "বাঙ্গলা গীতিকা" বা গীতিনাট্যের মূলে ইংরেজি অপেরার ছায়া যতটা না থাক যাত্রার প্রভাবই বেশি। - - - - গীতাভিনয় বা আধুনিক যাত্রার মূলে পাঁচালীর প্রভাবও কম নয়। এই প্রভাব আছে আখ্যানবস্তুতে আর গানের সুরে।"[১] সমসাময়িক অশ্লীল রুচি এগুলিতে যথেষ্ট ছায়াপাত করে। গীতিনাট্যগুলির উপজীব্য ছিল যাত্রার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে ছিল থিয়েটারের প্রয়োগকলা।

কলকাতার ইউরোপীয় সঙ্গীতসমাজে ইতালীয় ও জার্মাণ দেশীয়দেরও যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ধনী অভিজাত বাঙালীদের উপর এদের গানবাজনা থিয়েটারের রীতিমত প্রভাব পড়েছিল। এই উৎসাহী বাঙালীদের মধ্যে ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর, জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুর।

বাঙ্গলাদেশে বাঙালীদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের অনুশীলন ও চর্চা শুরু হয় ঠাকুর পরিবারেই। দ্বারকানাথের জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনায় ইউরোপীয় সঙ্গীত নিষ্ঠার পরিচয় রয়েছে। বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ী 'বেলগাছিয়া ভিলা'তে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে দ্বারকানাথ সপারিষদ বড়লাটকে নিমন্ত্রণ করেন। সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য সেদিন সেখানে কলকাতার সেরা ইউরোপীয় গাইয়ে বাজিয়ের দল এসেছিলেন। ফরাসী অপেরার বহু অভিনেতা অভিনেত্রীরা সেদিন এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। বিলেত যাওয়ার সময়ে দ্বারকানাথের নিত্যসঙ্গীদের মধ্যে যে একজন জার্মান মিউজিশিয়ানও ছিলেন, সে তাঁর প্রাণের গভীর সঙ্গীত অনুরাগেরই পরিচায়ক। ইংরেজদের 'দি চৌরঙ্গী' নামক অ্যামেচার অভিনয় সংস্থার পরিচালকমণ্ডলীতে দ্বারকানাথ যে ১৮১৩ থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ বাইশ বছর ধরে সদস্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাও তাঁর গানবাজনা অভিনয় প্রীতিরই নিদর্শন। থিয়েটারটি পরে যখন ঋণের দায়ে বন্ধ হবার উপক্রম হয় তখন দ্বারকানাথই তিরিশ হাজারের উপর টাকায় নিলাম থেকে ডেকে নিয়ে থিয়েটারটিকে বাঁচিয়ে দেন।[২]

দ্বারকানাথের এই ইউরোপীয় সঙ্গীত নিষ্ঠা, গানবাজনা অভিনয় প্রীতি সক্রিয়ভাবে পুরুষানুক্রমে পেয়েছিলেন তাঁর পুত্র, পৌত্র, পৌত্রীরা। দেবেন্দ্রনাথ নিজে সাহেব মাষ্টারের

কাছে ইংরেজী প্রথায় পিয়ানো শিখতেন প্রথম যৌবনে। তিনি বিলাতী যন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন বলেই ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা প্রণালী নূতন করে প্রবর্তিত হবার পর কোন এক সময়ে সমাজে ব্রহ্মসঙ্গীতের সঙ্গে একর্ডিয়ান ব্যবহার কবার রেওয়াজ হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ পিয়ানো বাজাতেন, বাঁশী বাজাতেন। পরে তিনি হারমোনিয়াম বাজাতেন এবং গানের সুর নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন। হেমেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ছেলেমেয়েদের দেশী বিদেশী যন্ত্র ও সঙ্গীতশিক্ষা ভালভাবেই দিয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানো, বেহালা হারমোনিয়াম, অর্গান বাজাতেন।[৩] আধুনিক বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গীত নাটক অভিনয়ের ইতিহাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রযত্ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিকাশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আনুকূল্য অনেকখানি সহযোগিতা করেছে। জোড়াসাঁকোর বাড়ীর তেতলার ছাদের মনোরম পরিবেশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কাদম্বরী দেবী, অক্ষয় চৌধুরীকে কেন্দ্র করে যে সঙ্গীত সংস্কৃতিচর্চার আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল, সেখানেই বালক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত প্রতিভা মুকুলিত হয়। জানকীনাথ বিলেত যাওয়ার পর স্বর্ণকুমারীও এলেন এই আসরে। নতুনদাদার সুরে স্বর্ণকুমারীও মাঝে মাঝে গান রচনা করতেন। এ কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন— "ভগিনী স্বর্ণকুমারী আমাদের বাড়ীতে বাস কবিতে আসায় সাহিত্যচর্চায় আমরা তাঁহাকেও আমাদের আর একজন যোগ্য সঙ্গীরূপে পাইলাম।" তিনি আরও লিখেছেন,— "স্বর্ণকুমারীও অনেক সময়ে আমার রচিত সুরে গান প্রস্তুত করিতেন।"[৪] শুধু গানবাজনায় নয়, নাটক রচনা অভিনয়েও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছিল অদম্য উৎসাহ। তিনি দুই ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথকে নিয়ে জোড়াসাঁকোয় একটি সখের নাট্য সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন। এঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথও ছিলেন। জোড়াসাঁকোর সখের নাট্যসম্প্রদায়ের অভিনয় শিক্ষক ছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের ভাই কৃষ্ণবিহারী সেন। নাটকের কনসার্টের গৎ রচনা করে দিতেন বিষ্ণু চক্রবর্তী।[৫]

সঙ্গীত নাটক চর্চার এই আবহাওয়ায় স্বর্ণকুমারীর দীর্ঘ কাল কেটেছে। পিতামহ ও পিতার কাছ থেকে তিনি জন্মসূত্রে পেয়েছিলেন গভীর সঙ্গীত প্রীতি। স্বর্ণকুমারীর সহজাত সঙ্গীতানুরাগকে বিকশিত হতে আনুকূল্য করেছিল ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গীতময় আবহাওয়া। এছাড়া ছিল নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রেরণা। এর মিলিত ফলশ্রুতি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী থেকে প্রকাশিত প্রথম গীতিনাটক স্বর্ণকুমারীর 'বসন্ত উৎসব'।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রঙ্গমঞ্চে নাটকের অভিনয় শহরবাসীকে মুগ্ধ করেছিল এবং পাড়ায় পাড়ায় সখের থিয়েটার গড়তে প্রেরণা যোগাচ্ছিল। "শখের দলে তখনকার সুপরিচিত নাটকগুলিই কাটছাঁট করিয়া এবং অতিরিক্ত গান যোগ করিয়া অভিনীত হইত।"[৬] এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামনারায়ণের "রত্নাবলী" অবলম্বনে হরিমোহন রায়ের 'রত্নাবলী গীতাভিনয়', অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শকুন্তলা গীতাভিনয়' (১৮৬৫), পূর্ণচন্দ্র শর্মার 'শ্রীবৎসরাজার উপাখ্যান' (১৮৬৬) তিনকড়ি ঘোষালের 'সাবিত্রী সত্যবান গীতাভিনয়' (১৮৬৭) নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মালতী মাধব' (১৮৭০), ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের মৈথিলীমিলন (১৮৭১), মানভিক্ষা (১৮৭৫), নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সতী কি কলংকিনী (১৮৭৪), পারিজাত হরণ

(১৮৭৫), অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'আদর্শ সতী' (১৮৭৬), গিরিশচন্দ্র ঘোষের গীতিনাটক 'আগমনী' (১৮৭৭) 'অকাল বোধন' (১৮৭৭), 'দোললীলা' (১৮৭৮) ইত্যাদি। গীতিনাট্যের আঙ্গিক সম্বন্ধে ধারণা তখনো সুস্পষ্ট নয়। এ সময়কার গীতিনাট্যগুলির সংলাপ গদ্যে রচিত হত, এবং সে সংলাপও কথ্য রীতিকে অনুসরণ করত। মাঝে মাঝে এগুলিতে গান আছে। অধিকাংশ গীতিনাট্যেই সুবিধে মত সস্তা হালকা পরিহাস রয়েছে। নায়ক নায়িকা ছাড়া একদল সহচরী রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা নিম্নরুচির আশ্রয় হয়েছে। এধরণের রুচি সে যুগের সমাজচিত্রেরই প্রতিফলন। অবশ্য উক্ত গীতিনাট্যগুলিতে উচ্চাঙ্গের রাগরাগিনীর পরিচয় আছে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ, (১৮৪৪—১৯১২) অমৃতলাল বসু প্রমুখ নাট্যকারগণ বিদেশাগত পেশাদারী নাটক ও অপেরার দলের অভিনয় দেখে থিয়েটারের পেশাদারী দল গঠনে উৎসাহী হন। এই সঙ্গে সঙ্গে শখের থিয়েটারের যুগের অবসান হয়। পেশাদারী দলের 'ন্যাশনাল থিয়েটার' (১৮৭২ সালে স্থাপিত) রঙ্গমঞ্চেই ইতালীয় অপেরার আদর্শে বাংলা ভাষার প্রথম গীতিনাটক 'কামিনীকুঞ্জ' (রচয়িতা গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রচনাকাল ১৮৭৯) অভিনীত হয়। ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ৯ই মাঘের সংবাদ প্রভাকরে একটি বিবৃতিতে এই ধরণের অভিনয়ের জন্য থিয়েটার কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে। ... "অধ্যক্ষগণ গীতাভিনয়ে সংসারের এবং তৎসহ সাধারণ দর্শকমণ্ডলের রুচি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমরা চরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। গত কয় বর্ষ ধরিয়া জাতীয় নাট্যশালায় 'সংস্কৃত যাত্রা' যাহা অপেরা নামে অভিনীত হইয়া আসিয়াছে, অধ্যক্ষগণ এক্ষণে তৎপরিবর্তে প্রকৃত গীতাভিনয় প্রদর্শন জন্য অগ্রসর হইয়াছেন।" গীতিনাট্যের আঙ্গিক সম্বন্ধে বলা হয়েছে "পেশাদার যাত্রায় যেমন দুই একটি কথা এবং তৎপরেই গান থাকে, এতদিন সেই প্রণালীর অপেরা বা যাত্রা অভিনীত হইতেছিল; অধ্যক্ষসমাজ এক্ষণে ইটালিয়ান অপেরার ন্যায় আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সমস্তই সঙ্গীত দ্বারা উত্তর প্রত্যুত্তর, স্বগত বিলাপযুক্ত প্রকৃত গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতেছেন।" স্বর্ণকুমারীর 'বসন্ত উৎসব' গীতিনাটকটির সৃষ্টির পিছনে 'কামিনীকুঞ্জ'র প্রভাব আছে বলে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, "অনুমান করি ঠাকুরবাড়ীর যুবকেরাও নিশ্চয়ই বাংলাভাষার নতুন ধরণের এই অপেরাটি দেখে খুশি হয়েছিলেন এবং সেই খুশির ফলেই 'বসন্ত উৎসব' অপেরা বা গীতিনাটকটির জন্ম!"[৭]

১৮৭৯ সালে 'বসন্ত উৎসব' প্রকাশিত হবার পর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে 'বিদ্বজ্জন সমাগম' সভায় সমাগত অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে এটি অভিনীত হয়. জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে 'বিদ্বজ্জন সমাগম' নামে বার্ষিক সম্মিলনের সূচনা হয় ১৮৭৪ সনের ১৮ই এপ্রিল (১২৮১, ৬ই বৈশাখ)। এই অনুষ্ঠানে সাহিত্যিকদের সম্মিলন হত। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিদ্বজ্জন-সমাগম উপর্য্যুপরি কয়েক বছর ঠাকুর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মিলনে ১৮৭৭ সনের অধিবেশনে অভিনীত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসন, ১৮৮২ সনের অধিবেশনে অভিনীত হয় রবীন্দ্রনাথের 'কালমৃগয়া'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' গীতিনাটিকা ১৮৮০ সালে ও 'হঠাৎ নবাব' প্রহসন ১৮৮৪ সালে অভিনীত হয়েছিল।[৮] 'বসন্ত উৎসবে'র অভিনয় যখন হয়

তখন রবীন্দ্রনাথ মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে বিলেতে রয়েছেন। এ প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা সরলা দেবী স্মৃতিচিত্রে লিখেছেন : "রবীন্দ্রনাথের বিলাত নিবাস কালেই আমার মায়ের রচিত 'বসন্তোৎসব' গীতিনাট্যের অভিনয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সঙ্গীতের এই মহাহিল্লোলে হিল্লোলিত হয়ে উঠেছিল বাড়ি তখন।"[৯]

রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকেফিরবার (১৮৮০ ফেব্রুয়ারী) পর দ্বিতীয়বার 'বসন্ত উৎসবে'র অভিনয় হয় জোড়াসাঁকোর রঙ্গমঞ্চে। স্বর্ণকুমারীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী লিখেছেন, "জোড়াসাঁকো হইতে কাব্যনাট্যের সৃজন প্রথম এই 'বসন্ত উৎসবে'ই। ইংলণ্ডে বইখানি পড়িয়া রবিমামা মাকে যে আনন্দপূর্ণ পত্র লেখেন, বড়ই দুঃখের বিষয়, সে পত্রখানি মা আর রাখেন নাই। রবিমামা বিলাত হইতে বাড়ি ফিরবার পর আমাদের অন্তঃপুরে 'বসন্ত উৎসবে'র অভিনয় হইয়াছিল।"[১০] ইন্দিরা দেবীরও স্মৃতিচারণা রয়েছে, "স্বর্ণ পিসিমার গীতিনাট্য 'বসন্ত উৎসবে'র সঙ্গেও আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতি জড়িত। তার গোড়ার দিকের গান 'ধর লো ধর্ লো ডালা এই যে কামিনী ফুল' এখনও কানে বাজে।" নাটকটির অভিনয়ে কিরণ ও কুমার চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। লীলা সেজেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী। নাটকটি পরে সখি সমিতির পক্ষ থেকে কোন·বাগানবাড়ীতে অভিনীত হয়। সে অভিনয় প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী লিখেছেন, "যদিও সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল, কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে তাঁদের সাহায্য ছাড়া আমাদের পক্ষে স্টেজ বাঁধা সম্ভব ছিল না। এই নাটকে সুরেন আর জ্যোৎস্না দাদা আমাদের প্রধান সহকারী ছিলেন।"[১১] এ প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর "সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে লিখেছেন— "সঙ্গীত সমাজে মেঘনাদ বধ আনন্দমঠ ও মৃণালিনী প্রভৃতি নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহাদের সহোদরা স্বর্ণকুমারী দেবীর নাটকাবলীও মঞ্চস্থ করা হত"।[১২]

'বসন্ত উৎসবে'র পরের বছর অর্থাৎ ১৮৮০ সালে বার হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গীতিনাট্য 'মানময়ী'। জোড়াসাঁকো থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় গীতিনাট্য। রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' প্রকাশিত হয় এর পরের বছর (১৮৮১ সালে)। তাই গীতিনাট্য রচনায় স্বর্ণকুমারী দেবীর কৃতিত্ব কম নয়। এমন কি সাহিত্য সঙ্গীত রচনায় যে নতুনদাদার দ্বারা স্বর্ণকুমারী সবিশেষ প্রভাবিত, গীতিনাট্য রচনায় সেই প্রতিভাবান অগ্রজেরও তিনি পূর্ববর্তিনী।

'বসন্ত উৎসব' উন্নত রুচির পরিচায়ক। সমসাময়িক গীতিনাট্য সাহিত্যে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য নিয়ে 'বসন্ত উৎসবে'র আবির্ভাব। আখ্যান পরিকল্পনায়, কাহিনীবিন্যাসে, চরিত্রচিত্রণে, সর্বোপরি গীতিঝঙ্কারে ও মাধুর্যে 'বসন্ত উৎসবে'র স্বকীয়তা অবশ্য স্বীকার্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' বিষয়বস্তুতে প্রচলিত পৌরাণিক আখ্যানেরই অনুসরণ করেছে। ইন্দ্রের উপর উর্বশী মান করলে মদনদেব সে মান ভাঙিয়েছে। বসন্ত তখন মদনদেবের ফুলবান হরণ করেছেন, তারপর বসন্ত মদনদেবকে মদ্যপান করিয়ে তাঁর ফুলধনু তাঁরই প্রতি নিক্ষেপ করেছেন। উর্বশীর প্রেমে তখন মুগ্ধ হয়েছেন মদনদেব। তখন বসন্ত চক্রান্ত করে রতিকে মদনদেবের এই প্রেমোন্মত্ত অবস্থা দেখিয়েছেন। রতি ক্ষুব্ধ হ'লে মদনদেব মার্জনা চেয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী'তে

কাহিনীর এই সুরুচিকর কৌতুকরসটুকু পরিবেশন নৈপুণ্যে উপভোগ্য হয়েছে। 'বসন্ত উৎসবে' স্বর্ণকুমারী পৌরাণিক আখ্যায়িকার গতানুগতিক অনুসরণ করেন নি। বরং এতে আগাগোড়া একটি বিষাদমধুর রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী রয়েছে। কাহিনীতে গাথাকাব্যের রোমান্টিক আখ্যানের ছায়াপাত ঘটেছে।

'বসন্ত উৎসব' ও 'মানময়ী' দুটি গীতিনাট্যেই দুটি ক'রে অঙ্ক রয়েছে। 'বসন্ত উৎসবে' অঙ্কগুলির গর্ভাঙ্ক রয়েছে— প্রথম অঙ্কে তিনটি, দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি। 'মানময়ী'র থেকে 'বসন্ত উৎসবে' চরিত্র আছে অনেক বেশি। 'মানময়ী'তে উর্বশী, বসন্ত, মদন ও রতির চারটি চরিত্র রয়েছে। তা ছাড়া আছে সখিরা। 'বসন্ত উৎসবে' রয়েছে চারটি প্রধান চরিত্র— লীলাবতী ও শোভাময়ী এবং তাদের প্রণয়ীদ্বয় কিরণ ও কুমার। এছাড়া আছে শোভাময়ীর দুই সখি ইন্দু, উষা, মায়াদেবীর মন্দিরের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্না যোগিনী উদাসিনী, এবং প্রণয়ের বিভিন্ন দেবদেবী রতি, মদন, বসন্ত ও কবিতা, সঙ্গীত।

বসন্তের উৎসবে সখিদের শোভাময়ীকে ফুলসজ্জায় সাজাবার আনন্দোচ্ছল আয়োজনে গীতিনাটকটির সূত্রপাত। এই আনন্দের মুহূর্তে শোভাময়ীর মনে পড়েছে সখি লীলাবতীর কথা। তিনি তখন গেছেন লীলাবতীর অন্বেষণে। গিয়ে তিনি দেখলেন লীলাবতী প্রণয়াস্পদ কুমারের প্রত্যাখ্যানের আঘাতে বেদনায় ম্রিয়মাণ। সখির বেদনায় সমব্যথী হয়ে শোভাময়ীকে নিয়ে গেলেন তিনি নদীকূলে পর্বত উপত্যকায় যোগিনী উদাসিনীর কাছে। উদাসিনী যোগিনী হলেও নারী, তিনি তাই নারীর ব্যথা উপলব্ধি করলেন। তিনি লীলাবতীকে দিলেন পুরুষকে বশ করার মন্ত্রপূত পুষ্পমাল্য। মালার অলৌকিক গুণে লীলাবতী ফিরে পেল প্রণয়ীকে। কিন্তু বিভ্রাট ঘটল তখন যখন মালার গুণে শোভাময়ীর প্রণয়াস্পদ কিরণও লীলাবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে পড়ল! দুই প্রণয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে বিরোধ ঘনিয়ে উঠল। মর্মাহত হয়ে নিরুপায় শোভাময়ী যোগিনী হওয়ার বাসনায় উদাসিনীর কাছে পুনরায় উপস্থিত হল। উদাসিনী গভীর স্নেহে এবার শোভাময়ীর আঁখিতে পরিয়ে দিলেন মায়া অঞ্জন। সেই অঞ্জনের প্রভাবে শোভাময়ী ফিরে পেল অনুতপ্ত কিরণকে। কাহিনীটি মেলোড্রামাটিক। গীতিনাট্যটি আগাগোড়া গানে রচিত। গানগুলিতে কখনও নারীর আনন্দচঞ্চল রোমান্টিক যৌবনাবেশ স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে আবার কখনও নারীচিত্তের প্রেমের বেদনা বিষাদে মর্মস্পর্শী হয়েছে। কথায় যে ভাব প্রকাশ হয় না, সঙ্গীতে তা মূর্ত হয়েছে। স্বর্ণকুমারীর সঙ্গীত প্রতিভার অভিনবত্ব এ গীতিনাট্যে অবশ্য স্বীকার্য। সঙ্গীতের নানান রাগে, তালে মানবহৃদয়াবেগের বিচিত্র অভিব্যক্তি ঘটেছে নাটকটিতে। নাটকটির শুরুতে শোভাময়ীর সখিদ্বয়ের ব্রজবুলি ঢঙে গানটিতে যৌবনচঞ্চল নারীর আনন্দোচ্ছল আবেগ মূর্ছিত হয়েছে—

"আও কোয়েলা কুহু বোলে,
আয়, তবে সহচরি, রুণু ঝুনু রুণু ঝুনু
বসন্ত জয়ধ্বজা তুলে।

আয়, সই, মিলি জুলি, ফুলগুলি তুলি তুলি,
সাজাব সখীরে সবে মিলে।।"

'বসন্ত উৎসবে'র ছন্দে ভাষায় বিহারীলালের প্রভাব স্পষ্ট :

"আ মরি! লাবণ্যময়ী কে ও স্থির-সৌদামিনী,
পূর্ণিমা-জ্যোছনা দিয়ে মাৰ্জ্জিত বদনখানি!"

বিহারীলালের 'সাধের আসনে'—

"মেঘের মণ্ডলে পশি, খেলা করে কে রূপসী,
যেন সুরধুনী ব্যোমকেশের মাথায়!'

আরও—

"অধরে মধুর হাস-তরুণ অরুণাভাস,
আমরা কি বিদ্যাধরী কে রূপসী নাহি জানি।

সারদামঙ্গলে :—

"কপোলে সুধাংশু-ভাস অধরে অরুণ হাস
নয়ন করুণাসিন্ধু প্রভাতের তারা জ্বলে।"

কাব্যছন্দে ভাষার ধ্বনিতে বিহারীলালের এমন স্পষ্ট প্রভাব 'বসন্ত উৎসবে' লক্ষ্য করা যায়।

গীতিনাটকটির গানের ভাষায় ভাবে যেমন নারীর যৌবনচঞ্চল চপল আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়েছে তেমনি প্রেমের প্রত্যাখ্যানে বেদনাহত নারীচিত্তের মর্মবাণীও মূর্ত হয়েছে। দয়িতের প্রত্যাখ্যানের আঘাতে লীলার হৃদয়বেদনার অভিব্যক্তিতে এই ভাব সুস্পষ্ট। নির্নিমেষ নেত্রে গভীর নিশীথের বহিপ্রকৃতিতে চেয়ে সে নিজের অন্তরে উদাস বেদনা অনুভব করেছে—

"চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশিথে চেয়ে
দুর্ভেদ্য অন্ধকারে হৃদয় রয়েছে ছেয়ে।
ভয়ানক সুগভীর বিষাদের এ তিমির,
আশার বিজলী-রেখা উজলে না এই হিয়ে।"

'বসন্ত উৎসবে'-র উপজীব্য রোমান্টিক প্রেম। নায়িকারাও রোমান্সের নায়িকা। নায়ক নায়িকার প্রেম বস্তুসংসারের আঘাতে, প্রাপ্তিতে জীবনরসে উপচীয়মান নয়। রোমান্টিক বিষাদে, অলৌকিক ঘটনায় এ প্রেম বস্তুধর্মিতার ঊর্ধ্বে বিচরণ করেছে। কাব্যের প্রেমভাবনা বা চরিত্র পরিকল্পনা অনেক সময় তাই মেলোড্রামাটিক হয়ে পড়েছে। এমনই একটি অংশ দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে শোভাকে প্রত্যাখ্যান করে মন্ত্রপূত মালার প্রভাবে লীলার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে লীলার প্রণয়ী কিরণের বিরুদ্ধে কুমারের অসিযুদ্ধের আহ্বান। খেমটা তালে অসিযুদ্ধের গানটিতে স্বর্ণকুমারীর সঙ্গীত রচনার নৈপুণ্য স্বীকার্য।—

''কিরণ। লও, এই লও, লও প্রতিফল।
কুমার। দেখিব, বীরত্ব তোর থাকিলে অটল।
কিরণ। মূঢ় হরে সাবধান।
কুমার। এ অমোঘ সন্ধান।
কিরণ। এ আঘাতে অবশ্যই বধিব পরাণ।
কুমার। এই দেখ বক্ষে তোর বিঁধি তলোয়ার।
কিরণ। চুপ, মূঢ় আস্ফালিতে নাহি হবে আর।
কুমার। কি বলিলি তুই?
কিরণ। এই দেখ তোব রক্তে কলঙ্কিত তুই।

পাদটীকা :—

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)— সুকুমার সেন। পৃঃ ৯৩।

২। "বাঙালী জীবনে বিলাতি সংস্কৃতির প্রভাব"— শান্তিদেব ঘোষ।
— "দেশ", ৬ই আষাঢ়, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

৩। তদেব।

৪। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃঃ ১৫১, ১৫৫—৫৬।

৫। "বাঙালী জীবনে বিলাতি সংস্কৃতির প্রভাব"— শান্তিদেব ঘোষ।
— "দেশ", ৬ই আষাঢ়, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)— সুকুমার সেন। পৃঃ ৯১।

৭। "দেশ", ৬ই আষাঢ়, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

৮। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর— সাহিত্য সাধক চরিতমালা।
"বিদ্বজ্জনসমাগম" — পৃঃ ২[illegible]।

৯। জীবনের ঝরাপাতা— সরলা দেবী চৌধুরাণী, পৃঃ ২৯।

১০। কৈফিয়ৎ— হিরণ্ময়ী দেবী, "ভারতী"— বৈশাখ, ১৩২৩।

১১। রবীন্দ্রস্মৃতি— ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, পৃঃ ২৮।

১২। সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ— হেমেন্দ্রকুমার রায়। ১ম সংস্করণ, ১৮৮১ শকাব্দ।
পৃঃ ৮৫।

অতৃপ্তি

এর পর উল্লেখ করতে হয় ছটি সর্গে রচিত স্বর্ণকুমারীর ক্ষুদ্র নাট্যকাব্য 'অতৃপ্তি'র। "ভারতী ও বালকে" এটি ১২৯৫ এর জ্যৈষ্ঠ থেকে আশ্বিন সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে বার হয়। নাট্যকাব্যেব ছাপ সত্ত্বেও এটি গাথাকাব্যেরই সগোত্র। পয়ার ত্রিপদী ছন্দে রচিত নাট্যকাব্যটির নামকরণেই রয়েছে বক্তব্যের ব্যঞ্জনা। কবির রোমান্টিক কাব্যানুভূতিই এতে বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনীর (ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত ১২৮৪ পৌষ-চৈত্র সংখ্যায়) নায়ক কবির মত এর নায়ক ললিতও স্থূল প্রেমের অতৃপ্তি ও গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে স্থিরতর আত্মরতিতে শান্তি খুঁজেছে। কবিচিত্তের সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের আর্তি কাব্যটিতে সুস্পষ্ট। 'অতৃপ্তি'তে নাট্যাংশ অপেক্ষা কাব্যাংশের প্রাধান্য। এর প্লটে নাটকীয়তা নেই, আছে হৃদয়াবেগ ও অনুভূতির বিস্তার। 'কবিকাহিনী'র প্লটের সঙ্গেও এর একটা সাধর্ম্য লক্ষ্য করা যায়। কবিকাহিনীর কবি প্রকৃতির মাধুর্য চিন্তায় বিভোর ছিল। তারপর তার হৃদয়ে জাগল অব্যক্ত আকুলতা। বালিকা নলিনী গভীর সমবেদনা নিয়ে এল তার কাছে। তাকে ভালবেসেও কবির অতৃপ্তি গেল না। অপার শান্তির আশায় কবি বেরিয়ে পড়ল দেশভ্রমণে। ফিরে এসে কবি দেখতে পেল তুষারের উপর নলিনীর মৃতদেহ। কবি আবার দেশপর্যটনে বেরিয়ে পড়ল। নলিনীর স্মৃতি বিশ্ব প্রেমে মিশে গেল। 'অতৃপ্তি'র ললিতও বনবালার লৌকিক প্রেমে তৃপ্ত না হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল শান্তির আশায়। বহু ঘুরে ললিত ফিরে এল বনবালার কুটির প্রাঙ্গণে। কিন্তু তার আগে দুঃখী বনবালা অভিমানাহত হয়ে জলধিতে আত্মবিসর্জন করেছে। বনবালাকে হারানোর ব্যথা ভুলতে ললিত বেরিয়ে পড়ল বহির্বিশ্বে। ললিতের অন্তরে অতৃপ্তির অব্যক্ত যন্ত্রণা কবিরই রোমান্টিক হৃদয়ানুভূতি।

'অতৃপ্তি'র রচনাভঙ্গীতে, ভাবে, ভাষায় বিহারীলালের প্রভাবও যথেষ্ট। উদাহরণতঃ

"ললিত। অনন্ত এ আকুলতা লয়ে
কি করি কি করি— কোথা যাই?"
"বনবালা। হু হু করিয়া জ্বলে উঠে
বেগে উচ্ছ্বলিয়া ছুটে
লণ্ডভণ্ড করি দিয়ে হৃদয়ের স্তর!"

বিহারীলালের কাব্যে ---

"এত যে যন্ত্রণা জ্বালা,
অবসান, অবহেলা,
তবু কেন প্রাণ টানে,
কি করি, কি করি!" (সারদামঙ্গল, ২য় সর্গ)।

"সমুদ্র উথুলে যেন ঘরের দেয়ালে
পড়িছে গর্জ্জিয়া এসে বেগে অনিবার!

— — — —

মানবের আর্তনাদ ওঠে ভয়ানক,
লণ্ডভণ্ড চতুর্দ্দিক, বিশ্ব তোলপাড়!"
(নিসর্গ সন্দর্শন, ৫ম সর্গ)

'অতৃপ্তি'র সর্গগুলির নামকরণে নায়ক নায়িকার মনোভাব ব্যঞ্জিত হয়েছে। ভাবের গভীরতায়, গীতিমূর্ছনায়, অলঙ্কৃত ভাষায় রোমান্টিক কাব্যানুভূতিতে 'অতৃপ্তি' নাট্যকাব্যটি মাধুর্য্যমণ্ডিত।

দেবকৌতুক

স্বর্ণকুমারীর দ্বিতীয় কাব্যনাটক "দেবকৌতুক" (১৯০৬) চারটি সর্গে রচিত। এটি ১৩১১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে কার্তিক সংখ্যার 'ভারতী'তে "উর্বশী ও তুকারাম" নামে বার হয়। "দেবকৌতুক" গ্রন্থের প্রথম সর্গের স্বর্গের নন্দন কাননের প্রথম দৃশ্যটি "উর্ব্বশী ও তুকারামে" ছিল না। গ্রন্থে এই দৃশ্যটিতেই পরিবর্তিত নাম "দেবকৌতুকের" তাৎপর্য নিহিত আছে। স্বর্গে "ইন্দ্রানীর সভাতলে নন্দন কাননে" বিভিন্ন দেবী ও দিগঙ্গনারা মিলিত হয়েছেন "করিতে মন্ত্রণা সবে, ভব নাট্যালয়ে কি নাটক অভিনব হবে অভিনীত এ নবীন যুগে।" সংস্কৃত নাটকের রীতিতে এই নান্দী বা প্রস্তাবনা অংশটিতে নাটকের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। অদৃশ্য নিয়তির অমোঘ নির্দেশে মর্ত্যে নরনারীর জীবন আবর্তিত হয়। স্বর্গের দেবতাদের নির্দেশেই ধরাতলের অসহায় মানুষ কখনও সৌভাগ্যের সুখাবেশে উদ্বেল হয়, কখনও ভাগ্যের বিড়ম্বনায় বিপর্যস্ত হয়। মানুষের জীবনে নিয়তির এই অমোঘ বিধানে দেবতাদের যে লীলা তাই স্বর্ণকুমারীর শিল্পীমানসে 'দেবকৌতুক' কাব্যনাট্যের নাট্যরস যুগিয়েছে। দেবতাদের সামান্য ছলনা কৌতুকে ধরাতলের নরনারীর ভাগ্য নির্ধারিত হয়, বাগ্‌দেবীর তাই গভীর সমবেদনা,—

"আহা, দুঃখ হয় বড় ভক্তদের তরে
আমাদেরি কল্পনা বিলাসে, নরনারী
এত ব্যগ্র নব নব লীলা রচনায় দিবানিশি।"

জীবনের একঘেয়ে প্রাত্যহিকতায় মানুষ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন তার বাসনা গিয়ে স্বর্গলোকে পৌঁছায়। কিন্তু এত "নূতন" দেবীরা পারেন কোথায়? পুরাতনকেই নূতনের আবরণ দিয়ে মর্ত্যে পাঠান তাঁরা। অবোধ মানুষ তাকেই নূতন বলে চিরকাল গ্রহণ করেছে। দেবীদের এ হেন আলাপ আলোচনার মাঝে ছন্দোপতন ঘটল রতির অভিমানে। মদনপত্নী রতি প্রণয়ের দেবীরূপে খ্যাত। দেবীসভায় তাঁর আসন বিন্যস্ত হয়েছে লক্ষ্মীর পশ্চাতে, কারণ আসন বিন্যাসকারী ইন্দ্র-র ধারণা "নরভাগ্য রচনায় নৈপুণ্য যাঁহার যত বেশী, তাঁহার আসন তত আগে"। তাই সর্বপ্রথমে অধিষ্ঠিতা বাণী-বাগ্‌দেবী, তারপরে সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী, এবং তারপরে কামপ্রিয়া রতির আসন বিন্যস্ত। রতি ক্ষুব্ধ হলেন লক্ষ্মীর পশ্চাতে তাঁর স্থান হওয়ায়। দেবীদের ঈর্ষা কলহের সমাধান স্বর্গে হল না, কারণ স্বর্গ অমর শান্তির আলয়। শচীর নির্দেশে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তির বিচার হল মর্ত্যে মানব জীবনে — "অশান্তি ঘটাতে চাও আছে বসুন্ধরা, যাও তথা।" বোম্বাই প্রদেশে সমুদ্রতীরে অরুণাবতী গ্রামে সদাশিব শ্রেষ্ঠীর দুই কন্যা উর্বশী ও মেনকা। তাঁদের ভাগ্য দিয়ে পরীক্ষা হল রতি ও লক্ষ্মীর মর্ত্যপ্রভাবের। উর্বশী

ভুবনমোহিনী রূপে মদগর্বিতা, আর মেনকা কল্যাণময়ী নারীরূপে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা। মহারাষ্ট্রীয় বীর সাহাজী উর্বশীর রূপের খ্যাতি শুনে তাঁর দর্শনাকাঙক্ষায় ব্যাকুল। একদা তাঁর দর্শনাভিলাষে সাহাজী সৈনিক তুকারামের ছদ্মবেশে বেরলেন পুরুষত্বের পরীক্ষা করতে। সাধারণ বেশেও তাঁর পুরুষত্বকে উর্বশী চিনে নিতে পারেন কি না সেই দেখতে। নিয়তির বিধানে মেঘাচ্ছন্ন বর্ষণশীল সন্ধ্যায় অরুণাবতীর মন্দিরে দেবী অরুণার সামনে তুকারামের ছদ্মবেশে সাহাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল মেনকার। দেবী কমলারই জয় হল, প্রথম দর্শনেই উভয়ে উভয়ের প্রণয় পাশে আবদ্ধ হলেন। সাহাজী মেনকাকেই উর্বশী বলে ভুল করলেন। আর তুকারাম রাজা সাহাজীর ছদ্মবেশে পার্বতী মন্দিরের নিকটবর্তী পথে যেতে যেতে মেনকা ও উর্বশীকে দেখে সাহাজীকে উর্বশীর সংবাদ দিতে ঘোড়া ছোটালেন। তাঁর পলকের দৃষ্টিকে অবহেলা ভেবে উর্বশীর রূপের গর্ব ভাঙ্গল। রূপগর্বে আহত হয়ে অভিমানস্ফুরিত চিরন্তন নারীহৃদয় জেগে উঠল—

"তীক্ষ্ণধার ছুরি বাজে এই অবহেলা
বৃথা গর্ব নারায়ণ মহাদেবে মোহি!
ক্ষুদ্র দীপ পতঙ্গেরে করে আকর্ষণ,
সাগর আকৃষ্ট শুধু চন্দ্র সূর্য্য করে।"

উর্বশী সাহাজী ভ্রমে তুকারামের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। নিয়তির অমোঘ নির্দেশে তুকারাম অজ্ঞাতে এক মর্মান্তিক ভুল করলেন— "উপেক্ষা আঘাতে

জাগালেন অনুরাগ বিরাগী হৃদয়ে।"

উর্বশীর রূপের গর্ব বিলীন হয়ে জাগল চিরন্তন নারীর প্রেম বুভুক্ষা। উর্বশীর বিকশিত নারীহৃদয় সাহাজীর ছদ্মবেশে তুকারামকে বাঞ্ছিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে গ্রহণ করতে কোন দ্বিধা করল না—

"ওহে সর্বোত্তম, আমি চাহিনা জানিতে
রাজা কিংবা প্রজা তুমি ক্ষুদ্র কি মহান্।
এ হৃদয় প্রেম-পুষ্প— লহ উপহার
সার্থক মানিব জনম।"

মর্ত্যের মানবজীবনে দেবীদের প্রভাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলেন কল্যাণী কমলা— উর্বশীর রূপের গর্ব ম্লান হয়ে গেল কল্যাণী মেনকার কাছে। পুরুষ শ্রেষ্ঠ সাহাজী মেনকাকেই বরণ ক'রে নিলেন জীবনে। এই পরাজয়ের জন্য প্রণয়ের দেবতা স্বামী মদনদেবকে অভিযোগ করেছেন রতি— "এত মোহনীয়ারূপা উর্বশী আমার, তারে উপেক্ষিতা করি বিমোহিলে সাহাজীরে মেনকাতে তুমি; কমলা— সৃজিতা কন্যাপরে, প্রেমরাজ!" মদন সান্ত্বনা দিয়েছেন "গুণবতী শ্রীরূপিণী মেনকা সুন্দরী"র প্রেমের অমর্যাদা করলে তাঁর "জগতে রটিত নিন্দা". "অবিচারী পক্ষপাতী কহিত ত্রিলোক", কারণ স্বর্গের নিয়ম ন্যায়বিধান। তাছাড়া মেনকার উপর ধরার দেবী স্বয়ং অরুণাবতীর-ও কৃপা ছিল, কল্যাণে, সহিষ্ণুতায়, ধৈর্য্যে সে পৃথিবীরই কন্যা। এ-ও বললেন তিনি, উর্বশী তুকার প্রেমে রতির জয় ঘোষিত।

'দেবকৌতুকে'-র অমিত্রাক্ষর ছন্দে ও ভাব মাধুর্যে মধুসূদনের অনুসরণ লক্ষণীয়। উদাহরণ:—

"সেই জ্যোতির্ময়ী দেবী! যতবার দেখি
অভিনব অনুপম মাধুরীচ্ছটায়
বিমুগ্ধ নয়ন মন! রতি দেবী যেন
সাগর-ললনা বেশে বিরাজেন হেথা—
দশদিক করি পূর্ণ রূপের জ্যোতিতে!"

ছন্দের অভাবিত মিলে "স্বপ্নপ্রয়ানে"-র বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। যেমন— "দেবকৌতুকে"—

"বুঝি না এ কোন্ তর,
মেলে না একটা বরও।"

"স্বপ্নপ্রয়াণে"—

"মরণেরে বরিয়াছে পরাণের প্রিয়—
ভুলানে কথায় আর কান দেবে কি ও"!
(— ৩য় স্বর্গ, ৭৯ স্তবক)

দেবীদের বিদ্বেষ কলহপরায়ণতায় স্বর্ণকুমারী জীবনরসের আস্বাদ দিয়েছেন। মর্ত্যনারীর ঈর্ষা কলহের দোষে গুণে ভালয় মন্দয় বাস্তব বৈশিষ্ট্যটুকু অমরলোকের দেবীদের মধ্যে মূর্ত হয়েছে। এছাড়া উল্লেখ্য উর্বশীর চরিত্রটি। রূপের জৌলুষে তার নারী হৃদয় চাপা পড়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় সর্গের প্রথম দৃশ্যে কবির কল্পনা বিলাসে, অলঙ্কৃত ভাষায় ছন্দোমাধুর্য্যে উর্বশীর এই রূপগর্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তুকারামের পলকের দৃষ্টিকে অবহেলা ভ্রমে নারীর এই রূপগর্ব ভেঙ্গে চিরন্তন প্রেমবাসনা জেগেছে। চরিত্রটির মনস্তত্ত্ব কাব্যছন্দে চমৎকার ব্যক্ত হয়েছে। উর্বশী মেনকা নারীর সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই সত্তাই কবিতার ভাষায় ছন্দে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাব্যের ভাবে ভাষায় কবির জীবন রসদৃষ্টির পরিচয় রয়েছে। গানগুলি সুপ্রযুক্ত ভাববহ।

যুগান্ত কাব্যনাট্য

স্বর্ণকুমারীর তৃতীয় কাব্যনাট্য হল ''যুগান্ত কাব্যনাট্য''। এটি 'ভারতী'তে ১৩২৪-এর মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। চারটি দৃশ্যে গাঁথা ক্ষুদ্র কাব্যনাট্যটি স্বর্ণকুমারী পুত্র জ্যোৎস্নানাথকে উপহার দিয়েছেন। কাব্যনাট্যটিতে পৌরাণিক রূপকে যুগজীবনের সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কলিযুগে মর্ত্যসংসারে অন্যায় অপ্রেমের রাজত্ব। ন্যায় করুণা শান্তি মানবমন থেকে বিলুপ্ত। এই জীবনসত্যই 'যুগান্ত কাব্যনাট্যে'-র রূপকে উদ্ভাসিত। কলির অন্যায় অবিচারে লাঞ্ছিত ''ন্যায়'', ''প্রেম'' সর্বশক্তিধর দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে অভিযোগ করেছে কলির প্রতাপের—

''পরাজিত পরাহত পীড়িত লাঞ্ছিত
দেবারি দানব করে ''ন্যায়'' তোমাদের।''
''কিছু নাই! সর্বস্বান্ত, নিপীড়িত ''প্রেম''
কলিরাজ সেনাপতি অপ্রেমের করে।''
''শান্তি'' রাণী সুধাবিহীন হয়ে অভিযোগ করেছে''
''অশান্তি দানবী
কলিরাজ— অনুচরী সুধা— ভাণ্ড হরি
সমুদ্রে করেছে ক্ষেপ— হস্তহীনা আমি।''
দৃষ্টিহীন ''করুণা'' রাণীর নিবেদন—
''উৎপাটিত চক্ষুমোর আমি দৃষ্টিহীন।''

মহাদেবের কন্যাগণ, কল্যাণ ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী, বিদ্যাবুদ্ধির দেবী বাণীদেবীও কলির অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাননি। এই অন্যায় অত্যাচারে মহাদেব ক্ষুব্ধ হয়ে সংহার মূর্তি ধরেছেন। তাঁর তাণ্ডব নৃত্যে দেবতারা শঙ্কিত। মহাদেবের এ তাণ্ডব নৃত্য অন্যায় অপ্রেমকে ধ্বংস করার। যুগের জীর্ণ সংস্কার অন্যায় অধর্মের অবসানে সূচনা হবে নূতন যুগের। নাটকের চতুর্থ দৃশ্যের শেষে কলিরাজ বন্দী হয়েছে, নব মঙ্গলময় যুগের সূচনা হয়েছে।

সুললিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে ভাষার মাধুর্যে, সংলাপে মাঝে মাঝে কথ্যরীতির নিপুণ অনুসরণে, ''যুগান্ত কাব্যনাটক''-টি স্বর্ণকুমারীর কবিকল্পনার বিশেষ মৌলিকতার দাবী করে। কাব্যনাটকটির রূপকে স্বর্ণকুমারীর কবি প্রতিভার সঙ্গে জীবনরসিকতার সুন্দর সমন্বয় সাধিত হয়েছে। ঘরোয়া সংলাপে নন্দী ভৃঙ্গী দুই ভাইয়ের চরিত্র দুটি সরস জীবন্ত। মাতা শিবানী ও নন্দীভৃঙ্গী ভ্রাতৃদ্বয়ের কথোপকথনে কাব্যের লঘুচ্ছন্দে মর্ত্যসংসারের মধুর ভ্রাতৃত্ব ও মাতৃস্নেহের গার্হস্থ্যরস সঞ্চারিত।

কৌতুকনাট্য

'ভারতী'-তে স্বর্ণকুমারীর যে কৌতুকনাট্যগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, পরে সেগুলি 'কৌতুকনাট্য'— এ সংগৃহীত হয়েছে। জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ীকে স্বর্ণকুমারী গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন। রচনাগুলির কৌতুকরস উজ্জ্বল নির্মল ও অকৃত্রিম, চরিত্রচিত্রণ স্বাভাবিক। এগুলির লক্ষ্য হল উনবিংশ শতকের নব্যবঙ্গীয় যুবকের ইংরেজনবীশি, উগ্র পাশ্চাত্ত্য মোহ ও ইংরেজী শিক্ষাভিমান, বাঙ্গালী পুরুষের বীর্যহীন আত্মম্ভরিতা, ভণ্ডামি, হীন স্বার্থপরতা, অক্ষম লেখকদের সাহিত্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা, অন্তঃপুরিকাদের অশিক্ষা ও নানান্ কুসংস্কার ইত্যাদি ধরণের সমাজ ও জীবনের অসঙ্গতি, ত্রুটি বিচ্যুতিগুলিকে নিয়ে অনাবিল কৌতুকের সৃষ্টি করা। চিত্তের গভীর সমবেদনা ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি স্বর্ণকুমারীর কৌতুকরসকে একটা স্মিতশোভন রূপ দান করেছে। নারীচরিত্রের অতি সাধারণ দুর্বলতাগুলিও স্বর্ণকুমারীর স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরসের খোরাক যুগিয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে নির্মল হাস্যরস প্রবর্তনের কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের। তাঁর কৌতুকরসাশ্রিত রচনাগুলির মধ্যে "লোকরহস্য" গ্রন্থটি (১৮৭৫) উল্লেখযোগ্য। লোকরহস্যের ব্যঙ্গ কৌতুক সূক্ষ্ম ও মার্জিত বলে বঙ্কিমের রসরচনার মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মনুষ্যচরিত্রের সাধারণ দুর্বলতা অসঙ্গতিগুলিই বঙ্কিমচন্দ্রের জ্বালাহীন সকৌতুক ব্যঙ্গ উদ্দীপ্ত করেছে। উনবিংশ শতকের নব্যবঙ্গীয় যুবকের উগ্র পাশ্চাত্ত্য মোহ ও ইংরেজ স্তাবকতা, পৌরুষহীন বাগাড়ম্বর, দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস, স্বাধীনতার হুজুগ প্রভৃতি বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের ত্রুটি দুর্বলতা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অভিনব ভঙ্গীতে "লোকরহস্যে" শুদ্ধ হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। "ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল", "ইংরাজ স্তোত্র", "রামায়ণের সমালোচন", "বাবু", "কোন স্পেশিয়ালের পত্র", "হনুমদ্বাবু সংবাদ", "বাংলা সাহিত্যের আদর" ইত্যাদি এই শ্রেণীর রচনা। "লোকরহস্যে"র সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর কৌতুকনাটকগুলির একটা ভাবগত সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের মত স্বর্ণকুমারীরও উদ্দেশ্য উনবিংশ শতকের সামাজিক জীবনের ও জাতীয় চরিত্রের ত্রুটি বিচ্যুতি, অসঙ্গতিগুলি নিয়ে অনাবিল কৌতুকসৃষ্টি করা। বুদ্ধিদীপ্ত সূক্ষ্ম বাক্‌চাতুর্যে স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরসে কৌতুকনাট্যগুলি উপভোগ্য।

'ভারতী'তে হেঁয়ালী নাট্য নামাঙ্কিত কলমটিতে এ ধরণের অনেকগুলি কৌতুকনাট্য লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যেগুলি পরে তাঁর 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গকৌতুকে' সংগৃহীত হয়েছে। 'ছাত্রের পরীক্ষা" (শ্রাবণ ১২৯১), "রোগের চিকিৎসা" (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২), "খ্যাতির বিড়ম্বনা" (১২৯২ মাঘ), "একান্নবর্তী" (১২৯৪ বৈশাখ) "বিনিপয়সার ভোজ" (পৌষ ১৩৫০), "রসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি" (আশ্বিন কার্তিক ১৩০১), "বশীকরণ" (১৩০৮ অগ্রহায়ণ) প্রভৃতি

কৌতুকনাট্যগুলিতেও মনুষ্যচরিত্রের অতি সাধারণ দুর্বলতা, সামাজিক অসঙ্গতি ইত্যাদি নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুকরস সৃষ্ট। চরিত্রচিত্রণের বিশিষ্টতায় সংলাপের তীক্ষ্ণ ঔজ্জ্বল্যে ঘটনা সাজানোর কৌশলে এগুলির কৌতুকরস স্বর্ণকুমারীর কৌতুকনাট্যের কৌতুকরসের সমগোত্রীয়। তবে রবীন্দ্রনাথের কৌতুকনাট্যগুলির বুদ্ধিগ্রাহ্যতা অধিক। অনেকসময়ই এগুলির গূঢ়ার্থ সহজবোধ্য নয়। সে তুলনায় স্বর্ণকুমারীর নাটকগুলির কৌতুক, বা বক্তব্য অনেক সহজবোধ্য, প্রকাশ্যে প্রতীয়মান।

স্বর্ণকুমারীর লজ্জাশীলা (১২৯২ মাঘ), বৈজ্ঞানিক বর (১২৯২ মাঘ), লোহার সিন্ধুক (ফাল্গুন ১২৯২), ষষ্ঠীর বাছা (১২৯৩ পৌষ), চাক্ষুষ প্রমাণ (১২৯৩ আষাঢ়) সৌন্দর্য্যানুরাগ (১২৯৪ শ্রাবণ) গানের সভা (১২৯৪ পৌষ) ব্যাঘ্রসভা (১২৯৪ চৈত্র) সূক্ষ্মার্থ (১২৯৫ পৌষ), তত্ত্বজ্ঞানী (১২৯৫ মাঘ) নিজস্ব সম্পত্তি (১২৯৫ ভাদ্র) বিরহ বেদনা (কার্তিক ১২৯৪) সূক্ষ্মডাক্তারী (১২৯৮ বৈশাখ) শিক্ষাবিভ্রাট (১৩১৯ বৈশাখ) প্রভৃতি কৌতুকনাট্যগুলিতে চরিত্র, ঘটনার অতি সাধারণ অসঙ্গতি বা দুর্বলতা স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুকরস সৃষ্টি করেছে। এগুলির হাস্যরসের মধ্যে লেখিকার উদ্ভাবনের মৌলিকত্ব ও সাবলীলতা লক্ষণীয়। খাঁটি দেশি বুলিতে, মেয়েদের স্বভাব ও আচরণ বৈশিষ্ট্যে, মনস্তত্ত্বের নিপুণ চিত্রণে "লজ্জাশীলা", "ষষ্ঠীর বাছা", "লোহার সিন্ধুক" কৌতুকনাট্যগুলি চিত্তাকর্ষক। বঙ্গীয় পুরুষের পৌরুষহীন আস্ফালন ইংরেজী শিক্ষার আত্মাভিমান, সমাজসংস্কারের নামে ভণ্ডামি হীনমন্যতা চমৎকার কৌতুকরস জমিয়েছে "বৈজ্ঞানিক বর", "সৌন্দর্য্যানুরাগ", "তত্ত্বজ্ঞানী", "সূক্ষ্মডাক্তারী" ইত্যাদি রচনাগুলিতে। কৌতুক নাট্যগুলিতে লেখিকার ঘটনা সাজানোর কৌশলও নিপুণতার পরিচায়ক। স্থানে স্থানে নারীচরিত্র ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে লেখিকার নারীহস্তের স্পর্শ লক্ষণীয়। গভীর সমাজচেতনায় ও জীবনদৃষ্টিতে, সরস বাগ্‌ভঙ্গীতে, অনাবিল হাস্যরসে কৌতুকনাট্যগুলি উল্লেখযোগ্য শিল্পসৌন্দর্য লাভ করেছে।

গাথা কাব্য

বাংলা কাব্যে অনুবাদ, মঙ্গলকাব্য, কবিগান, পাঁচালী প্রভৃতির গতানুগতিকতাকে ভেঙে নূতন স্বাদের বৈচিত্র্য আনলেন মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩)। সমস্ত ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ ধরে বাঙালীর রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতি সর্বত্র যে পরিবর্তন সাধনের আন্দোলন চলেছিল কাব্যে মধুসূদন সেই প্রাণোন্মাদনার সাড়া এনেছিলেন 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র (১৮৬১) রাবণে, মেঘনাদের পৌরুষে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের বাঁধনহীন প্রাণস্পন্দনে, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর নিবিড় ভাব নিবিষ্টতায়। মধুসূদনের আগে অবশ্য নূতনত্বের হাওয়া এনেছিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭—৮৭) কাব্যে ইংরেজী রোমান্স আখ্যায়িকার প্রভাব ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ প্রচেষ্টা এনে। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) তাঁর এই প্রচেষ্টার নিদর্শন। মধুসূদনের কাব্যের উদার গম্ভীর বীররসে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৫৭—১৯০৯) প্রমুখ কবিরা। মধুসূদনকে অনুসরণ করলেও হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু' কাব্যে (১৮৬৪) ও নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে (১৮৭৬) স্বদেশপ্রেমের লিরিক্যাল উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা প্রবলভাবে পরিস্ফুট। এই স্বদেশপ্রাণতা আসলে ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালীর পরাধীনতার রোমান্টিক বেদনা, যে বেদনা বাঙালীর চিরকালের রোমান্টিক গীতিময় ভাবানুভূতিকে উচ্ছ্বসিত করেছে। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' (১৮৬১) গীতিময় ভাবানুভূতির পরিচয় বিদ্যমান। হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী'র (১৮৭০) বিভিন্ন কবিতায়ও কবির নিছক ব্যক্তি-অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে।

লিরিক্যাল উচ্ছ্বাসের আভাসকে স্পষ্টরূপে অভিব্যক্তি দিয়ে বাঙলাকাব্যে একটা স্বতন্ত্র ধারা এনে আত্মমগ্ন ভাবনাকে বাঙ্ময় রূপ দিলেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-৯৪)। তাঁর 'সারদামঙ্গল' কাব্য (১৮৭৯) বহির্জগত নিরপেক্ষ রোমান্টিক আত্মমগ্ন অনুভূতির অভিব্যক্তি। শুধুমাত্র কাব্য রচনা না করলেও স্বর্ণকুমারীর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০—১৯২৬) কাব্যরচনায় মৌলিকতার ছাপ আছে। তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য (১৮৭৫) মননশীলতা ও কবিমানসের সৌকুমার্যের পরিচয়বাহী। এ কাব্যে কবিকল্পনার মায়াজাল রূপকের আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ করেছে কবির ছন্দোনৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় রেখে। বিহারীলালের রোমান্টিক গীতিভাবনায় প্রভাবিত হলেও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮—৭৮) দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫—১৯২০) রূপ সচেতন কবি। মৌলিক কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০—৯৮)। বাঙলা কাব্যে রোমান্টিক আখ্যানকাব্য বা গাথার প্রচলন করেন তিনি। এ কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য আঙ্গিকের দিক থেকে তত নয়, যতটা ভাবনার দিকে। তাঁর 'উদাসিনী' কাব্য (১৮৭৪) এই শ্রেণীর কবিতার সার্থক নিদর্শন। তাঁর গাথা কবিতা থেকেই স্বর্ণকুমারী 'গাথা' কাব্য রচনায় প্রেরণা পান।

'ভারতী'কে কেন্দ্র করেই স্বর্ণকুমারীর কবিপ্রতিভার বিকাশ। তাঁর কিছু কবিতা সঙ্কলিত হয় 'কবিতা ও গান' গ্রন্থে (১৮৯৫)।[১] স্বর্ণকুমারীর কবি-প্রতিভার স্বরূপ হল রোমান্টিক গীতিময়তা, লিরিক্যাল আত্মভাবমগ্নতার সুর তাঁর কবিতাগুলিতে সুপরিস্ফুট। তাঁর কবিমানস ক্লাসিক কাব্যের গাম্ভীর্যকে গ্রহণ না করে নিয়েছে সুমধুর রোমান্টিক কল্পনার লীলাবিলাসের পথ। সহজ সরল ভাবনা উদ্বেলতা (lyricism) ও স্বরধ্বনি বহুল কোমল মধুর সুরেলা শব্দব্যবহারেই স্বর্ণকুমারীর কবিতাগুলির বিশিষ্টতা। অতি শৈশবে বালিকা স্বর্ণকুমারীর আপনমনে কবিতার ছন্দে কথা বলা ও গান গাওয়া থেকেই এই কবিপ্রাণতার উন্মেষ। অতি প্রত্যূষে বাগানে গিয়ে বালিকা স্বর্ণকুমারী বাগানভরা ফোটা ফুলের উপর মৌমাছির গুণগুণানি শুনতেন। স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন, "সেই অস্পষ্ট ঊষালোকে এই সুন্দর দৃশ্য আমার মনের মধ্যে ভারী একটা সুখের মোহ রচনা করত।"[২] থালা ভরে তিনি ফুল তুলতেন এবং পিতার কাছে সেগুলি নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হতেন। পিতা পুষ্পপাত্র টেবিলে রেখে শিশু কন্যাকে কাছে টেনে নিতেন। দুএকটি গোলাপ কন্যার হাতের কাছে ধরে দেবেন্দ্রনাথ বলতেন,—

"পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ
পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ।"— (নবরত্নমালা)[৩]

দেবেন্দ্রনাথ 'মহর্ষি' হলেও তাঁর মধ্যে একটি রোমান্টিক কবিমন ও সৌন্দর্যপিপাসু হৃদয় নিত্যজাগ্রত ছিল। দেওয়ান-ই-হাফিজ, জয়দেব ও মেঘদূত তাঁর প্রিয়সঙ্গী ছিল। পিতার কবিপ্রাণতা কন্যায় বিদ্যমান ছিল। পিতার সান্নিধ্য ছাড়া ভায়েদের সাহিত্যচর্চার আবহাওয়াও স্বর্ণকুমারীর কবিমানস বিকাশে অনেকটা আনুকূল্য করেছে। অক্ষয় চৌধুরী ছিলেন ঠাকুরবাড়ীর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্যচক্রে তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য। অন্যান্য সদস্য সদস্যাদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী। স্বর্ণকুমারীর মনের গঠন এই কাব্যময় আবহাওয়াতেই বর্ধিত হয়েছিল এবং অক্ষয় চৌধুরীর দ্বারা সম্ভবতঃ তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাছাড়া ছিলেন বিহারীলাল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিহারীলালের হৃদ্যতা ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী তাঁর ভক্ত ছিলেন। সেই সূত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে বিহারীলালের যাতায়াত ছিল, এবং স্বর্ণকুমারীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বর্ণকুমারীর গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়ে পড়েন। স্বর্ণকুমারীর কাব্যে বিহারীলালের কাব্যভাবনা ও রীতির প্রভাব লক্ষিত হয়।

কাব্যগ্রন্থহিসেবে 'গাথা'-ই স্বর্ণকুমারীর প্রথম প্রকাশিত কাব্য। ১৮৮০ সালের, ২০ ডিসেম্বর 'গাথা' বের হয়। 'সাশ্রু সম্প্রদান', 'সাধের ভাসান', 'খড়্গ-পরিণয়', 'অভাগিনী' এই চারটি প্রণয় কাহিনী কাব্যটিতে রয়েছে। "যতনের গাথা হার"টি স্বর্ণকুমারী একান্ত স্নেহের পাত্র ছোটভাই রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছেন। ভাবে, বিষয়ে, আখ্যান পরিকল্পনায় ও সহজ কবিত্বের অভিব্যক্তিতে 'গাথা' কাব্য অভিনব ও মধুর। প্রণয়কাহিনীগুলির নায়ক নায়িকাদের প্রণয়ে দৈবজনিত ব্যর্থতায়, মিলনের তীব্র আবেগে স্বর্ণকুমারীর রোমান্টিক কবিপ্রাণতার সম্যক পরিচয় রয়েছে। অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্য 'গাথা' কাব্যের অগ্রদূত। ডঃ সুকুমার সেন গাথা কাব্যের "প্রণয়ে অচরিতার্থতা, প্রণয়ী প্রণয়িনীর মিলনে আত্মকৃত অথবা দৈবঘটিত ব্যাঘাত ও

তজ্জনিত হতাশা''[৪] ইত্যাদি যে বিশিষ্টতাগুলির উল্লেখ করেছেন সেগুলি 'উদাসিনী', 'গাথা' উভয় কাব্যেই লক্ষিত হয়। 'গাথা'র প্রণয় কাহিনীগুলির মিলন বিরহ, সুখ-দুঃখ পরিকল্পনায় 'উদাসিনী'র কাহিনীর প্রভাব আছে বলে মনে হয়।

স্বর্ণকুমারীর 'গাথা' কাব্যের সমসাময়িক রচনা রবীন্দ্রনাথের গাথা-জাতীয় কাব্য 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮) ও 'বনফুল' (১৮৮০)। 'বনফুল' লেখা হয় অনেক আগে কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'কবিকাহিনী'র দেড় বছরের বেশি পরে। চরিত্র পরিকল্পনায়, ভাবে, বিষয়বস্তুতে রচনা-ভঙ্গীতে 'বনফুল', 'উদাসিনী', 'গাথা' কাব্যের সমগোত্রীয়।

স্বর্ণকুমারীর 'গাথা' কাব্যের 'সাধের ভাসান' অংশটি 'ভারতী'তে বের হয়, ১২৮৬ বঙ্গাব্দের (১৮৭৯ সাল) পৌষ সংখ্যায়। এর কাহিনী হল, বিরহিণী নায়িকা গান গেয়ে নদীতীরে বেড়াতে বেড়াতে অকস্মাৎ শুনতে পেল প্রিয়তমের পরিচিত স্বরের গান। ভাবাবেগে জ্ঞান হারাল সে। বিনোদ গান গাইতে গাইতে একটি তরীতে নদীভ্রমণ করছিল। বহুদিনের অদর্শনের পর নদীতীরে নায়ক নায়িকার মিলন হয়। মিলনের ভাবাবেগ কাব্যের ভাবে ভাষায় ছন্দে স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে। বিনোদ নিজের অঙ্গুরীয় নায়িকার হাতে পরিয়ে তাকে নিয়ে আবার নদীভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল। এমন সময়ে আকাশ মেঘে কালো হয়ে ঘনিয়ে এল দুর্যোগ। বহির্প্রকৃতির দুর্যোগ প্রণয়ীযুগলকে আরও কাছে এনে নির্ভীক করে তুলল। পরম সাহসে 'সাধের ভাসানে' বেরিয়ে পড়ল তারা। চার লাইনের পয়ার স্তবকে গাথাটি রচিত। এর ভাবে, বর্ণনাভঙ্গীতে বিহারীলালের কাব্যের সুস্পষ্ট ছায়া পরিলক্ষিত হয়। 'সাধের ভাসানে'র শুরুতেই নায়িকার চিত্র—

> ''কে ও উন্মাদিনী, কে ওই বালিকা
> সুধার সুরেতে ছাড়িছে তান,''

'সারদামঙ্গলে'-র সারদা,—

> ''ওই কে অমরবালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে,
> ঘুমন্ত প্রকৃতিপানে চেয়ে আছে কুতূহলে।''[৫]

''সাধের ভাসানে''-র রোমান্টিক বিরহিণী নায়িকার চিত্র অঙ্কনে 'উদাসিনী'র বিরহিণী সরলারও ছায়াপাত হয়েছে। সুরেন্দ্র সন্ধানে যখন সরলা বেরিয়েছে

> ''মরণের ভয়ে আর টলে কি হৃদয়,
> সমুদ্রে শয়ান আমি শিশিরে কি ভয়?
> যাই যাই ছেড়ে দাও একলা যাইব,
> একলাই বনমাঝে নির্ভয়ে ভ্রমিব।''[৬]

'সাধের ভাসানে' বিনোদের বিরহে নায়িকার অবস্থা—

> ''প্রখর উত্তাপ হয়েছে, হোক না,
> বালিকার তায় আসিবে কি বা?
> বহে যদি ঝড়, বহুক ঝটিকা,
> কিবা এল গেল নিশি কি দিবা?''

কবিতার ভাষায় ছন্দে বিহারীলালের প্রভাবই সর্বাধিক। নিদর্শন স্বরূপ—

"মেঘে মেঘে মেঘে, ছেয়েছে আকাশ
দেখা নাহি যায় চাঁদিমা আর,
নদীর উরসে ঢেউ সাথে ঢলি
খেলে না জোছনা রজত ধার"

'বঙ্গসুন্দরী'-তে—

"বহ বহ বহ সংগীত লহরী
ধর গো সপ্তমে পূরবী তান!
ব'য়ে লয়ে চল ত্বরা তনু-তরী,
অমৃত সাগরে জুড়াব প্রাণ।"[৭]

ভাষার ধ্বনিঝঙ্কারে 'সাধের ভাসানে' 'বঙ্গসুন্দরী'র (১৮৭০) প্রভাব রয়েছে। কিন্তু বিষয়বস্তু কল্পনায় ও বর্ণনাভঙ্গীতে স্বর্ণকুমারীর স্বকীয়তা সুস্পষ্ট। প্রকৃতির রূপ বর্ণনায়, নায়ক নায়িকার প্রেমানুভূতি ও মনোভাব পরিস্ফুটণে সহযোগিতা করেছে কবির সরল মধুর গীতিময় ভাষা। 'সাধের ভাসানে' গল্পের থেকেও নায়ক-নায়িকার রোমান্টিক প্রেমের হৃদয়াবেগ চিত্রণের দিকে স্বর্ণকুমারীর ঝোঁক বেশি লক্ষ্য করা যায়। বিরহিণী নায়িকার উদাসীনতা বা ঝড়ের দুর্যোগের ভয়াবহতা স্বর্ণকুমারীর কাব্যের ভাষায় ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে। যুক্তাক্ষর বর্জিত সরল ধ্বনিমধুর ভাষা ব্যবহারে স্বর্ণকুমারীর কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। উদাহরণতঃ —

"উতর না দিয়ে বলিল বালিকা
এক দিঠে তার মু'খানি হেরে
"বিনোদ, তুমি যে বিনোদ আমার
দিব না, দিব না তোমায় ছেড়ে।"

ভৈরবী ও মল্লার রাগের গান দুটি প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয় বেদনাকে প্রকাশ করেছে।

'গাথা'-র তৃতীয় কবিতা 'খড়্গাপরিণয়' 'ভারতী'-তে বের হয় ১২৮৬ বঙ্গাব্দের (১৮৭৯) চৈত্র সংখ্যায়। 'খড়্গা পরিণয়ে'-র কাহিনী ঐতিহাসিক। এর কাহিনী সূত্র টডের রাজস্থান ইতিহাস থেকে নেওয়া।[৮] গাথাটির শুরুতেই স্বর্ণকুমারী তার উল্লেখ করেছেন। টডের গ্রন্থে রয়েছে রাণা সঙ্গের তৃতীয় পুত্র রাণা রত্ন নিপুণ যোদ্ধা,— রাজপুত জাতির গর্ব তিনি। চিতোরের সিংহাসন অধিকারের আগেই অম্বররাজ পৃথ্বীরাজ দুহিতাকে হরণ করে তিনি বিবাহ করেন এবং রাজপুত অশ্বারোহী বাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর দ্বিমুখী তরবারীটি রাজকুমারীর কাছে রেখে যান। এ ঘটনা সবায়ের অজ্ঞাত ছিল। বুন্দিরাজ সূরযমল তাই পৃথ্বীরাজ দুহিতাকে দাবী করেন এবং তাঁর রাজ্যে নিয়ে যেতে চান। রাণার সুদীর্ঘ অনুপস্থিতিতে অম্বর রাজকুমারী সূরযমলকে বিবাহ করলেন। 'আহিরিয়া' উৎসবে রাণা ও সূরযমলের যুদ্ধ হয় ও রাণা মারা যান। এই কাহিনী নিয়ে 'খড়্গা পরিণয়' গাথা কবিতাটি রচিত। গাথাটিতে কাহিনীর কোন পরিবর্তন করা হয় নি। 'খড়্গা পরিণয়ে'র মূল সুর ইতিহাসের বীর্য ও রোমান্স।

পৃথ্বীরাজের কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথও 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১) গাথা কাব্যটি রচনা করেছিলেন। রুদ্রচণ্ডের কন্যা অমিয়া পৃথ্বীরাজের সভাসদ চাঁদ কবিকে ভাইয়ের মত ভালবাসে। অমিয়া ও চাঁদ কবির এই নির্মল ভাইবোনের ভালবাসাতে 'রুদ্রচণ্ডে'র বিশিষ্টতা।

'সাধের ভাসানে'র মত 'খড়্গ-পরিণয়ে' ও চার লাইনের দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনে মিলের পয়ার ছন্দ ও ত্রিপদী ছন্দ রয়েছে। গাথাটির উপমা অলঙ্কারে শব্দ-লালিত্য, ভাষার গীতিময় ধ্বনিচাতুর্য আকর্ষণীয়। উদাহরণত ঃ—

"নীহারেতে ধোয়ানো, একরতি নোয়ানো
গোলাপটি যেন মরি মুখখানি বিকাশে।"

ব্যতিরেক অলঙ্কারে নায়িকার রূপ বর্ণনায় কবির কল্পনার পরিচয় রয়েছে—

"নব ঊষা জিনি বরণ মাধুরী
কল্পনারি শুধু প্রতিমা হেন,
বাসব ধনুর মাধুরীটি দিয়ে
জোছনা মাখিয়ে সৃজিত যেন।"

বীর্যবতী তেজস্বিনী নায়িকা 'সারদামঙ্গলে'র সারদাকে মনে করিয়ে দেয়—

"কে ওই ললনা শান্ত জ্যোতির্ম্ময়ী
দাঁড়ায়ে প্রাসাদ শিখরোপরি
মধুর ঝলকে শুকতারা যেন
ঊষাতে আকাশ উজল করি।"

গাথাটিতে অলঙ্কার প্রয়োগে ভাষার সৌন্দর্য সাধন লক্ষণীয়।

"সূরযের সনে হইবে বিবাহ;—
অশনির সম বাজিল বুকে;
শোণিত লহরী থামিল বহিতে
গোলাপ-কলিকা শুকালো মুখে।
নীহার-পীড়িত শ্বেত পদ্মসম,
এলায়ে পড়িল অবশ কায়,
নয়নের জ্যোতি হইল মলিন,
প্রভাতে চাঁদিয়া যেমতি হায়।"

কবির স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিতে, ভাবোপযোগী সুকুমার নমনীয় সঙ্গীতময় ভাষায়, অলঙ্কার প্রয়োগে গাথা কবিতাটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। গাথাটির ছন্দে, অলঙ্কারে বিহারীলাল ও অক্ষয় চৌধুরীর অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়।

ত্রিপদী ছন্দে সরল ললিত ক্রিয়াপদের ব্যবহার ঃ—

"রাজ-ব্রত ধরিয়ে ছিনু যেন মরিয়ে
কি যাতনা সহিনু যে না পারি কহিতে

আর যে তা হয় না, প্রাণ তাতে রয় না
সসৈন্য সেনাপতি ভেটি তারে লইতে।"

'উদাসিনী'র ছন্দ মনে করিয়ে দেয়—

"বিবরিতে বিবরণ বালা প্রায় অচেতন,
আধ মোদা আঁখি দুটী যেন রে নিদ্রায়।
বনদেবী প্রবোধিয়ে অশ্রুধারা নিবর্ত্তিয়ে
সিঞ্চিয়ে সরসী-বারি শান্তিল বামায়।"[১]

গাথাটির নারীচরিত্রগুলি রোমান্স লক্ষণাক্রান্ত হলেও, সজীব। বিশেষতঃ একদিকে নারীর দৃপ্ত তেজোময়ী সত্তা ও অন্য দিকে প্রেমময়ী কোমল রূপের চিত্রণ মনোরম। নারীহৃদয়ের বিচিত্র ভাবানুভূতি স্বর্ণকুমারী গাথাটির রোমান্টিক নায়িকাদের চরিত্রে প্রচুরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'খড়্গ পরিণয়ে'র পরিণতিতে অসিযুদ্ধে রাণা রতন নিহত হলেন, সূরযমল ক্ষতবিক্ষত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ হারালেন— উভয় পতির মধ্যে প্রতিনিধি অসি নিয়ে প্রাণত্যাগ করল নায়িকা অলকা। আখ্যায়িকার গল্পরসটি আগাগোড়া অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

'সাশ্রু সম্প্রদান' ১২৮৭ বঙ্গাব্দের (১৮৮০) বৈশাখ- সংখ্যার 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। এর প্রতিপাদ্য ত্রিভুজ প্রণয়ে প্রত্যাখ্যানের বেদনা ও দৈব প্রতিকূলতায় প্রেমে ব্যর্থতা। এর কাহিনী, প্রেমমুগ্ধ অজিত বালিকা নলিনীকে নানাভাবে খুশি করার চেষ্টা করে। কিন্তু নলিনী অন্যের বাগদত্তা। একদিন উভয়ের আলাপের সময় নলিনীর বাগ্‌দত্ত প্রবাসী প্রণয়ী অকস্মাৎ এসে পড়ল। নিরপরাধিনী নলিনীকে ভুল বুঝে সে চলে যায়। এই ঘটনার বহুদিন পরে নির্জন সাগর তীরে এক মন্দিরে সন্ন্যাসিনী রূপে দেখা গেল নলিনীকে। এখানে হঠাৎ একদিন নলিনীর সঙ্গে দেখা হল তার বাগ্‌দত্ত প্রণয়ীর। সন্ন্যাসিনীর বেশ ত্যাগ করে রূপসী নায়িকা নলিনী প্রণয়ীকে নিয়ে মন্দিরের দেবসমীপে উপনীত হল বিবাহের জন্য। নিয়তির নির্দেশে তাদের বিবাহ দিল পুরোহিত অজিত। নলিনীকে তার স্বামীর হাতে সঁপে দিতে গিয়ে অজিতের এক ফোঁটা উদ্গত অশ্রু ঝরে পড়ল নলিনীর হাতে— তাই হল 'সাশ্রু সম্প্রদান'। এখানেও ছন্দ চার লাইনের পয়ার ও ত্রিপদী। গাথাগুলির বিশিষ্টতাই হল একদিকে রোমান্টিক কল্পনাবিলাস, কবিত্বের স্ফুরণ আর একদিকে কাহিনী বর্ণনা, চরিত্র চিত্রণ। 'সাশ্রু সম্প্রদানে' গল্পের আকর্ষণই বেশি। ভাষার অলঙ্করণে, চারুত্ব সম্পাদনে, প্রেমের বেদনার অভিব্যক্তিতে এখানেও স্বর্ণকুমারী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

শেষ গাথাটি হল 'অভাগিনী'। বিপিন স্ত্রী দামিনীকে গভীরভাবে ভালবাসে। তার সাধ স্ত্রীকে রত্ন আভরণে সাজাবার। কিন্তু সামর্থ্য নেই। অর্থ উপার্জনের জন্য তাই সে গেল প্রবাসে। স্বামী সোহাগিনী দামিনী স্বামীবিরহে শুকিয়ে যেতে লাগল। দীর্ঘ কাল পরে চিঠি এল বিপিন গৃহে ফিরে আসছে। আনন্দে আহ্লাদিত হল দামিনী। কিন্তু সারাদিন বৃথা প্রতীক্ষায় কাটল দামিনীর। খবর পেল সে বিপিন যে নৌকায় ফিরছিল সে নৌকা সমুদ্রে ডুবে গেছে। অভাগিনী নারী জ্ঞান হারাল। কিন্তু বিপিন জীবিত ছিল। ঘরে যখন সে ফিরল দামিনীর তখন শেষ অবস্থা—

স্বামীর বুকেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলল সে। দামিনীর নারীহৃদয়ের দুঃখানুভূতিই এ গাথাটির প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রবাসী স্বামীর বিরহে বিষণ্ণ দামিনীর নিস্তব্ধতায় ব্যাঘাত করতে প্রকৃতিরও সঙ্কোচ বোধে কবির সূক্ষ্ম সৌন্দর্যজ্ঞান অভিব্যক্ত,—

"ভয়ে ভয়ে বায়ু ছোঁয় সে মূরতি
ছুঁইতেও কাঁপে ডরে।
পাছে তার সেই কঠোর আঘাতে
চুলগাছি যায় স'রে।"

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গতার গভীব ভাবানুভূতির স্ফুরণ গাথাগুলির উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। বিরোধ অলঙ্কারের সুচারু প্রয়োগে কাব্যের সুষমা আকর্ষণীয়—

"কোলাহল মাঝে কি শূন্যতা ভাব!
চিতার গর্জ্জন সম—
কোলাহলে শুধু বাড়ে ভীষণতা
বাড়ায় শূন্যতা মম।"

'অভাগিনী'র কাহিনীবস্তু সামান্য, কবিত্বের প্রকাশই মুখ্য। আখ্যান পরিকল্পনায় নায়ক নায়িকার চরিত্র চিত্রণে, ভাষার অলঙ্করণে কাব্যের ভাবমাধুর্যে স্বর্ণকুমারীর গাথাগুলির শিল্পোৎকর্ষ লক্ষণীয়।

পাদটীকা :-

১। 'কবিতা ও গান' গ্রন্থটি স্বর্ণকুমারীর কাশিয়াবাগান বাগানবাড়ীতেই 'ভারতী' যন্ত্রে তারিণীচরণ বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত হয়।

২। সাহিত্য স্রোত (১ম ভাগ)— স্বর্ণকুমারী দেবী, ১৯২৯। পৃঃ ৫৭।

৩। তদেব, পৃঃ ৫৮।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)— ডঃ সুকুমার সেন, (১৯৪৬), পৃঃ ৩২।

৫। বিহারীলাল রচনাসম্ভার— প্রমথনাথবিশী সম্পাদিত (১৯৬১)। 'সারদামঙ্গল' প্রথম সর্গ, পৃঃ ১০৬।

৬। উদাসিনী— শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। কলিকাতা বাল্মীকিযন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত। সংবৎ ১৯৩০। ৭ম সর্গ, পৃঃ ৬১।

৭। বঙ্গসুন্দরী,— অষ্টম সর্গ।

৮। Annals and Antiquities of Rajasthan or the Central and Western Rajpoot States of India. Vol. I. by James Tod. Chapt. IX, p. 238.

৯। উদাসিনী, ২য় সর্গ, পৃঃ ১৮।

কবিতা

স্বর্ণকুমারীর কবি প্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর কাব্যাবলী উচ্ছ্বাসবিহীন, চিন্তাগাঢ় ও দৃঢ়বদ্ধ। তাঁর কবিতাগুলিতে অক্ষয় চৌধুরী ও বিহারীলালের প্রভাব সুস্পষ্ট। বিশেষ করে কবিতাগুলির ভাষায়, ছন্দে তিনি বিহারীলালের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন সর্বাধিক। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (স্বপ্নপ্রয়ান-কাব্য) প্রভাবও দুর্লক্ষ্য নয়। তবু শব্দশিল্পে, ভাবের সংযত সূক্ষ্ম প্রকাশে তাঁর রচনারীতির একটা নিজস্ব ভঙ্গী আছে। তাঁর কবিদৃষ্টি আত্মগত কিন্তু বহির্জগতের প্রতি উদাসীন নয়। ধ্বনিমধুর যুক্তাক্ষর বর্জিত সরল সুমিত শব্দ প্রয়োগে, উপমা অলঙ্কারের সৌন্দর্যসম্মত সূক্ষ্ম ব্যবহারে, ভাবের প্রকাশে তাঁর একটা স্বকীয়তা আছে।

রোমান্টিক গীতিকবিতার দিকেই স্বর্ণকুমারীর স্বাভাবিক প্রবণতা। তাঁর রোমান্টিক মন কল্পনার বিস্তার ঘটিয়েছে কখনও নারীপ্রেমকে কেন্দ্র করে কখনও প্রকৃতির সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে আবার কখনও বা তা কেন্দ্র করেছে দেশের প্রতি গভীর নিষ্ঠাকে। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যকে কখনও তিনি চোখ ভরে দেখেছেন আবার কখনও তাঁর রোমান্টিক অনুভূতি উৎসারিত হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্যের সূত্র সন্ধানে। প্রকৃতির সৌন্দর্য, নিয়ম ও কর্মধারায় তিনি ঈশ্বরের কল্যাণময় বিধানই দেখেছেন। স্বর্ণকুমারীর প্রেমের কবিতাগুলিতে নারীহৃদয়ের প্রকাশ অকৃত্রিম। কিন্তু সর্বোপরি স্বর্ণকুমারী জীবনরসিক। জীবনসত্যকে অতিক্রম করে গিয়ে তাঁর কল্পনা কোথাও বাধাবন্ধহীন উচ্ছ্বাসে পর্যবসিত হয় নি। জীবন সত্যের গভীরতর উপলব্ধিই তাঁর কবিতাগুলির একটানা মর্মস্পর্শী সুর। এখানেই তাঁর কবিতাগুলির শিল্পমাধুর্য, রসোৎকৃষ্টতা।

স্বর্ণকুমারীর প্রেমকবিতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য "ভুলে যেতে গিয়াছি ভুলিয়া", "বল বারবার", "নহে তিরস্কার", "থামাও বাঁশরী তান", "উপহার", "কি যেন নেই", "অধরে অধরে", "নহে অবিশ্বাস", "কেমনে ভুলি", "বলি শোন খুলে", "চুপ চুপ", "যাক ভোর", "কি দোষ তোমার", "হোক কালের মরণ", "জানিনা ত", "আমি কি চাহি" প্রভৃতি। রোমান্টিক কবিমানস মানুষের অন্তর্রহস্যের উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছে কবিতাগুলিতে। নারীহৃদয়ের ও বিচিত্র প্রেমানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে কাব্যিক ভাষায় ভাবে। প্রেমে প্রত্যাখ্যাতা নারীর অসহায় মর্মবেদনা—

> "এ অশ্রু তোমার প্রতি নহে তিরস্কার,
> ভুলে ভাল বেসেছিলে, কি দোষ তোমার,
> এখন ভেঙেছে মোহ, ফুরায়ে গিয়েছে স্নেহ,
> তোমার কি হাত তাহে, কপাল আমার!

আমি কাঁদি দু-জনের কেন হোল দেখা,
তাই ত এ ভুল তুমি করিয়াছ সখা!
(নহে তিরস্কার)।

প্রেমে প্রত্যাখ্যানের করুণ বেদনার মধ্যেও সত্য উপলব্ধি—

"আসিবে কি? আসিবে না— পাষাণ নিষ্ঠুর ধরা,
কে কার আপন হেথা? কে কাহারে দেয় ধরা?
শূন্য হেথা ব্যবধান, দেয় না কেহ ত দেখা
সব দূর, সব পর সব হেথা একা একা!
(থামাও বাঁশরী তান)

কতকগুলি কবিতা স্বর্ণকুমারীর গভীর জীবনরসোপলব্ধিতে সমুজ্জ্বল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, "হা ধিক্ মানব", "কে ছোট কে বড়", "অশ্রুজল", "কেন এ সংশয়", "সুখের অবসাদ", "জীবন অভিনয়", "প্রজাপতির মৃত্যুগান" "আমার সে ফুল দুটি", "অলি ও ফুল", "কেউ চাহে না আপন পানে", "অনাদি মন্ত্র" ইত্যাদি। কবিতাগুলিতে মানুষের প্রতি কবির অগাধ প্রীতি, জীবনের সারসত্যে গভীর বিশ্বাস সমুদ্ভাসিত। মানবহৃদয়ের বহুতর ক্ষুদ্রতায়, বৃহত্তর আদর্শ চ্যুতিতে কবি দুঃখ করেছেন "হা ধিক্ মানব" সনেটটিতে। কবিতাটিতে স্বর্ণকুমারীর জীবন রসবোধের পরিচয় রয়েছে—

"হা ধিক্ মানব, তুই কি করিলি হীন!
অনন্ত শক্তি তোর অক্ষয় ভাণ্ডার,
অনন্ত প্রেমের স্ফূর্তি ইচ্ছার অধীন,
জানিয়াও জানিলিনে ব্যবহার তার।"

"সুখের অবসাদ" সনেটটিও জীবনের গভীরতর অনুভূতিতে উজ্জ্বল। "কলিকালে কালোরূপ" একটি সরস উপভোগ্য কবিতা। উদাহরণতঃ

"সখি ওলো!
চুপে চুপে বলি শোন;
পাইয়াছি দরশন,
কলিকালে কালো রূপে আলো-করা শ্যাম।
নাই বটে পীত ধড়া,
বাঁশী গোপী মনচোরা,
শিরে শুধু শোভে পদ্ম, কটিতটে চাম!

— — — —

কি শুধায় ওগো সখি?
নাম ধাম বলিব কি?
কিছু আর নাহি জানে অবোধ এ রাধা!

প্রিয় হস্তাক্ষর দেখি
মজিয়াছে শুধু আঁখি!
পেয়াদা সে, এই জানি, ডাকের পেয়াদা!''

বাৎসল্যের রসানুভূতিও তাঁর কবিমানসে ঢেউ তুলেছিল— ''আশীর্ব্বাদ'', ''ভাইবোন'', ''শিশু হরি'', ''খুকুরাণি'' প্রমুখ কবিতাগুলি তার নিদর্শন। ''শিশু হরি'' কবিতাটিতে স্বর্ণকুমারীর বাৎসল্য রসসৃষ্টিতে নৈপুণ্যের গাঢ়তর পরিচয় রয়েছে—

গিয়াছে বেলা ব'য়ে, এসেছে সন্ধ্যা হয়ে,
শ্রীহরি মা মা করি ছুটিয়ে আসে,
দেখে মা নাহি ঘরে, খুঁজিয়ে গৃহে ফিরে,
আকুল আঁখি নীরে পরাণ ভাসে।
মেঘেতে ভাসে চাঁদ, জ্যোৎস্নার নাহি বাঁধ,
তারকা ফুটে ওঠে, গগনময়,
এই ত চাঁদা মামা, কোথায় মা-গো আমা,
কে দিবে টিপ ভালে এই সময়?''

''প্রভাত'', ''কোথায় কোথায়'', ''মাযাবিনী'', ''তুমি জ্যোতির্ম্ময় রবি'', ''স্রোত'', ''মধ্যাহ্ন'', ''সিন্ধুর বিলাপ'', ''অপবাহ্নে'', ''সন্ধ্যা'', ''সন্ধ্যার স্মৃতি'', ''বর্ষায়'', ''বসন্ত জ্যোৎস্নায়'', ''শারদ জ্যোৎস্নায়'', ''লজ্জাবতী'' প্রভৃতি কবিতাগুলি স্বর্ণকুমারীর গভীরতর নিসর্গ প্রীতির পরিচায়ক। কবিতাগুলিতে স্বর্ণকুমারী কখনও প্রকৃতির সৌন্দর্যের রসাবেশে বিভোর আবার কখনও বহিঃপ্রকৃতির দৃশ্যে চিরন্তন মানবলীলার হৃদয়াবেগের ও অনুভূতির প্রতিচ্ছবি দেখেছেন। কবির নারীহৃদয়ের সহানুভূতি বিধবা নারীর প্রতি উৎসারিত হয়েছে ''বঙ্গের বিধবা'' কবিতায়। নারীর বৈধব্যের মহিমা নারীর অনুভূতিতে—

''সংসার কঠোর ঘোর,
ভেঙেছে আশ্রয় তোর,
ছিন্নবৃন্তে বিকশিত সৌন্দর্য্য— তরুণা,
ম্লান ধরাতলে বাস,
অধরে অটুট হাস,
হৃদয়ে লুকান অশ্রু, নয়নে করুণা!''

''নীরব বীণা'' (১২৯৮ আশ্বিন— কার্তিক, ভারতী) ও ''আত্মবলি'' (ভারতী ১৩২১ বৈশাখ) কবিতা দুটিতে কবির গভীর মর্মবেদনার প্রকাশ ঘটেছে। দুটি কবিতাতেই একটা রিক্ততা শূন্যতার সুর ধ্বনিত হয়েছে—

''আমি নীরব বীণা, অতি দীনা,
ভাঙ্গা হৃদয় খানি,
আমার ছেঁড়া তার নাহি আর মধুর বাণী!

সবাই বোঝে হেথা, বলা কথা,
কে বোঝে নীরব প্রাণে?
কেহ কি বুঝিবে না— একো জনা?
কে জানে!"
(নীরব বীণা)

"আত্মবলি"-তে ছন্দোচাতুর্য ও ধ্বনিমাধুর্য লক্ষণীয়, তার সঙ্গে রয়েছে মরমী বিচিত্র জীবন-উপলব্ধি—

"ইচ্ছা আছে শক্তি নাই, নিরুদ্যম যন্ত্রী,
স্বর্ণবীণা ভূমে লোটে, ছিন্ন সব তন্ত্রী।
ছন্দহীন মহাকাব্য, ভাবশূন্য ভাষা,
পুঞ্জীকৃত কর্ম্মরাশি, নাহি পুণ্য আশা।
হাসি শুধু দুঃখময়, ফুল গন্ধহীন,
হৃদি প্রেমভরা, কিন্তু নীরস মলিন।
দেহ সচেতন, তাহে নাহি রূপকান্তি,
জীবন রয়েছে 'ড়ে, হৃত সুখ শান্তি।"

স্বর্ণকুমারীর "স্মরিও আমায়" কবিতাটি Moore-এর "Irish Melodies"-এর অন্তর্গত, "Go Go where Glory waits thee" কবিতাটির ভাবানুবাদ। নিদর্শন,—

Off as summer closes,
when thine eye reposes
on its lingering roses,
once so loved by thee.
Think of her who wove them,
Her who made thee love them,
oh then remember me.

স্বর্ণকুমারী ভাবটিকে সুন্দর ফুটিয়েছেন—

"নিদাঘের শেষাশেষি,
মলিনা গোলাপরাশি,
নিরখিয়া কত সুখী হইতে অন্তরে,
দেখি কি স্মরিবে তায়,
যেই অভাগিনী হায়!
গাঁথিত যতনে তার, মালা তোমা তরে।
যে হস্ত গ্রথিত ব'লে তোমার নয়নে,

হ'ত তা সৌন্দর্য-মাখা,
শিখিলে তুমি গো সখা,
গোলাপে বাসিতে ভাল যাহারি কারণে
তখন সে দুখিনীকে কোর নাথ মনে।"

স্বর্ণকুমারীর গীতিকাব্যোচিত অনুভূতির অকৃত্রিম প্রকাশ ঘটেছে দেশাত্মবোধক কবিতা বা গানগুলিতে। "সমর সঙ্গীত" (ভারতী ১৩২৫ ফাল্গুন), "বাঙ্গালী পল্টনের যুদ্ধযাত্রা" (১৩২৫ পৌষ) "রণ সঙ্গীত" (১৩২৬ শ্রাবণ) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণকুমারীর দেশাত্মবোধক কবিতার নমুনা, যাতে তাঁর স্বদেশপ্রীতির স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত —

"বল ভাই বন্দেমাতরম
সাত সমুদ্রের ঢেউ তুফানে খেলুক গানের রং
অস্ত্র নাইক হাতে, (মোদের) ভাবনা কি রে তাতে!
ভক্তি মহাশক্তি ও ভাই অমেয় ভূতলে।
আয়রে ভাই আয়রে চলে, বন্দেমাতরম বলে।
আমরা রক্তবীজের ঝাড়,
মরণ মাঝেই গোপন মোদের সঞ্জীবনী বাড়।
চাই না রক্তপাত (আমরা)
করবো না আঘাত,
ব্যর্থ করব অরির অস্ত্র ধর্ম কৃপাবলে।
আয়রে ভাহ দলে দলে বন্দেমাতরম্
বলে।"
(গীতিগুচ্ছ — প্রথম খণ্ড)

পৃথিবী

স্বর্ণকুমারীর সর্বতোমুখী প্রতিভা বিজ্ঞানকেও তার পরিধির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল, 'পৃথিবী' (১৮৮২) তার উজ্জ্বলতম প্রমাণ। কবি ও বিজ্ঞানী উভয়েরই লক্ষ্য এক, যদিও পন্থা বিভিন্ন। উভয়েই চায় অজানাকে জানতে। কবির সন্ধানের ক্ষেত্র ভাবলোক, বিজ্ঞানীর কর্মক্ষেত্র হচ্ছে বাস্তব রাজ্য বা জড় জগৎ। কবি চান অরূপকে রূপ দিতে, অব্যক্তকে ব্যক্ত করতে তাঁর ভাষায়, ছন্দে ও সুরে। বিজ্ঞানী রূপকে বিশ্লেষণ করে খোঁজেন অরূপের সন্ধান, ব্যক্তকে পরীক্ষা করে জানতে চান তার অন্তরালে অব্যক্তের ঠিকানা। এইখানেই কবি ও বিজ্ঞানীর মধ্যে ঘটে যোগাযোগ। তাই কবি, সাহিত্যশিল্পী হয়েও বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বের আলোচনায় স্বর্ণকুমারীর ছিল অপরিসীম কৌতূহল ও ঔৎসুক্য। এর পরিচয় আমরা পাই 'পৃথিবী' নামক বইটিতে ও 'ভারতী'র পাতায় প্রকাশিত স্বর্ণকুমারীর অগণিত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধে। ছেলেবেলা থেকেই বিজ্ঞানের নানাবিষয়ে তাঁর অনুসন্ধিৎসার অন্ত ছিল না। স্বর্ণকুমারীর আবাল্যকালের এই বৈজ্ঞানিক রুচিটি গড়ে উঠেছিল ঠাকুরবাড়ীর সর্বাঙ্গীণ বিজ্ঞান রসাস্বাদনের আবহাওয়ায়।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগ ছিল। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের তিনি সবসময়ই গল্প বলার ছলে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্মের উন্নতির কথা বলতেন। তাঁর এই ধরণের উপদেশেরই একটি সঙ্কলন 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি', যেটি লিপিবদ্ধ করেন তাঁর পৌত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯—১৯৩৭)। ১৮৯৩ সালে পার্ক স্ট্রীটের বাড়ীতে থাকাকালে তিনি বাড়ীর ছেলেমেয়েদের এ উপদেশগুলি দিয়েছিলেন। গ্রন্থটি এক হিসেবে মানুষের ও ধর্মের অভিব্যক্তির ইতিহাস। গ্রন্থটিতে দেবেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যাত্ম চেতনার অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে। বিধাতার সৃষ্টির অভিপ্রায়, পরিণাম জানার জন্যই বিজ্ঞানচর্চায় তাঁর অপরিসীম ঔৎসুক্য। বিশ্বচরাচরের সৃষ্টির কৌশলে, অগণিত নক্ষত্রমণ্ডলে তিনি ঈশ্বরেরই সৃজনী প্রতিভার পরিচয় দেখেছেন। অসীম আকাশে ভ্রাম্যমাণ অগণ্য নক্ষত্রের একটি হল এই পৃথিবী। তার "পালনীশক্তির" প্রভাবেই নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। "তাহারা সকলে মিলিয়া একটি যন্ত্র — ঈশ্বর শঙ্কু স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।" জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি বিজ্ঞানের সমস্ত ধারাতেই দেবেন্দ্রনাথের যেমন অনুসন্ধিৎসা ছিল তেমন দখলও ছিল। একটি সুপ্রকাণ্ড অগ্নিগোলকের অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থায় পৃথিবী কেমন করে এল সে ইতিহাস জানা যায় বিজ্ঞানের ভূতত্ত্ব শাখায়। ভূ-তত্ত্ব আলোচনায় দেবেন্দ্রনাথের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি তিনি অধ্যয়ন করতেন। নির্জন পাহাড় পর্বতে থেকে তিনি বহুবছর ভূ-তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন করেছেন। তিনি

নিজেই বলতেন, "এ বিষয় তাঁকে একটা authority (গুরু) বলা যায়।"[১] "জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি" গ্রন্থটির ভূমিকায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, এটি দেবেন্দ্রনাথের 'পথের কথা'। তিনি ব্রহ্মলোকের যাত্রী হয়ে চলেছেন, পথে গুটিকতক উপদেশ দিয়েছেন। "সমস্ত জীবন সাধনা করিয়া, ঈশ্বরচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন" তার কতক আভাস আছে এ গ্রন্থে। বিজ্ঞানের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের আজন্ম অন্তরঙ্গতা ও বিজ্ঞান অনুশীলন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুপ্রেরণা যে বহুল পরিমাণে তাঁর ছেলেমেয়েদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মহর্ষির অনুপ্রেরণায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের প্রায় সকলেই বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু পুস্তক দেবেন্দ্রনাথের গ্রন্থশালায় ছিল। পিতার বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তিতে তাঁর ছেলেমেয়েরা যে বিশেষ করে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে। 'ভাবতী' পত্রিকা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভায় যথাযোগ্য পরিচালিত হয়ে। সাবলীল লিখনভঙ্গী, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী, ও গণিতের ইতিহাস আলোচনার প্রয়াসে এর প্রবন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য। দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু কালীবর বেদান্তবাগীশ (১৮৪২—১৯১১) গণিতের ইতিহাসের প্রায় সবগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। (১২৮৫ আশ্বিন সংখ্যার 'ভারতী'তে বের হয় তাঁর 'গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার আবির্ভাব কাল' প্রবন্ধটি। ঐ বছরের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর সারগর্ভ প্রবন্ধ "প্রাচীন ভারতের কয়েকটি কাল নির্ণয় যন্ত্র।") তখনকার দিনের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকাতেও গণিত সংক্রান্ত বহু চিন্তাশীল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে ১৩১৯ সালের ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ঘর পূরণ" প্রবন্ধটিতে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রয়েছে। গণিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। স্মৃতিকথায় তিনি বলেছেন, "অঙ্ক আমার ভাল লাগিত; কিন্তু ক্লাসের বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে অঙ্ক কষা ও গণিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার ভাল লাগিত Trigonometry ও Mensuration বাড়ীতে ইচ্ছামত আমি তাহাই আলোচনা করিতাম।"[২] এণ্ট্রান্স পাশ ক'রে (১৮৬৪) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। Rees সাহেব তখন গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কাউকে বড় প্রশংসা করতেন না, কেবল একবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বড়দাদার (দ্বিজেন্দ্রনাথ) বুদ্ধির প্রশংসা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ নূতন নিয়মে জ্যামিতি ছাপিয়েছিলেন, ছাত্রেরা তাঁর হাতে সেই বইয়ের একটি খণ্ড দিলে, তিনি খানিকটা পড়ে বলেছিলেন, "This man has brains"। দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালে 'ভারতী'-তে গণিত বিষয়ক বহু চিন্তাশীল প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজে দুর্বোধ্য গাণিতিক প্রবন্ধকে সহজসাধ্য করে দীর্ঘদিন যাবৎ 'ভারতী' পত্রিকার বিভিন্ন প্রসঙ্গে পরিবেশন করেছিলেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, "দ্বাদশ স্বীকার্য্যবর্জ্জিত জ্যামিতি" প্রবন্ধ (ভারতী, ১৩০৬, ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা), "জ্যামিতির নূতন সংস্করণ" (ভারতী, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১২৮৬, বৈশাখ ১২৮৭), "স্থান মান" (ভারতী পৌষ-চৈত্র ১২৯০, বৈশাখ ১২৯১)। ১৩০৯ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁর মৌলিক চিন্তাসম্বলিত প্রবন্ধ নিউটনের মতবাদ সম্বন্ধে "নিউটনের দুইটি প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত

হইতে একটি নূতন সিদ্ধান্তের ব্যবকলন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯—১৯২৯) সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকাতেও (প্রথম প্রকাশ ১২৯৮ সাল) ঠাকুর পরিবারের প্রায় সকলেরই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হত। এর বেশির ভাগ প্রবন্ধ ছিল জীবনবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে এবং লিখতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে 'সাময়িক সারসংগ্রহ' নামে এক অধ্যায় লিখতেন, যার মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক নানা আলোচনার মধ্যে থাকত পাশ্চাত্ত্য দেশের বিজ্ঞানের সব গবেষণার চুম্বক। এ পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মস্তিষ্কতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধগুলি তাঁর বৈজ্ঞানিক মনীষার পরিচায়ক। 'সাধনা'-র ১২৯৯ সালের আষাঢ় সংখ্যার 'মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফ্রেনোলজি' রচনাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তেও (প্রথম প্রকাশ ১৮৪৩ অগাষ্ট, রবীন্দ্রনাথের প্রথম সম্পাদনা ১৯১১ এপ্রিল) নিয়মিতভাবে বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ 'বৈজ্ঞানিক' শিরোনামায় নানাপ্রকারের বৈজ্ঞানিক সংবাদ ও আলোচনা প্রকাশ করতেন। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও বিজ্ঞানে গভীর অনুরাগের পরিচায়ক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সম্পাদনায় ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত তাঁর পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ''প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম।'' প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে তিনি ভার, চাপ, চুম্বক, তড়িৎ, আনবিক ক্রিয়া, শব্দবিজ্ঞান ও আলোক কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহযোগে সাধারণের বোধগম্য করে পুস্তকটিতে প্রকাশ করেন।

এ প্রসঙ্গে ঠাকুরবাড়ী থেকে প্রকাশিত আরও একটি পত্রিকার উল্লেখ করা যায় যেটি হল 'পুণ্য' পত্রিকা। হেমেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানাসক্তি তাঁর ছেলেমেয়েদেরও বিজ্ঞানচর্চায় প্রেরণা যুগিয়েছে। ১৩০৪ সালে হিতেন্দ্রনাথ ও ঋতেন্দ্রনাথ 'পুণ্য' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল হেমেন্দ্রকন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরীর উপর। এর প্রথম সংখ্যায় পত্রিকাটি প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছিল— ''এই পত্রে জনসমাজের উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতি নানাবিষয়ক প্রবন্ধই স্থান লাভ করিবে।'' এই পত্রিকার বিশেষত্ব ছিল জীববিজ্ঞান, রসায়ন ও প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ের প্রবন্ধ সম্ভারে। জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রধানত সরল সাবলীল প্রবন্ধ রচনা করেছেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ। মহর্ষির ধর্ম সাহিত্য আলোচনায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ পিতামহকে সর্বদাই সাহায্য করতেন। তাঁর বিজ্ঞান অনুরাগের পিছনে যে পিতামহের প্রেরণা অনেকটা ছিল তা সহজেই অনুমেয়। 'পুণ্য' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ''অভিব্যক্তিবাদের আপত্তি খণ্ডন'' (১৩০৭ পৌষ), ''ভূগর্ভে অভিব্যক্তির সাক্ষ্য (১৩০৭ ফাল্গুন), 'বর্ণভেদে জীবরক্ষা'' (১৩০৮ বৈশাখ) ''ভূপৃষ্ঠে প্রাণসঞ্চার'' (১৩০৮ আষাঢ়, শ্রাবণ)। প্রাচীন ভারতের রসায়ন বিষয়ক বহু পুঁথি ও তথ্য হেমেন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছিলেন। রসায়ন শাস্ত্রে বিশেষ অনুরাগী হেমেন্দ্রনাথের রসায়ন বিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু প্রবন্ধ কন্যার সম্পাদিত 'পুণ্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ''রসায়ন বিজ্ঞানের উপকারিতা'' (১৩০৮

আশ্বিন ও কার্ত্তিক), 'রাসায়নিক আকর্ষণ (১৩০৮ আষাঢ় শ্রাবণ)। ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথেরও শিক্ষার ভার ছিল সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে, এবং তাঁর শিক্ষায় নানা বিষয়ে তিনি বহু প্রেরণা লাভ করেন।

১২৯২ সালে সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রকাশ করেন 'বালক' পত্রিকা— বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রচনা প্রকাশ করার জন্য। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে এপ্রসঙ্গে লিখেছেন, "বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করার জন্য মেজোবউ ঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মেছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল সুধীন্দ্র, বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ীর বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।" একবছর সগৌরবে চলবার পর 'বালক' ভারতীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এতে নরেন্দ্রবালা দেবীর বালক বালিকাদের উপযুক্ত সহজ সরল ভাষায় লেখা অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রয়েছে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য "সূর্য্যের কথা" (বৈশাখ) "সূর্য্যকিরণের ঢেউ" (জ্যৈষ্ঠ), "সূর্য্যকিরণের কার্য্য" (আষাঢ়), "বায়ুস্তরের চাপ" (ভাদ্র) ইত্যাদি। প্রবন্ধগুলিতে সূর্য্যের আয়তন, পৃথিবীর থেকে সূর্য্যের দূরত্ব নির্ণয় করেছেন লেখিকা। বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানীদের মতবাদ কেন্দ্র করে সূর্যকিরণের স্বরূপ, সূর্যকিরণের ঢেউয়ের গতি, সূর্য্যকিরণের উপযোগিতা, পৃথিবীর ভারাকর্ষণ, বায়ুর ভার, চাপ ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক তথ্য সহজ সরল ভাষায় তিনি পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

মহর্ষির বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা বিশেষ করে প্রভাবিত করেছিল তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথকে। মহর্ষি ছেলেমেয়েদের বাল্যবয়স থেকেই পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক রুচি ও রসবোধ গড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথের লেখা তাঁর পাঠ্য তালিকায় তার নিদর্শন পাওয়া যায়— "তখন নর্মাল স্কুলের একটি শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষ মহাশয় বাড়িতে আমাদের পড়াইতেন। - - - চারুপাঠ বস্তুবিচার প্রাণিবৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য পর্যন্ত ইঁহার কাছে পড়া। - - - ইস্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত। ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লংটি পরিয়া প্রথমেই এক কাণা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তারপরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধ কাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল শিখিতে হইত। - - - তাছাড়া প্রায় মাঝে মাঝে সীতানাথ দত্ত মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষাটি আমার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল। - - - ইহা ছাড়া ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের একটি ছাত্রের কাছে কোনো এক সময়ে অস্থিবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিলাম।" রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি হলেও বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও ঔৎসুক্য জেগেছিল সেই বাল্যকাল থেকেই। তিনি নিজেই "বিশ্বপরিচয়ে'-র (১৯৩৭, ১৩৪৪ আশ্বিন) ভূমিকায় বলেছেন— "বালক কাল থেকে বিজ্ঞানের রস-আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না। আমার বয়স বোধ করি তখন নয়-দশ বছর; মাঝে মাঝে রবিবারে হঠাৎ আসতেন সীতানাথ

দত্ত মহাশয়। আজ জানি তাঁর পুঁজি বেশি ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞানের অতি সাধারণ দুই একটি তত্ত্ব যখন দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতেন আমার মন বিস্ফারিত হয়ে যেত। - - তারপরে, বয়স তখন হয়তো বারো হবে, পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ডালহৌসি পাহাড়ে। সমস্ত দিন ঝাঁপানে করে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছতুম ডাকবাংলায়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে গিরিশৃঙ্গের বেড়া দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন।" রবীন্দ্রনাথ পিতৃদেব সম্পর্কে আরও লিখেছেন— "তিনি প্রক্টরের লিখিত সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয়ে মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন। আমি তাহা বাঙলায় লিখিতাম"। গৃহশিক্ষক সীতানাথ দত্ত ও পিতৃদেবের সাহচর্যে রবীন্দ্রনাথের বাল্যবয়সে যে বিজ্ঞান আসক্তি জেগেছিল, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তা উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পায়। তাঁর নিজের কথায়— "তারপর বয়স আরো বেড়ে উঠল। ইংরেজি ভাষা অনেকখানি আন্দাজে বোঝবার মতো বুদ্ধি তখন আমার খুলেছে। সহজবোধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই যেখানে যত পেয়েছি পড়তে ছাড়িনি। মাঝে মাঝে গাণিতিক দুর্গমতায় পথ বন্ধুর হয়ে উঠেছে, তার কৃচ্ছ্র তার উপর দিয়ে মনটাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছি।" সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা বৃত্তির উদ্রেকের জন্য, চিন্তার সূক্ষ্মতা যাথাযথ্যের জন্য বিজ্ঞান চর্চার যে একান্ত প্রয়োজন তা দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই উপলব্ধি করেছিলেন। শুধু পথনির্দেশ দিয়ে ক্ষান্ত হননি, লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায় তিনি স্বহস্তে লেখনী ধরেছেন। সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তাও যে প্রয়োজন, তারই কর্তব্যবোধে তিনি 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। বিজ্ঞানের শুষ্ক তথ্যের বর্ণনায় সাহিত্যের রস যোগান দিতে পারলে তা যে রসাল ও উপভোগ্য হয়ে উঠে, 'বিশ্বপরিচয়ে'র পাতায় পাতায় তার নমুনা আছে। পরমাণু লোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগত, গ্রহলোক ও ভূলোক ইত্যাদি জড়বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত বিভাগগুলির বিশদ বর্ণনা রয়েছে পুস্তিকাটিতে।

স্বর্ণকুমারীর ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র বা অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক কেউই ছিলেন না; তাঁরা সকলেই ছিলেন প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিল্পী বা লেখক। কিন্তু তাঁদের সকলেরই বিবিধপ্রকার বিজ্ঞানের রসগ্রহণ ও রসাস্বাদনের আগ্রহের যে অন্ত ছিলনা, তা ঠাকুরবাড়ীর এই পারিবারিক আবহাওয়া থেকে অনুমান করা কঠিন নয়। বিজ্ঞান রসাস্বাদনের অনুরাগ মূলতঃ তাঁরা পেয়েছিলেন মহর্ষির অনুপ্রেরণায়। স্বর্ণকুমারীর বিজ্ঞান আসক্তিও জেগেছিল ছেলেবেলাতেই পিতার সাহচর্যে। মহর্ষির কাছে তিনিও বাল্যকালেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ করেন। এ-বিষয়ে তাঁর লেখাতেই জানা যায়— "তিনি (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ) মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরে আসিয়া আমাদিগকে সরল ভাষায় জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তিনি যাহা শিখাইতেন, তাহা আমাদিগকে নিজের ভাষায় লিখিয়া তাঁহারই নিকট পরীক্ষা দিতে হইত।"[৪] পিতার কাছে শৈশবের এই বিজ্ঞান শিক্ষাই স্বর্ণকুমারীর মনে বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভায়েদের সাহচর্যে, আনুকূল্যে তা আরও অদম্য হয়েছিল। স্বর্ণকুমারীর

সাহিত্য শিল্পের সর্বত্র তাঁর এই বৈজ্ঞানিক মর্জির যুক্তিনিষ্ঠতা ও চিন্তার স্বচ্ছতা লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্ব আলোচনায় স্বর্ণকুমারীর অপরিসীম কৌতূহল ও ঔৎসুক্যের পরিচায়ক "পৃথিবী" নামক বিজ্ঞানগ্রন্থ। যে পিতার কাছে শৈশবে তাঁর বিজ্ঞানচর্চার দীক্ষা, সেই পিতৃদেবকেই লেখিকা তাঁর গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন। গ্রন্থরচনার প্রেরণা সম্বন্ধে লেখিকা ভূমিকায় বলেছেন— "গণিত শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত বিজ্ঞানের অন্তরে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন। নানাকারণবশতঃ অঙ্কশিক্ষাও সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না— বিজ্ঞান এইরূপে কষ্টসাধ্য বলিয়া ইহা বিশ্ব বিদ্যালয়েই একরূপ আবদ্ধ। বিজ্ঞানের এই দুরূহ পথ সুগম করিবার জন্য ইয়োরোপ ও আমেরিকা দেশে গণিতের সাহায্য ব্যতীত যেরূপ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল প্রচার হইতেছে এই পুস্তকখানি সেইপ্রকার গ্রন্থের আদর্শানুসারে রচিত।" পৃথিবী সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের মনে যে ধরণের প্রশ্নের উদয় হতে পারে, প্রচলিত বিজ্ঞানের উপদেশ অনুযায়ী সাধারণের পাঠোপযোগী করে লেখিকা সেই সকল প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা করেছেন "পৃথিবী" গ্রন্থে। বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় স্বর্ণকুমারী ভাইদের পূর্বসূরী। এ বিষয়ে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথেরও অগ্রবর্তিনী। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' রচনার প্রধান উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে হালকা না করে তার যাথার্থ্যকে বজায় রেখে পরিভাষার জটিলতা বর্জন করে সহজ চলতি ভাষায় প্রকাশ করা। 'বিশ্ব পরিচয়' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। তার পঞ্চান্ন বছর আগে যখন এদেশের মেয়েদের জীবন কাটে অন্তঃপুরের বদ্ধ অন্ধকারে তখন সেই অন্তঃপুরিকাদেরই একজন, স্বর্ণকুমারী, বিজ্ঞানে এমন দুর্লভ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন যে সরল বাঙলা ভাষায় ভূবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানান তত্ত্ব ও তথ্য আলোচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মহিলা তো দূরের কথা, পুরুষেরাও তখন বাঙলা সাহিত্যে এ ধরণের বিজ্ঞান আলোচনার রসাস্বাদ পান নি। যশস্বিনী লেখিকা স্বর্ণকুমারীর প্রতিভা ও মনীষার অনন্যতা এইখানেই। ভূ-বিজ্ঞান (Geology) বিষয়ক প্রথম পুস্তক রচনা করেন বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র বসু। তাঁর রচিত ভূ-তত্ত্ব প্রথম ভাগ প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৮ বঙ্গাব্দে। তারপরেই স্বর্ণকুমারীর 'পৃথিবী' নামক ভূ-বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞানে যাদের প্রথম হাতেখড়ি হচ্ছে তাদের পক্ষে পরিভাষা সঙ্কুল ভাষা হবে বিজ্ঞানের পাঠে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। ফলে বিজ্ঞান তাদের কাছে রস না যুগিয়ে শুধু সৃষ্টি করবে বিভীষিকার। স্বর্ণকুমারী তাই 'পৃথিবী' গ্রন্থে পরিভাষার জটিলতাকে যতদূর সম্ভব পরিহার করে, বিজ্ঞানের বহু আধুনিক তথ্যকে অতি সহজ মনোজ্ঞ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় তরুণ শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থিত করেছেন। মাতৃভাষার প্রতি স্বর্ণকুমারীর গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের নিদর্শন এই গ্রন্থটি। তাই শিক্ষার বাহন মাতৃভাষায় তিনি বিজ্ঞানশিক্ষাকে যথাসম্ভব সরল সুবোধ্য সরস করে তুলেছেন। দূরদৃষ্টি ও রসজ্ঞতা স্বর্ণকুমারীর যে কি পরিমাণে ছিল তা এই বইটি পড়লে বোঝা যায়। পৃথিবীর উৎপত্তি, ভূ-গর্ভ, ভূ-পঞ্জর, পৃথিবীর গতি প্রণালী ও পৃথিবীর শেষ পরিণাম ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য প্রসঙ্গ স্বর্ণকুমারী এ গ্রন্থে মনোরম সহজবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। পাশ্চাত্ত্য ভূ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দুরূহ তথ্য ও মতগুলি তিনি যে বিশেষভাবে অবগত ছিলেন তা গ্রন্থটি পড়লেই বোঝা যায়। বাঙলা ভাষায় জড়-বিজ্ঞানের উপযুক্ত পুস্তক না থাকার সে সময়ের

পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থাদির তথ্যগুলিকে বিশেষভাবে আয়ত্ত করে তিনি এই দুরূহ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।

গ্রন্থের প্রস্তাবনাটি প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রের ইতিহাসসূচক। এই অংশে স্বর্ণকুমারীর মনস্বিতার সুগভীর পরিচয় পরিস্ফুট। প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের সৃষ্টি মহিমায় অভিভূত বিজ্ঞানাত্মা মানবমন ধীরে ধীরে বিজ্ঞান জিজ্ঞাসায় কৌতূহলী হয়ে উঠে। সৃষ্টির এই অপার সৌন্দর্যের পিছনের রহস্য জানবার জন্য মানুষ বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসুক হয়। প্রস্তাবনায় স্বর্ণকুমারী মানবমনের সেই প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি দিয়েছেন সহজ মনোজ্ঞ ভাষায়— "জীবনের প্রভাত কালে, চৌদিকে সজ্জিত প্রাকৃতিক বস্তুর সৌন্দর্য দেখিয়া আমরা বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়ি। পরে দেখিতে দেখিতে এই সৌন্দর্য উপভোগস্পৃহার তীক্ষ্ণতা কমিয়া আসে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যের প্রভাবও মন্দ হইয়া পড়ে। তখন আমরা শুধু বিস্মিত হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিনা। বিস্ময় উদ্দীপক বস্তুকে কেবলমাত্র দেখিয়াই আমাদের মনস্তুষ্টি হয় না, আশ্চর্য প্রভৃতি মনোভাবের দ্বারা আমরা প্রথমে যে সকল বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সেই বস্তু সমুদ্রের উপকূলে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকি, মনোভাব শমিত হইলে আমরা সেই সকল বস্তুর তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হই। মনুষ্যের এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা হইতেই বিজ্ঞানের সৃষ্টি। বস্তুদিগের প্রাকৃতিক তত্ত্ব নির্বাচন করাই বিজ্ঞানের কার্য।" জিজ্ঞাসা বৃত্তির উদ্রেক করে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, অন্ধ সংস্কার সরিয়ে দৃষ্টির স্বচ্ছতার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান শিক্ষার। মনস্বিনী স্বর্ণকুমারী তাই বুঝেছিলেন বিজ্ঞানশিক্ষাকে সর্বসাধারণের নিকট বোধগম্য করতে হলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার গোড়াপত্তন করে দিতে হয়। স্বর্ণকুমারী এই গুরুদায়িত্ব পালনের ভার নিজেই তুলে নিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার জন্য "পৃথিবী"র সৃষ্টি। "পৃথিবী" স্বর্ণকুমারীর সুগভীর স্বদেশানুরাগের আর একটি দিকেও আলোকপাত করেছে। স্বর্ণকুমারী মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন দেশের স্বাধীনতা আসবে দেশকে আত্মনির্ভরশীল করে তুললে। সে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা যায় দেশের প্রাচীন গৌরবাদর্শের উপলব্ধিতে। তাই লেখিকা গভীর অধ্যবসায়ে দেশের প্রাচীন শাস্ত্র, পুরাণ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর সে অধ্যবসায় সফল হয়েছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস অন্বেষণ করে তিনি দেখেছেন ভারতবর্ষই বিজ্ঞানের আদিম জন্মভূমি বেদ বর্ণিত সময়েও ভারতে বিজ্ঞানচর্চা দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের গৌরব সন্ধানে স্বর্ণকুমারীর এই অনুসন্ধিৎসা গভীর দেশাত্মবোধেরই পরিচয়বাহী। স্বর্ণকুমারী লিখেছেন, বহুকাল পূর্বে আর্যগণ বীজগণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি শাস্ত্রে যা লিখে গেছেন, ইউরোপে তা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতবর্ষীয়রা অঙ্ক বিদ্যারও প্রবর্তক। জ্যোতির্বিদ্যাও হিন্দুদের প্রথম আলোচিত। খৃষ্টের জন্মের তিন সহস্র বছর আগে এদেশে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা ছিল। এদেশ থেকেই জ্যোতিষচর্চা প্রথমে ক্যালডিয়া, মিশর, গ্রীস প্রভৃতি দেশে ব্যাপ্ত হয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের চর্চায় ভারতই ইউরোপের তথা পাশ্চাত্ত্যের পথপ্রদর্শক— "চিকিৎসা বিদ্যা ও রসায়নবিদ্যাতেও ভারতবর্ষীয়গণ জগতের গুরু। চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থ আরবেরা নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছে এবং গ্রীকগণ ইহা এদেশ হইতে শিক্ষা করিয়াছে। ভৌতিক বিদ্যাতেও আর্যেরা অনেক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ন্যায়দর্শনে শব্দ উৎপত্তির তত্ত্ব বিশদরূপে সন্নিবেশিত আছে।" পৃথিবী যে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দীতে তা আবিষ্কৃত হয়েছে। পোলিশ জ্যোতির্বিদ নিকোলাস

কোপর্নিকাসই (১৪৭৩—১৫৪৩) সৌর কেন্দ্রিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন এবং পৃথিবী যে সৌরমণ্ডলের একটি গ্রহমাত্র এবং একই সঙ্গে সূর্য্যের ও নিজের চারিদিকে আবর্তনশীল সে মত প্রচার করেন। কিন্তু সহস্রাধিক বছর পূর্বে ভারতীয় গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট (৬ ষ্ঠ শতক) বলেছেন, "পৃথিবীর আবর্ত্তনবশতঃই স্থির নক্ষত্র মণ্ডল এবং গ্রহগণের উদয় অস্ত হইতেছে।" আর্যভট্টই সর্বপ্রথম দিনরাত্রির ভেদের কারণস্বরূপ পৃথিবীর আহ্নিক গতির কথা প্রচার করেন। তাঁর প্রায় হাজার বছর পরে পাশ্চাত্ত্যে কোপনির্কাস এ তত্ত্ব প্রচার করেন। দূরবীণ সৃষ্টি হবার পর ইউরোপে অল্পকালমাত্র সূর্যবিম্ব (Sun spots) পর্যবেক্ষিত হয়েছে। ইতালীয় পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও (১৫৬৪—১৬৪২) ইউরোপের বিজ্ঞানজগতে অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছিলেন। তাঁর বহু কৃতিত্বপূর্ণ আবিষ্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ এবং সৌরকলঙ্ক বা সূর্যবিম্ব আবিষ্কার। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণে রয়েছে, "বিশ্বকর্মা অল্প অল্প করিয়া সূর্যের তেজ কর্তন করিয়া লইলেন, যে অংশ কর্তিত হইল, সেই অংশটিতে শ্যামিকা অর্থাৎ কলঙ্ক রহিল।" জ্যোতির্বিদ বরাহমিহিরের (৬ষ্ঠ শতক) বৃহৎসংহিতায় সৌরকলঙ্কের কথা আরো স্পষ্ট করে আছে। শুধু তাই নয় হার্শেল (ইংরেজ জ্যোতির্বিদ স্যার ফ্রেডরিক হার্শেল, ১৭৩৮—১৮২২) সূর্য বিম্বের সঙ্গে দুর্ভিক্ষের যে সম্বন্ধ দেখেছেন অষ্টাদশ শতকে, বরাহমিহির তার বহু আগেই বলেছেন, যে দেশে সূর্য বিম্ব দেখা যায় সেই দেশের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। সেখানে মেঘ সকল প্রভূত বারি বর্ষণ করে না, নদী ক্ষীণ হয়ে যায় এবং কোন কোন স্থানে শস্য জন্মায়। প্রখ্যাত ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতবিশারদ স্যার আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২—১৭২৭) ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর "প্রিন্সিপিয়া" (Philosophiae Naturalis principia Mathematica) গ্রন্থে গ্রহগতির প্রকৃত কারণ অর্থাৎ অভিকর্ষ আবিষ্কার করে জ্যোতির্বিদ্যার অগ্রগতির পথ সুগম করেন। কিন্তু আর্যদের মধ্যে এর আংশিক জ্ঞান যে বহু পূর্বেই ছিল তা স্বর্ণকুমারী দেখেছেন "ভাস্করাচার্যে"র (১২শ শতাব্দী) "সিদ্ধান্ত শিরোমণি"তে। সূর্যের আকর্ষণ সম্বন্ধে ঋগ্বেদেও উল্লেখ আছে। অণু অণুকে আকর্ষণ করে, মাধ্যাকর্ষণের এই যে একটি নিয়ম জৈন দর্শনে তার উল্লেখ আছে। বৈজ্ঞানিক তথ্যের নিখুঁত বিশ্লেষণ পারাটিতে স্বর্ণকুমারীর বিজ্ঞান তত্ত্ব ও জিজ্ঞাসায় গভীর রসাগ্রহ ও বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে। এর থেকে ভারতীয় পুরাণ শাস্ত্রে লেখিকায় সুগভীর পাণ্ডিত্যও উপলব্ধ হয়। সংস্কৃত ভাষা ও পুরাণশাস্ত্রের সঙ্গে যে স্বর্ণকুমারী সুপরিচিত ছিলেন, এই সুদীর্ঘ মননশীল বিশ্লেষণধারা তার পরিচয়বাহী। ভারতীয় পুরাণশাস্ত্রাদির পাতায় পাতায় তিনি গভীর আগ্রহভরে অন্বেষণ করেছেন আধুনিক বিজ্ঞানের প্রচ্ছন্ন সত্য। ইউরোপীয় ভূতত্ত্ববিদ্যায় পৃথিবীর জীবন ইতিহাসকে, "মৎস্য যুগ" (Age of fishes) "সরীসৃপ যুগ" (Age of reptiles) "স্তন্যপায়ী" (Age of mamals), "মনুষ্য যুগ" (Age of man) এই চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, সে তত্ত্বও ভারতীয় পুরাণের অবতারতত্ত্বের আখ্যানে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বলে স্বর্ণকুমারীর সুচিন্তিত অভিমত— "পুরাণানুসারে জীবশূন্য অপার জলধিজলের প্রথম জীব মৎস্য, দ্বিতীয় জীব কূর্ম, তৃতীয় জীব বরাহ, চতুর্থ নৃসিংহ। রূপক করিয়া তাহারা বিধাতাকে বার বার এইরূপে অবতার করাইয়াছেন। পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হইল, সুতরাং স্বয়ং তিনি যেন এক এক বার এক এক

জাতীয় জীবরূপে অবতার হইলেন। বুঝিয়া দেখিলে এই রূপকেই কি আধুনিক বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত সত্য পাওয়া যায় না?"

বিজ্ঞান সাধনায় ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য আবিষ্কার ব্যতীত স্বর্ণকুমারী 'পৃথিবী' গ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞানের জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূ-বিদ্যা দুটি শাখা পাশ্চাত্ত্যে যে অভূতপূর্ব বিকাশ লাভ করেছে তারও একটা সুচিন্তিত সারগর্ভ ধারাবাহিক ক্রম নিরূপণ করেছেন। সহজ, মিষ্ট, প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি বিজ্ঞানের তরুণ শিক্ষার্থীদের কাছে জ্যোতিষ ও ভূ-বিদ্যা বিজ্ঞানের দুটি শাখার মূল তাৎপর্য ও ক্রমবিকাশকে সহজবোধ্য করে দিয়েছেন।

'পৃথিবী' গ্রন্থ নয়টি অধ্যায় বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায় "সৌরপরিবারবর্তী পৃথিবী"। প্রকৃতির সৃষ্টি বৈচিত্র্য মনুষ্যহৃদয়ে অপার রহস্যবোধের উদ্রেক করে। সেই রহস্যভেদ করতেই মানুষের বিজ্ঞান শিক্ষা। "নিস্তব্ধ নিশীথে অসংখ্য তারকমালা খচিত অনন্তশীল নভোমণ্ডল" দেখে মানুষের কৌতূহল জাগে সেই নক্ষত্রলোকের সৃষ্টিকৌশল জানার— তার থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত। এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ, তাদের স্বরূপ, গতি, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, গ্রহগণের কেন্দ্রাতিগ (Centrefugal) শক্তি, ধূমকেতু, উল্কা ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব। নাক্ষত্রিক গবেষণায় টলেমি, কোপার্নিকাস, নিউটন যে যুগান্তকারী অগ্রগতি ঘটিয়েছেন তার সুচারু, নিখুঁত রূপায়ণ লেখিকার বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণে পারদর্শিতার পরিচায়ক।

"পৃথিবীর গতি প্রণালী" নামক দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে সূর্য ও গ্রহগণের গতিতত্ত্বের বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন স্বর্ণকুমারী। পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি, সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন ইত্যাদি বিজ্ঞানের তত্ত্বকে চিত্রের মাধ্যমে স্বর্ণকুমারী সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলেছেন বিজ্ঞানের তরুণ শিক্ষার্থীর কাছে। 'পৃথিবী'তে স্বর্ণকুমারীর ব্যক্তিত্বের একাধিক সত্তার প্রতিফলন ঘটেছে— এক্ষেত্রে তিনি সাহিত্যিক, শিক্ষিকা, বিজ্ঞানসাধিকা, স্বদেশব্রতী সর্বোপরি সবের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনে মনস্বিনী শিল্পী।

'পৃথিবী'র তৃতীয় অধ্যায় থেকে সূচিত হয়েছে ভূ-বিদ্যার আলোচনা। ভূ-বিজ্ঞানে মূলতঃ জ্ঞাতব্য বিষয় হল পৃথিবীর উৎপত্তি। বিজ্ঞানে একটি শাখা অপর একটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে অন্বিত। তাই পৃথিবীর উৎপত্তি জানতে গেলে সৌরজগতের উৎপত্তিই আগে জানা আবশ্যক। এই অধ্যায়ে স্বর্ণকুমারী সূর্যকে বেষ্টন করে নক্ষত্রগুলির আবর্তন ও গতির কারণ, সূর্যের উত্তাপ, পৃথিবীর আকৃতির কারণ ইত্যাদি বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার মীমাংসার চেষ্টা করেছেন কান্ট, হারসেল, ফরাসী গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ পিয়েরি সাইমন লাপ্লাস (১৭৪৯—১৮২৭), জার্মাণ দার্শনিক হেলমহল্টস (১৮২১—৯৪) ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকদের মতানুসরণে।

তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার ভঙ্গীটি সরল হৃদয়গ্রাহী। উদাহরণস্বরূপ একটি সহজ দৃষ্টান্তে স্বর্ণকুমারী নিতান্ত আনাড়ির কাছেও পৃথিবীর আকৃতি ও তার কারণ সহজ বোধগম্য করে দিয়েছেন—

"পৃথিবীব মেরুদ্বয় চাপা ও কটিদেশ স্ফীত বলিয়া এক প্রকার নিশ্চয় বলা যায় পৃথিবী

একসময় তরল বস্তু ছিল, কেননা একটা কঠিন বস্তু (যেমন প্রস্তর ইত্যাদি) চিরকাল ঘুরিলেও তাহার কোন স্থান চাপা, কোন স্থান স্ফীত হইবে না কিন্তু তরল পদার্থ নির্মিত গোলক পূর্বোক্ত প্রকারে ঘুরিলে তাহার উপর ও নিম্ন দিক হইতে পদার্থ সকল নামিয়া মধ্যদেশ স্ফীত করিয়া তুলিবে।'' এর পরে ক্রমে শীতল হয়ে পৃথিবীর বর্তমান আকার গ্রহণ, ভূ-পৃষ্ঠে পাহাড় পর্বতের উৎপত্তি, জোয়ার ভাঁটা ইত্যাদি ভূ-বিজ্ঞানের নীরস তথ্যকে স্বর্ণকুমারী সরস ভঙ্গিমায় স্বাদু করে তুলেছেন।

চতুর্থ অধ্যায় ''ভূ-পঞ্জর''। পৃথিবী পৃষ্ঠে জীবজন্তু উদ্ভিদ উৎপত্তি কি করে সম্ভব হল, ভূ-বিদ্যার সেই দিকটিতে এই অধ্যায়ে আলোকপাত করেছেন লেখিকা। দুরূহ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সরস বর্ণনাগুণে কতটা স্বাদ পাওয়া যায় তার উদাহরণ— ''সকল দ্রব্যই প্রায় তরল হইতে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইবার সময় আয়তনে ছোট হইতে থাকে। দ্রব ধাতব পদার্থ ঘন হইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া আয়তনে অনেক কমিয়া যায়। সেই নিমিত্ত ভূ-গর্ভ কালে শীতল হইয়া ঘন হইবার সঙ্গে সঙ্গে হ্রস্বায়তন হইয়া পৃথিবীর কঠিন আবরণের সহিত অসম্বন্ধ হইতে লাগিল। যেমন একটি তুলা পূর্ণ বালিশের কতকগুলি তুলা খুলিয়া লইলে বালিশটি তুবড়াইয়া যায়, তেমনি পৃথিবীর আভ্যন্তরিক পদার্থের আয়তন হ্রাসবশতঃ পৃথিবীর কঠিন আবরণ অন্তরে পূর্বের ন্যায় নির্ভর না পাইয়া, তুবড়াইয়া কোন কোন স্থানে দমিয়া গেল, কোন কোন স্থানে উচ্চ হইয়া পর্বতমালায় পরিণত হইল। হিমালয় আল্পস প্রভৃতি আধুনিক উচ্চ পর্বত সকল অধিকাংশ এইরূপে নির্মিত।'' ভূ-বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ তথ্যানুসরণে ভূ-পঞ্জরের গঠন, উপাদান সম্পর্কে সুসংহত নিপুণ আলোচনা স্বর্ণকুমারীর অনুসন্ধিৎসু মানসের আলোকরশ্মিতে অভিষিক্ত হয়েছে। পৃথিবীতে কি করে প্রাণের উৎপত্তি হল, তা ভূ-বিজ্ঞানীদের একটি প্রধান গবেষণার বিষয়। পৃথিবী প্রথম অবস্থায় প্রাণীর বাসোপযোগী ছিল না। মিত ভাষায় লেখিকা সে অবস্থাটিকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন— ''তারাহীন অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় নানাপ্রকার বাষ্পীয় পদার্থ সমাচ্ছন্ন অন্ধকার পৃথিবীর নিবিড় মেঘ ভেদ করিয়া সূর্য তখন কিরণ দিতে পারিত না। সেই উত্তপ্ত এবং চিররাত্র অন্ধকার পৃথিবীতে কি করিয়া প্রাণী দেখা দিবে? এই সময়কে ozoic অর্থাৎ জীবশূন্য সময় কহা যায়।'' যে সকল পরিবর্তন দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠ বতমান আকারে পরিণত হয়েছে ভূ-বেত্তাগণ মৃত্তিকা পরীক্ষা করে তাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। ভূ-পঞ্জরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব আলোচিত হয়েছে ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে। সপ্তম অধ্যায় চতুর্থ প্রস্তাব। মাটির নীচে আবিষ্কৃত মনুষ্য কঙ্কাল, অস্ত্রশস্ত্র দেখে ভূ-বিজ্ঞানীরা আদিম মানুষের উৎপত্তির কালনির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। মাঝে মাঝে নানান্ প্রবাদ, ঐতিহাসিক কিংবদন্তীতে বৈজ্ঞানিক আলোচনাটিকে তিনি সরস মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। লেখিকা ঈশ্বরের সৃষ্টির ক্রম উন্নতির পরিচয় দিয়েছেন, নিকৃষ্ট জীব থেকে মানুষের অভিব্যক্তিতে। এ প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী লিখছেন— ''চিন্তাশীলতাই মানুষের সেই বিশেষ গুণ। সুতরাং মানুষ কি, ইহার উত্তরে সংক্ষেপতঃ এই বলা যাইতে পারে মানুষ বুদ্ধিমান এবং চিন্তাশীল। এই দুই শক্তির বলেই মনুষ্য বাহ্যজগতের অধীশ্বর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার দ্বারাই মনুষ্য সমস্ত পৃথিবীকে দমনে রাখিয়া আবার মনকে মহৎ চিন্তার দ্বারা অত্যুচ্চে উঠাইতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার দ্বারাই মনুষ্য কবি, ইহার দ্বারাই মনুষ্য ভাবুক— ইহার

দ্বারাই মনুষ্য অঙ্কশাস্ত্রবিশারদ এবং অসীম ভাব ধারণা করিতে সক্ষম। এই চিন্তাশীলতা হইতেই নিউটনের "প্রিন্সিপিয়া", লাপ্লাসের "মেকানিক মেলেস্ত", কালিদাসের শকুন্তলা, শেক্‌সপিয়ারের ওথেলো, লিয়ার ইত্যাদি রচিত।"

"ভূ-গর্ভ" নামক অষ্টম অধ্যায়ে পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মতামত পরিবেশন করেছেন লেখিকা। নবম বা শেষ অধ্যায় হল "পৃথিবীর পরিণাম" উননব্বই বছর আগে স্বর্ণকুমারী চাঁদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লিখেছেন— "চন্দ্রে বায়ু নাই, জলও নাই। আমরা যাহাকে চন্দ্রের কলঙ্ক বলি তাহা প্রকাণ্ড গহ্বর মাত্র, ঐ সকল গহ্বর পূর্বে সমুদ্র ছিল, এখন শুকাইয়া এইরূপ গহ্বর হইয়াছে। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে জ্যোতির্বেত্তারা বলেন যে চন্দ্রে উদ্ভিদ, জল কিংবা প্রাণী নাই। চন্দ্র এরূপ মন্দগতি যে নিজের চারিদিকে ঘুরিতেই উহার ২৯১/২ দিন লাগে। যে গ্রহের চন্দ্রের মতন অবস্থা হয় তাহাকেই মৃত কহা যায়।" পৃথিবীরও মৃত্যু সম্ভব কিনা জানতে গেলে আগে জানা প্রয়োজন পৃথিবীতে এমন কোন পরিবর্তন হচ্ছে কিনা যাতে তার জীবনীশক্তি হ্রাস পায়। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের Law of exchange তত্ত্বটিকে প্রাঞ্জল সহজ বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যার মধ্যেও স্বর্ণকুমারীর বর্ণনা বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয়— "একটা গরম ও একটা শীতল বস্তু একসঙ্গে রাখিলে কিছুক্ষণ পরে উভয়েরই উষ্ণতা সমান হয় শীতল বস্তু যতটা উষ্ণতা পায়, উষ্ণ বস্তু ততটা হারায়। ইহাকেই বৈজ্ঞানিকরা আয়-ব্যয়ের নিয়ম (Law of exchange) বলেন। এবং সকল প্রকার তেজই (energy) ক্রমে উষ্ণতায় পরিণত হইবার দিকে উন্মুখ। কাজে কাজেই মনে হয় যে, এমন এক সময় আসিবে যখন সকল প্রকার তেজই উষ্ণতায় পরিণত হইয়া জগৎময় সমভাবে বিস্তৃত হইবে। সে অবস্থায় পৃথিবীর চন্দ্রের ন্যায় মৃত দশা হইবে।"

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার মীমাংসা করতে গিয়ে স্বর্ণকুমারী শেষ পর্যন্ত পিতৃদেবের মত বিশ্বজগতের রহস্যে ঈশ্বরেরই অপার প্রেম, করুণা উপলব্ধি করেছেন। তাঁরই অপার আনন্দের সৃষ্টি এ ধরাধাম। অতএব পৃথিবীর পরিণাম কি তা সীমিত বুদ্ধি মানব আজও আয়ত্ত করতে পারে নি। তাই লেখিকার আস্তিক্য বোধে মনে হয়,— "যাহাই হউক মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজ্যে শেষ মঙ্গল হইবেই।" সৃষ্টির শেষ পরিণাম সম্বন্ধে তাঁর চির অনুসন্ধিৎসু চিত্ত এই গভীর উপলব্ধির উপসংহারে উপনীত হয়েছে।

বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাবলী

স্বর্ণকুমারীর কতকগুলি সারগর্ভ মননশীল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বের হয়েছিল 'ভারতী'তে। এগুলি অধিকাংশই পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে 'পৃথিবী'তে সঙ্কলিত হয়েছে। আজ থেকে ৮০-৯০ বছর আগে একজন মহিলার পক্ষে বাঙলা ভাষায় এ ধরণের মহাকাশের ও পদার্থ বিদ্যার বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিবেশন যে যথেষ্ট মনস্বিতার ও মৌলিক কৃতিত্বের পরিচায়ক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনাড়ম্বর সহজ বর্ণনাভঙ্গীতে, বিজ্ঞানের তথ্যনিষ্ঠায়, চিন্তাশীল বিশ্লেষণে এবং লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গীর স্বকীয়তায় প্রবন্ধগুলি উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসার স্বাক্ষরবাহী। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানীদের মতানুসারে স্বর্ণকুমারী মহাকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী, পদার্থ বিদ্যার বিভিন্ন রহস্যের সমাধান সূত্র খুঁজেছেন। এর মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর তুলনায় অন্যান্য গ্রহ জীবের বাসযোগ্য কি না, পৃথিবীর সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্যবাহী মঙ্গলগ্রহে জীবের অস্তিত্ব সম্ভব কিনা, বিভিন্ন তারকার বিশিষ্টতা, তাদের ঔজ্জ্বল্য বা কিরণের গতি, সূর্যের সঙ্গে এদের সম্পর্ক, সূর্যের থেকে এদেব দূরত্ব, মহাকাশে কত গ্রহ, উপগ্রহ রয়েছে ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার মীমাংসা প্রচেষ্টা। স্বর্ণকুমারী ধীর স্থির চিন্তাশীলতায় এসব প্রশ্নের উত্তব খুঁজেছেন বিশ্বের বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুসরণ করে। ভারতের প্রাচীন ঋষিরাও এঁদের মধ্যে অন্যতম। ঋষিরা মানুষের জীবনে মানসিক বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। পাশ্চাত্ত্যের জীবন দৃষ্টিতে ভোগস্পৃহার আধিক্য। সেই কারণে বিজ্ঞানের যন্ত্রের উন্নতি সেখানে সর্বাধিক। কিন্তু ভারতীয় ঋষিদের মতে মানসিক উৎকর্ষ সাধন মানব জীবনের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিজ্ঞান-জ্ঞানকে তাঁরা পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধির উপায় ভাবতে ঘৃণা করতেন। তাঁরা জানতেন মনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব সুখ শান্তি লাভ হবে। তাই বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা তাঁরা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতেন।

বিজ্ঞানের তরুণ পাঠকেরা জানে পদার্থের তিন অবস্থা, তরল অথবা কঠিন, অথবা বাষ্পময়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা পরীক্ষানিরীক্ষা করে যে পদার্থের আবও একটি অবস্থা উদ্ভাবন করেছেন তা হল পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বা কিরন্ত পদার্থ (Radiant matter)। এই বিষয়ে একটি আকর্ষণীয় প্রবন্ধ রচনা করেছেন স্বর্ণকুমারী। প্রবন্ধটি "পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বা কিরন্ত পদার্থ (ভারতী ১২৯১ শ্রাবণ)। মহাকাশ ও গ্রহ উপগ্রহ সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী বিভিন্ন মূল্যবান ও মনোজ্ঞ তথ্য পরিবেশন করেছেন "অন্যান্য গ্রহগণ জীবের নিবাসভূমি কি না" (ভারতী ১২৯১ জ্যৈষ্ঠ), "মঙ্গলগ্রহে জীব থাকিতে পারে কি না" (ভারতী ১২৯২ বৈশাখ), "সৌরজগতে কত চাঁদ" (ভারতী ও বালক ১২৯৩ আষাঢ়), "তারকাজ্যোতি" (১২৯৪ পৌষ), "তারকারাশি" (১২৯৪ মা[illegible] "যমক ও বহু সঙ্গিক তারকা" (১২৯৪ ফাল্গুন), "পরিবর্তনশীল তারকা" (১২৯৪

চৈত্র), ''তারকার বর্ণ ও তারকার নির্মাণ উপাদান'' (১২৯৫ বৈশাখ), ''তারকাগুচ্ছ'' (১২৯৫ আষাঢ়), ''নীহারিকা'' (১২৯৫ শ্রাবণ), ''সূর্য'' (১২৯৫ অগ্রহায়ণ) ইত্যাদি। 'বালক' (১২৯২) পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায়ও স্বর্ণকুমারীর ''ছায়াপথ'' নামক একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মেঘশূন্য অন্ধকার আকাশে অগণিত তারা দেখে মানুষ বিস্ময়াভিভূত হয়। বিজ্ঞানীরা সেই বিস্ময় বশতঃই তারকাদের সংখ্যাবদ্ধ করেছেন। ''তারকাজ্যোতি'' প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারী লিখেছেন— ''খালি চোখে আমরা ছয় হাজার মত তারকা দেখতে পাই।'' এই ছয় হাজারের অর্ধেক অনুমান তিন হাজার মাত্র আমরা একসময়ে দেখিতে পাই। কেননা আকাশ গোলকের অর্ধেক মাত্র এক সময়ে আমাদের নেত্রপথে পড়ে, অপরার্ধ আমাদের পদতলে থাকে। কিন্তু দূরবীক্ষণ দ্বারা ইহার বহুগুণ তারকা দেখিতে পাওয়া যায়। হার্শেলের ২০ ফুট দূরবীণ দিয়া হার্শেল ও ষ্ট্রার ২,০০,০০,০০০ দুই শত লক্ষ তারা গণনা করিয়াছিলেন।'' ''যমক বা বহু সঙ্গিক তারকা''গুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন স্বর্ণকুমারী। কতকগুলি তারা খালি চোখে একটি মনে হয়, কিন্তু দূরবীণে দেখলে বোঝা যায় এগুলি দুটি, তিনটি, চারটি বা আরও বেশির সমষ্টি। সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহ যেমন সূর্যর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে, এই বহু সঙ্গিক তারকাগুলিও তেমনি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আবদ্ধ হয়ে পরস্পবকে প্রদাক্ষিণ করে। তবে গ্রহদের থেকে এদের প্রদক্ষিণ সময় লাগে বেশি। কারণ একটি থেকে অন্যটি থাকে অনেক দূরে। যে যমক তারার প্রদক্ষিণ সময় সব থেকে অল্প লাগে তারও একবার প্রদক্ষিণ করতে লাগে ৩৬ বছর। জ্যোতির্বিদরা ছয় হাজারেরও বেশি যমকতারা আবিষ্কার করেছেন। ''অন্যান্য গ্রহগণ জীবের নিবাস ভূমি কি না?'' প্রবন্ধটিতে স্বর্ণকুমারী বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থীর কাছে গ্রহগুলির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়ে দিয়েছেন। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় জানা গেছে চন্দ্রে জল নেই, বায়ু নেই। সুতরাং তাঁদের অনুমান চন্দ্র জীবশূন্য। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এত বাষ্পাবৃত ও মেঘাবৃত যে দূরবীণেও দেখা যায় না। এই বাষ্প বিষম উত্তাপের ফল। ক্রমাগত ঝড় বৃষ্টির বিপ্লবে আলোড়িত এই গ্রহগুলি জীবের নিবাসভূমি নয় বলেই বিজ্ঞানীদের ধারণা। বুধ, শুক্র, মঙ্গল পৃথিবীর বড় কাছাকাছি। বিশেষতঃ মঙ্গলের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সঙ্গে পৃথিবীর সামঞ্জস্য দেখা যায়। বুধ, শুক্র সূর্যের এত কাছে, যে সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে গ্রহগুলিতে জীবের বাস সম্ভব নয়। মঙ্গলগ্রহে পৃথিবীর দ্রব্য ওজনে লঘু হয়ে যায় বলে বিজ্ঞানীদের অভিমত। তাঁরা মনে করেন, মানুষ বা জীবজন্তু পৃথিবীর মত এখানে দাঁড়াতে, চলতে পারবে না। জাহাজ যেমন সমুদ্রে টলমল করে, এখানেও তেমনি প্রাণীরা স্থির থাকতে পারবে না। এই ধরনের লঘু সরস রচনা ভঙ্গীতে বিজ্ঞানের নানান মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব প্রবন্ধগুলিতে যুক্তি সহকারে বিশ্লেষিত হয়েছে। বাঙলা ভাষায় এ ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দুর্লভ।

১২৯২ এর ভারতীতে অগ্রহায়ণ থেকে কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয় স্বর্ণকুমারীর 'মেসমেরিজম' বা শক্তিচালনা সংক্রান্ত ধারাবাহিক আলোচনা। ইংলণ্ডে ইন্দ্রিয়াতীত মানসিক শক্তির উপর যে গবেষণা করেছেন মনোবিজ্ঞানীরা তারই মনোরম চিন্তাশীল আলোচনা প্রবন্ধগুলি। এঁদের মধ্যে ছিলেন ডাবলিন কলেজের বিজ্ঞান অধ্যাপক বালফোর স্টুয়ার্ট, পদার্থের

চতুর্থ অবস্থা আবিষ্কারক ক্রুকস প্রমুখ খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা। মনের কথা পাঠ, দিব্যদর্শন, ইচ্ছা শক্তি সঞ্চালন ইত্যাদি বিষয়ে এঁরা যে সব পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন তারই সরস মননশীল আলোচনা করেছেন লেখিকা প্রবন্ধগুলিতে।

পাশ্চাত্ত্যে বহু বিজ্ঞানীদের নানান গবেষণার চুম্বক রয়েছে স্বর্ণকুমারীর ''বৈজ্ঞানিক সংবাদ'' সঙ্কলন অংশটিতে (ভারতী ১২৯৬ বৈশাখ)।

পাদটীকা :—

১। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর — অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৯১৬)। পৃঃ ৬৩১।

২। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর — সাহিত্য সাধক চরিতমালা। পৃঃ ৬।

৩। তদেব, পৃঃ ৩৫—৩৬।

৪। সাহিত্যস্রোত (১ম ভাগ) স্বর্ণকুমারী দেবী, পৃঃ ৫৪।

অন্যান্য প্রবন্ধ

স্বর্ণকুমারীর প্রতিভা বহুবিচিত্র। চিন্তাগাঢ় দৃঢ়বদ্ধ ও সুপাঠ্য প্রবন্ধ রচনায়ও স্বর্ণকুমারী কম বিশিষ্ট ছিলেন না। বস্তুতঃ 'ভারতী'র সম্পাদিকা হিসেবেই গদ্য লেখিকা স্বর্ণকুমারীর আত্মপ্রকাশ। তাঁর চিন্তায় আছে গভীরতাজনিত স্বচ্ছতা কিন্তু জটিলতা নেই। তাঁর একান্ত নিজস্ব রচনারীতির প্রবন্ধগুলির বিশেষ গুণ হচ্ছে সরলতা স্পষ্টতাজনিত সহজ মাধুর্য। 'ভারতী'তে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলি বিচিত্র-বিষয়ক। স্বর্ণকুমারীর রচনাভঙ্গিরও বিষয়ানুমত বিচিত্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সাহিত্য-সমালোচনা কিছুই তাঁর অনুসন্ধিৎসু মানসের আলোকরশ্মির অভিষেক থেকে বঞ্চিত হয় নি। 'ভারতী'তে প্রকাশিত স্বর্ণকুমারীর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল— "রাণা বংশে ইরাণীত্ব আরোপ" (১২৯৪ জ্যৈষ্ঠ) "কবি নাস্তিকতা ও শেলি" (১২৯৪ জ্যৈষ্ঠ), "কবি ও কবিতা" (১২৯৫ ভাদ্র), "গিলটির বাজার" (১২৯৪ আষাঢ়), "আমাদের সমাজ" (১২৯৪ ফাল্গুন), "সরলতা কি নিন্দাপ্রিয়তা" (১২৯৪ শ্রাবণ), "এক ভয়ঙ্কর ঘটনা" (১২৯৫ ফাল্গুন), "স্ত্রীশিক্ষা ও বেথুন স্কুল" (১২৯৪ শ্রাবণ), সখিসমিতি (১২৯৮ পৌষ), "রমাবাঈ" (১২৯৬ শ্রাবণ)। প্রবন্ধগুলি যুক্তিনিষ্ঠ, বিশ্লেষণধর্মী ও তথ্যগর্ভ। প্রবন্ধকারের গভীর স্বদেশপ্রীতির পরিচয় রয়েছে "রাণা-বংশে ইরাণীত্ব আরোপ" প্রবন্ধে। "দীপনির্ব্বাণ" "মিবাররাজ", "বিদ্রোহ" প্রভৃতি উপন্যাসের লেখিকার ইতিহাসনিষ্ঠ মন নিয়েই প্রবন্ধটি রচিত। মেবারের রাজপুত বংশের প্রাচীন গৌরবগাথা অন্বেষণ প্রচেষ্টা রয়েছে প্রবন্ধটিতে। "কবি নাস্তিকতা ও শেলি" প্রবন্ধটি সাহিত্যশিল্পী স্বর্ণকুমারীর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে কবির আত্মা ও কাব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ। স্বর্ণকুমারী ইংরেজ কবি শেলির কাব্য অনুসরণে তাঁর কবিধর্মের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে শেলির কবিধর্মের মধ্যে রয়েছে গভীরতর অধ্যাত্ম বিশ্বাস। কোন অন্ধ বিশ্বাস বা ধর্মের নামে মিথ্যা মোহ শেলির ছিল না। তাঁর ঈশ্বর অনুভূতি গভীর জীবনরসোপলব্ধিতে নিহিত। ভাবের গভীরতায় ও বক্তব্যের ঋজুতায় প্রবন্ধটিতে স্বকীয়তা রয়েছে। "কবি ও কবিতা" প্রবন্ধটিতে স্বর্ণকুমারী শেলি ও বায়রণের কাব্যের ও কবিভাবনার রসগত পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। লেখিকার কবি-চেতনার ভাব বিভায় প্রবন্ধটি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মানবমনের অতি সাধারণ একটি প্রবণতা জীবনরসিক প্রাবন্ধিকের রসোজ্জ্বল বর্ণনা বৈশিষ্ট্যে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে "সরলতা কি নিন্দাপ্রিয়তা" প্রবন্ধে। প্রবন্ধটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অন্তর্গত 'পরনিন্দা' প্রবন্ধের সাদৃশ্য মনে পড়ে। 'ভারতী'তে স্বর্ণকুমারী রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেগুলিতে বিশেষ করে তাঁর স্বাধীনতার জন্য আত্মনির্ভরতা অর্জনের মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। ইংরেজদের এদেশবাসীর প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য ঔদার্য প্রদর্শনের ছলনা ও

ভারতীয়কে হীনবীর্য করে রাখার প্রচেষ্টার প্রতি ঘৃণা স্বর্ণকুমারীর নানান লেখায় প্রকট হয়েছে। "গিলটির বাজার" প্রবন্ধটিতে স্বর্ণকুমারীর এই ধরণের পরাধীনতার বেদনা সুপ্রকট। সর্বত্রই যেখানে ছলনা, কপটতা সেখানে বাঙালী তার খাঁটিত্ব নিয়ে টিকবে কি করে? 'আমাদের সমাজ" প্রবন্ধের রাষ্ট্রনীতি ভাবনায় বঙ্কিমচন্দ্রের "কমলাকান্তের পত্রের" "পলিটিক্স" প্রবন্ধের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। স্বর্ণকুমারীর বক্তব্য, ভিক্ষা করে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না, তা জোরের সঙ্গে অর্জন করতে হয়। সমাজেব প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে সত্যের, মহত্ত্বের, জ্ঞানের উপর। সহজ সরল ভাবোপযোগী ভাষায়, স্পষ্ট ঋজু বক্তব্যে প্রবন্ধটির বিশিষ্টতা রয়েছে।

"এক ভয়ঙ্কর ঘটনা" রহস্যজনক কৌতুককর কাহিনী। গল্প বলার সুচারু ভঙ্গীটি মনোরম।

অকপট দেশানুরাগী দানশীলতায় অনন্য সূর্য্যকান্তর অকাল মৃত্যুতে শোকরচনা "মহারাজ সূর্য্যকান্ত" (১৩১৫ অগ্রহায়ণ) প্রবন্ধটিতে স্বর্ণকুমারী শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন। কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডে তিনি বাস করতেন। লর্ড কার্জনের অনুরোধ অনুনয়েও তিনি অটল থেকে যেরকম দৃঢ়ভাবে বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এরকম আদর্শ দেশানুরাগ ও পুরুযোচিত দৃঢ়তা সচরাচর দেখা যায় না। দানশীলতাব জন্য তাঁকে বলা হত "মহারাজ"।

১৩১৭ আশ্বিন সংখ্যায় 'ভারতী'তে "ইংরাজদিগের ক্রীড়াকৌতুক" প্রবন্ধটিতে ইংরাজদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটিকে লেখিকা সুস্পষ্ট করেছেন। ইংরাজদিগের জীবনে কাজ বা খেলা কিছুই অর্থহীন থাকে না। তাদের সবকিছুতেই স্বাস্থ্যসংক্রান্ত, নয়ত বুদ্ধি, স্ফূর্তিজনক উদ্দেশ্য থাকে।

'ভারতী'র সম্পাদনাকালে স্বর্ণকুমারীর সম্পাদিকার বক্তব্যগুলিতেও বুদ্ধি সমুজ্জলতার সঙ্গে মিশেছে হৃদয়ের প্রসন্ন স্নিগ্ধতা। প্রাঞ্জল মিতভাষণ ও যুক্তিনিষ্ঠা তাঁর লেখাগুলির প্রধান ধর্ম। ১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় দীনেশচন্দ্র সেনের "মাসিক পত্রের ত্রুটি" (ঐ সংখ্যাতেই প্রকাশিত) নিবন্ধের সমালোচনা করেছেন স্বর্ণকুমারী। দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছিলেন 'বঙ্গদর্শনে'র পর পত্রিকার চাহিদা কমে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশী ভাবাপন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায়কে দেশের দিকে ফিরিয়েছিলেন বঙ্গদর্শনের পানপাত্র দিয়ে। এখন দেশবাসীর সে বিদেশীভাবের নেশা কমে গেছে। এখন জাতীয়তা বোধ জাগানই উদ্দেশ্য। তার জন্য পত্রিকাগুলির প্রয়োজন পল্লীবাংলার সঙ্গে হৃদ্য যোগাযোগ করা। এবিষয়ে স্বর্ণকুমারীর অভিমত, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার মত অনেক পত্রিকাই অল্প বিস্তর পরিমাণে দেশের অতীত ও বর্তমান কালের নানাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করে থাকে। তবে দীনেশবাবুর অভিমত অনুসারে বঙ্গের গ্রামপল্লীতে ঘুরে ঘুরে উপকরণ সংগ্রহ করলে যে পত্রিকাগুলির শ্রীবৃদ্ধি হবে সে বিষয়ে লেখিকা একমত। পরিশেষে তাঁর ক্ষোভ : "যদি বঙ্কিমবাবু বাঁচিয়া থাকিতেন, যদি রবীন্দ্র রামেন্দ্র লেখনী চালনায় পরিশ্রান্ত না হইতেন তাহা হইলে এখনও মাসিক পত্রিকাগুলি পাঠকের আগ্রহের সামগ্রী থাকিত। কিন্তু দুঃখেব বিষয় যাঁহারা লেখনী পরিত্যাগ করিতেছেন তাঁহাদের মত প্রতিভা লইয়া কেহ আর সে

স্থলভুক্ত হইতেছেন না।'' ১৩১৭ সালের আশ্বিন সংখ্যাতেও সম্পাদিকার একটি সরস চিন্তাশীল ''বক্তব্য'' রয়েছে ঐ সংখ্যাতেই প্রকাশিত বিপিনচন্দ্র পালের 'ভাবত ও বিলাত' নিবন্ধটির প্রত্যুত্তরে। স্বর্ণকুমারীর যুক্তিনিষ্ঠ অভিমত হল যে কোন সমাজেব উন্নতির মূলে রয়েছে শিক্ষা, জ্ঞান। সে শিক্ষা হয় দেখে আর ঠেকে। প্রবন্ধটিতে স্বর্ণকুমারীর বাস্তবভিত্তিক নিরপেক্ষ দূরযানী দৃষ্টি প্রশংসনীয়। দেশপ্রেমী স্বর্ণকুমারী লেখক মৈনুদ্দীন হোসেনকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন, তাঁর হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি সমন্বয় প্রচেষ্টার জন্য। মৈনুদ্দীন হোসেনের 'হিন্দু মুসলমানের একতা' প্রবন্ধটি 'ভারতী'তে বের হয় ১৩১৭ মাঘ সংখ্যায়। ঐ সংখ্যাতেই স্বর্ণকুমারীর সম্পাদিকার বক্তব্যটি প্রকাশিত হয়।

১৩২৪ আষাঢ় সংখ্যায় ''বাঙালীর রসবোধ'' প্রবন্ধটিতে বাঙালীর রসরুচির প্রশংসা করেছেন লেখিকা সেনাবাহিনীর বাঙালী হাবিলদার ধীরেন্দ্রনাথ সেনের ছন্দোবদ্ধ পদাবলীতে রচিত দৈনন্দিন কর্মসূচী দেখে।

'ভারতী'তে প্রকাশিত স্বর্ণকুমারীর অন্যান্য রচনা ''শিল্পশিক্ষা'' (১৩২৪ কার্তিক), ''বিধবা-বিবাহ ও হিন্দু পত্রিকা'' (১৩১৩ ভাদ্র), ''পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব'' (১২৯৫ বৈশাখ), ''বেঙ্গলী'' (১৩২২ আষাঢ়)। 'শিল্পশিক্ষা'য় নারীজাতির শিক্ষা ও চারিত্রিক উন্নতির জন্য লেখিকার আন্তরিক বাসনা সুব্যক্ত। এর জন্য তাঁর অভিমত হল আলস্য বিসর্জন দিয়ে নারীদের অবসর সময়ের জন্য শিল্পকর্ম শেখা উচিত। 'বেঙ্গলী' জাহাজ বাঙালী স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে আহত সৈনিকদের সেবাব জন্য আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এই জাহাজের নামকরণ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ সভায় স্বর্ণকুমারী উপস্থিত ছিলেন। সেই প্রসঙ্গেই ''বেঙ্গলী'' রচিত। ভীরু বাঙালীর এহেন বীরভাবাপন্ন কাজ স্বদেশবৎসল স্বর্ণকুমারীকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর রাষ্ট্র ভাবনার সম্যক প্রকাশ :— ''এই যে অল্পবয়সের বীরভাব আত্মদানের ইচ্ছা— গভর্ণমেন্ট যদি এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইহাকে সুপথে চালিত করেন, তবেই দেশের কার্য্যে গভর্ণমেন্টের কার্যে ইহা সম্পূর্ণভাবে সার্থকতা লাভ করিতে পারে। আমাদের মনে হয়, এই নীতিই রাজদ্রোহিতা নিবারণের একটি অমোঘ উপায়। যাহারা মরিতে চায়, রাজকর্মেই তাহারা মরুক না।''

মেরী কার্পেন্টার হলে ১৩২১ সালে চৈত্র মাসে গান্ধীর পত্নী শ্রীমতী কস্তুরী বাঈ দেবীর সম্বর্ধনার জন্য বঙ্গরমণীদের যে সভা হয়, সে সভায় কাদম্বিনী গাঙ্গুলির ইংরেজী অভিভাষণের পর স্বর্ণকুমারী যে অভিনন্দনটি পাঠ করেন সেটি প্রকাশিত হয় 'ভারতী'র ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। কস্তুরীবাঈয়ের পাতিব্রত্য, আত্মোৎসর্গের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন লেখিকা।

স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য সমালোচনাগুলিতে সাহিত্য বিচার বোধ ও সত্যদৃষ্টির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য বা কাব্য মাত্রই যে জীবনসম্ভব, গভীর জীবনানুভূতি ছাড়া সার্থক সাহিত্যের সৃষ্টি যে অসম্ভব সে কথা নিঃসংশয় দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন। অনুভূতির সত্যতাই সাহিত্যসৃষ্টির একমাত্র উপাদান নয়, সুষ্ঠু প্রকাশও সফল সাহিত্যের অপরিহার্য গুণ। জীবনবোধ হীন কল্পনার আতিশয্যের সমালোচনা করেছেন স্বর্ণকুমারী। ১৩০০ আষাঢ় সংখ্যার 'ভারতী'তে সীতানাথ নন্দীর আলেখ্য গ্রন্থের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন—

"কল্পনা তাহার নবীন আরোহীকে বেশ চিনিয়া লইয়াছে; তাঁহার হাতে লাগাম। অথচ সেই প্রভু প্রকৃত আরোহী তাঁহাকে বাগ মানাইবেন কি, তাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ করিয়া সে তাঁহাকে ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে।" স্বর্ণকুমারী নিজে বাঙলাভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থ "পৃথিবী" রচনা করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন সাধারণ মানুষের জন্য বাঙলাভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার একান্তভাবে প্রয়োজন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই দায়িত্ব কিছুটা পালন করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "প্রকৃতি"র সারগর্ভ সরস সমালোচনাটিতে স্বর্ণকুমারী তাই লেখকের এই বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এছাড়া স্বর্ণকুমারীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সমালোচনা হল; রমানাথ মিত্রের "কন্যা এবং পুত্রোৎপাদিকা শক্তির মানবেচ্ছাধীনতা" নামক অনুবাদ গ্রন্থটির সমালোচনা (১৩০০ আষাঢ়)। ১৩০০ আশ্বিন সংখ্যাতেও স্বর্ণকুমারী সমালোচনা করেন প্রমথনাথ সরকারের "অভিজ্ঞান শকুন্তল" (অনুবাদ) গ্রন্থের, প্রমীলা নাগের "তটিনী" কাব্যের, শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দার্শনিক মীমাংসা গ্রন্থের (১ম ভাগ)।

'ভারতী'তে "বিবিধ প্রসঙ্গ" বা "কুড়ানো" নামাঙ্কিত স্বর্ণকুমারীর ছোট ছোট রস-রচনাগুলির উৎকর্ষও কম নয়। জীবনের খুঁটিনাটি অসঙ্গতি, নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের নিতান্ত সাধারণ ছোটখাট মনস্তত্ত্ব বা জীবনসত্যের চমৎকার প্রতিফলন এগুলি। উদাহরণত:—

"জীবনের বাকী কখনো পুরে না। বাকীতেই জীবন। মুহূর্তের বাকী পুরাইতে দিবস, দিবসের বাকী পুরাইতে মাস, মাসের বাকী পুরাইতে বৎসর চলিয়া যায়।" জীবনের অনেক সত্য এমনভাবে কবির অনুভূতির আলোকে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে এই ধরণের লেখাগুলিতে। ১২৯৫ আষাঢ়, অগ্রহায়ণ, ১২৯৪ চৈত্র, ১২৯৮ বৈশাখ, মাঘ, ১২৯৫ আষাঢ় সংখ্যার ভারতীতে স্বর্ণকুমারীর এই ধরণের কতকগুলি চুটকী প্রকাশিত হয়েছিল।

"আলিবাগের প্রধান দ্রষ্টব্য, প্রধান কৌতূহল, তাহার সমুদ্রতীরবর্তী সুদুর প্রসারিত প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ দুর্গনিকেতন"। এই দুর্গে বসে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রবল প্রতাপ বিস্তার করেছিলেন কান্‌হোজি আঙ্গ্রে। কান্‌হোজি ও দুর্গের ঐতিহাসিক তথ্য স্বর্ণকুমারী লিপিবদ্ধ করেছেন ১৩০৭ এর বৈশাখ সংখ্যার 'ভারতী'র 'কান্‌হোজি আঙ্গ্রে' প্রবন্ধে। আলিবাগ দেখতে গিয়ে কান্‌হোজির রাণীর পোষ্যপুত্রর কাছে এই তথ্য স্বর্ণকুমারী সংগ্রহ ক'রেছেন। এককালের মহা-প্রভাবশালী দুর্গ এখন নির্জন পরিত্যক্ত। শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারামের সেনাপতি ছিলেন কান্‌হোজি। প্রবল বিক্রমের জন্য কান্‌হোজিকে ইংরেজরা দস্যুর মত ভয় পেত। প্রবন্ধটিতে কান্‌হোজির শৌর্য বীর্য পরাক্রম, দৃঢ় মনোবল, সঙ্কল্প ফুটিয়ে তোলাই লেখিকার উদ্দেশ্য এবং সরল গম্ভীর ঋজু ভাষায় সে কাজে তিনি সার্থকও হয়েছেন।

এলাহাবাদ থেকে ঝুসি দেখতে গিয়ে তার মনোরম চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন স্বর্ণকুমারী ১৩১৮র 'ভারতী'তে 'ঝুসি' প্রবন্ধে। ঝুসি পুরাতন প্রতিষ্ঠান পুরের ভগ্নাবশেষ। প্রতিষ্ঠানপুরের ঐতিহাসিক খ্যাতি আছে যথেষ্ট। এখানকার একটি পুরাতন ভগ্নপ্রায় দুর্গে এক পরমহংসের সাক্ষাতে যান স্বর্ণকুমারী। গঙ্গার ঘাটের স্নানার্থীদের দৃশ্যাটি প্রবন্ধে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে লেখিকার

ভাষাচিত্রাঙ্কন নৈপুণ্যে। কেউ স্নান করছে— কেউ ফোঁটা কাটছে— তীরে নানারকম পণ্য নিয়ে বসে আছে দোকানীরা— সব নিয়ে হিন্দুতীর্থ স্থানের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে গঙ্গার ঘাটের চিত্রে। আর একদিকে ক্রমশ অবনত হয়ে সমতল হরিৎক্ষেত্রে শেষ হয়ে যাওয়া ঝুসির পাহাড় স্বর্ণকুমারীর রোমান্টিক মনকে আকর্ষণ করেছে। ঝুসি থেকে নেমে নৌকায় উঠলেন স্বর্ণকুমারী, সেখান থেকে দেখলেন গঙ্গার দুপারের দৃশ্য।

'নীলগিরির টোডা জাতি' ভারতীতে বেরোয় ১৩১৭ পৌষ সংখ্যায়। টোডাজাতি সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী এর আগে 'ভারতী'তে লিখেছিলেন ১৩০২ এর মাঘে। এবারের প্রবন্ধটি চিত্র সমেত প্রকাশিত হয়। স্বর্ণকুমারী নীলগিরিতে যখন গেছেন তখন বর্ষাকাল। নীলগিরির বর্ষায় খানিকক্ষণ মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নীলগিরির বর্ষা দেখে লেখিকার মনে পড়েছে দার্জিলিং-এর বর্ষা— "দার্জিলিং-এর বর্ষার দিনে অনবরত বৃষ্টি বর্ষণশীল মেঘাচ্ছন্ন প্রকৃতিতে একটা বিরক্তির ভাব আছে, শীতে ক্লান্তি আছে, সেখানকার রৌদ্রস্ফুট তুষার দৃশ্যও অতি মহান, অতি গম্ভীর, অতি বিস্ময়কর, তাহা কেবল দূর হইতে দর্শনের স্পর্শনের নহে, তাই তাহার মধ্যে তৃপ্তির পূর্ণ সুখ্ নাই। নীলগিরির জলবায়ু হইতে দৃশ্য সৌন্দর্য সমস্তই নিরতিশয় তৃপ্তিজনক।" নীলগিরির প্রকৃতি চিত্রণে এখানে লেখিকার ভাল-লাগার স্পর্শটি অনুভব করা যায়। এখানে ইংরাজদের দেখে তাঁর মনে হয়েছে— "যেমন পদ্মের শোভা জলে, জলের শোভা পদ্মে, সেই রূপ গিরি ও ইংরাজল না উভয়ের রূপে উভয়ে শোভা বর্ধন করেন।" টোডা পাড়ায় গিয়ে স্বর্ণকুমারী অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে দেখেছেন টোডাদের কুটীর, তাদের জীবনযাত্রা, ধর্মচর্চা ইত্যাদি। তাদের বাসস্থান আচার ব্যবহারে লেখিকা অনার্যত্বই দেখেছেন। কিন্তু আকৃতিতে তারা সুন্দর, সুশ্রী। এক একজন গ্রীক প্রস্তর ছবির মত সৌম্য সুন্দর। যুবতীরা বেশি ফিটফাট, সাজসজ্জায় বেশি মনোযোগী। তথ্যের দিক থেকে প্রবন্ধগুলি যথেষ্ট মূল্যবান। কিন্তু তথ্যভার প্রবন্ধকে কোথাও আড়ষ্ট বা ভারাক্রান্ত করে নি— বর্ণনার সাবলীল গতিটি সর্বত্রই বজায় আছে।

১৩১৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠে বের হয় "প্রয়াগের দু-একটি দৃশ্য।" স্বর্ণকুমারী নৌকো ক'রে সঙ্গম দেখতে গিয়েছিলেন প্রয়াগের মাহাত্ম্য গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমে। সরস্বতী প্রয়াগ ছেড়ে গেলেও, গঙ্গা যমুনার মিলন সৌন্দর্যে মুগ্ধ হ'তে হয়। পাণ্ডারা স্বীকার করে না সরস্বতী নেই, বলে তিনি অন্তঃশীলা বইছেন। নৌকায় দুর্গ প্রাকারের কাছে গিয়ে লেখিকার রোমান্টিক মন অতীত ইতিহাসের কল্পনাজগতে চলে গেছে। কল্পনার দৃষ্টিতে স্বর্ণকুমারী দেখেছেন— এই দুর্গে ব'সে মোগলরা ভাবতেই পারেনি একদিন এ জায়গা ইংরেজরা দখল করবে। গঙ্গা-যমুনার মিলন স্থানের জলের তোড় দেখে স্বর্ণকুমারীর মনে হয়েছে যেন দুই নারী— "কে স্বামীর কাছে অগ্রে পৌঁছিবে— এই বিবাদে উন্মাদ হইয়া যেন দুই পত্নী একজন আর একজনকে তীরবেগে ছাড়াইয়া চলিতে চাহিতেছে, পরে অতি বেগে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াই যেন শান্ত মূর্তি ধারণ করিয়াছে।" সঙ্গম স্থানটি দেখে স্বর্ণকুমারীর কৃষ্ণের মোহিণীমূর্তির কথা মনে হয়েছে। প্রচলিত বিভিন্ন প্রবাদকাহিনী ভ্রমণ নিবন্ধে গল্পরস সঞ্চার করেছে। প্রয়াগতীর্থ মন্দিরে পূর্ণ। হিন্দুর ধর্মের সংস্কারগুলিও দৃষ্টি এড়ায়নি বিচক্ষণ লেখিকার। একটু নির্জন স্থান

মাত্রই ইঁট বা পাথর বাঁধান গাছের তলায় সিঁদুর মাখান পাথর পূজো হয়, "অন্ততঃপক্ষে একটা মাটির ঢিবিও দেবতারূপে বিরাজিত।" উদার যুক্তিবাদী অধ্যাত্ম প্রেমিক স্বর্ণকুমারী মানুষের এই সংস্কার মেনে নিতে স্বাভাবিক ভাবেই কুণ্ঠিত।

এখানকার দেবস্থান ও দেবতার বিশদ বর্ণনা রয়েছে ১৩১৯-এর ভাদ্র সংখ্যার 'প্রয়াগের কয়েকটি মন্দির' রচনাটিতে। দেবপূজার প্রাবল্যের কারণও নির্ধারণ করতে যুক্তিবাদী স্বর্ণকুমারীর বিলম্ব হয়নি। তিনি এ সম্বন্ধে লিখেছেন "আমার মনে হয় সৌন্দর্য পূজার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেই প্রথমতঃ এরূপস্থলে দেবাবির্ভাব কল্পনা করা হইয়াছে। বলিতে কি আমাদের দেশের লোকের মত প্রকৃতি পূজা করিতে, স্বভাব সৌন্দর্যে দেবত্ব আরোপ করিতে আর দ্বিতীয় জাতি নাই।" ভরদ্বাজের শান্তির আশ্রমে ধূলা ময়লা, পাণ্ডাদের পয়সা চাওয়ার উৎপাত হট্টগোলে স্বর্ণকুমারীর শিল্পীমন ব্যথিত হয়েছে। অলোপীবাগের পাথরে তৈরী লাল রংয়ের স্বর্ণচূড় মন্দির, খুলদাবাদের মন্দির প্রভৃতির দেয়ালের ভাস্কর্যে মুগ্ধ হয়েছেন স্বর্ণকুমারী। দারাগঞ্জের বাসুকী মন্দির দেখে লেখিকার মনে হয়েছে "বিকালের প্রশান্ত কনক আভা প্লাবিত হরিদ্রাবর্ণের এই ক্ষেত্রাকাশ চারিদিকে কেমন একটা গম্ভীর বৈরাগ্যের তান তুলিতেছে— বাসুকীদেব সহস্র ফণা তুলিয়া যেন তন্ময় চিত্তে সেই বৈরাগ্য সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন।" 'শিবকোটির মন্দিরে' পুরোহিতদের স্তবগান শুনতে শুনতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বালির চড়া ভেঙ্গে নদীর চড়ার দিকে গিয়ে স্বর্ণকুমারী বিস্ময়ে স্তব্ধভাবে গঙ্গার তীরে গিয়ে বসলেন। মনুষ্য হৃদয়ের ভাবানুভূতির সুর যেন পেলেন গঙ্গার বুকে— "মানুষের হৃদয়ের মত গঙ্গার হৃদয়েও যেন একই সঙ্গে হাসিকান্না গাঁথা রহিয়াছে। একদিকে গঙ্গার ছোট ছোট তরঙ্গ হাসির কুলু কুলু শব্দে আমাদের পায়ের কাছের তটদেশ আঘাত করিতে লাগিল, আবার অন্যদিকে ওপারের পাড় ভাঙ্গিবার শব্দ মৃদুতর হইয়া তাহার শোকসঙ্গীতের ন্যায় কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। পূর্বদিকে মেঘের মত আবছা আবছা গাছপালার মধ্যে একটি মাত্র আলো টিপ টিপ করিতেছিল, পশ্চিম দিগন্তে গাছপালার ভিতর সন্ধ্যার তারা জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল; প্রিয়জনবেষ্টিত হইয়া তীবে বসিয়া অতি সুখের আধিক্যে মনে হইতে লাগিল, যদি মরিতে হয় এই সময় এই গঙ্গার বুকে।"

প্রয়াগের একটি প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান 'খসরুবাগ', ১৩১৯ আষাঢ় সংখ্যায় 'খসরুবাগ' প্রবন্ধে খসরুবাগের চিত্রসম্বলিত বর্ণনা রয়েছে। জাহাঙ্গীর পুত্র খসরু যখন এ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন তখন তিনি এই বাগানটি তৈরী করেন, পরে তাঁর মৃত্যু হ'লে এখানেই তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়। খসরু তাঁর দুই পুত্র সমেত শাজাহানের প্ররোচনায় ক্রীতদাস কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। খসরু ও শাজাহান দুজনেই মানসিংহের ভগ্নীর পুত্র। যে ফকিরের উপর সমাধি রক্ষণাবেক্ষণের ভার তার কাছে স্বর্ণকুমারী এ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করলেন। খসরুর সমাধি প্রাচীরে লেখা অনেক কবিতার মধ্যে সেইটিতে স্বর্ণকুমারী আকৃষ্ট হয়েছেন বেশি যার অর্থ হল "এই যে নবাব খসরু— ইনি অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রের ভারও সহ্য করিতে পারিতেন না, অঙ্গে ব্যথা লাগিত, আর এখন কত মণ পাষাণ ভারের নীচে স্বচ্ছন্দে শুইয়া আছেন।" সমাধিক্ষেত্রের এই উদাসী করুণভাবে স্বর্ণকুমারী স্তব্ধ— "অথচ এই কষ্টেবও এমন একটা আকর্ষণ আছে যে, সমাধিক্ষেত্রে আসিলে আর ফিরিতেও মন চাহে না— কে জানে মৃত্যুর মধ্যে কি মায়া নিহিত।"— সমাধিক্ষেত্রে যেন

স্নেহ প্রেম অশ্রুবেদনাব কোন মূল্য নেই— এখানে এসে জীবনের শাশ্বত সত্য, তথা মঙ্গলের বোধ জাগে— "সংসারের অনিত্যতা প্রাণের শিরায় শিরায় প্রবেশ করে, অহঙ্কার ভুলাইয়া দেয়, ক্রমে সেই কষ্টের মধ্যে একটা পবিত্র প্রশান্ত ভাব অন্তঃশীলা বহিতে আরম্ভ করিয়া সেই কষ্টকেও এমন উপভোগ্য করিয়া তোলে যে সমাধিক্ষেত্র হইতে তখন আর ফিরিতে ইচ্ছা হয় না, তাহার মধ্যে একটা সত্যমঙ্গল ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।"

প্রয়াগে যমুনাবক্ষে সুজান দ্বীপ নামে যে একটি পাহাড় দ্বীপ আছে তার চিত্রাঙ্কণ করেছেন স্বর্ণকুমারী ১৩১৯ শ্রাবণে 'সুজানদ্বীপ' প্রবন্ধে। বড়ুয়াঘাট থেকে নৌকোয় স্বর্ণকুমারী সুজানদ্বীপ দেখতে গিয়েছিলেন। বড়ুয়াঘাটের শোভা ধোপারা! "ধোপারাই বড়ুয়াঘাটের প্রধান শোভা! যমুনার ধারে সারাদিনই প্রায় সার গাঁথিয়া ধোপারা আহা ওহো শব্দ করিতে করিতে তালে তালে কাপড় কাচে। হায়! সেকালে যমুনা পুলিনে শ্যামের সেই বংশীধ্বনি— আর একালে ধোপাদের এই চীৎকার সঙ্গীত!" এই লঘু কৌতুকের পরেই লেখিকা গভীরভাবে দেখেছেন নীল আকাশ প্রতিবিম্বিত যমুনার নীল জল— যেখানে তীরের বৃক্ষচ্ছায়া কেঁপে উঠছে, সূর্যের কিরণ চিক্‌চিক্ করছে। "সমস্ত আকাশটা তাহার মধ্যে তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিতেছে পড়িতেছে।" কবিকল্পনায় স্বর্ণকুমারী দেখেছেন, "একটা ছোট্ট হৃদয়ের মধ্যে অসীম জগৎ সংসারের যেন লীলাখেলা চলিয়াছে।"

১৩২০ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে বেরোয় স্বর্ণকুমারীর 'পুরী' ভ্রমণ কাহিনী। সূর্যোদয়ের হৃদয়গ্রাহী ভাষাচিত্র অঙ্কন করেছেন স্বর্ণকুমারী। সমুদ্র স্নান এখানকার একটি আকর্ষণীয় বস্তু। নুড়িয়াদের নিয়ে সবাই স্নান করে। সমুদ্র স্নান দেখে গভীর ভাবনা এসেছে লেখিকার মনে— "ভীম তরঙ্গের উপর ক্ষুদ্র মানুষের এত সহজ প্রভুত্ব দেখিয়া আমার মনে হইত সংযমই সিদ্ধিলাভের প্রকৃত পথ। বাসনা তখনই সম্পূর্ণ সফল হয় যখন বাসনাকে জয় করা যায়। সমুদ্রের জয় তখনই যখন সে বাসনায় উন্মত্ত না হইয়া ধীর প্রশান্তভাবে তলদেশ হইতে জাহাজকে আক্রমণ করে। প্রচণ্ড ঝড়েও রক্ষা আছে— তাহাতে আর রক্ষা নাই।" বলিষ্ঠদেহ নুড়িয়াদের স্বর্ণকুমারীর 'মূর্তিমন্ত সাহস' বলে মনে হয়েছে। দেবতার থেকেও দেবস্থানের আড়ম্বব স্বর্ণকুমারীর চোখে পড়েছে। জগন্নাথ দেখার আগে পাণ্ডাদের সন্তুষ্ট করা এই রকমই একটি আড়ম্বব। মন্দিরের মনোহর কারুকার্য স্বর্ণকুমারীর শিল্পীচিত্তকে মোহিত করেছে। স্বর্ণকুমারীর অধ্যাত্ম বোধ স্পষ্ট হয়েছে জগন্নাথ দর্শনের বর্ণনায় : "জগন্নাথের দারুময় মূর্তিতে একেবারেই শিল্পসৌন্দর্যের অভাব। বস্তুতঃ এমূর্তি নিরাকার ব্যঞ্জক;— তাই ভক্ত এই মূর্তিতেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রূপ দেখিয়া থাকেন। চৈতন্য এইরূপ দেখিয়াই পাগল হইয়া ছিলেন।" দেখার আকর্ষণে আঠারনালা, চন্দন সরোবর, অন্নছত্র সব দেখেছেন স্বর্ণকুমারী— পূণ্য সঞ্চয়ের অন্ধ যুক্তিহীন বাসনা তাঁর নেই।

স্বর্ণকুমারীর নারীমনে ধর্মের কোন কুসংস্কার বা অন্ধ বিশ্বাস নেই। তাঁর ঈশ্বরবোধ অখণ্ড বিশাল প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত। এই অধ্যাত্মবোধ তাঁর সাহিত্যচিন্তাতে প্রগাঢ় গভীরতা এনে দিয়েছে। জীবনকে দেখেছেন তিনি স্বচ্ছ যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিতে। মানুষকে দেখার ক্ষেত্রেও তাঁর এই স্বচ্ছ দৃষ্টি

প্রযুক্ত। পত্র তথা প্রবন্ধগুলিতে স্বর্ণকুমারীর প্রকৃতিপ্রেমের সঙ্গে এই অধ্যাত্ম বোধ ও মানবপ্রীতি মিশেছে। ভাবে ভাষায় প্রবন্ধগুলি বাংলাসাহিত্যে বিশেষ মূল্যের দাবী রাখে।

এ ছাড়া 'ভারতী'র বিভিন্ন প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারীর রাজনীতিক চেতনারও পরিচয় রয়েছে, যেগুলির মধ্যে দিয়ে স্বদেশে বিদেশী শাসন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ইংরেজের প্রতি যে তাঁর কোন বিদ্বেষ ছিল না তা তাঁর জীবন ও বিভিন্ন লেখা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। কিন্তু তাই বলে পরাধীনতার বেদনা যে তাঁর নেই, তা নয়। তাঁর মতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্কটা ভাল হওয়া দরকার। ইংরেজ যদি কায়েমী শাসন করতে চায় ত শাসিতের প্রতি তার আরও একটু দরদী হওয়া প্রয়োজন বলে স্বর্ণকুমারী মনে করতেন। স্বাধীনতা পাওয়ার সম্পর্কে স্বর্ণকুমারীর অভিমত বিপ্লব বা অসংযমী বিদ্রোহের পথ যথার্থ পথ নয়— তা আত্মধ্বংসী— বরঞ্চ আত্ম-নির্ভরতা বা পরনিরপেক্ষ আত্মস্বাতন্ত্র্যেই স্বাধীনতা কাম্য। ইংরেজরা যখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে আমাদের আত্মনির্ভরতার বলে তখন তারা আপনা থেকেই চলে যাবে ব'লেই লেখিকার ধারণা। ইংরেজ শাসকের শোষণ তিনি সমর্থন করেন নি, আবার আমাদের তরুণদের বোমাবিপ্লবের পথও তাঁর সমর্থন পায় নি।

১৩১৫ এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতী'তে 'লর্ড কার্জন ও বর্তমান অরাজকতা' প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারীর ইংরেজ শাসনের প্রতিনিধি লর্ড কার্জনের দুর্নীতির প্রতি বিদ্বেষ ঝরে পড়েছে। কার্জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে স্বর্ণকুমারী তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। কার্জন আগে লর্ডও ছিলেন না, ধনশালীও ছিলেন না। পারস্যদেশে গিয়ে তিনি সেখানকার রীতিনীতি ও অধিবাসীদের সম্বন্ধে একটি বই লেখেন এবং সেই তাঁর সৌভাগ্যের মূল কারণ। বিবাহ ও জীবনের নানাঘটনার মধ্য দিয়ে কার্জনের চতুর কূটনীতি বুদ্ধির দ্বারা জীবনে খ্যাতি অর্জনের কৌশলটি স্বর্ণকুমারী ফোটাতে চেষ্টা করেছেন। দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা সবদিকেই কার্জন শোষণ ও কঠোরতা নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর শাসনের সবশেষ ও প্রধান কুফল ১৯০৪-এ বঙ্গভঙ্গ। এদেশবাসীর কণ্ঠে জাগল 'বন্দেমাতরম্'— তা বিদ্রোহ নয়— দুর্নীতির প্রতিবাদ। ১৯০৫-এ কার্জন এদেশ থেকে চলে গেলেন— তাঁর রাজনীতি ভারতে থেকে গেল, যার ফলে দেশে অসন্তুষ্টি, স্বদেশী আন্দোলন, ছাত্রদের 'বন্দেমাতরম্' ঘোষণা। স্বর্ণকুমারীর মতে শাসকও শাসিতের মধ্যে প্রকৃত পরিচয় থাকলে এমন হত না।

দেশ স্বাধীন করার মানসে দেশের তরুণরা যে বিদ্রোহ, বোমা বিস্ফোরণ প্রভৃতিতে মত্ত হয়েছে স্বর্ণকুমারীর মতে দেশ স্বাধীন করার প্রকৃত পথ তা নয়। তাঁর মতে দেশ স্বাধীন করতে হ'লে আমাদের জাতিধর্ম নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ১৩১৫ শ্রাবণ সংখ্যায় 'রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' আলোচনায় স্বর্ণকুমারীর এই রাজনৈতিক চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে। তিনি দেখেছেন, ''আমাদের মধ্যে চিরদিনই এই একতার অভাব। মানুষ হইয়া মানুষকে ঘৃণা করাই আমাদের ধর্ম। চণ্ডাল, যবন ম্লেচ্ছ— এসব নাম ঘৃণাসূচক সম্ভাষণ। নীচবর্ণের হিন্দুগৃহে আসিলেও গৃহের ধূলিকণা পর্যন্ত আমরা দূষিত বিবেচনা করি।'' ইংরাজের উন্নতির মূলে তাদের ঐক্যবোধ। ঐক্যের যে কতখানি শক্তি ইংরেজদের দেখে তা আমাদের বোঝা উচিত। কিন্তু আমাদের হিন্দু মুসলমানের

মধ্যে সদ্ভাব আশা যে ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'য়ে পড়ছে তাতে জাতির কল্যাণকামী স্বর্ণকুমারী শঙ্কিত। ইংরাজ শাসনই আমাদের প্রকৃত হীনতার কারণ নহে। যদি কখনও সত্য সত্য জাতিবর্ণ নির্বিচারে আমরা সমগ্র ভারতবাসী দৃঢ় গ্রথিত প্রাচীরের ন্যায় এক হইতে পারি, তখনই সহস্র ঝটিকাঘাতে অটল থাকিয়া, আমরা একটা মহৎ জাতি হইতে পারিব।'' স্বর্ণকুমারী দেখেছেন ইংরেজের শাসনে দেশের শ্রীবৃদ্ধি, কল্যাণ হয়েছে। যেখানে শাসয়িতা ও শাসিতের মধ্যে স্বার্থ সংঘর্ষ সেখানেই আমরা পেষিত হই। ক্ষমতাশালী ও অক্ষমের মধ্যে, শাসয়িতা ও শাসিতের মধ্যে, প্রভু ও দাসের মধ্যে এমন সম্বন্ধ চিরকালই থাকার— স্বদেশী সরকার হলেও থাকবে। বৈধ উপায়ে, বিচারবুদ্ধিতে, একতায়, দৃঢ় সংকল্পে কাজ করলে কতক পরিমাণে আমরা অত্যাচার অবিচার নিবারণ করতে পারব। ''যোগ্যতার জয় সর্বত্র''। যখন ধনী মধ্যবিত্ত সকলে মিলে দেশের উন্নতিতে স্বার্থত্যাগ করতে পারবে তখন আমরা অধীন হয়েও যথার্থ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারব। ''রাজা প্রজার মধ্যে সদ্ভাব সর্বতোভাবে প্রার্থনীয় এবং উভয়পক্ষ হইতেই ইহার চেষ্টা আবশ্যক।'' একজোট হ'য়ে কাজ করতে না পারলে আমাদের জাতিগত আশা দুরাশা মাত্র। শাসকের অন্যায় দেখলে যেমন অসন্তোষ স্বরূপ প্রতিবাদ প্রকাশ আবশ্যক, তেমনি বিনা কারণে ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাও স্বর্ণকুমারীর অভিপ্রেত নয়। স্বর্ণকুমারীর অভিপ্রেত হ'ল— ''আমরা একটু সুবিচার চাই, আমরা রাজনৈতিক উচ্চাধিকার চাই— আর মানুষে মানুষের নিকট যে আচরণ প্রত্যাশা করে আমরা ইংরাজের নিকট সেই আচরণটুকু চাই— প্রভু ও দাস সম্পর্কের পরিবর্তে রাজা প্রজায় বন্ধুত্বের সম্পর্কটুকু চাই।''

উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহের পথে যে দেশের তরুণেরা প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে সে পথ আমাদের লক্ষণীয় নয়। আমাদের গোড়ায় গলদ— জাতিগঠনের চেষ্টা আমাদের নেই। চরিত্রবল বৃদ্ধির চেষ্টা প্রকৃত জাতিগঠনের চেষ্টা। ১৩১৫ ভাদ্র সংখ্যায় 'আমাদের কর্তব্য' প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারী এই বিষয়েই আলোচনা করেছেন— এবং দেশ স্বাধীন করার প্রকৃত স্থির পথ নির্দেশ করেছেন। স্বদেশী গ্রহণ, বিদেশী বর্জনে আমাদের মনোযোগী হ'তে হবে. তার জন্য প্রয়োজন ধৈর্যের। তার জন্য স্বদেশী দ্রব্যের মূল্যও সুলভ করা প্রয়োজন। জাতির আকাঙ্ক্ষাকে নিয়োগ করতে হবে নানাবিধ কলাকৌশল উদ্ভাবনে বিজ্ঞানচর্চায়। একান্তচিত্তে ধীর অধ্যবসায়ে এভাবে যোগ্যতা অর্জন করলে, অনাবশ্যক হ'য়ে ইংরেজ আপনিই চলে যাবে। আমরা যোগ্য হ'লে আপনিই স্বরাজ পাব। স্বেচ্ছাসেবকদের পরোপকারে প্রবৃত্ত করতে হবে, মহিলাদের শিক্ষিত ক'রে যোগ্যতা বাড়াতে হবে।

১৩১৫ পৌষ সংখ্যার 'কর্তব্য কোন পথে' প্রবন্ধেও স্বর্ণকুমারী স্বাধীনতা অর্জনের এই পথ নির্দেশ কবেছেন। ''উত্তেজনার মুহূর্তে প্রাণদান অপেক্ষাকৃত সহজ বীরত্ব, কিন্তু আমৃত্যু কষ্টকর অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগই অধিকতর বীরত্বের পরিচায়ক।'' গৃহবিবাদ ভুলে সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে আত্মসঙ্কল্পে অটল থেকে এই পথই ভারতবাসীর একমাত্র গ্রহণীয় পথ ব'লে স্বর্ণকুমারীর অভিমত।

প্রিয়নাথ বসুর স্বদেশী সার্কাস দেখে স্বর্ণকুমারী উৎসাহী হয়েছেন বাঙ্গালীর সর্বতোমুখী

প্রতিভায় ও স্বাদেশিকতায়। বাঙ্গালীর এই ক্রীড়া-কৌতুক প্রচেষ্টায় সরকারের উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য ব'লে স্বর্ণকুমারীর ধারণা— "সকল দেশেই রাজাগণ প্রজার সুখদুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ, তাহাদের কীর্তিজনক কার্যে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। আমরাই কেবল সে সুখ হইতে বঞ্চিত। এইরূপ উপায়ে কত সহজে যে তাঁহারা আমাদের সহিত এক হইতে পারেন দুঃখের বিষয় তাহা তাঁহাবা একেবারেই দেখিতে পাননা। আর তাঁহাদের এইরূপ সহানুভূতির অভাব-বশতঃই আমাদের রাজা যে বিদেশী ইহা আমরা ভুলিতে পারি না; তাঁহারা চিরদিনই আমাদের পর থাকিয়া যান।" এই মন্তব্য থেকে ইংরেজ সরকার সম্পর্কে স্বর্ণকুমাবীর যথাযথ মনোভাবটি হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

অরবিন্দ ঘোষের (১৮৭২--১৯৫০) দেশপ্রীতি স্বর্ণকুমারীকে মুগ্ধ করেছে। পুলিশ অরবিন্দকে মকদ্দমায় জড়িয়েছিল-- পরে নিরপরাধ বলে ৬ই মে (১৯০৯) তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। সে প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী লিখেছেন— "বিধাতা অরবিন্দকে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ কবিয়াছেন। তিনি যাহাকে ভালবাসেন তাহাকে কষ্ট দিয়া নিজের কাছেই টানিয়া লন।" তাঁর মুক্তির পরদিন অনেক ছাত্ররা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। স্বর্ণকুমারীও গিয়েছিলেন তাঁকে দেখতে। অরবিন্দের সৌম্য প্রফুল্লমূর্তি দেখে স্বর্ণকুমারী খুশি হন। তাঁর শিক্ষার সার্থকতা লেখিকা অকুণ্ঠ-চিত্তে স্বীকার করেছেন— "তাঁহার আদর্শ তাঁহার শিক্ষা কেবল বঙ্গদেশের মধ্যে নহে— ভারতবর্ষে নবধর্ম নবযুগ নবজীবন সঞ্চার করিয়াছে। তাঁহার জীবন ভারতে অতুল কীর্তি। মাতৃভূমি তাঁহার নিকট জড় পদার্থ নহে, আত্মাবন্ত পদার্থ।"

সবশেষে স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পর্কে শ্রীগোপাল হালদারের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য "বাংলা সাহিত্যে স্বর্ণকুমারীদেবী প্রায় Matriarch; সত্যই রবীন্দ্রনাথের যোগ্য অগ্রজ মনে, মতে, লেখায়; সাহিত্যে আধুনিক যুগের নারীর জীবন্ত আবির্ভাব।" (বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ গোপাল হালদার। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬)।

গ্রন্থ

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় — সাহিত্য সাধক চরিতমালা। পৃঃ ১৫৪।

আত্মচরিত — রাজনারায়ণ বসু। পৃঃ ১৯-২১, ১৪৬।

আত্মচরিত — শিবনাথ শাস্ত্রী। পৃঃ ৬৭।

আত্মজীবনী— মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। পৃঃ ১৫-২১

আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস — সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ২০-২২, ২৭-২৮।

ইন্দিরা — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ১৯৭।

উপন্যাসের কথা — দেবীপদ ভট্টাচার্য। পৃঃ ১৫১।

কপালকুণ্ডলা — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ১৬৮-৬৯।

কৃষ্ণকুমারী নাটক — মধুসূদন দত্ত। পৃঃ ১৪৯।

কুমারী কার্পেন্টারের জীবনচরিত — রজনীকান্ত গুপ্ত। পৃঃ ২৭।

গীতবিতান, গ্রন্থ পরিচয়। পৃঃ ১৯৪।

ঘরোয়া — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১৪৬।

চন্দ্রশেখর — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ১৫৯।

ছিন্নপত্র — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৮৩।

জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত — যোগেশচন্দ্র বাগল। পৃঃ ১৪৫।

জীবনস্মৃতি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১৫, ৬২, ৬৮, ১৪৩-৪৬।

জীবনের ঝরাপাতা — সরলা দেবী চৌধুরাণী। পৃঃ ১৫-১১৩।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর — সাহিত্য সাধক চরিতমালা। পৃঃ ১৫২।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ — মন্মথনাথ ঘোষ। পৃঃ ৩১, ১৫৩।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি — বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। পৃঃ ২৮-৩০, ৩৫,৪৪,১০২,১৫৩।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর — সাহিত্য সাধক চরিতমালা। পৃঃ ১৭-১৯।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর — অজিতকুমার চক্রবর্তী। পৃঃ ১৭,৩৪-৩৬।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর — সাহিত্য সাধক চরিতমালা। পৃঃ ১৪৬।

নবযুগের বাঙলা — বিপিনচন্দ্র পাল। পৃঃ ১৪৭।

পদ্মিনী উপাখ্যান - রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ১৪৮-১৪৯।

স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন — পৃঃ ৬৭।

প্যারীচাঁদ মিত্র — সাহিত্য সাধক চরিতমালা। পৃঃ ৫২।

পুরাতনী — ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সম্পাদিত। পৃঃ ২৫, ৩৬, ৩৮-৩৯।

পুরাতন প্রসঙ্গ (১ম পর্যায়) — বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃঃ ৬৫।

পুরাতন প্রসঙ্গ (২য় পর্যায়) — বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃঃ ৪২।

পুরুবিক্রম নাটক — জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১৫২-৫৩।

বঙ্গবিজেতা — রমেশচন্দ্র দত্ত। পৃঃ ১৬০।

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ১৫১, ১৫৯, ১৯৫।

বঙ্গের মহিলা কবি — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। পৃঃ ৩১।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) — সুকুমার সেন। পৃঃ ৩১, ৭০, ১৪৮-৫০, ১৫৮, ২৩২-৩৩।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড) — সুকুমার সেন। পৃঃ ২৫০।

বাঙলার নারীজাগরণ — প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। পৃঃ ৫৪, ৯৭, ১০৮।

বাঙলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস — ডঃ বিজিতকুমার দত্ত। পৃঃ ৫০, ১৫৯।

বাঙলার ইতিহাস সাধনা — প্রবোধচন্দ্র সেন। পৃঃ ১৫০।

বাঙলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ — আশা দেবী। পৃঃ ৬৭।

বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ — গোপাল হালদার। পৃঃ ২৮৪।

"বির্জিতলাও" — ইন্দিরা দেবী।— "স্মৃতিকথা"— সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। পৃঃ ৬৬।

বিহারীলাল চক্রবর্তী — সাহিত্য সাধক চরিতমালা। পৃঃ ৬৫।

ভারতকোষ - (১ম খণ্ড) — বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৫৩, ১০০।

মহম্মদ মহসীনের জীবনচরিত — প্রমথনাথ মিত্র। পৃঃ ১৭৯।

"মালতী পুঁথি" — প্রবোধচন্দ্র সেন, রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা (১ম খণ্ড), বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত। পৃঃ ১৫৪।

মৃণালিনী — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ১৪৬-৪৭, ১৫৬-১৫৭।

রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচয় — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ১৯৪।

রবীন্দ্র স্মৃতি — ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। পৃঃ ৩৭, ৪৯-৫০, ৫৮-৫৯, ৭৭।

রবীন্দ্র জীবনী (১ম খণ্ড) — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ৫৮, ৭০, ৮৬, ১৪৫,১৯৪।

রবীন্দ্র স্মৃতি — সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ১০৪, ১১০।

রবিতীর্থে — অসিতকুমার হালদার। পৃঃ ১০৭-০৮

রাজপুত জীবনসন্ধ্যা — রমেশচন্দ্র দত্ত। পৃঃ ১৫৭-৫৮।

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ — শিবনাথ শাস্ত্রী। পৃঃ ১৫১।

শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী — বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৪২, ৫৬, ৬৩।

শিবনাথ শাস্ত্রী — সাহিত্য সাধক চরিতমালা। পৃঃ ৬৭।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর — সাহিত্য সাধক চরিতমালা। পৃঃ ১৪১।

স্বর্ণস্মৃতি — মন্মথ নাথ ঘোষ। পৃঃ ২৪, ৩৪, ৫৮, ৬৪, ১১৪, ১১৯।

স্বর্ণকুমারী দেবী — সাহিত্য সাধক চরিতমালা। পৃঃ ৩৪, ৫৪, ১০৯, ১২১।

সরোজিনী নাটক — জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১৪৯।

সাহিত্যস্রোত (১ম খণ্ড) — স্বর্ণকুমারী দেবী। পৃঃ ২৫, ২৬, ১০৯, ১১৬, ১১৮।

সীতারাম — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ১৮৪।

মহারাণী সুচারু দেবীর জীবনকাহিনী — প্রভাত বসু। পৃঃ ১০৯।

হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড) — বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত। পৃঃ ১৪৯।

The Annals & Antiquities of Rajsthan or the Central and Western Rajpoot States of India by Lieut. Col. James Tod. Page - 147-48, 150, 155, 157, 211, 214.

The Autobiography of an Indian Princess – Suniti Devi. Page - 98.

An unfinished Song – Swarnakumari Devi. Page - 26, 106, 110.

Bethune School and College Centenary Volume – Page - 97.

The Bride of Lammermoor – Page - 150-51, 157.

The Delhi Sultanate, History and culture of the Indian people – Bharatiya Vidya Bhavan. Page - 212.

History of Bengal – Stewart. Page - 183-85.

History of Bengal – Jadunath Sarkar. Page - 183-87.

Pramatha Nath Bose – Jogesh Chandra Bagal. Page - 60.

The Theosophical Craze ; It's History Page - 52.

পত্রিকা

"দেশ"— ১৩৫০, ২৬ চৈত্র।

—"রবীন্দ্রনাথের একটি গান"— শান্তিদেব ঘোষ। পৃঃ ১৯৪।

"দেশ"— ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, ৬ই আষাঢ়। "বাঙালী জীবনে সংস্কৃতির প্রভাব"

— শান্তিদেব ঘোষ। পৃঃ ২৩২-৩৩।

"দেশ"— সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭২।

—"কবিভ্রাতা"— পুলিনবিহারী সেন। পৃঃ ৮৬।

"দেশ"— সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৩।

—"নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত"— রথীন্দ্রনাথ রায়। পৃঃ ৭৮-৮২।

"দেশ"— ১৩৭৩, ১৭ই আষাঢ়।

—"মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়"— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পৃঃ ১১২।

"প্রবাসী"— ১৩১৮, ফাল্গুন-চৈত্র।

—"পিতৃস্মৃতি"— সৌদামিনী দেবী। পৃঃ ৭, ২০, ২২, ২৪, ২৬।

"প্রবাসী"— ১৩৩৭, বৈশাখ,

—"আমাদের কথা"— প্রফুল্লময়ী দেবী। পৃঃ ১৬, ৩২, ৩৮।

"প্রদীপ"— ১৩০৬ ভাদ্র।

— আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার"— স্বর্ণকুমারী দেবী। পৃঃ ২৩, ২৪-৩০, ৩৭, ৩৮,১১৬।

"বালক"— ১২৯২, পৃঃ ২৫, ৬৮-৬৯।

"বিবিধার্থ সংগ্রহ"— (১৭৭৩-৭৪ শকাব্দ) ১৮৫১-৫২ খ্রীঃ

—"রাজপুত্র ইতিহাস" (ধারাবাহিক প্রকাশিত)। পৃঃ ১৫৫।

"বিবিধার্থ সংগ্রহ"— ১৮৫৭, পৌষ।

—"কৃষ্ণকুমারী ইতিহাস"। পৃঃ ৩৮, ১৪৯।

"বিশ্বভারতী"— ১৩৫২ বৈশাখ-আষাঢ়।

—"দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ"—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ১৪৬।

"বিশ্বভারতী"— ১৩৫৯ কার্তিক-পৌষ, পৃঃ ১২৩-২৪।

"ভারতী ও বালক"— ১২৯৪ পৌষ, পৃঃ ৬৮-৬৯।

"ভারতী"— ১৩২০ শ্রাবণ।

—" ভুক্তভোগীর পত্র"— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ২৯।

"ভারতী"— ১৩২০ জ্যৈষ্ঠ।

—"জানকীনাথ ঘোষাল"— হিরণ্ময়ী দেবী। পৃঃ ৩৩-৬৬।

"ভারতী"— ১৩২০ বৈশাখ।

"ভারতী"— ১৩২৩ বৈশাখ।

—"কৈফিয়ৎ"— হিরণ্ময়ী দেবী। পৃঃ ৪৩-৬৬, ৯৬।

"ভারতী"— ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ,

—"পুরাতন কথা"— সরোজকুমারী দেবী। পৃঃ ৪৭, ৭৮, ১১০।

—"মিলন কথা"— গিরীন্দ্রমোহিনী। পৃঃ ৫৮, ৭০-৭৬।

—"স্মৃতি"— দেবেন্দ্রনাথ সেন। পৃঃ ৭৮, ৮৬-৮৮।

"ভারতী"— ১২৯৮, অগ্রহায়ণ, পৃঃ ২০।

"ভারতী"— ১৩০৪, মাঘ, পৃঃ ২০।

"ভারতী"— ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ২০।

"ভারতী"— ১৩১২ আশ্বিন, পৃঃ ৫৫।

"ভারতী"— ১৩২৫ পৌষ, পৃঃ ৫৫।

"ভারতী ও বালক"— ১২৯৫ বৈশাখ।

—"দার্জিলিঙ পত্র"— স্বর্ণকুমারী দেবী। পৃঃ ৮৩-৮৫।

"ভারতী ও বালক"— ১২৯৬, জ্যৈষ্ঠ।

—"গাজিপুর পত্র"— স্বর্ণকুমারী দেবী। পৃঃ ৮৬-৮৭।

—১২৯৬, ভাদ্র, " গাজিপুর পত্র", পৃঃ ৮৬-৮৭।

"ভারতী ও বালক"— ১২৯৮ আশ্বিন ও কার্তিক,

—"পত্র"— স্বর্ণকুমারী, পৃঃ ৯২।

— ১২৯৯, আষাঢ়।

—"পত্র"— স্বর্ণকুমারী, পৃঃ ৯২।

"ভারতী"— ১৩৩১ আশ্বিন।

—"কবি গিরীন্দ্রমোহিনী"— স্বর্ণকুমারী। পৃঃ ৭০-৭২।

"ভারতী"— ১৩৩৩ বৈশাখ।

—"ভারতী স্মৃতি"—অনুরূপা দেবী, পৃঃ ৯৯-১০১।

'সখা'— ১৮৮৩, জানুয়ারী, পৃঃ ৬৭।

"সাহিত্য"— ১৩০৬ ভাদ্র। পৃঃ ২০৭।

"সাহিত্য"— ১৩০৭ শ্রাবণ, পৃঃ ২০৯।

"সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা"— ১৩৬৭, ২য় সংখ্যা, ৬৭ বর্ষ।

—"হিন্দুমেলার বিবরণ"— শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। পৃঃ ১৪৪, ১৪৭।

The Calcutta Municipal Gazette, 1932, 9th July, Page - 54, 124.

Government of Bengal, Hooghly College Register 1836-1936. By members of the College staff, Part-c. Page - 60.

Presidency College, Calcutta Centenary volume 1955. Page - 60.